قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

বলে দিনঃ এই আমার পথ। আমি মানুষকে **আল্লাহর দিকে আহ্বান করি** সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণ। আল্লাহ পবিত্র। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। *(সূরা, ইউসুফ ১২:১০৮)*

আল্লাহর দিকে আহ্বান

لا إله إلا الله

"আল্লাহ ব্যতীত কোন (হক্) ইলাহ নেই"

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"আল্লাহ স্বাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই **তিনি ব্যতীত কোন হক্ ইলাহ নেই**। ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানবান লোকেরা সততা ও ইনসাফের সাথে এ স্বাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহা পরাক্রমশালী এবং বিজ্ঞানী ছাড়া কেহই ইলাহ হতে পারে না।"

(আল ইমরান: ১৮)

- কুরআন
- হাদীস
- সালফে সালেহীন এবং
- তাদের অনুসারীদের লেখনী থেকে সংকলিত।

http://IslamiSangkolon.wordpress.com

সূচীপত্র

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ তায়ালার। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই সাহায্য কামনা করি। তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই। আমাদের নফ্‌সের সকল অনিষ্টতা এবং আমাদের সকল কর্মের ভুল-ভ্রান্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। আর যাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেন, কেউ তাকে হেদায়েত দান করতে পারে না। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল।

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার বানীঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" *(আল-ইমরান ৩ঃ ১০২)*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।" *(আন-নিসা ৪ঃ১)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" *(আল-আহযাব ৩৩ঃ ৭০ -৭১)*

অতঃপর রাসূল (সঃ) এর বানীঃ "নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বানী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হচ্ছে নবীর (সঃ) পথ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হল দ্বীনের ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কৃত বিষয়, প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বিষয় বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হল জাহান্নাম"। *(সুনানে ইবনে মাজাহ, সহীহ)*

যুগে যুগে নবী-রাসূলরা প্রেরিত হয়েছিলেন মানবজাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার জন্য, হেদায়েতের রাস্তা দেখানোর জন্য। যারাই সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তারাই সফলতা লাভ করেছে। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্‌ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।" *(সূরা, নাহল-১৬ঃ৩৬)*

আমরা **"আল্লাহর দিকে আহ্বান"** সংকলনে নবী-রাসূলরা যে আহ্বান নিয়ে এ যমীনে এসেছিলেন সে প্রকৃত আহ্বান তুলে ধরেছি সে সব সত্যের অনুসন্ধানীদের জন্য যারা সিরাত্বাল মুস্তাক্বিম বা সঠিক পথের অনুসরণে সফলতা এবং মুক্তি লাভ করতে চান, যারা আল্লাহ ছাড়া যত বাতিল ইলাহ (মা'বুদ) আছে তাদের দাসত্বকে পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে চান। এটি আমরা এমন এক চমৎকার ধারায় সংকলন করেছি যে কেউ এটা অধ্যয়ন করলে তাওহীদ, ঈমান এবং ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করতে পারে। এটি সংকলনের সময় আমরা কোন ব্যক্তি বা দলের অন্ধ অনুসরণ করিনি কারণ

একমাত্র আল্লাহর রাসূল ছাড়া এ সৃষ্টি জগতে কারো অন্ধ অনুসরণ বৈধ নয়। আমাদের একমাত্র মানদন্ড হচ্ছে কুরআন এবং সুন্নাহ। আমরা এ সংকলনে কোন ব্যক্তি থেকে ততটুকুই গ্রহন করেছি যতটুকু কুরআন এবং সুন্নাহের মধ্যে এর বাইরে কোন কিছু গ্রহন না করার একান্ত চেষ্টা করেছি। আল্লাহর কসম! এর সংকলনের পেছনে কোন স্বার্থপরতা জড়িত নেই শুধু একথা ছাড়াঃ

"আর হে আমার জাতি! আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌র জিম্মায় রয়েছে" *(সূরা, হুদ ১১ঃ২৮)* ।

এ সংকলনের পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য একটাই মানবতার কল্যান, যেন মানুষেরা অন্য সব কিছুর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদতের দিকে ফিরে আসে। হে আল্লাহর বান্দা আল্লাহ্‌ আপনাকে সত্য পথের দিশা দান করুন! এ সংকলনটি আপনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে পাঠ করুন, আমরা আশাবাদী আল্লাহ্‌ হয়তো আপনাকে এর মাধ্যমে হেদায়েত দান করবেন। কারণ আল্লাহতো আপনাকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টির অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, আপনি তো ভাল-মন্দ বুঝতে পারেন।

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার বানীঃ **"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে-এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়।"** *(সূরা, দাহর ৭৬ঃ২-৩)*

আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সেই বানীঃ **"যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।"** *(সূরা, বনী ঈসরাঈল ১৭ঃ১৫)*

আল্লাহর দিকে নবী-রাসূলদের আহ্বান

মানবজাতিকে (অর্থাৎ সর্বপ্রথম মানব আদম ও তাঁর স্ত্রীকে) এ দুনিয়ায় পাঠানোর সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেছিলেনঃ **“আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে।”** *(সূরা, বাকারা ২ঃ ৩৮)*

যুগে যুগে নবী-রাসূলরা সে হেদায়েতের আহ্বান নিয়ে মানবজাতির কাছে এসেছিলেন। আমাদের ঐ সত্য পথের অনুসরণ করার জন্য জানা প্রয়োজন নবী-রাসূলদের আহ্বান সম্পর্কে, যাতে আমরা মুক্তি ও সফলতা লাভ করতে পারি। আল্-কুরআনের অনেক স্থানে আল্লাহ (সুবঃ) নবী-রাসূলদের আহ্বানের বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে আমরা আল-কুরআন থেকে কয়েকজন নবী এবং রাসূলের আহ্বান তুলে ধরছি-

নূহ (আঃ) *এর আহ্বানের ব্যাপারে আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ*

“আর অবশ্যই আমি নূহ (আঃ) কে তাঁর জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি, (তিনি বললেন) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করছি।” *(সূরা, হুদ ১১ঃ২৫-২৬)*

ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর কওমকে এই বলে আহ্বান জানিয়েছিলেনঃ

“হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত। হে আমার সম্প্রদায়, আমি একমুখী হয়ে স্বীয় আনন ঐ সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেক নই।” *(সূরা, আন'আম ৬ঃ৭৮-৭৯)*

“স্মরণ কর ইব্রাহীমকে। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন; তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বোঝ।” *(সূরা, আনকাবুত ২৯ঃ ১৬)*

হুদ (আঃ) *এর আহবানঃ*

“আর আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছি; তিনি বলেন-হে আমার জাতি, আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই।” *(সূরা, হুদ ১১ঃ ৫০)*

সালেহ (আঃ) এর আহবানঃ

“আর সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহ কে প্রেরণ করি; তিনি বললেন-হে আমার জাতি। আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নাই।” *(সূরা, হুদ ১১ঃ ৬১)*

ইউসুফ (আঃ) এর আহ্বানের অংশবিশেষঃ

“হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ্ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।” *(সূরা, ইউসুফ ১২ঃ৩৯-৪০)*

আল্লাহর একক সার্বভৌমত্বের দাবীদার ত্বাগুত ফিরাউনের উদ্দেশ্যে *মুসা (আঃ)* বলেছিলেনঃ

“আল্লাহ্র বান্দাদেরকে আমার কাছে অর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত বিশ্বস্ত রাসূল। আর তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না।” *(সূরা, আদ-দোখান ৪৪ঃ ১৮-১৯)*

ঈসা (আঃ) এর আহ্বানঃ

“নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তার ইবাদত কর। এটা সরল পথ।” *(সূরা মারইয়াম ১৯ঃ৩৬)*

মুহাম্মদ (সঃ) রিসালাত পাওয়ার পর থেকে আমৃত্যু আল্লাহর দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন এই বলেঃ

‘ইয়া আইয়ুহান্ নাস **কুলু** لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ তুফলেহাও’ হে লোক সকল! তোমরা বল لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। (*আহমাদ, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*)। মুহাম্মদ (সঃ) এর আহ্বান এর ব্যাপারে আল্লাহ বলেনঃ

“যেন তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাঁরই পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা। আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক আমলকারীকে বেশী করে দেবেন আর যদি তোমরা বিমুখ হতে থাক, তবে আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।” *(সূরা, হুদ ১১ঃ২-৪)*

রাসূল (সঃ) যখন মুশরিকদের বাতিল ইলাহদের বর্জন করে এককভাবে শুধু আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন তারা জবাবে বলেছিলঃ “আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মা'বুদগুলোকে বর্জন করব?” *(সূরা, সাফফাত ৩৭ঃ৩৬)*

আহলে কিতাবদের আহ্বান করার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূল (সঃ) কে শিক্ষাদান করেনঃ

“বলঃ ‘হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া আমাদের কেউ কাউকে রব হিসেবে গ্রহন করব না। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলে দাও যে, ‘সাক্ষী থাক আমরা তো মুসলিম।” *(সূরা, আল- ইমরান ৩ঃ৬৪)*

উপরোক্ত আল্লাহর বানীগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় সমস্ত নবী-রাসূলরাই এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, কুরআনে সূরা নাহলের ৩৬ নং আয়াতে রাসূলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

“আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য।” *(সূরা, নাহল ১৬ঃ৩৬)*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আরো বলেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

অর্থ: **“আমি তোমার পুর্বে এমন কোন রাসূল পাঠাইনি তার কাছে এই ওহী ছাড়া যে (لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا) আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই (فَٱعۡبُدُونِ) সুতরাং আমারই ইবাদত কর।”** *(সূরা, আম্বিয়া ২১:২৫)*

সুতরাং সমস্ত নবী-রাসূলগনের আহ্বানের কালিমা ছিল একটাইঃ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ-আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা মানুষকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহর (সুবঃ) বানীঃ

“মানুষের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে-তাকে পরীক্ষা করব, অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়।” *(সূরা দাহর ৭৬ঃ১-৩)*

আল্লাহ্ (সুবঃ) মানবজাতিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি এবং ভাল-মন্দের জ্ঞান দান করেছেন। সামান্য বীর্য কণা থেকে সৃষ্টি করে আল্লাহ্ মানুষকে অনেক উত্তম অবস্থানে নিয়ে এসেছেন, অন্যান্য প্রানী থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তাদের জীবিকার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস তিনিই সরবরাহ করছেন। আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেনঃ

"নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" *(সূরা, বনী ঈসরাঈল ১৭ঃ৭০)*

আল্লাহ্ মানবজাতির জন্য এ যমীনকে সম্পূর্ণ বসবাস উপযোগী করে দিয়েছেন, আসমানকে তাদের জন্য করেছেন ছাদ স্বরূপ। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

"তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে।" *(সূরা, বাকারা ২ঃ২১-২২)*

এতসব আল্লাহ্ (সুবঃ) এমনি এমনিই দেননি। এসব কিছুর পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেনঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

"তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?" *(সূরা, মু'মিনুন ২৩ঃ১১৫)*

মানুষ সৃষ্টির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুবঃ) তায়ালা বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থাৎ **"আমি মানুষ এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য"**। *(যারিয়াত ৫১ঃ৫৬)*

আয়াতের ليعبدون এর ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেন □ □ □ □ □ □ □ অর্থাৎ আমার (আল্লাহর) একত্বকে মেনে নেয়ার জন্যই আমি তাদের সৃষ্টি করেছি। সুতরাং তাওহীদকে মেনে নিয়ে এককভাবে শুধু আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই আল্লাহ (সুবঃ) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর এ দিকেই সমস্ত নবী-রাসূলগণ আহ্বান করেছিলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসুল প্রেরন করেছি আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য।" *(সূরা, নাহল ১৬ঃ৩৬)*

সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর হক্ হচ্ছে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা। রাসূল (সঃ) বলেছেন-"বান্দার প্রতি আল্লাহর হক্ হচ্ছে তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না।" *(মুসলিম, ইফাবা/৫০)*

সুতরাং যে ব্যক্তি শরীকবিহীন অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পূরণ করল, আল্লাহর হক্ আদায় করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীক করল সে সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর হক্ আদায় করল না। সে তার নিজের ধ্বংস ডেকে আনল, সে কাফির, মুশরিক এবং অকৃতজ্ঞ। অতএব একজন মানুষের উচিত তার নিজের মুক্তির জন্য নিম্নের তিনটি বিষয়ে জানা এবং নিজের জন্য মেনে নেয়াঃ

১। এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা;

২। আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা;

৩। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে রব এবং ইলাহ হিসেবে গ্রহন না করা;

আর لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـٰهُ কালেমার স্বীকৃতির মাধ্যমে উপরোক্ত তিনটি জিনিসেরই স্বীকৃতি দেয়া হয়;

কালেমা لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা

হে আল্লাহর বান্দারা (আল্লাহ্ আপনাদের সত্য পথের দিশা দান করুন) আপনারা জেনে রাখুন ইসলামে প্রবেশের একটি মাত্র কালেমা لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ ইহাকে কালেমা তাইয়েবা বা কালেমাতুত তাওহীদ বলে। এ কালেমার স্বাক্ষ্য দানের মাধ্যমে একজন মানুষ তাওহীদ কে মেনে নেয়, ইসলামে প্রবেশ করে এবং মুসলিমে পরিণত হয়। অপরদিকে যে এ কালেমার স্বাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাকে সে কাফির এবং মুশরিক থেকে যায়। এ কালেমা সম্পর্কে জানার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা নির্দেশঃ

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

"তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।" *(মুহাম্মদ ৪৭ঃ১৯)*

রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই"একথা জানা অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম)*

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

আল্লামা শাইখ আব্দুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ (রহঃ) বলেছেনঃ "লা ইলাহা ইলালাহর অর্থসহ সেই এলমে ইয়াকীনী বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যা نفی اثبات (কি অস্বীকার করা হয় আর কি সাব্যস্ত করা হয় তা) সহ জানা আল্লাহ্ ওয়াজিব করে দিয়েছেন।" *(আদ দারু সুন্নাহ)*

শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আবদির রাহমান আবা বাতিন (রহঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

هَـٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

'বস্তুতঃ সকল মানুষের জন্য এটা একটা পয়গাম। যাতে এর দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং তারা জেনে নিবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ শুধু একজনই, আর বুদ্ধিমান যাতে লোকেরা উপদেশ গ্রহন করে।" *(সূরা ইবরাহীম ১৪ঃ ৫২)*

وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ

إلا من شهد بالحق وهم يعلمون

শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেছেন, "অর্থ জানা ব্যতীত এবং কালেমা (লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ) এর দাবী মোতাবেক কর্ম সম্পাদন ব্যতীত শুধুমাত্র শাব্দিক স্বাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না। বরং এ মৌখিক স্বাক্ষ্য আদম সন্তানের বিরুদ্ধে একটি দলিল হিসেবে বিবেচিত।" তিনি আরও বলেন, "আপনি জেনে রাখুন (আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন) যে, নামাজ-রোজা ফরজ কিন্তু এরও আগের ফরজ হচ্ছে لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ 'র স্বাক্ষ্য দানের বিষয়টি জেনে নেয়া। অতএব নামাজ-রোজার গবেষণার অপরিহার্যতার চেয়ে বান্দার জন্য অধিকতর অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ এর অর্থ নিয়ে গবেষণা করা।

এ কালেমা সম্পর্কে জানা অপরিহার্য এ জন্য যে, "আল্লাহ এক এবং তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য হকদার" এটা না জানলে কোন ব্যক্তির ইসলামে প্রবেশ গ্রহনযোগ্য নয়। এ জন্যই তাওহীদের ইলমকে বান্দার ইসলাম কবুলের শর্তরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজেকে মুসলিম দাবী করে তার প্রতি ফরজ হচ্ছে সে এ কালেমার অর্থ, গুরুত্ব, মর্যাদা, ফযীলত, এর রোকন ও এর শর্তাবলী জেনে নেবে; যেন এর দাবী পুরণ করতে পারে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভ করতে পারে। কারণ এ কালেমা সম্পর্কে অজ্ঞতা, মুর্খতা বান্দার ব্যর্থতা এবং চিরস্থায়ী ধ্বংস ডেকে আনে। আসুন, আমরা সকলে এ কালেমা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জেনে নেই।

কালেমা لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ সম্পর্কে বর্তমানে অধিকাংশ লোকের অবস্থা

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ এ কালেমা সম্পর্কে অজ্ঞ, একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তায়ালা যার প্রতি করুনা করেছেন, আর শিরক্ থেকে রক্ষা করেছেন, সে ছাড়া অধিকাংশ লোকের মধ্যেই কতিপয় শিরক্ লুকায়িত আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। অধিকাংশ লোকের অবস্থা হচ্ছে তারা জানে না এ কালেমার অর্থ কি, কি এর গুরুত্ব ও মর্যাদা, এ কালেমার দাবীই বা কি, এ কালেমার স্বাক্ষ্য দানের মাধ্যমে কি তারা স্বীকার করে নিয়েছে আর কি অস্বীকার করেছে। তারা দাবী করছে আমরা মুসলিম আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর করো ইবাদত করি না অথচ তারা বাস্তবিকভাবে আল্লাহর পাশাপাশি অন্য অনেক কিছুর ইবাদত করছে।

আল্লাহ্র (সুবঃ) বানীঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ

অর্থাৎ **"অনেক মানুষ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।"** *(সূরা, ইউসুফ ১২:১০৬)*

বর্তমানে এ আয়াতের বাস্তবতায় দেখছি অধিকাংশ মানুষ মুখে ঈমানের দাবী করা সত্বেও কর্মের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সাথে শিরক্ করছে। বর্তমান সময়ের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে শেখ মুহাম্মদ আলী আল রাফাঈ বলেন- "অধিকাংশ মুসলমানই এ ভুল ধারণা করে যে, কালেমাটি মুখে উচ্চারণ করলে অথবা মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহন করলে ও লালিত পালিত হলে এবং একটি মুসলিম নামধারণ করলেই মুসলমান হওয়া যায়। তার কাজকর্ম, জীবন-যাপন পদ্ধতি যাই হোক না কেন। এটি খ্রিষ্টানদের একটি আক্বীদা। সাহাবাদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাস্তবিকভাবে, তাদের এবং আমাদের কালেমা বোঝার ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের পতাকাতলে নিজেকে দাখিলের জন্য প্রত্যেকেরই কালেমাকে সঠিকভাবে উপলব্দি এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।"

لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ এর গুরুত্ব ও মর্যাদা

لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ এর গুরুত্ব যে কত অপরিসীম, এর মর্যাদা যে কত উচ্চ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ক্ষুদ্র পরিসরে তা বলে শেষ করার মত নয়। তবুও সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা এ কালেমার গুরুত্ব এবং মর্যাদা তুলে ধরছি।

১. لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ এটি ইসলামের মূল কালেমা। এর স্বাক্ষ্য দানই ইসলামে প্রবেশের একমাত্র রাস্তা। কেউ বুঝে শুনে এ কালেমার স্বাক্ষ্য দিলে সে হবে মুসলিম, আর অস্বীকার করলে সে হবে কাফির। এ হচ্ছে এমন এক কালেমা যা মানুষের ঈমান এবং কুফরীর মধ্যে পার্থক্য করে দেয়। সবারই একথা জানা আছে যে, একজন অন্য ধর্মাবলম্বী যদি ইসলামে আসতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই এ কালেমার স্বীকৃতি দিতে হয়। বর্তমানে যারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করছে তাদের জন্যও অবশ্যই জরুরী যে তারা বুঝে-শুনে এ কালেমার স্বাক্ষ্য দেবে অন্যথায় তাদেরও মুসলিম দাবী করা বৃথা হবে।

   রাসূল (সঃ) যখন মুয়ায (রাঃ) কে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, নিশ্চয়ই তুমি আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। সুতরাং তুমি প্রথমে তাদেরকে কালেমা لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ 'র দাওয়াত দিবে- -------- । *(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)*

২. নাবী-রাসুলদের মূল দাওয়াতই ছিল لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ এর দিকে আহ্বান করা, যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা মানব জাতির হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

   وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

   অর্থঃ **"আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল পাঠাইনি তার কাছে এই ওহী ছাড়া যে (لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا) আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই (فَٱعْبُدُونِ) সুতরাং আমারই ইবাদত কর।"** *(সূরা, আম্বিয়া ২১:২৫)*

   সুতরাং এ কালেমার দাওয়াতই সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াত, এ কালেমাকে মেনে নেয়াই হেদায়েতের রাস্তা গ্রহণ করা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যানকে মেনে নেয়া।

৩. কালেমা لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ ইসলামের মূল ভিত্তি। ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির প্রথম ভিত্তি হচ্ছে শাহাদাতাইন বা দুটি বিষয়ে স্বাক্ষ্য দেয়া। প্রথম যে বিষয়ে স্বাক্ষ্য দিতে হয় তা হচ্ছে لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ। আল্লাহর রাসুল বলেছেন:- "ইসলাম ভিত্তি পাঁচটি। এ স্বাক্ষ্য দেয়া যে, "আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ)

আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুল। সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, (আল্লাহর) ঘরের হাজ্জ আদায় করা এবং রমযান মাসে সিয়াম পালন করা।" *(বুখারী, মুসলিম)*

এটা যেহেতু ইসলামের মুল ভিত্তি, এখন কেউ যদি বলে আমি মুসলিম, আমার দ্বীন ইসলাম তাহলে অবশ্যই তাকে এ কালেমার স্বাক্ষ্য জেনে-শুনে দিতে হবে এবং এটাকে দৃঢ়ভাবে গ্রহন করতে হবে।

৪. কালেমা: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ হচ্ছে ঈমানের সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) বলেন- "ঈমানের শাখা সত্তুরটিরও কিছু বেশী। এর সর্বোচ্চ শাখা لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ এ কথা স্বীকার করা। আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া"। *(বুখারী, মুসলিম)*

এখন কেউ যদি ঈমান গ্রহন করতে চায় তবে অবশ্যই এ কালেমাকে স্বীকার করতে হবে। আর যারা কুফরীতে নিমজ্জিত থাকতে চায়, তারাই এ কালেমার স্বাক্ষ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

৫. কালেমা لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ কে মেনে নেয়া এবং সে অনুযায়ী কাজ করা, বান্দার প্রতি আল্লাহর হক্। কারণ এ কালেমা স্বাক্ষ্য দানের মাধ্যমে বান্দাহ্ তাওহীদ কে মেনে নেয়। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে এক ও একক হিসেবে মেনে নেয় এবং যাবতীয় ইবাদত শুধু তাঁর জন্য নিবেদন করবে এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক করবে না বলে স্বীকৃতি দেয়। রাসূল (সঃ) বলেছেন- "বান্দার প্রতি আল্লাহর হক্ হচ্ছে তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না।" *(মুসলিম, ইফাবা/৫০)*

৬. এ কালেমার জন্য আল্লাহতায়ালা মানুষ এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ কালেমার স্বীকৃতির মাধ্যমে বান্দাহ্ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্বকে মেনে নেয়। আল্লাহতায়ালা বলেছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি মানুষ এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য"। *(যারিয়াত, ৫১:৫৬)*

আয়াতের لِيَعْبُدُونِ এর ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেন □ □ □ □ □ □ □ অর্থাৎ আমার (আল্লাহর) একত্বকে মেনে নেয়ার জন্যই আমি তাদের (মানুষ ও জ্বিন) সৃষ্টি করেছি।

৭. لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ এমন এক মহান কালেমা যার স্বাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহতায়ালা, ফেরেশতা এবং যারা জ্ঞানবান তারা দিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা বলেছেনঃ

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"আল্লাহ্ স্বাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন হক্ ইলাহ নেই। ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানবান লোকেরা সততা ও ইনসাফের সাথে এ স্বাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহা পরাক্রমশালী এবং বিজ্ঞানী ছাড়া কেহই ইলাহ হতে পারে না।" *(আল ইমরানঃ ১৮)*

আল্লাহ্ বলেছেন যারা জ্ঞানী তারা সততা এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এ কালেমার স্বাক্ষ্য দেয়। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে যারা অজ্ঞ, মূর্খ, জাহেল তারাই এ কালেমার স্বাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকে।

৮. لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ এমন এক কালেমা যে, আসমান-যমীন এবং এবং এর মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা যদি এক পাল্লায় তোলা হয় আর لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ কে অপর পাল্লায় তোলা হয় তবে لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ এ পাল্লাই ভারী হবে।

হাদীসে এসেছে আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন– মুসা (আঃ) বলেন, 'হে আমার রব আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি আপনাকে ডাকতে পারি এবং আপনার যিক্র করতে পারি। আলাহ তা'য়ালা বললেন, "হে মুসা! বল- لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ। মুসা (আঃ) বললেন, হে আমার রব আপনার সমস্ত বান্দারাতো ইহা বলে। আল্লাহ আহ্কামুল হাকিমিন, রাব্বুল আলামীন যিনি সব জানেন যেখানে আমরা কিছুই জানিনা, তিনি নাযিল করলেন, "হে মুসা! আমি ছাড়া সাত আকাশ এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু আছে এবং সাত যমীন যদি পাল্লার এক দিকে স্থাপন করা হয় এবং অপর দিকে لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـهُ কে স্থাপন করা হয় তবে দ্বিতীয় অংশটি ভারী হয়ে যাবে।' *(ইবনে হিব্বানঃ২৩২৩, আল-হাকিম ১/৫২৮)*

৯. এ কালেমার স্বীকৃতি দেওয়া না দেওয়ার উপরই নির্ভর করে বান্দার সফলতা ব্যর্থতা। যে এ কালেমাকে মনে-প্রানে গ্রহন করল সে জান্নাত লাভ করবে। আর জান্নাত পাওয়া বান্দার অনেক বড় সাফল্য। আল্লাহতায়ালা বলেনঃ

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। এটা অনেক বড় সাফল্য।" *(সূরা বুরুজ, ৮৫ঃ১১)*

আর এ কালেমার স্বাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তি যে চূড়ান্ত ব্যর্থতা জাহান্নাম থেকে বেঁচে চূড়ান্ত সফলতা জান্নাত লাভ করবে। এ ব্যাপারে রাসূল (সঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি এর নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(মুসলিম, ইফাবা/২৩)*

রাসূল (সঃ) আরও বলেন, "আল্লাহতায়ালা ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের আগুন হারাম করে দিয়েছেন যে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য- উচ্চারণ করেছে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

মূলকথা হচ্ছে তাওহীদই ইসলামের শুরু ও শেষ, জাহেরী-বাতেনী এবং মুখ্য উদ্দেশ্য। আর ইহাই সকল রাসূল (আলাইহিস সালাম) এর দাওয়াত ছিল। এ তাওহীদ (কায়েম) এর লক্ষ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন, সকল নাবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন এবং সব আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর এ তাওহীদের কারণেই মানুষ মু'মিন-কাফির, সৌভাগ্য-দূর্ভাগ্যে বিভক্ত হয়েছে। আর তাওহীদই বান্দাদের উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব। সর্বপ্রথম এর মাধ্যমেই ইসলামে প্রবেশ করে। এবং এ তাওহীদ নিয়েই দুনিয়া ত্যাগ করে।

তাওহীদের উপকারিতা

কালেমা এর স্বীকৃতির মাধ্যমে মূলত তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়া হয়। তাওহীদের শাব্দিক অর্থ একীকরণ (কোন কিছু এক করা) অথবা দৃঢ়ভাবে এককত্ব ঘোষণা করা। কিন্তু যখন তৌহিদ শব্দটি আল্লাহর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন আল্লাহ সম্পর্কিত মানুষের সকল পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কর্মকান্ডে আল্লাহর এককত্ব উপলব্ধি করা ও তা নিরবচ্ছিন্নভাবে অক্ষুন্ন রাখা বুঝায়। মানুষের একক ও সমষ্টিগত জীবনে 'র স্বাক্ষ্য দানের মাধ্যমে যখন সত্যিকার তাওহীদ আসবে তখন অতীব সুন্দর ফল পাওয়া যাবে। ঐ সমস্ত লাভের মধ্যে আছেঃ

১. তাওহীদ মানুষকে অপরের দাসত্ব থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে নত হওয়া এবং ঐ সমস্ত সৃষ্টি যারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের কোন ক্ষমতা নেই নিজেদের ক্ষতি ঠেকাতে বা ভাল করতে, না তারা মৃত্যু দেয়ার অধিকারী, না কবর থেকে বাঁচানোর ক্ষমতার অধিকারী, তাওহীদ ঐ সমস্ত কিছুর ইবাদত করা হতে মানুষকে মুক্তি দেয়; অপরের গোলামী করা হতে বাঁচিয়ে ঐ এক আল্লাহর দাসত্বে লাগিয়ে দেয় যিনি তার প্রতিপালক ও স্রষ্টা। তার বুদ্ধিকে নানা ধরনের কুসংস্কার ও মিথ্যা ধারণা হতে স্বাধীন করে। এজন্য কুরআন পাকে দেখা যায় মুশরিকদের নেতারা ও অজ্ঞ সীমালঙ্ঘনকারীরা সর্বদাই সমস্ত নবীদের দাওয়াতের বিরোধিতা করেছে এবং বিশেষভাবে আমাদের রাসূল (সঃ)-এর দাওয়াতের কারণ তারা বুঝত যে যখনই কেউ বলবে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখনই সে মানুষের গোলামী করা হতে স্বাধীন হয়ে যাবে এবং সে অত্যাচারের বেড়াজাল ছিড়ে ফেলবে, মুমিনদের কপাল উঁচু হবে এবং তারা বিশ্বজগতের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে তা নত করবে না।

২. তাওহীদ সঠিক ব্যক্তিত্ব গড়তে সহায়তা করে। মানুষ এতে সঠিকভাবে জীবন গঠন করতে পারে এবং সত্যিকারের দিক নির্দেশনা পায়। তার লক্ষ্য বস্তুকে নির্দিষ্ট করে দেয়। কারণ সে বুঝে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপায় নাই। ফলে তাঁর দিকে গোপনে ও প্রকাশ্যে মুখ ফেরাতে পারে। সুখে ও দুঃখে তাঁকে ডাকতে পারে। অন্যদিকে মুশরিকদের আত্মা নানা ধরনের রব ও উপাস্যের প্রতি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। ফলে একবার সে জীবিতদের দিকে মুখ ঘোরায়, আবার সে মৃতদের দিকে ঘুরে। এ কারণেই ইউসুফ (আঃ) বলেছেনঃ

   অর্থাৎ, "হে আমার জেলের সাথীদ্বয়! নানা ধরনের রবই উত্তম, না এক আল্লাহ যিনি একক এবং সর্বোচ্চ শক্তিধর।" *(সূরা ইউসুফঃ ৩৯)*

   তাই মুমিন এক আল্লাহর ইবাদত করেন। তিনি জানেন কি করলে তার রব খুশী হবেন, আর কি করলে তিনি নারাজ হবেন। তাই যে কাজে তিনি খুশী হন তাই করতে থাকেন। ফলে তার অন্তর শান্ত হয়ে যায়। আর মুশরিক নানা ধরনের উপাস্যের উপাসনা করে। কোনটা তাকে ডানে নিয়ে যায়, কোনটা বামে। আর তার মাঝে পড়ে সে হয় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এতে তার মনে কোন শান্তি থাকে না।

৩. তাওহীদ হচ্ছে মানুষের জীবনে নিরাপত্তার ভিত্তি। কারণ, এর দ্বারাই সে নিরাপত্তা ও শান্তি পায়। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। তা ভয়ের সমস্ত দ্বার বন্ধ করে দেয়, যেমন রিযিকের ব্যাপারে, জানের ব্যাপারে, পরিজনের জন্য, মানুষ হতে ভয়, জিন হতে, মৃত্যু হতে এবং অন্যান্য ভয়-ভীতি হতেও। একত্ববাদী মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অন্যেরা

যখন ভয়ের মধ্যে থাকে তখন তাকে দেখবে নির্ভীক। যখন মানুষ চিন্তা পেরেশানীতে জর্জরিত, তখন সে অবিচলিত থাকে। এদিকে নির্দেশ করে কুরআন পাক বলেনঃ

অর্থাৎঃ **"যারা ঈমান এনেছে এবং তার সাথে শির্ককে জড়িত করেননি, তাদের জন্যই রয়েছে শান্তি এবং তাঁরাই হচ্ছে হেদায়াতপ্রাপ্ত।"** *(সুরা আনআমঃ ৮২)*

আর এই নিরাপত্তা মানুষের অন্তরের অন্তস্থল হতে নির্গত হয়। কোন প্রহরীর প্রহরায় হয় না। এ হল দুনিয়ার নিরাপত্তা। আর আখিরাতের নিরাপত্তা তো আরও বড় এবং চিরস্থায়ী। কারণ তারা আল্লাহর জন্য এখলাছের সাথে ইবাদত করেছে এবং তাদের একত্ববাদের সাথে কোন শির্ক মিশায়নি। কারণ শির্কই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অত্যাচার।

৪. তাওহীদ হচ্ছে মানুষের মনের শক্তির উৎস। তা তাকে মানসিক শক্তি যোগায়। ফলে তার অন্তর আল্লাহ্ হতে প্রাপ্তির আশায় ভরে যায়। তার উপর বিশ্বাস জন্মে এবং তাঁর উপর ভরসা করে, তাঁর বিচারে মন খুশী থাকে, তাঁর হতে প্রদত্ত বিপদে সহ্য ক্ষমতা আসে। সৃষ্টি থেকে সে মুখ ঘুরাতে পারে, সে পাহাড়ের মত অটল হয়ে যায়। যখনই সে কোন বিপদে পতিত হয়, তখনই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহকে ডাকতে থাকে। সে কখনও মাজারে মৃতের কাছে ফরিয়াদ করতে যায় না। তাদের নিদর্শন হচ্ছে নবী (সঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীসেঃ

অর্থাৎ, "যখন কোন কিছু চাও শুধু আল্লাহর কাছেই চাও, যখন কোন সাহায্য চাও তাঁর কাছেই চাও।" *(তিরমিযী, হাসান, ছহীহ)*। তাঁরা সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের ঐ কথার উপর আমল করে-

অর্থাৎ, **"যখন আল্লাহ পাক তোমাকে কোন বিপদ স্পর্শ করান, তখন তিনি ছাড়া কেউ তাকে দূর করার নেই।"** *(সুরা আনআমঃ ১৭)*

৫. তাওহীদ হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব এবং একতার বন্ধনের মূল। কারণ তা কখনই এমন অনুমতি দেয় না যে, আল্লাহকে ছেড়ে একদল লোক অপর দলকে রব হিসেবে মানবে। কারণ, উপাসনা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং সমস্ত মানুষের ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা একমাত্র তিনিই রাখেন। আর সমস্ত আবেদদের মুকুট হচ্ছেন মুহাম্মদ (সঃ) যাকে আল্লাহ্ নির্বাচন করেছেন সকলের মধ্য হতে।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ এর ফযীলত

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ এর স্বাক্ষ্য যে ব্যক্তি দেয় তিনি মুসলিম, সর্বোত্তম জিনিস ঈমান লাভ করে। সে হয় অনুগ্রহ লাভের যোগ্য এক আল্লাহর বান্দা। لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ এর অনেক ফযীলত। সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে কিছু ফযীলতের কথা আমরা তুলে ধরছি-

- মানুষের জীবনের চূড়ান্ত সফলতা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। এ কালেমা জান্নাতে প্রবেশ করায়। আল্লাহর রাসুল বলেন, "যে ব্যক্তি মারা গেল এ অবস্থায় যে সে জানে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ হক্ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম হা/২৬)*

  রাসুল (সঃ) আর ও বলেন, "যে ব্যক্তি সত্যতার সাথে খাঁটি অন্তরে বলবে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। *(মুসলিম)*

- তবে অবশ্যই এর জন্য শর্ত হচ্ছে বান্দাকে শিরক মুক্ত থাকতে হবে, যাবতীয় ইবাদত স্রেফ আল্লাহর জন্য নিবেদন করতে হবে। কারণ আল্লাহতা'য়ালা বলেনঃ

  إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

  অর্থাৎঃ **"কেহ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাতকে অবশ্যই হারাম করে দিবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।"** *(সূরা-মায়েদা, ৫৪৭২)*

- মানুষের চূড়ান্ত ব্যর্থতা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া। যে ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে সে ধ্বংসের গহবরে পড়বে। لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ এমন মহান কালেমা যে তা জাহান্নামকে হারাম করে দেয়।

  আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেন-

"যে কেউ অন্তর হতে সত্য সহকারে এ কালেমার স্বাক্ষ্য প্রদান করবে যে, لا إله إلا الله (আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ ইলাহ নেই) এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর রাসুল আল্লাহ তাঁর উপর জাহান্নমের আগুন কে হারাম করে দিবেন।" *(বুখারী, মুসলিম)*

- কিয়ামতের কঠিন এবং ভয়াবহ মূহুর্তে এ কালিমার স্বাক্ষ্যদানকারীর জন্য নবী (সঃ) সুপারিশ করবেন। প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেন- "আমার শাফায়াত পেয়ে সর্বাধিক সাফল্য লাভ করবে ঐ ব্যক্তি যে তার অন্তর থেকে খালেসভাবে বলবে- لا إله إلا الله *(বুখারী, কিতাবুল ইলম)*

- لا إله إلا الله এর যিকির করতে সমস্ত মাখলুক আদিষ্ট । এ কালেমার যিকির সর্বোত্তম যিকির। নবী (সঃ) বলেন- "সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে- لا إله إلا الله। *(সহীহ সুনানে তিরমিজি লিল আলবানী ৩/২৬৯৪)*

- এ কালেমা যে স্বীকার করে নেবে এবং শিরক মুক্ত থাকবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। প্রিয় নবী (সঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি বলে لا إله إلا الله আর আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় তা সবই অস্বীকার (বর্জন) করে তার সম্পদ এবং রক্ত হারাম। আর তার হিসাব আল্লাহর উপর।" *(মুসলিম)*

- لا إله إلا الله আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখ দেয় এবং গুনাহ মাফ করায়।

  শেখ আব্দুল্লাহ খৈয়্যাথ দালিলুর মুসলিম ফি-এ তেক্বাদ ওয়া তাথহীর-কিতাবে বলেন- মানুষ প্রকৃতিগত কারণে এবং মাসুম না হওয়ার কারণে মাঝে মাঝে পদলিত হয়। ফলে আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে পাপের মধ্যে লিপ্ত হয়। যদি সে শির্ক হতে বেঁচে খালেছ তাওহীদের অধিকারী হয়, তবে অবশ্যই তার একত্ববাদ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য এবং এখলাস থাকবে لا إله إلا الله বলার মধ্যে। ফলে এটা তার সবচেয়ে বড় কারণ হবে সুখের জন্য এবং তার গুনাহ মাফের জন্য এবং পাপকে দূরীভূত করার জন্য; যা নবী (সঃ)-এর হাদীসে এসেছেঃ

  অর্থাৎঃ "যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নাই। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল। আর ঈসা (আঃ) আল্লাহর দাস এবং আল্লাহ তা'আলার ঐ কথা যা মরিয়ম (আঃ)- এর প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি ঈসা (আঃ) আল্লাহ্ হতে প্রেরিত রূহ, জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য- তবে তাকে আল্লাহ পাক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে যে কোন আমলই করুক না কেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

  এই সমস্ত সাক্ষ্য যখন কোন মুসলমান দিবে, তখন তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা ওয়াজেব হবে, যা চিরস্থায়ী নেয়ামতের জায়গা, যদিও তার কোন কোন আমলে দোষ থাকে এবং কমতি থাকে। হাদীসে কুদসীতে পাওয়া যায় আল্লাহ পাক বলেনঃ

  অর্থাৎ, "হে আদমের সন্তান, যদি তুমি কোন শির্ক না করে আমার সামনে দুনিয়া ভরতি পাপরাশি সহ হাজির হও, তবে আমি তোমাকে দুনিয়া ভরতি ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করব।" *(তিরমিযী)*

  অর্থাৎ, যদি আমার কাছে আস দুনিয়া পূর্ণ গুণাহ এবং পাপ নিয়ে, কিন্তু এমতাবস্থায় যে তুমি একমাত্র তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করেছ, তবে আমি অবশ্যই তোমার গুনাহখাতা মাফ করে দিব। অন্য হাদীসে আছেঃ

  অর্থাৎ, "যে আল্লাহ পাকের সাথে কোন শির্ক করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে শির্কের উপরে মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম)*

  এই সমস্ত হাদীসসমূহ তাওহীদের ফযীলত প্রকাশ করছে। মানুষের সুখের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় কাজ। তার গুনাহ মাফের জন্য এবং তার ভুলভ্রান্তি মুছে ফেলার জন্য এটাই সবচেয়ে বড় অছিলা।

নিজ জীবনে তাওহীদ বাস্তবায়ন বা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা

তাওহীদের বাস্তবায়ন হলঃ তাওহীদকে শির্ক, বিদ্আত ও পাপাচার মুক্ত করা।

তাওহীদকে কলুষ মুক্ত করা দু'রকমঃ

ওয়াজিব ও

মান্দুব বা মুস্তাহাব।

ওয়াজিব তাওহীদ তিন বিষয়ের মাধ্যমে হয়ঃ

- তাওহীদকে এমন শির্ক, হতে মুক্ত করা, যা মূল তাওহীদের পরিপন্থী।

- তাওহীদকে এমন বিদ্আত হতে মুক্ত করা যা তাওহীদের পরিপূর্ণতার পরিপন্থী বা মূল তাওহীদের পরিপন্থী অথবা সে বিদ্আত যদি কুফুরী পর্যায়ের হয়ে থাকে।
- তাওহীদকে এমন পাপকর্ম হতে মুক্ত করা যা তাওহীদের (অর্জিত) পূণ্য হ্রাস করে এবং তাওহীদে কু-প্রভাব ফেলে।

আর মান্দুব (তাওহীদ) হলো মুস্তাহাব কাজ। যেমন নিম্নরূপঃ

- ইহ্সানের (ইখলাসের) পূর্ণ বাস্তবায়ন।
- ইয়াকীনের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।
- আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট অভিযোগ না করে পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করা।
- সৃষ্টি জীব হতে মুক্ত হয়ে শুধু মাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াই যথেষ্ঠ মনে করা।
- কিছু বৈধ উপকরণ ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলের প্রকাশ। যেমন-ঝাড় ফুঁক ও দাগা (রোগ নিরাময়ের জন্য) ছেড়ে দেওয়া।
- নফল ইবাদাত করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে পূর্ণ ভালবাসা লাভ করা।

অতঃপর যারা তাওহীদকে বাস্তবায়ন করবে উপরে বর্ণনানুপাতে এবং বড় শির্ক হতে বেঁচে থাকবে, তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী বসবাস করা হতে পরিত্রান লাভ করবে। আর যারা বড় ও ছোট শির্ক করা হতে বেঁচে থাকবে এবং বড় ও ছোট পাপ হতে দূরে থাকবে, তাদের জন্য দুনিয়াতে ও আখিরাতে পূর্ণ নিরাপত্তা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ **"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শির্কের অপরাধ ক্ষমা করবেন না। আর ইহা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা করেন (তার অন্যান্য অপরাধ) ক্ষমা করে দেন।"** *(সূরা আন-নিসা, আয়াত, ৪৮)*

তিনি আরো বলেনঃ **"যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শির্কের সাথে মিশ্রিত করেনা, তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।"** *(সূরা, আল-আনআম, আয়াত-৮২)*

শিরকের ভয়াবহতা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক্ করবে না ।" *(সূরা, নিসা-৪ঃ৩৬)*

এ আলোচনায় আমরা তাওহীদ এর বিপরীত শিরক্ সম্পর্কে আলোচনা করেছি সেই সত্যানুসন্ধানীদের জন্য যারা বর্তমান জাহিলিয়্যাতের এ অন্ধকারে নিজে তাওহীদের চেতনা নিয়ে একজন মুসলিম হিসাবে বাঁচতে চান এবং পরিবার, সমাজ তথা আল্লাহর এ যমীন থেকে শিরকের কলুষ কালিমাকে মুছে দিয়ে তাওহীদের আলোয় আলোকিত করতে চান। আর আল্লাহর খলিফা হিসাবে এটাই আমাদের অন্যতম দায়িত্ব ।

শির্ক পরিচিতি

যেহেতু শিরক্ তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজেই, শিরক্ সম্পর্কে জানতে হলে সর্বপ্রথম তাওহীদ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

তাওহীদ

শুধু তাওহীদ বলতে তাওহীদে মুতলাক বা অবিভক্ত তাওহীদ কে বুঝায়। যার অর্থ- এককত্ব বা একত্বে ভূষিত করা। সালফে সালেহীনগণ তাওহীদকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করেছেন।

১. তাওহীদ হল- কায়মনোবাক্যে এ সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষন করা যে, সকল বিষয়েই আল্লাহ এক ও একক, অদ্বিতীয়, নিরুপম, সমকক্ষহীন, তুলনাহীন। তিনি ব্যক্তি সত্বা, কর্মরাজি, সুন্দর নামসমূহ ও গুনাবলী এবং ইবাদতের সার্বভৌম অধিকারে সম্পূর্ন এক ও একক। তেমনিভাবে তিনি একত্বের অধিকারী সৃষ্টিকর্মে ও নির্দেশদানে। (শরহুল আক্বিদাহ আত্ তাহাবিয়্যাহ)

২. তাওহীদ হচ্ছে- আল্লাহর লেশমাত্র দোষহীন পরিপূর্ন গুনরাজিতে আল্লাহর একত্বের হৃদয়গত ইলম ও বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা। (কিতাবুত তাওহীদ)

৩. তাওহীদ হচ্ছে- একমাত্র সত্য মা'বুদের জন্যে একমাত্র সত্য দ্বীন ও ঈমানের পথে একাভিমুখী বান্দাহ হয়ে যাওয়া। (ইবনুল কাইয়্যেম রহঃ)

৪. তাওহীদ হচ্ছে- ইবাদত তথা ইসতিয়ানাত তথা দাসত্ব ও সাহায্য প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহর সাথে বিশেষিত করা। (কিতাবুত তাওহীদ লি ইবনে তাইমিয়্যাহ রহঃ)

শিরক্

শির্ক শব্দের আভিধানিক অর্থ- অংশীদারিত্ব, অংশীবাদ, মিলানো, সমকক্ষ করা, অংশীস্থির করা, সমান করা, ভাগাভাগি, সম্পৃক্ত করা। ইংরেজীতে Poytheism (একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস), Sharer, Partner, Associate.

পারিভাষিক পরিচিতি –

- "শরীয়তের পরিভাষায় যেসব গুনাবলী কেবল আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত সেসব গুনে অন্য কাউকে গুনান্বিত ভাবা বা এতে অন্য কারো অংশ আছে বলে মনে করাই শিরক্ ।"
- "শিরক্ হচ্ছে বান্দাহ্র আল্লাহর সাথে তাঁর রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত কর্ম কিংবা তাঁর জাত ও আসমা ওয়াস সিফাতে তথা নাম ও গুনাবলী অথবা উলুহিয়্যাতে (ইবাদতে) কাউকে শরীক করা"। *(মিরাসিল আম্বিয়া, পৃঃ ৮)*
- শিরক্ হচ্ছে আল্লাহর সাথে এমন বিষয়ে সমকক্ষ স্থির করা যেটা আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। যেমন- আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা, অন্য কারো নিকট আশা করা, আল্লাহর চাইতে অন্য কাউকে বেশী ভালবাসা, অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতের কোন একটি অন্যের দিকে সম্বোধন করাকে শিরক্ বলে। *(অধিকাংশ লোক ঈমান আনা সত্বেও মুশরিক পৃঃ৩০)*
- তাওহীদুল্লাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত মানুষের সকল বিশ্বাস, কথা ও কাজে আল্লাহর এককত্বের উপলব্দি ও মেনে চলা। পক্ষান্তরে শিরক্ হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

- ইমাম কুরতুবী বলেন, শিরক্ হল আল্লাহর নিরংকুশ প্রভূত্বে কারো অংশীদারিত্বের আক্বীদা পোষণ করা।
- আক্বীদার পরিভাষায়, শিরক্ হচ্ছে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সীমাবদ্ধ কোন বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা।
- "শিরকের ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, এতে দু'শরীকের অংশ সমান হওয়া আবশ্যক নয়। বরং শতভাগের একভাগের অংশীদার হলেও তাকে অংশীদার বলা হয়। তাই আল্লাহতা'য়ালার হক্বের সামান্যতম অংশ অন্যকে দিলেই তা শির্কে পরিণত হবে। এতে আল্লাহর অংশটা যতই বড় রাখা হোক না কেন।" *(তাওহীদ জিজ্ঞাসা ও জবাব পৃঃ৩৫)*

শির্কের ভয়াবহতা

শির্কের পরিণাম ভয়াবহ। এটি মানুষের চুড়ান্ত ধ্বংস ডেকে আনে। আল কোরআন ও সহীহ হাদীস থেকে এর ভয়াবহতার স্বরূপ তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ্।

শিরক্ সবচেয়ে বড় অপরাধ-বড় গুনাহ

আল্লাহ্ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্ম।" *(সূরা, লুক্মান ৩১ঃ১৩)*

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহর রাসুল সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটি?" রাসুল (সঃ) বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক করা, অথচ আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" *(সহীহ বুখারী, মুসলিম)*

শিরক্বের অপরাধ/ গুনাহ আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না

আল্লাহ্ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না। এটি ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। এবং কেহ আল্লাহর শরীক্ করলে সে এক মহাপাপ আরোপ করে।" *(সূরা, নিসা-৪ঃ৪৮)*

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক্ করা ক্ষমা করেন না। এটি ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। এবং কেহ আল্লাহর শরীক্ করলে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।" *(সূরা, নিসা-৪ঃ১১৬)*

জাবির বিন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেছেন- "বান্দার জন্য সর্বদাই ক্ষমা রয়েছে যতক্ষন পর্যন্ত হিযাব বা পর্দা পতিত না হয়।" বলা হলো, "হে আল্লাহর রাসুল! হিযাব বা পর্দা কি?" তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক্ করা।" *(মুসনাদে আহমদ, ইবনু কাছীর ১ম খন্ড ৬৭৮পৃঃ)*

শিরক্ করলে জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিত

আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

"হে বনী ইসরাইল! তোমরা আমার রব এবং তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর। কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।" *(সূরা, মায়েদা-৫ঃ৭২)*

রাসুল (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক্ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে যাবে।" *(মুসলিম)*

শিরক্ করলে সব আমল বাতিল হয়ে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়

আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই ওহী হয়েছে তুমি আল্লাহর সাথে শরীক্ করলে তোমার আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্য তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থ ।" *(সূরা যুমার, ৩৯ঃ৬৫)*

সূরা আনফালের ৮৩-৮৭ আয়াতে আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়লা ১৮ জন নবীর নাম নিয়ে তাদের ব্যাপারে বলেছেন-

"এটি আল্লাহর হেদায়েত, নিজ বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এটি দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন । তারা যদি শিরক্ করতো তবে তাদের কৃতকর্ম নিস্ফল হত ।" *(সূরা, আন'আম-৬ঃ৮৮)*

আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়লা আরও বলেনঃ

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

"আমি তাদের আমলের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকনায় পরিণত করে দেব ।" *(সূরা, ফোরক্বান-২৫ঃ২৩)*

শিরক্কারী ধ্বংসে এবং বিপর্যয়ে পতিত হয়

আল্লাহ্ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ
الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

"যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল ।" *(সূরা, হাজ্জ ২২ঃ৩১)*

আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা আরও বলেনঃ

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

"যারা আল্লাহর সাথে অপর ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, সুতরাং শীঘ্রই ওরা (মুশরিকরা) এর পরিনতি জানতে পারবে ।" *(সূরা, হিজর ১৫ঃ৯৬)*

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) বলেন- "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে বেঁচে থাকবে ।" সাহাবাগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল সেগুলো কি?" রাসুল (সঃ) বলেলেন, ''আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং যাদু---------- ।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

শিরক্কারী মুশরিক অপবিত্র-তার জন্য দোয়া করা যাবে না, এরা সৃষ্টির অধম

আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

"নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র ।" *(সূরা, তাওবাহ-৯ঃ২৮)*

আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

"আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নাবী ও মু'মিনদের সংগত নয়, এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী ।" *(সূরা, তাওবাহ ৯ঃ১১৩)*

আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা আরও বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

"আহলে কিতাব ও মুশরিক কাফেররা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।" *(সূরা, বাইয়্যেনাহ ৯৮ঃ৬)*

শিরক্ করলে কাফের-মুশরিকে পরিণত হয়ে যায়

ঈমান আনার পরেও কেউ যদি আল্লাহর সাথে শিরক্ করে তবে সে কাফের এবং মুশরিক হয়ে যায়। ইসলামী শরী'য়া অনুযায়ী তাকে 'মুর্তাদ' বলা হয়। তার হুদুদ (শাস্তি) মৃত্যুদন্ড। রাসুল (সঃ) বললেন- "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক ও সর্বনাশা গুনাহ থেকে বিরত থাক।" অত:পর শিরকের কথা বললেন। অত:পর বললেন- যে ব্যক্তি নিজের দ্বীনকে পরিবর্তন করে (অর্থাৎ ইসলামকে ত্যাগ করে) তাকে হত্যা কর।" *(বুখারী, আহমাদ, কবীরা গুনাহ-বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার পৃঃ৭)*

আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

"যদি তোমরা তাদের (মুশরিকদের) কথামত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে।" *(সূরা, আন'আম ৬ঃ১২১)*

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা মুসলিমদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন যদি তারা মুশরিকদের আক্বীদা-বিশ্বাস, কাজ-কর্মে আনুগত্য করে তাহলে তারা মুশরিক হয়ে যাবে।

শির্কের ক্ষতিকর দিক এবং তার বিপদসমূহ

শির্কে অনেক অনিষ্টকর দিক আছে, ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে তার বিশেষত্বগুলোঃ

শির্ক মানবতার জন্য অবমাননাকর

মানুষের সম্মানকে ধূলায় লুণ্ঠিত করে ও তার সামর্থ্যকে নিচু করে দেয়। তার মর্যাদাকেও নিচু করে দেয়, কারণ আল্লাহ পাক মানুষকে খলীফা হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং তাকে সম্মানিত করেছেন এবং তাকে সমস্ত নাম শিখিয়েছেন। তার অনুগত করে দিয়েছেন; যা কিছু আছে আসমান ও যমীনে, তাকে এই জগতের সকলের উপর নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু সে তার অবস্থাকে ভুলে গেছে। ফলে সে এই জগতের কোন কোন জিনিসকেও ইলাহ ও মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। তার কাছে নিজেকে ছোট করে এবং অপমানিত হয়। এর থেকে অসম্মানের বিষয় আর কি হতে পারে যা আজকে দেখা যাচ্ছে কোটি কোটি লোক হিন্দুস্তানে গাভীর পূজা করছে যাকে আল্লাহ পাক মানুষের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ঝাঁক ধরে বসে আছে। তাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন নিবেদন করছে। অথচ তারাও তাদের মতই আল্লাহ পাকের দাস। না নিজেদের জন্য তারা কোন উপকার করতে পারে; না ক্ষতি করতে পারে। দেখ, হোসেন (রাঃ) নিজেকে শহীদ হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি জীবিতাবস্থায়। তবে কেমন করে অপরের কষ্ট দূর করবেন এখন মৃত্যুর পর এবং ভালকে ডেকে আনবেন? মৃতরাই জীবিত মানুষের দোয়ার মুখাপেক্ষী। তাই আমরা তাদের জন্য দোয়া করি। আমরা যেন তাদের কাছে দোয়া না চাই আল্লাহকে ছেড়ে।

আল্লাহ পাক এই সম্বন্ধে বলেনঃ

অর্থাৎ, **"যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে ডাকে তারা এতটুকুও জিনিস সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। মৃতরা কখনই জীবিতদের সমান নয় এবং তারা জানে না কখন তাদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে।"** *(সুরা নহলঃ ২০)*

এবং অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেনঃ

অর্থাৎ, **"যে আল্লাহ পাকের সাথে কোন শির্ক করে, যেন সে আকাশ থেকে পড়ে গেছে এবং এক পাখি তাকে ঠোঁট দিয়ে নিয়েছে অথবা তাকে বাতাস বহু দূরে নিক্ষেপ করেছে।"** *(সুরা হজ্জঃ ৩১)*

শির্কের কারণে সমস্ত আজেবাজে কুসংস্কার ও বাতিল মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে

কারণ যে মনে করে এই জগতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রভাব আছে, যেমন নক্ষত্র, জ্বিন, নশ্বর, আত্মা ইত্যাদি, তার বুদ্ধি এমন হয়ে যায় যে, সে সমস্ত কুসংস্কারকে গ্রহণ করতে তৈরি হয়ে যায় এবং সমস্ত মিথ্যাবাদী দাজ্জালদের বিশ্বাস করতে শুরু করে। এভাবে সমাজের মধ্যে শির্ক প্রবেশ করতে থাকে। জ্বিন বশকারী, গণক, যাদুকর, জ্যোতীষ এবং এই জাতীয় লোকেরা মিথ্যা

দাবি করে যে, তারা ঐ ভবিষ্যৎ জানে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। ফলে সমাজের মধ্যে আস্তে আস্তে আসবাব সংগ্রহের প্রচেষ্টা দূর্বল হয় এবং জগতের নিয়ম উল্টে যেতে থাকে।

শির্‌ক সবচেয়ে বড় যুলুম

সত্যিই এটা যুলুম। কারণ সবচেয়ে বড় সত্য হল আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই ও অন্য কোন প্রতিপালক নেই। তিনি ছাড়া কেউ আইন প্রণেতা নেই। কিন্তু মুশরিক আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে মাবুদ বানিয়ে নেয়। অন্যের কাছ থেকে আইন গ্রহণ করে এবং মুশরিক নিজের উপরও যুলুম করে। কারণ, মুশরিক তারই মত আরেকজন দাসের গোলাম হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। শির্‌ক অপরের উপর যুলুম। কারণ, যে আল্লাহর সাথে অন্যকে শির্‌ক করে সে তো অত্যাচার করল; কারণ এমন কাউকে সে হক্ দিল যার ঐ অধিকার নেই।

শির্‌ক হচ্ছে সমস্ত কল্পনা ও ভয়ের মূল

কারণ, যার মাথায় কুসংস্কার বাসা বাঁধতে শুরু করে এবং সমস্ত আজেবাজে কথা ও কাজকে গ্রহণ করতে থাকে, ফলে সমস্ত দিক হতেই সে ভয় পেতে শুরু করে। কারণ, সে নানা মাবুদের উপর ভরসা করতে শিখেছে। তাদের প্রত্যেকেই ভাল করতে অপারগ, এমনকি নিজেদের থেকেও তারা কষ্ট মুসিবত দুর করতে পারে না। ফলে যেখানে শির্‌ক চলতে থাকে সেখানে নানা ধরনের কুসংস্কার ও ভয় প্রকাশ পেতে থাকে কোন প্রকাশ্য কারণ ছাড়াই। আল্লাহ পাক এই সম্বন্ধে বলেনঃ

অর্থাৎ, **"যারা কুফরী করে আমি তাদের অন্তরে ভয়কে নিক্ষেপ করব। ঐ কারণে যে তারা আল্লাহর সাথে শির্‌ক করছে, আর যে সম্বন্ধে আল্লাহ পাক কোন প্রমান পাঠাননি। তাদের ঠিকানা আগুন এবং জালেমদের জন্য সেটা কতই না নিকৃষ্ট জায়গা।"** *(সূরা আল ইমরানঃ ১৫১)*

শির্‌কের কারণে নেক আমলগুলো নষ্ট হয়ে যায়

কারণ সে তার অনুগামীদেরকে মাধ্যম ও শাফায়াতকারীর উপর ভরসা করতে শেখায়। ফলে নেক কাজগুলোকে সে ছাড়তে শুরু করে এবং গুনাহ করতে শুরু করে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে সমস্ত অলীরা তাদের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে সুপারিশ করবে। এটা ইসলামের পূর্বের আরবদের বিশ্বাস। যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ পাক বলেনঃ

অর্থাৎ, **"তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন অন্যদের ইবাদত করে যারা না পারে তাদের ক্ষতি করতে আর না পারে কোন ভাল করতে এবং বলে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বল (হে মুহাম্মাদ)! তোমরা কি আল্লাহকে আসমান ও জমিনের মধ্যে ঐ জিনিস শিখাতে চাও যা তিনি জানেন না। তারা যে সমস্ত শির্‌ক করছে আল্লাহ পাক এর থেকে পবিত্র ও উচ্চ।"** *(সূরা ইউনুসঃ ১৮)*

তাকিয়ে দেখ এই খ্রিষ্টানদের দিকে যারা একটার পর একটা অন্যায় কাজ করে যাচ্ছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, ঈসা (আঃ) যখন শূলে চড়েছেন তখন তাদের সমস্ত গুনাহ মুছে দিয়ে গেছেন। আজ দেখা যায় অনেক মুসলমান ফরজ, ওয়াজিব ত্যাগ করছে এবং নানা ধরনের হারাম কাজ করছে। তা সত্ত্বেও এ ধারণা করে বসে আছে যে, রাসুল তাদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য অবশ্যই শাফায়াত করবেন। কিন্তু রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আদরের কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে বলেছেনঃ

অর্থাৎ, "হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ (সঃ) তোমার যত টাকা দরকার তা আমার নিকট হতে চেয়ে নাও; কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ পাকের হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই।" *(বুখারী)*

শির্‌ক উম্মতকে টুকরো টুকরো করে দেয়

আল্লাহ্ বলেনঃ অর্থাৎ, **"তোমরা মুশরেকদের মত হয়ো না যারা তাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করেছে এবং তারা দলে দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক দল তাদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে খুশী।"** *(সূরা রূমঃ ৩১-৩২)*

মূলকথাঃ অবশ্যই আগের এই সমস্ত অধ্যায়গুলো পরিষ্কারভাবে এটাই ফুটিয়ে তুলেছে যে, শির্‌ক খুব খারাপ কাজ, তাই এ থেকে বেঁচে থাকা ফরজ। তার থেকে দূরে সরে থাকা দরকার এবং তার মধ্যে ঢুকে পড়ার ব্যাপারে ভয় করা দরকার। কারণ, এটা সবচেয়ে বড় গুনাহ। তা বান্দার সমস্ত আমলকেই নষ্ট করে দেয়, এমনকি তার ঐ সমস্ত নেক কাজও যাতে উম্মতের উপকার হত, মানবতার সেবা হত। যেমন, আল্লাহ পাক বলেনঃ

অর্থাৎ, **"তাদের ঐ সমস্ত আমলকে আমার কাছে পৌছানো হবে কিন্তু সেগুলো আমি ধূলির মত উড়িয়ে দেব।"** *(সূরা ফুরকানঃ ২৩)*

তাওহীদ ও শির্কের চিরকালীন দ্বন্দ্ব

- তাওহীদ ও শির্কের মধ্যে যুদ্ধ বহু পুরাতন। নূহ (আঃ) মূর্তি পূজা ছাড়াতে যখন তাঁর জাতিকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকছিলেন তখন থেকেই তা শুরু হয়। তিনি এভাবে সাড়ে ন'শত বছর পর্যন্ত দাওয়াত দেন। তারা যেভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করে সে সম্পর্কে কুরআন বলেঃ

  অর্থাৎ, **"তার কওমের নেতারা বললঃ তোমরা কখনও তোমাদের দেবদেবীদের ছেড় না, না "ওদ্দা", "সূয়া'য়", "ইয়াগুছা", ইয়া'য়ুকা", নাছরা, যদিও এরা অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছে।"** *(সূরা নূহঃ ২৩-২৪)*

  বুখারী শরীফে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছেঃ এরা ছিলেন নূহ (আঃ)-এর জাতির মধ্যে ভাল ও নেককার লোক। যখন তারা মারা গেলেন তখন শয়তান তাদের জাতির লোকদের কাছে গোপনে বলল, তারা যেখানে বসত সেখানে তাদের প্রতিমূর্তি তৈরী করতে এবং তাদেরকে তাদের নামে বিভূষিত করতে। তারা তা করল। কিন্তু তখন পর্যন্তও তাঁদের ইবাদত করা হত না। যখন এই লোকেরা মারা গেল তখন কেন যে মূতিগুলো বানানো হয়েছিল তা লোকেরা ভুলে গেল; ফলে তখন থেকেই মূর্তি ও পাথরের পূজা শুরু হয়ে গেল।

- তারপর নূহ (আঃ) এর পর যত রাসুলগণ (আঃ) এসেছিলেন প্রত্যেকেই এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকতে শুরু করলেন এবং ঐ সমস্ত মাবুদদের ত্যাগ করতে বললেন যাদের ইবাদত করা হত আল্লাহকে ছেড়ে আর যারা ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতাই রাখে না।

  কুরআন পাক এই খবরে ভরপুর। আল্লাহ্ বলেনঃ

  অর্থাৎ, **"কওমে আ'দের কাছে আসলেন তাদের ভাই হুদ (আঃ) তিনি তাদের দাওয়াত দিয়ে বললেনঃ হে আমার জাতি, এক আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি পরহেজগার হবে না?"** *(সূরা আ'রাফঃ ৬৫)*

  অন্যত্র বলেনঃ

  অর্থাৎ, **"তাদের কওমে সামুদের কাছে এসেছিলেন তাদের ভাই ছালেহ (আঃ)। তিনি এই দাওয়াত দিতেনঃ হে আমার জাতি, আল্লাহ পাকের ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই।"** *(সূরা হুদঃ ৬১)*

  অন্যত্র বলেনঃ

  অর্থাৎ, **"মাদায়েনে আসলেন তাদের ভাই শুয়াইব (আঃ)। তিনি তাদের বললেনঃ হে আমার জাতি, আল্লাহ পাকের ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই।"** *(সূরা হুদঃ ৮৪)*

  অন্যত্র বলেনঃ

  অর্থাৎ, **"যখন ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতা এবং জাতির লোকদের বললেন, অবশ্যই আমি ওদের থেকে সম্পর্কমুক্ত যাদের ইবাদত তোমরা কর। আমি শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করি যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে সঠিক রাস্তা দেখাবেন।"** *(সূরা যুখরুফঃ ২৬-২৭)*

  মুশরিকরা সমস্ত নাবীদের বিরোধিতা করত এবং অহঙ্কারের সাথে মুখ ঘুরিয়ে নিত। সাথে সাথে তাঁরা যে সমস্ত দাওয়াতী নিয়ে আসতেন তার বিরুদ্ধেও যত ধরনের শক্তি তাদের ছিল তা দিয়ে তাঁদের বিরোধিতা করত।

- এই আমাদের রাসুল (সঃ) যিনি আরবদের কাছে নবুয়ত পাওয়ার আগে বিশ্বাসী আল-আমীন বলে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু যখনই তাদের এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকলেন এবং ঐ সমস্ত মূর্তির ইবাদত না করতে বললেন যা তাদের বাপ দাদারা করত, সাথে সাথে তারা তাঁর সত্যবাদীতা ও আমানতদারী ভুলে গেল। আর বলতে শুরু করলঃ তিনি মিথ্যাবাদী, তিনি যাদুকর। এই কুরআন পাক তাদের বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেঃ

  অর্থাৎ, **"যখনই তাদের মধ্য হতে একজন ভয় প্রদর্শক আসলেন তখনই তারা অবাক হয়ে গেল, ফলে কাফেররা বলতে লাগলঃ এ যাদুকর এবং চরম মিথ্যাবাদী। সে কি আমাদের সমস্ত মাবুদদের এক মাবুদ বানিয়ে ফেলতে চায়, এ তো বড়ই অবাক হওয়ার কথা।"** *(সূরা ছোয়াদঃ ৪-৫)*

  অন্যত্র বলেনঃ

অর্থাৎ, **"এভাবে যত রাসুল তাদের পূর্বে এসেছেন তাদেরকে তারা অবশ্যই বলেছে যাদুকর এবং পাগল। তারা কি একে অপরকে এই ব্যাপারে উপদেশ দিত? বরঞ্চ তারা হচ্ছে সীমালঙ্ঘনকারী।"** *(সূরা যারিয়াতঃ ৫২-৫৩)*

এটাই হচ্ছে সমস্ত রাসুলের তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়ার পরের অবস্থা। এটাই হচ্ছে তাঁদের মিথ্যাবাদী কওম ও অপবাদ দানকারীদের ভূমিকা।

- আর আমাদের এই সময়ে যখন কোন মুসলমান তাদের ভাইদের দাওয়াত দেয় চরিত্র সংশোধন করতে, সত্য কথা বলতে এবং আমানতদারী ঠিক করতে, তখন তাতে কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হয় না। আর যখনই ঐ তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিতে শুরু করে যার দিকে সমস্ত রাসুলরা দাওয়াত দিয়েছেন, আর তা হল এক আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং তাঁকে ছেড়ে অন্য নাবী এবং আউলিয়া (যারা আল্লাহর দাস) এদের কাছে দোয়া করতে নিষেধ করা, তখনই মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাকে নানা ধরনের মিথ্যা অপবাদে জর্জরিত করতে থাকে।

- যারা তাওহীদের দিকে মানুষকে ডাকবে তাঁদের অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে। এবং ঐ রাসুল (সঃ)-এর অনুসরণ করতে হবে যাঁকে তার রব বলেছেনঃ

  অর্থাৎ, **"তারা যা বলে তা তুমি সহ্য কর এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে পরিত্যাগ কর।"** *(সূরা মুজাম্মেলঃ ১০)*

  অন্যত্র আয়াতে বলেনঃ

  অর্থাৎ, **"তারা যা বলল তা সহ্য করতে থাক এবং তাদেরকে পাপের বা কুফরী কার্যে অনুসরণ কর না।"** *(সূরা ইনসানঃ ২৪)*

- মুসলমানদের উপর দায়িত্ব হচ্ছে তাওহীদের দিকে যে দাওয়াত দেয়া হয় তাকে কবুল করা এবং ঐ দাওয়াতকে ভালবাসা। কারণ, তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়া সমস্ত রাসূলদের কাজ ছিল এবং আমাদের রাসুল (সঃ) এর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। যে নাবীকে ভালবাসে অবশ্যই সে তাঁর দাওয়াতকে ভালবাসবে। যে তাওহীদকে ঘৃণা করল সে যেন রাসুল (সঃ)-কেই ঘৃণা করল। আর কোন মুসলমানই কি এ কাজ করতে রাজী হবে?

শির্‌ক কেন এত ভয়াবহ

- শির্‌ক মূলত এ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকেই অস্বীকার করে। কারণ আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য, এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেনঃ

  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

  "আমি মানব এবং জ্বিন জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" *(সূরা, যারিয়াত-৫১ঃ৫৬)*

- শিরকের মাধ্যমে আল্লাহর মর্যাদা এবং নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন করা হয়। আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের রব এবং ইলাহ, আর আমরা হচ্ছি তার বান্দাহ বা দাস। যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সৃষ্টি। শিরক্ করলে এই নগণ্য দাসকে/সামান্য সৃষ্টিকে স্রষ্টার স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ জন্যই শিরক হচ্ছে আল্লাহর মর্যাদা এবং সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী, চরম যুলম-অবিচার। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেনঃ

  لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

  "আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক্ চরম যুল্‌ম।" *(সূরা, লুক্‌মান-৩১ঃ১৩)*

  আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা আরও বলেনঃ

  ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

  "আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতেছেনঃ- তোমাদের আমি যে রিযিক্ দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তাতে অংশীদার? ফলে তোমরা কি সমান? তোমরা কি তাদের সেরূপ ভয় করো যেরূপ তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভয় করো? আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করি।" *(সূরা, রূম ৩০ঃ২৮)*

চাকর বা দাস-দাসী মনিবের ধন-সম্পদের অধিকারী হয় না, মনিব তাদেরকে ভয় করে না, সেরূপ মহান আল্লাহর সঙ্গে কোন সৃষ্টির কোন ব্যাপারে শরীকানা হয় না, হতে পারে না।

- শিরক্ করলে আল্লাহর হক আল্লাহকে না দিয়ে অন্যকে দেয়া হয়। রাসুল (সঃ) বলেন- "বান্দার প্রতি আল্লাহর হক্ হচ্ছে বান্দা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক্ করবে না।" *(বুখারী হা/২৬৪৬)*

শির্‌ক না করার নির্দেশ এবং আহ্বান

আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا

"আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।" *(সূরা, নিসা-৪ঃ৩৬)*

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

"বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারও ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত; ইহাই শ্বাশ্বত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা জানেনা।" *(সূরা, ইউসুফ ১২ঃ৪০)*

اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

"তোমরা আমার রব এবং তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর। কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।" *(সূরা, মায়েদা-৫ঃ৭২)*

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

"বল, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি এই ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" *(সূরা-কাহফ-১৮ঃ১১০)*

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

"(হে নবী) তুমি বল হে কিতাবীগণ! আস এমন একটি কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত না করি এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক না করি, আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ব্যতীত নিজেদেরকে রব হিসেবে গ্রহন না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল, তোমরা স্বাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম।" *(সূরা, আলে ইমরান-৩ঃ৬৪)*

আল্লাহতা'য়ালা আরও বলেনঃ

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"আর উহা এই যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হইও না।" *(সূরা, ইউনুস ১০ঃ১০৫)*

মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেছেনঃ "আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক্ করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় কিংবা পুড়িয়ে মারা হয়।" *(মুসনাদে আহমাদ)*

শির্‌ক না করার ফযীলত

আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত।" *(সূরা, আন'আম ৬ঃ৮২)*

মুয়ায (রাঃ) থেকে বর্নিত তিনি বলেন- আমি উফাইর নামক একটি গাধার পিঠে নাবী (সঃ) এর পেছনে বসেছিলাম। নাবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি কি জান বান্দার নিকট আল্লাহর হক্ কি? আমি বললাম আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ "বান্দাহর নিকট আল্লাহর হক্ হল বান্দাহ তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর বান্দাহর নিকট আল্লাহর অধিকার হলো তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদান করবেন না। (বুখারী হা/২৬৪৬)

আবু যর (রাঃ) নাবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নাবী (সঃ) বলেন- "জিব্রাঈল এসে আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আল্লাহর সাথে শরীক্ স্থাপন না করে যে ব্যক্তি মারা যায় সে জান্নাত লাভ করবে। আবু যর বললেন, যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও কি? নাবী (সঃ) বললেন, হ্যাঁ যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও। *(বুখারী হা/৯৬৯৬, মুসলিম হা/১৮০)*

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি নাবী (সঃ) এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, জান্নাত এবং জাহান্নাম ওয়াজিব কারী বস্তু দু'টি কি কি? তিনি বলেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না বানিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানিয়ে মারা গেল সে জাহান্নামী। *(মুসলিম হা/১৭৭)*

আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সঃ) বলেছেন যে- ''আল্লাহতা'য়ালা বলেছেনঃ হে আদম সন্তান তোমরা যদি আমার সাথে অংশীস্থাপন না করে দুনিয়াভরা অপরাধ (গুনাহ) নিয়েও আমার সাথে স্বাক্ষাত কর, তবে আমি দুনিয়া ভরা ক্ষমা নিয়ে তোমাদের নিকট উপস্থিত হব। *(তিরমিজী, মেশকাত, বা'বুল ইস্তেগফার)*

শির্ক সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা

তাওহীদ হচ্ছ ঈমান ও ইসলামের মূল ভিত্তি। তাওহীদ সকল নাবী-রাসুলের দাওয়াতের কেন্দ্রীয় বিষয়। আল্লাহর নিকট ইবাদত কবুলের শর্ত হচ্ছে তাওহীদ। বিপরীত দিকে শির্ক হচ্ছে জঘন্যতম পাপ। শিরকের অপরাধীকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না। শির্ক যাবতীয় আমলকে নষ্ট করে দেয়, জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়। তাই আমাদের তাওহীদের পাশাপাশি শির্ক সম্পর্কেও ইলম্ অর্জন করতে হবে। শির্ক্ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে আমরা আমাদের অজ্ঞাতেই আল্লাহ না করুন শির্কে জড়িয়ে যেতে পারি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।" *(সূরা, যূমার ৩৯ঃ৯)*

আমাদেরকে জানতে হবে শির্ক কি? শির্ক কিভাবে হয়, শির্কের কারণ কি? শির্কের পরিণাম ও ভয়াবহতা কি? তাহলেই আমরা শির্ক থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকতে পারব। ভাল কিছু জানলে যেমন তা অর্জন করার আগ্রহ থাকে, তেমনি খারাপ কিছু জানলে তা থেকে সতর্ক থাকার ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। যার পরিণাম মন্দ ও ভয়াবহ তা জানলেই তা থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকা যায়। তাই বিবেক-বুদ্ধির ফায়সালা হচ্ছে ভাল ও মন্দ দু'টিরই জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

প্রসিদ্ধ সাহাবী হোযাইফা (রাঃ) বলেনঃ লোকেরা রাসুল (সঃ) কে ভাল ও কল্যানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করত, আর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম মন্দ ও অনিষ্টের বিষয়ে, এতে জড়িত হয়ে যাওয়ার ভয়ে। *(বুখারী)*

মন্দ থেকে বাঁচার জন্য মন্দ সম্পর্কে জানতে হবে। অনিষ্ট থেকে সতর্ক থাকতে হলে তা জানতে হবে। হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হলে বাতিলকে জানতে হবে। ইসলামের উপর বলিষ্ঠভাবে টিকে থাকতে হলে শির্ক, কুফর ও জাহিলিয়্যাতকে পুরোপুরি চিনতে হবে। তা না হলে দৃঢ়ভাবে ইসলামের উপর টিকে থাকা যাবে না। এ জন্যই উমার (রাঃ) বলেছেনঃ 'যে জাহিলিয়্যাত সম্পর্কে কিছু না জেনে ইসলামে (ইসলামী পরিবেশে) বেড়ে উঠেছে তার এই ইসলামের গিটগুলো একটি একটি করে ছিড়ে যাবে। *(তাইসীরুল আজিজিল হামিদ পৃঃ১১৪)*

শুধু তাওহীদের ইলমই যথেষ্ট নয়, শির্কের ইলম অর্জন করতে হবে। তাহলেই শির্ক্ থেকে বাঁচা সহজ হবে। শির্ক সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে আমাদেরকে অনেক শির্ক আচ্ছন্ন করে ফেলবে অথচ আমরা বুঝতেও পারব না যে এগুলো শির্ক। আর এসব শির্ক্ আমাদের ঈমানকে ও যাবতীয় আমলকে বিনাশ করে দিবে।

শির্কের কারণ

কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে আমরা এখানে শির্কের ৬ টি কারণ উপস্থাপন করছি, যেন সকলে এগুলো জেনে শির্ক থেকে বেঁচে থাকতে পারে-

আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা ও খারাপ মনেবৃত্তি পোষণ করা

মন্দ ধারণাই শিরকের নেপথ্য কারণ। যে কোন শিরকের পেছনে আল্লাহ্ সম্পর্কে কোন না কোন দোষ-ক্রটি ও মন্দ ধারণা কাজ করে। ভালবাসার বিপরীত এ মন্দ ধারণা পোষন করার কারণেই মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে অন্যেও ইবাদত করে। গায়রুল্লাহকে তার জন্য আল্লাহর চেয়ে অধিক দয়ালু ও কল্যানকামী মনে করে। আল্লাহ্ সম্পর্কে যারা মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ
دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"এবং মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষন করে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন। অমঙ্গল চক্র তাদেও জন্য। আল্লাহ্ তাদেও উপর রাগান্বিত হয়েছেন এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন, তা কত নিকৃষ্ট আবাস।" (*সূরা ফাতহ ৪৮ঃ৬*)

মুশরিকদের এ মন্দ ধারণার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে তাওহীদের ইমাম ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও মূতি পুজারী জাতির সামনে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন পবিত্র কুরআনে তা এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে-

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ
أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ
فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

"তোমরা কিসের পুজা করছ? তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা অলীক মা'বুদগুলোকে চাও? তাহলে বিশ্ব জাহানের রব সমন্ধে তোমাদের কি ধারণা?" (*সূরা- সাফফাত ৩৭ঃ৮৫-৮৭*)

এ কথার মর্ম হলো, তোমরা রাব্বুল আলামীনের মধ্যে কি ধরণের দোষ-ক্রটি ও মন্দের ধারনা পোষণ করছ? যার ফলে তাকে পরিত্যাগ করেছ এবং তাঁর পরিবর্তে এতসব মা'বুদ ও দেবতা বানিয়ে নিয়েছ? আল্লাহর সত্ত্বা, তাঁর গুনাবলী ও কার্যাবলী সম্পর্কে কি ধরণের খারাপ মনোবৃত্তি পোষণ করছ? কি ধরণের দোষ-ক্রটি তাঁর মধ্যে আছে বলে ধারণা করছ? কি ধরণের অক্ষমতা, অপারগতা, করুণার অভাব তাঁর মধ্যে আছে বলে তোমরা মনে করছ? যার ফলে সরাসরি তাঁর ইবাদত না করে ভায়া ও মাধ্যমের পুজা করছ এবং তাদের কাছেই কল্যাণের প্রত্যাশা করছ? এবং অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য তাদের শরণাপন্ন হচ্ছ?

উপরন্তু মুশরিকরা মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে দয়া করবেন না। এজন্যই তারা মাধ্যম ও ভায়া মা'বুদের ইবাদত করে। আল্লাহর নিকট এসব ভায়া মা'বুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে বলে বিশ্বাস করে। আল্লাহ্ তাদেরকে ভাল না বাসলেও ভায়া মা'বুদরা সুপারিশ করলে সে সুপারিশ আল্লাহ্ বাতিল করতে পারেন না।

সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করা

আল্লাহর সাথে শিরকের কারণ হচ্ছে, সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

"তাঁর সমতুল্য কোন কিছুই নেই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (*সূরা শুরা ৮২ঃ১১*)

"তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" (*সূরা- ইখলাস ঃ৪*)

অথচ মানুষ দু'আ, ভয়, আশা-ভরসা, সিজদা, মানত, কোরবানী এসব ইবাদত গুলো এককভাবে আল্লাহর জন্য নিবেদন না করে সৃষ্টিকেও এসব ইবাদতে শরীক করছে। পীর, ফকির, মাজার, মূর্তি, মৃত অলী-আউলিয়াদের জন্য তারা এসব নিবেদন করার মাধ্যমে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করছে। আল্লাহ্ আমাদের একমাত্র রব। অথচ মানুষ নবী, ফেরেশতা, জ্বীন, ওলী- আউলিয়া, পোপ-ফাদার, পুরোহিত, পীরবাবা, খাজাবাবা, দয়াল বাবা, কবর-মাজারস্থ মৃত ব্যক্তি, মুর্তি-দেবতার কাছে মানুষের লাভ-ক্ষতি, দান-বঞ্চনার ক্ষমতা আছে বলে মনে করে একমাত্র রব আল্লাহর সমতুল্য করছে। আল্লাহ্ একমাত্র আইন-বিধান দাতা, সার্বভৌমত্বেও মালিক অথচ মানুষ মানুষের জন্য আইন-বিধান দিয়ে সার্বভৌমত্বেও মালিক সাজছে।

এমনি আরো অসংখ্যভাবে মানুষ সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করছে।

আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা না দেয়া

শিরক মানে আল্লাহর সমস্ত মর্যাদাকে অস্বীকার করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমন্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে। পবিত্র মহান তিনি। তারা যাকে শরীক করে তিনি তাঁর উর্দ্ধে।" *(সূরা যুমার ৩৯ঃ৬৭)*

আয়াতের "হাক্কা ক্বাদরিহী" অর্থ যথাযথ মর্যাদা, যেরূপ মর্যাদা দিতে হয় সেরূপ মর্যাদা। পরিপূর্ণ, অবিভাজ্য, অংশীদারমুক্ত মর্যাদা। সে মর্যাদার অপর নাম তাওহীদ, একত্ব, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন। যে শিরক করল সে তাঁর মর্যাদা খন্ডিত করল, ভাগ করল, তাঁর মর্যাদার একাংশ অন্যকে দিল এবং আল্লাহকে দিল আংশিক মর্যাদা। আল্লাহকে যেরূপ মর্যাদা দেয়া উচিত সেরূপ মর্যাদা না দেয়ার কারণেই অনেকে আল্লাহর সাথে শিরক করে।

আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মুর্খতা

শিরকের কারণ সমূহের মধ্যে এটি হল জননী বা মাতৃ কারণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ

"বলুন, হে মূর্খরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ করছ?" *(সূরা, যুমার-৩৯ঃ৬৪)*

"আল্লাহ এবং তাঁর একত্ব সম্পর্কে মূর্খতা সবচেয়ে বড় মূর্খতা। আর আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে জ্ঞান হচ্ছে সবচেয়ে বড় জ্ঞান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ জেনে রেখো, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।" *(সূরা মুহাম্মদ-৪৭ঃ১৯)*

কিভাবে আমরা আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা হতে বিরত হব

আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা হতে বিরত থাকা কখনই পূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তিন ধরনের শির্কের বাদ দিব।

রবুবিয়াতের ক্ষেত্রে শির্ক

এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্র (সুবঃ) সাথে অন্য স্রষ্টা এবং পরিচালক আছে। যেমন কতিপয় পীর মনে করে থাকে যে, আল্লাহ্ (সুবঃ) দুনিয়ার কিছু কাজ কারবারকে কোন কোন আউলিয়ার হাতে সোপর্দ করেছেন, তারাই তা নির্বাহ করে থাকেন, যেমন কুতুবরা। এই ধারণা ইসলামের পূর্বের মুশরিকরা পর্যন্ত করে নাই যখন কুরআন তাদের প্রশ্ন করেঃ

"আর কে সমস্ত কাজ দেখাশুনা করে, তারা বলবে যে, আল্লাহ্।" *(সূরা ইউনুস ১০ঃ ৩১)*

লেখক বলেন, এক সূফী বলেছেনঃ আল্লাহ্র এমন বান্দাও আছে যদি সে বলে, হও, সাথে সাথে তা হয়ে যাবে। কিন্তু কুরআন তাদেরকে এই বলে মিথ্যাবাদী বলে যেঃ

"যখনই তিনি (আল্লাহ্) কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন বলেন- হও, সাথে সাথে তা হয়ে যায়।" *(সূরা ইয়াছিন ৩৬ঃ ৮২)*

"এবং আল্লাহ্ বলেনঃ "ওহে তাঁরই সৃষ্টি এবং হুকুমত।" *(সূরা আরাফ ৭ঃ ৫৪)*

ইবাদতের ক্ষেত্রে শির্ক

তা হল আল্লাহ্র সাথে অন্যের ইবাদত করা, যেমন নবীদের এবং নেককার বান্দাদের। যেমন তার অসিলায় বিপদ মুক্তি চাওয়া এবং বিপদে পড়ে তাদের কাছে দোয়া করা এবং এই জাতীয় কার্য। বড়ই অনুতাপের বিষয় যে, এসব এই উম্মতের মধ্যে অনেক আছে এবং এ বিশেষ পাপ ঐ সমস্ত পীররা গ্রহণ করবে যারা এই জাতীয় শির্ককে সাহায্য করে। অসিলা খোঁজার নামে তাকে অন্য নামে বিভূষিত করে। কারণ অসিলার অর্থ হল আল্লাহ্র কাছে কোন মাধ্যমকে খোঁজা। যেমন লোকেরা বলে যে, আল্লাহ্র রাসূল সাহায্য করুন, হে আবদুল কাদের জিলানী সাহায্য করুন। আর এই চাওয়াটা ইবাদত। কারণ তা হল দোয়া এবং দোয়া হল ইবাদত।

তাঁর গুণের মধ্যে শির্ক

তা হল তাঁর কোন সৃষ্টিকে ঐ সমস্ত গুণে ভূষিত করা যা শুধু তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। যেমন গায়েব (ভবিষ্যত) এর ইল্ম জানা। এই দলের মধ্যে অনেক পীররা অন্তর্ভুক্ত এবং যারা তাদের সাথে জড়িত আছে। যেমন বুছাইরী নবী (সঃ)-এর প্রশংসাতে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার দয়াতেই দুনিয়ার ভাল, আর মন্দও তোমা হতে এবং তোমার ইল্ম হতেই কলম ও লওহে মাহ্ফুজের ইল্ম। এর থেকে পথভ্রষ্ট চরম মিথ্যাবাদীদের কথা এসেছে যারা ভুল ধারণা পোষণ করে যে, নবী (সঃ)-কে তারা জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পায় এবং তাঁকে ঐ সমস্ত গোপন (বাতেন) জিনিস সম্বন্ধে প্রশ্ন করে যা তারা জানে না। ঐ সমস্ত লোকদের গোপন কথা যাদের সাথে তারা ভালবাসা করে এবং যাদের কোন কোন কার্যে তারা হস্তক্ষেপ করতে চায়। এমনকি ঐ কথাও যা নবী (সঃ) তাঁর জীবিত অবস্থাতেও জানতেন না। যেমন আল্লাহ্ নবী (সঃ)-এর ব্যাপারে বলেনঃ

"যদি আমি গায়েব জানতাম তবে ভালকেই বাড়িয়ে নিতাম এবং কোন ক্ষতিই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না।" *(সূরা আ'রাফ ৭ঃ ১৮৮)*

আর এটা কিভাবে সম্ভব তিনি তাঁর ওফাতের পর এই গায়েবকে জানেন যখন তিনি তাঁর উপরের বন্ধুর কাছে চলে গেছেন।

একদা নবী (সঃ) শুনলেন একটা বাচ্চা মেয়ে বলছেঃ এবং আমাদের মধ্যে এমন নবী আছেন যিনি আগামীকালের কথা জানেন। তখন নবী (সঃ) তাকে বললেনঃ না, এ কথা বল না, ঐ কথাই বল যা বলছিলে।" *(সহীহ বুখারী)*

তাওহীদ এবং শিরকের প্রকারভেদ

তাওহীদ এবং এর শ্রেনী বিভাগ

তৌহিদের আক্ষরিক অর্থ একীকরণ (কোন কিছু এক করা) অথবা দৃঢ়ভাবে এককত্ব ঘোষণা করা এবং এটার উৎপত্তি আরবী 'ওয়াহহাদা' শব্দ হতে যার অর্থ এক করা, ঐক্যবদ্ধ করা অথবা সংহত হওয়া।[১] কিন্তু যখন তৌহিদ শব্দটি আল্লাহর (অর্থাৎ তৌহিদুল্লাহ)[২] সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন আল্লাহ সম্পর্কিত মানুষের সকল পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কর্মকান্ডে আল্লাহর এককত্ব উপলদ্ধি করা ও তা নিরবচ্ছিন্নভাবে অক্ষুন্ন রাখা বুঝায়। আল্লাহ এক, তাঁর আধিপত্যে এবং তাঁর কর্মকান্ডে (রবুবিয়াহ) কোন শরীক বা অংশীদার নেই। এটাই বিশ্বাস যে, আল্লাহ একক, তাঁর রাজত্বে এবং কর্মে কোন শরীক নেই (রবুবিয়াহ)। তিনি তাঁর মৌলিকত্বে এবং গুণাবলীতে অতুলনীয় (আসমা ওয়াস সিফাত) এবং উপাস্যরূপে চির অপ্রতিদ্বন্দ্বী (উলুহিয়াহ/ইবাদাহ)। এই তিনটি বিষয়কে ভিত্তি করে তাওহীদের শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে। এই শ্রেণী তিনটি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একটির সঙ্গে অপরটি এতই অবিচ্ছেদ্য যে, কেউ যদি একটি বিষয় বাদ দেন তাহলে তিনি তাওহীদের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হবেন। উপরে বর্ণিত তাওহীদের যে কোন একটি বিষয় বাদ দেয়াকে "শির্ক" (অংশীদারী) বলে; আল্লাহকে অংশীদারদের সঙ্গে সংযুক্ত করা, যা ইসলাম অর্থে প্রকৃতপক্ষে পৌত্তলিকতা।

তাওহীদের তিন শ্রেণীকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত শিরোনামে উল্লেখ করা হয়ে থাকেঃ

১) তাওহীদ আর-রবুবিয়াহ (প্রতিপালকের এককত্ব অক্ষুন্ন রাখা)

২) তাওহীদ আল-আছমা ওয়াছ ছিফাত (আল্লাহর নাম ও গুনাবলীর এককত্ব বজায় রাখা)

৩) তাওহীদ আল-ইবাদাহ (আল্লাহর ইবাদতের এককত্ব বজায় রাখা)[৩]

রাসুল (সঃ) এর সময় তাওহীদের মূল তত্ত্বগুলি এমনভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল না বিধায় রাসূল (সাঃ) অথবা তাঁর সাহাবাগণ কর্তৃক তাওহীদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়নি। তা সত্বেও, কোরআনের আয়াত এবং রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণের ব্যাখ্যামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে তাওহীদের শ্রেণীগুলি ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

তাওহীদ আর-রবুবিয়াহ

তাওহীদ আর-রবুবিয়ার মূল কথা হচ্ছে যে যখন কিছুই ছিল না তখন আল্লাহ একই সকল সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দেন; সৃষ্টি থেকে অথবা সৃষ্টির জন্য কোন প্রয়োজন মেটানোর কারণ ব্যতিরেকেই আল্লাহ সৃষ্ট জগৎ প্রতিপালন করেন। তিনি সমগ্র বিশ্ব ও এর অধিবাসীদের একমাত্র প্রভু এবং তাঁর সার্বভৌমত্বের কোন প্রতিদ্বন্দী নেই। আরবী ভাষায় "রবুবিয়াহ" শব্দটির মূল ধাতু হচ্ছে "রব" (প্রতিপালক) যা একই সাথে সৃষ্টি ক্ষমতা এবং প্রতিপালন উভয় গুণের পরিচয় বহন করে। এই শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী আল্লাহই একমাত্র সত্যিকার শক্তি, তিনিই সকল বস্তুর চলাফেরা ও পরিবর্তনের ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি যেটুকু ঘটনা ঘটাতে দেন সেটুকু ব্যতীত সৃষ্টি জগতে কিছুই ঘটে না। এই বাস্তবতার স্বীকৃতি স্বরূপ রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) প্রায়ই "লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন বিচলন অথবা ক্ষমতা নেই) বলে বিস্ময়সূচক উক্তি করতেন।

কোরআনের বহু আয়াতে রবুবিয়াহ আকীদার ভিত্তি পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ বলেছেন-

---

১. *J.M. Cowan,the Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic (Spoken language Services Inc, New York, 3rd ed, 1976 p 1055)*

২. *প্রকৃতপক্ষে তৌহিদ শব্দটি কোরআনে অথবা রাসূল (সঃ) এর বাণীর (হাদীস) কোথাও উল্লেখ নেই। তা সত্ত্বেও, নবম হিজরী সনে রাসূল (সঃ) যখন মুআয ইবনে যাবাকে ইয়েমেনে গভর্ণর করে পাঠালেন তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "আপনি খৃষ্টান ও ইহুদী (আহল আল কিতাব)দের কাছে যাবেন, কাজেই আপনি প্রথমেই তাদের আল্লাহ এর এককত্ব দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করবেন (ইউওয়াহহিদু আল্লাহ) ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্নিত এবং আল বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত (Muhammad Muhsin khan, Sahih Al Bukhari, (Arabic English), (Riyadh; Maktabah ar Riyaad al-Hadeetah, 1981), 8 vol, 9, pp 348-9, no, 469) and Muslim (Abdul Hamid Siddiq, Sahih Muslim (Englishtrans), (Lahore; Sh. Muhmmad ashraf Publishers, 1987) Vol. 1, pp 14-5, no. 27). এই হাদীসে নবী (সঃ) যে ক্রিয়ার বর্তমান কাল রূপ ব্যবহার করেছেন, সেই ক্রিয়ার বিশেষ্য হতে তৌহিদ শব্দটি উৎপত্তি।*

৩. *ইবনে আবিল-এজ্জ্ব আল হানাফী, শার-আল-আকীদাহ আত-তাহাউইয়্যা, পৃষ্ঠা ৭৮।*

"আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা ।" *(সূরা আয-যুমার ৩৯ঃ ৬২)*

"প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে এবং তোমরা যাহা কর তাহাও ।" *(সুরা আছ্-ছাফফাত ৩৭ঃ ৯৬)*

"এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহই করিয়াছিলেন ।" *(সূরা আল্-আনফা'ল ৮ঃ ১৭)*[৪]

"আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না ।" *(সূরা আত্-তাগাবুন ৬৪ঃ ১১)*

রাসূল (সঃ) এই ধারণার আরও বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, "সাবধান, যদি সমস্ত মানব জাতি তোমাকে সাহায্য করার জন্য কিছু করতে চায়, তারা শুধু অতটুকুই করতে সক্ষম হবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য আগেই লিখে রেখেছেন । অনুরূপ, যদি সমস্ত মানব জাতি ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়, তারা শুধু ততটুকুই ক্ষতি করতে সক্ষম হবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য আগেই লিখে রেখেছেন ।"[৫]

কাজেই, মানুষ যা সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য বলে ধারণা করে তা শুধুমাত্র এই জীবনের পুর্ব নির্ধারিত পরীক্ষার অংশ । আল্লাহ যে ভাবে নির্ধারণ করে রেখেছেন সেই ভাবেই ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয় । আল্লাহ কোরআনে উলেখ করেছেন,

"হে মু'মিনগ! তোমাদিগের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে তোমাদিগের (কিছু) শত্রু রহিয়াছে; অতএব তাহাদিগের সম্পর্কে তোমরা সর্তক থাকিও ।" *(সূরা আত্-তাগা'বুন ৬৪ঃ১৪)*

অর্থাৎ **"মানুষের জীবনের ভাল জিনিসের মধ্যেও আল্লাহর উপর বিশ্বাসের কঠিন পরীক্ষা নিহিত আছে । অনুরূপভাবে, জীবনের কঠিন ও ভয়াবহ ঘটনাবলীতেও পরীক্ষা নিহিত রয়েছে; যেমন আয়াতে উল্লেখ হয়েছেঃ "নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করিব । তুমি ধৈযশীলগণকে শুভ সংবাদ দাও ।"** *(সূরা আল্-বাকারা ২ঃ১৫৫)*

কখনও কখনও জীবনের ঘটনাগুলো উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করা সহজ যখন কার্যকরণ অনুযায়ী ফলাফল ঘটে । আবার কখন উপলব্ধি করা কঠিন যখন আপাতঃ দৃষ্টিতে মন্দ কাজের সুফল অথবা ভাল কাজ থেকে খারাপ ফল আসে । আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, সীমিত জ্ঞানের জন্যে এই ধরনের আপাতঃ অনিয়মের পেছনে কি বিজ্ঞতা রয়েছে তা মানুষের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বাইরে ।

"কিন্তু তোমরা যাহা পছন্দ কর না সম্ভবতা তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যাহা পছন্দ করা সম্ভবতা তাহা তোমাদের কাছে অকল্যাণকর ।" *(সূরা-আল বাকারা ২ঃ ২১৬)*

মানুষের জীবনে আপাতঃ অকল্যাণকর ঘটনা কখনো শেষ পর্যন্ত কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয় এবং আপাতঃ কল্যাণকর জিনিস যা মানুষ পছন্দ করে তা শেষ পর্যন্ত অকল্যাণকর হয় । জীবনে যে সব সুযোগ আসে তা থেকে পছন্দ করে জীবন গড়ার মধ্যেই মানুষের প্রভাব সীমাবদ্ধ- সুযোগের প্রকৃত ফলাফলের উপর মানুষের কোন ক্ষমতা নেই । অন্য কথায়- "মানুষ প্রস্তাব করে, সৃষ্টা নিষ্পত্তি করে ।"

তাওহীদুর রবুবিয়্যার প্রতি ঈমানের দাবী হচ্ছে নিম্নে লিখিত ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব মেনে নেয়াঃ

১) "আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা"- *সূরা আন'আম ৬ঃ১০২/ আরাফ ৭ঃ৫৪/ যুমার ৩৯ঃ৬৫/ সাফফাত ৩৭ঃ৯৬ ।*

২) "তিনিই আসমান, যমীন এবং এর মধ্যবতী সবকিছুর প্রতিপালক"- *সূরা ফাতিহা ১ঃ১/ শুয়ারা ২৬ঃ২৪/ নাস ৪ঃ১ ।*

৩) "তিনিই সবপ্রানীর একমাত্র জীবিকা দাতা"- *সূরা হুদ ১১ঃ৬/ যারিয়াত ৫১ঃ৫৮ ।*

৪) "সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র মালিকানা তাঁরই"- *সূরা বাকারা ২ঃ২৫৫/ মু'মিনুন ২৩ঃ৮৪-৮৫ ।*

৫) "আল্লাহই আসমান-যমীন সহ সব কিছুর পরিচালনাকারী"- *সূরা সাজদা ৩২ঃ৫ ।*

৬) "আল্লাহই আসমান, যমীন এবং এর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী"- *সূরা মু'মিনুন ২৩ঃ৮৮ ।*

৭) "আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী"- *সূরা আলে ইমরান ৩ঃ২৬/ ফোরকান ২৫ঃ২/ আরাফ ৭ঃ১৫৮ ।*

---

৪. এটি একটি অলৌকিক ঘটনার সূত্র যা ঘটেছিল যখন রাসূল (সঃ) হাতে কিছু ধূলা নিয়ে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন (বদরের যুদ্ধের প্রথম দিকে) । শত্রুদের অবস্থান বহুদূরে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ সেই ধূলি তাদের মুখ মন্ডলে পৌছে দেন ।

৫. ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্নিত এবং আত-তিরমিজী কর্তৃক সংগৃহীত । †`Lyb Ezzeddin Ibrahim Denys Jonson- Davies, An-Nawawiis Forty Hadith, (Englishtrans) (Damascus, Syria;the Holy Koran publishing House, 1976), p 68, no 19

৮) "আল্লাহই একমাত্র আইন-বিধান দাতা, হালাল-হারাম ঘোষনাকারী"- *সূরা ইউসুফ ১২:৪০/ আরাফ ৭:৫৪/ রাদ ১৩:৪১/ কাসাস ২৮:৭০, ৮৮/ আন'আম ৬:৫৭/ ১০:৫৯/ ৯:৩৭/ ৫:৫০/ নাহল ১৬:১১৬ ।*

৯) "তিনিই ভাল-মন্দ নির্ধারণকারী, সাহায্যকারী, বিপদাপদ দাতা এবং মুক্তিদাতা, রক্ষাকর্তা"- *সূরা তাগাবুন ৬৪:১১/ ইউনুস ১০:১০৭/ আন'আম ৬:৬৪/ আলে ইমরান ৩:২৬/ ৭:১৮৮/ ৩:১৫০/ ৩৬:৭৪-৭৫ ।*

১০) "তিনিই একমাত্র সন্তানদাতা এবং জীবন-মৃত্যুর মালিক"- *সূরা শুরা ৪২:৪৯-৫০/ হাজ্জ ২২:৬৬ ।*

১১) "তিনিই একমাত্র গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞানী"- *সূরা আন'আম ৬:৫৯/ নামল ২৭:৬৫/ লুকমান ৩১:৩৪ ।*

তাওহীদ আল্-আছ্মা ওয়াছ-ছিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব বজায় রাখা)

এই শ্রেণীর তাওহীদের পাঁচটি প্রধান রূপ আছেঃ

১) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব বজায় রাখার প্রথম শর্ত হ'ল, কোরআন এবং হাদিসে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) আল্লাহর যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে ছাড়া আর কোনভাবে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া যাবে না। তিনি বলেন,

"এবং মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও নারী যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদিগকে তিনি শাস্তি দিবেন। উহাদিগের চারিদিকে অমঙ্গল চক্র, আল্লাহ উহাদিগের প্রতি রাগ করিয়াছেন, উহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং উহাদিগের জন্য অমঙ্গল পরিণতি প্রস্তুত রাখিয়েছেন।" *(সূরা আল্-ফাত্হ্ ৪৮: ৬)*

কাজেই ক্রোধ আল্লাহর গুণাবলীর একটি। এটা বলা ভূল হবে যে, যেহেতু ক্রোধ মানুষের মধ্যে একটি দুর্বলতার চিহ্ন যা আল্লাহর জন্য শোভন নয় সেহেতু আল্লাহর ক্রোধ অবশ্যই তাঁর শাস্তি বুঝায়। **"কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে"** *(সূরা আশ্-শূরা ৪২: ১১)* আল্লাহর এই ঘোষণার ভিত্তিতে আল্লাহর ক্রোধ যে মানুষের ক্রোধের মত নয় তা গ্রহণ করতে হবে। তথাকথিত "বিজ্ঞতাপূর্ণ" (rational interpretation) ব্যাখ্যা অনুযায়ী যখন যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছান যায় তখন তা নাস্তিকতার জন্ম দেয়। (অনুবাদকের মতামতঃ "rational interpretation" দ্বারা খুব সম্ভবত লেখক আবু আমিনাহ এটাই বলতে চেয়েছেন যে যেহেতু **"কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে"** *(৪২: ১১)* কাজেই আল্লাহ মানুষের মত এবং যেহেতু মানুষের প্রাণ আছে কাজেই আল্লাহর প্রাণ থাকতে পারে না। এই যুক্তির ফলেই একজন নাস্তিকতায় উপনীত হয়। কিন্তু এটা শুধু শব্দের মারপ্যাঁচের মাধ্যমে সত্যের অপব্যাখ্যা) কারণ আল্লাহ নিজেকে জীবন্ত বলে উল্লেখ করেছেন, সুতরাং যুক্তিবাদী বিচার অনুযায়ী স্রষ্টা নিষ্প্রাণ এবং অস্তিত্বহীন নয়। প্রকৃত ব্যাপার হ'ল আল্লাহর গুণাবলীর সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য শুধুমাত্র নামে, মাত্রায় নয়। যখন স্রষ্টাকে উদ্দেশ্য করে গুণাবলি ব্যবহৃত হয় তখন সেগুলি সার্বভৌম অর্থে গ্রহণ করতে হবে এবং বুঝতে হবে সে সেগুলি মানব সুলভ অসম্পুর্ণতা মুক্ত।

২) তাওহীদ আল্-আছ্মা ওয়াস-সিফাত এর দ্বিতীয় রূপ হ'ল আল্লাহর উপর কোন নতুন নাম ও গুণাবলী আরোপ না করে তিনি নিজেকে যেভাবে উলেখ করেছেন সেভাবেই তাঁকে উলেখ করা। উদাহরণস্বরূপ, যদিও তিনি বলেছেন যে তিনি রাগ করেন তথাপি তাঁর নাম আল্-গাদিব (রাগী জন) দেয়া যাবে না কারণ আল্লাহ বা তাঁর রাসুল (সাঃ) কেউ এই নাম ব্যবহার করেননি। এটা একটি ক্ষুদ্র বিষয় মনে হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর অসত্য বা ভূল বর্ণনা রোধ করার জন্য তৌহিদ আল্-আছ্মা ওয়াছ-ছিফাত অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ সসীম মানুষের পক্ষে কখনোই অসীম স্রষ্টার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

৩) তাওহীদ আল্-আছ্মা ওয়াছ-ছিফাত এর তৃতীয় শর্ত অনুযায়ী আল্লাহকে কখনোই তাঁর সৃষ্টির গুণাবলি দেয়া যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, বাইবেল ও তৌরাতে দাবী করা হয় যে আল্লাহ ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং তারপর সপ্তম দিনে নিদ্রা যান। এই কারণে ইহুদি ও খৃষ্টানগণ হয় শনিবার নতুবা রবিবারকে বিশ্রামের দিন হিসাবে নেয় এবং ঐ দিন কাজ করাকে পাপ বলে গণ্য করে। এই ধরণের দাবী স্রষ্টার উপর তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী আরোপ করে। মানুষই গুরুভার কাজের পর ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং সবলতা পুনরুদ্ধারের জন্য তাদের ঘুমের প্রয়োজন হয়।[৬] বাইবেল ও তৌরাতের অন্য জায়গায় উলেখ করা হয়েছে যে মানুষ যেমন তার ভূল উপলব্ধি করে অনুতপ্ত হয় তেমনি স্রষ্টাও তাঁর খারাপ চিন্ত

৬. *এর বিপরীতে আল্লাহ কোরআনে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন, " তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না।" (সূরা আল বাকারা ২:২৫৫)*

ার জন্য অনুতপ্ত হন ।[৭] অনুরূপভাবে স্রষ্টা একটি আত্মা অথবা তাঁর একটি আত্মা আছে বলে দাবী করা তৌহিদ আল্-আছমা ওয়াছ ছিফাতকে সম্পুর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয় । আল্লাহ কোরআনের কোন জায়গায় নিজেকে আত্মা বলে উলে-খ করেননি অথবা তাঁর রাসুল (সঃ) হাদিসে ঐ ধরণের কোন বক্তব্য প্রদান করেননি । প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ আত্মাকে তাঁর সৃষ্টির একটি অংশ হিসাবে উলেখ করেছেন ।[৮]

আল্লাহর গুণাবলী উল্লেখ করতে কোরআনের আয়াতকে মৌলিক নিয়ম হিসাবে অনুসরণ করতে হবে,

"কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।" *(সূরা আশ-শূরা ৪২ঃ ১১)*

শ্রবণ ও দর্শন মানুষের গুণাবলী কিন্তু যখন স্রষ্টার উপর আরোপিত করা হয় তখন সেগুলি তুলনাবিহীন এবং ত্রুটিমুক্ত । যাহোক এই গুণাবলী মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চোখ ও কান অপরিহার্য, যা স্রষ্টার জন্য প্রযোজ্য নয় । স্রষ্টা সম্বন্ধে মানুষ কেবলমাত্র ততটুকুই জ্ঞাত যতটুকু তিনি তাঁর পয়গম্বরদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন । সুতরাং, মানুষ এই সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে অবস্থান করতে বাধ্য । মানুষ যদি স্রষ্টার বর্ণনা দিতে লাগামহীন বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাহলে আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির গুণাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মত ভূলের সম্ভবনা থেকে যায় ।

কল্পিত চিত্রের প্রতি আসক্তির কারণে খৃষ্টানরা মানুষ সদৃশ অগণিত চিত্র অঙ্কন, খোদাই এবং ঢালাই করে সেগুলিকে স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি নাম দিয়েছে । এইগুলি জনগণের মধ্যে যিশুখৃষ্টের দেবত্বের স্বীকৃতি আদায় করতে সাহায্য করেছে । স্রষ্টা মানুষের মত, একবার এই কল্পনা গ্রহণযোগ্য হলে, যিশুখৃষ্টকে স্রষ্টা হিসাবে গ্রহণ করতে সত্যিকার কোন সমস্যা দেখা দেয় না ।

৪) তাওহীদ আল্-আছ্মা ওয়াছ্-ছিফাতের চতুর্থ রূপের জন্য প্রয়োজন মানুষের উপর আল্লাহর গুণাবলী আরোপ না করা । যেমন, বাইবেলের নতুন সংস্করণে (Newtestament) পলকে (Paul) তৌরাতে (Genesis 14:18-20) বর্ণিত সালেমের রাজা মেলচিজদেকের রূপে দেখান হয়েছে এবং তার ও যিশুখৃস্টের কোন আদি বা অন্ত নেই । এই বলে স্বর্গীয় গুণে গুণান্বিত করা হয়েছেঃ

- "স্রষ্টার প্রধান পুরোহিত, সালেমের রাজা মেলচিজদেক রাজাদের বধ করার পর প্রত্যাগত আব্রাহামের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন এবং তাকে আশীবাদ করলেন";
- "এবং আব্রাহাম তাকে সব কিছুর এক দশমাংশ বিলি করে দিলেন । তাঁর নামের অর্থ হিসাবে তিনিই প্রথম ন্যয়নিষ্ঠার রাজা এবং সালেমেরও রাজা, অর্থাৎ শান্তির রাজা"
- "তিনি পিতা অথবা মাতা অথবা বংশ বৃত্তান্ত এবং আদি অন্তবিহীন; কিন্তু স্রষ্টার পুত্রের সদৃশ হয়ে চিরদিন পুরোহিত হিসাবে বহাল থাকবেন ।"[৯]
- সুতরাং যিশুখৃস্টও নিজেকে প্রধান পুরোহিত পদে পদোন্নতি দেননি কিন্তু তাঁর দ্বারা নিয়োজিত হয়েছিলেন যিনি তাঁকে বললেন, "তুমি আমার পুত্র, আজ আমি তোমাকে জন্মদান করলাম;"
- যেমন তিনি অন্যখানেও বলেন, "মেলচিজ্দেকের পরে তুমি চিরদিনের জন্য পুরোহিত" ।[১০] বেশীর ভাগ শিয়া সম্প্রাদায় (ইয়েমেনের যাইদাইদরা ছাড়া) তাদের ইমামগণকে সম্পুর্ণভাবে ভূলভ্রান্তির উর্দ্ধে (মাসুম)[১১], অতীত, ভবিষ্যত ও অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞানী, ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম[১২] এবং সৃষ্টির অনুপরমাণু

---

৭. *Exod s 32: 14 i andthe Lord repented ofthe evil which hethoughtto doto his people. (এবং প্রভু অনুতপ্ত হলেন মানুষের অমঙ্গল করার চিন্তা করার জন্য) । (Holy Bible, Revised Standard Version).*

৮. *আল্লাহ স্পষ্টভাবে এই আয়াতে উল্লেখ করেনঃ তারা আপনাকে (মুহাম্মদকে) আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে । বলে দেন (তাদের) যে, আমার স্রষ্টার আদেশে আত্মা (বিদ্যমান) । (সূরা আল ইছরা ১৭ঃ ৮৫)*

৯. *Hebrews 7: 1-3 (Holy Bible, Revised Standard Version)*

১০. *Hebrews 5: 5-6 (Holy Bible, Revised Standard Version)*

১১. *মুহাম্মদ রিদা আল্-মুজাফফর তার Faith of Shi'a Islam (U.S.A) Muhammaditrust of Great Britain and Northern Ireland, 2nd ed, 1983). শীর্ষক বইতে উল্লেখ করেছেন, আমরা বিশ্বাস করি যে, রাসূলের মত, একজন ইমাম অবশ্যই ভূলভ্রান্তির উর্দ্ধে অর্থাৎ জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত, প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য, পরিকল্পিত ভাবে অথবা অপরিকল্পিভাবে ভুল করা অথবা অন্যায় করায় অক্ষম কারণ ইমামগণ ইসলামের সংরক্ষক এবং এটা তাদের অধীনে সুরক্ষিত । পৃষ্ঠা ৩২ আরও দেখুন Islam (Teheran: A Group of Muslim Brothers, 1973), p 35, by Sayed Saeed Akhtar Rizvi.*

নিয়ন্ত্রণকারী[১৩] হিসাবে স্বর্গীয় গুণে গুনান্বিত করেছে। এঁটা করতে যেয়ে তারা সেই সব প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করেছে যারা স্রষ্টার অদ্বিতীয় গুণাবলির অংশীদার এবং আল্লাহর সমসাময়িক।

৫) আল্লাহর নামের এককত্ব বজায় রাখার আরও অর্থ হ'ল যদি নামে আগে আব্দ' (অর্থ ভৃত্য অথবা বান্দা) সংযোজিত না করা হয় তাহলে তার সৃষ্টিকে আল্লাহর কোন নামে নামকরণ করা যাবে না। কিন্তু 'রাউফ' এবং 'রহিম' এর মত বহু স্বর্গীয় নাম মানুষের নাম হিসাবে অনুমোদিত কারণ রাসুল (সঃ) কে উল্লেখ করতে যেয়ে আল্লাহ এই ধরনের কিছু নাম ব্যবহার করেছেন।

"তোমাদিগের মধ্যে হইতেই তোমাদিগের নিকট এক রাসুল আসিয়াছে। তোমাদিগকে যাহা বিপন্ন করে উহা তাঁহার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদিগের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দরদী (রাউফ) ও পরম দয়ালু (রহিম)।" (সূরা আত্-তওবা ৯ঃ ১২৮)

কিন্তু 'আর-রাউফ' (যিনি সবচেয়ে সমবেদনায় ভরপুর) এবং 'আর রহিম' (সবচেয়ে ক্ষমাশীল) মানুষের ব্যাপারে তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন নামের আগে আবদ ব্যবহার করা হবে, যেমন আব্দুর-রাউফ অথবা আব্দুর রহিম। আর-রাউফ এবং আর রহিম এমন এক পূর্ণতার প্রতিনিধিত্ব করে যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। তেমনিভাবে, আব্দুর-রাসূল (বার্তাবাহকের গোলাম), আব্দুন-নবী (রাসুলের গোলাম), আব্দুল-হুসাইন (হুসাইনের গোলাম) ইত্যাদি নামগুলি নিষিদ্ধ, কারণ এখানে মানুষ নিজেদেরকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের গোলাম হিসাবে ঘোষণা করেছে। এই মতবাদের ভিত্তিতে, রাসুল (সঃ) মুসলিমদের তাদের অধীনস্থদের 'আবদী' (আমার গোলাম) অথবা 'আমাতী' (আমার বাঁদী) বলে উলেখ করতে নিষেধ করেছেন।[১৪]

তাওহীদ আল্-ইবাদাহ্ (আল্লাহর ইবাদতের এককত্ব বজায় রাখা)

প্রথম দুই শ্রেণীর তাওহীদের ব্যাপক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা থাকলেও শুধুমাত্র সেগুলির উপর দৃঢ় বিশ্বাসই তৌহিদের ইসলামী প্রয়োজনীয়তা পরিপূরণে যথেষ্ট নয়। ইসলামী মতে তৌহিদকে পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্য তৌহিদ আর-রবুবিয়াহ এবং আল্-আছমা ওয়াছ-ছিফাত অবশ্যই এদের পরিপূরক তৌহিদ আল্-ইবাদাহ্-র সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। এই বিষয়টি যে ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত তা'হল আল্লাহ নিজেই পরিস্কার ভাষায় উলেখ করেছেন যে রাসুলের সময়কার মুশরিকণ (পৌত্তলিকণ) তৌহিদের প্রথম দুই শ্রেণীর বহু বিষয় সত্য বলে স্বীকার করেছিল। কোরআনে আল্লাহ রাসুল (সঃ)-কে পৌত্তলিকদের বলতে বলেছেন,

"বল কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কাহার কর্তৃত্বাধীন, কে জীবিতকে মৃত হইতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হইতে নির্গত করে এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করে? তখন তাহারা বলিবে, আল্লাহ"। (সুরা ইউনুছ ১০ঃ ৩১)

"যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে, উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ'।" *(সুরা আয-যুখরুফ ৪৩ঃ ৮৭)*

"যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ভূমি মৃত হইবার পর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া কে উহাকে সঞ্জীবিত করে? উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ'।" *(সুরা আল-আনকাবুত ২৯ঃ ৬৩)*

মক্কার পৌত্তলিকরা সবাই জানতো যে আল্লাহ হ'ল তাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, তাদের প্রভু এবং মালিক তবুও আল্লাহর কাছে ঐ জ্ঞান তাদের মুসলিম বানাতে পারেনি। আল্লাহ বলেছেনঃ

"তাহাদিগের অধিকাংশ আল্লাহ বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁহাকে শরীক করিয়া।" *(সুরা ইউসুফ ১২ঃ ১০৬)*

---

১২. *আল মুজাফফর আরো উল্লেখ করেছেন, আমরা বিশ্বাস করি যে ইমামগণের অনুপ্রেরণা পাবার ক্ষমতা উৎকর্ষতা চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছেছে এবং আমরা এটাকে স্বর্গীয় ভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা বলি। এই ক্ষমতা বলে ইমাম সুশৃঙ্খল যুক্তিতর্ক অথবা কোন শিক্ষকের পথ নির্দেশ ছাড়াই যে কোন স্থানে এবং যে কোন সময়ে যে কোন বিষয়ে সংবাদ তাৎক্ষনিকভাবে বুঝতে সক্ষম।*

১৩. *আল খোমেনী বলেন, "নিশ্চয়ই ইমামের একটি সম্মানজনক অবস্থান, সুউচ্চ পদমর্যাদা, সৃজনশীল খেলাফত এবং সৃষ্টির সকল পরমাণুর উপর সার্বভৌম ক্ষমতা ও প্রাধান্য রয়েছে।" (Aayatullah Musavi al-khomeini al-Hukoomah al-Islaameyah, Beirut: attaleeiah press, Arabic ed, 1979, p 52)*

১৪. *Sunan Abu Dawud, (Englishtrans), Vol, 3 pp 1385, no 4957.*

এই আয়াতের উপর, মুজাহিদের[১৫] ভাষ্য হলঃ আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের প্রতিপালন করেন এবং আমাদের জীবন নেন এই বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ঘোষণা তাদেরকে আল্লাহর পাশাপাশি অন্যান্য দেব দেবতার উপাসনা হতে বিরত করেনি।[১৬] পূর্বে উল্লেখকৃত আয়াতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাফেররা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, রাজত্ব ও ক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, ভীষণ প্রয়োজন এবং দুর্যোগের সময় তারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে হজ্জ, দান, পশু বলি, মানত এমনকি উপাসনাও করত। এমনকি তারা ইব্রাহিমের ধর্ম অনুসরণ করছে বলেও দাবি করত। ঐ ধরণের দাবীর কারণে আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেনঃ

"ইব্রাহিম ইয়াহুদীও ছিল না, খৃস্টানও ছিল না, সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" *(সুরা আল-ইমরান ৩ঃ ৬৭)*

কিছু পৌত্তলিক মক্কাবাসী এমনকি পুনরুত্থান, শেষ বিচার এবং পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য (কদর) বিশ্বাস করত। প্রাক-ইসলামী কবিতায় তাদের এই বিশ্বাসের প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, কবি যুহাইর (Zuhayr) বলেছিলেনঃ

"হয় ইহা স্থগিত করা হয়েছিল, একটি পুস্তকে রক্ষিত হইয়াছিল এবং শেষ বিচার দিনের জন্য রক্ষা করা হয়েছিল নতুবা ত্বরান্বিত করা হয়েছিল এবং প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছিল।"

আন্তারা (Antarah) বলেছেন বলে উদ্ধৃত আছেঃ

"ওহে এবিল মৃত্যু হইতে তুমি কোথায় পালাইয়া যাইবে, যদি আসমানস্থিত আমার স্রষ্টা তোমার ভাগ্যে তা লিখিয়া থাকে?"

মক্কাবাসীরে তৌহিদ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি এবং আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি তারা অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে নাস্তিক (কাফের) এবং পৌত্তলিক (মুশরিক) হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।

ফলে তৌহিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল তৌহিদ আল-ইবাদাহ অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে এককত্ব বজায় রাখা। যেহেতু একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত প্রাপ্য এবং মানুষের ইবাদতের ফল হিসাবে একমাত্র তিনিই মঙ্গল মঞ্জুরী করতে পারেন, সেজন্য সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহকে উদ্দেশ্য করেই করতে হবে। অধিকন্তু, মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যে যে কোন ধরণের মধ্যস্থতাকারী অথবা যোগাযোগকারীর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ একমাত্র তাঁকে উদ্দেশ্য করেই ইবাদতের গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এটাই সকল পয়গম্বর কর্তৃক প্রচারিত বার্তার সারমর্ম। আল্লাহ বলেছেন-

"আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে।" *(সুরা আয-যারিয়াত ৫১ঃ ৫৬)*

"আল্লাহর ইবাদত করিবার ও তাগুতকে (মিথ্যা দেবদেবীকে) বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠাইয়াছি।" *(সুরা আন-নাহল ১৬ঃ ৩৬)*

সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পুর্ণভাবে উপলব্ধি করা মানুষের সহজাত ক্ষমতার উর্দ্ধে। মানুষ একটি সসীম সৃষ্টিকর্ম এবং তার নিকট হতে অসীম স্রষ্টার ক্রিয়াকান্ড সম্পুর্ণ যুক্তিসঙ্গতভাবে উপলব্ধি আশা করা যায় না। এই কারণে স্রষ্টা তাঁকে ইবাদত করা মানুষের স্বভাবের একটি অংশ হিসাবে তৈরি করেছেন। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিস্কার করে বুঝানোর জন্য তিনি পয়গম্বারদের এবং মানসিক ক্ষমতার বোধগম্য কিতাবসমূহ প্রেরণ করেছিলেন। স্রষ্টার ইবাদত (ইবাদাহ) করা উদ্দেশ্য এবং পয়গম্বারদের প্রার্থনা বার্তা ছিল একমাত্র সৃষ্টাকে ইবাদত করা, তৌহিদ আল ইবাদাহ। এর কারণে আল্লাহ ছাড়া অথবা আল্লাহ সহ অন্যকে ইবাদত করা কঠিন গুনাহ, শিরক। যে সূরা আল ফাতিহা, মুসলিম নরনারীদের নামাজে প্রতিদিন অন্ততপক্ষে সতেরবার পড়তে হয় সেই সূরার চতুর্থ আয়াত উল্লেখ করে **''আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার কাছেই আমবা সাহায্য চাই।''** এই বিবৃতি থেকে পরিস্কার হয়ে যায়, সকল প্রকার ইবাদত আল্লাহকে উদ্ধেশ্য করে করতে হবে যিনি সাড়া দিতে পারেন।

রাসূল (সাঃ) এককত্বের দর্শন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে বলেছেনঃ তুমি যদি ইবাদতে কিছু চাও তাহলে শুধু আল্লাহর নিকট চাও এবং তুমি যদি সাহায্য চাও তাহলে শুধু আল্লাহর নিকট চাও'' প্রয়োজনীয় এবং আল্লাহর নিকটবর্তীতা আরও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পায় কোরআনের বহু আয়াতে। উদাহরনস্বরূপঃ

---

১৫. মুজাহিদ ইবনে যুবায়ের আল মাক্কী, ইবনে আব্বাস এর অতি বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। তাঁর কোরআনের তাফসিরের (বিবরণী) বর্ণনা আবদুর রহমান আত-তাহির কর্তৃক সংকলিত হয়েছে এবং "তাফসির মুজাহিদ" শীর্ষক শিরোনামে (Islamabad ;Majma al-Buhooth)দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

১৬. ইবনে যারীর আত তাবারী কর্তৃক সংগ্রহীত।

"আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহবানকারী যখন আমাকে আহ্বন করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই। সুতরাং তাহারও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করক যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে।" *(সূরা আল বাকারা ২ঃ ১৮৬)*

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে কুমন্ত্রনা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষা ও নিকটতম।" *(সূরা ক্বাফ ৫০ঃ ১৬)*

তৌহিদ আল ইবাদাহ এর স্বীকৃতি, বিপরীত ভাবে সকল প্রকার মধ্যস্থতাকারী অথবা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারের সম্পৃক্ততার অস্বীকৃতি অপরিহার্য করে তোলে। যদি কেউ জীবিত ব্যক্তিদের জীবনের উপর অথবা যারা মারা গিয়েছে তাদের আত্মার উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য মৃত্যের কাছে প্রার্থনা করে, তারা আল্লাহর সঙ্গে একজন অংশীদার যুক্ত করে। এই ধরণের প্রার্থনা আল্লাহর পাশাপাশি অন্যের উপাসনা করার মত। রাসূল (সঃ) সুস্পষ্টভাবে বলেছেনঃ

"প্রার্থনাই ইবাদত।"[১৭] এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট এবং মহিমান্বিত বলেছেনঃ

"আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর না যাহা তোমাদিগের কোন উপকার করিতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না।" *(সূরা আল আম্বিয়া ২১ঃ ৬৬)*

"আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে আহবান কর তাহারা তো তোমাদিগেরই মত বান্দা।" *(সূরা আল আরাফ ৭ঃ ১৯৪)*

যদি কেউ রাসূল (সাঃ) অথবা তথকথিত আউলিয়া, জিন অথবা ফেরেশতাগণের নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে অথবা প্রার্থনাকারীর পক্ষ হয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে অনুরোধ করে তাহলে তারাও শির্ক করে। মূর্খ লোকেরা যখন আব্দুল কাদের জিলানীকে[১৮] গাওছি আজম উপাধীতে ভূষিত করে তখন তৌহিদের এই নিয়মে শির্ক করে। উপাধিটির আক্ষরিক অর্থ, মুক্তি প্রাপ্তির প্রধান উৎস; এমন একজন যিনি বিপদ হতে রক্ষা করার চেয়ে সবচেয়ে উপযুক্ত অথচ এই ধরণের বর্ণনা শুধু মাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। দূর্ঘটনা ঘটলে কেউ কেউ আবদুল কাদিরেকে এই উপাধিতে ডেকে তাঁর সাহায্য এবং আত্মরক্ষা কামনা করে, যদিও আল্লাহ আগেই বলেছেনঃ

"আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দান করলে তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী আর কেহ নাই।" *(সূরা আল-আন্আম ৬ঃ ১৭)*

কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, যখন মক্কাবাসিদের তাদের মূর্তিপূজার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তারা উত্তর দিলঃ

"আমরা তাদের ইবাদত করি যাহাতে তাহারা আমাদিগকে আল্লাহর কাছাকাছি পৌছায়।" *(সূরা আয্-যুমার ৩৯ঃ ৩)*

মূর্তিগুলিকে শুধুমাত্র মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ব্যবহার করলেও আল্লাহ তাদের আচার অনুষ্ঠানের কারণে তাদের পৌত্তলিক বলেছেন। মুসলিমদের মধ্যে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ইবাদত করার প্রতি জোর দেয় তারা ভাল ভাবে এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখতে পারেন।

তার্সাস নগরীর সলের (পরবর্তীকালে যাকে পল বলা হত) শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হয়ে খৃস্টানগণ পয়গম্বর যিশুখৃস্টের উপর দেবত্ব আরোপ করেছিল এবং তারা যিশুখৃষ্ট ও তাঁর মাতাকে উপাসনা করত। খৃস্টানদের মধ্যে ক্যাথোলিকদের প্রতিটি উপলক্ষের জন্য কিছু সাধু আছে। ক্যাথোলিকরা সাধুদের কাছে সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই প্রার্থনা করে যে এই সব সাধুরা জাগতিক ঘটনাবলিতে সরাসরিভাবে প্রভাব ফেলতে সক্ষম। ক্যাথলিকরা তাদের পুরোহিতদের আল্লাহ এবং তাদের নিজেদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবেও ব্যবহার করে। তারা বিশ্বাস করে যে এইসব পুরোহিতদের কৌমার্য ও ধর্মানুরাগের কারণে আল্লাহ কর্তৃক তাদের কথা

---

17. Sunan Abu Dawud, vol 1, p 387, no 1474.

১৮.আবদুল কাদির (১০৭৭-১১৬৬) বাগদাদের হানাফি আইনের স্কুল ও একটি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন। যদিও তিনি কোরআনের কিছু আয়াতে আধ্যাতিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তবুও তাঁর ধর্মোপদেশ কঠোরভাবে সনাতনী ছিল (আল-ফাতহ আর-রব্বানী, কায়রো, ১৩০২ পুস্ত কে সংগৃহীত)। ইবনে আরাবী (জন্ম ১১৬৫) তাঁকে (জামানার কুতুব হিসাবে ঘোষণা দেন এবং তাঁকে আল্লাহ ব্যতীত সকল বস্তুর উর্দ্ধে স্থান দেন। আলী ইবনে ইউসুফ আশ-শাওনাফী (মৃত ১৩১৪ খৃ) বাহযাত আল আশরার (কায়রো, ১৩০৪) নামে লিখিত একটি পুস্তকে আবদুল কাদির এর উপর বহু অলৌকিক ঘটনা আরোপিত করেন। তাঁর নামানুসারে কাদেরীয়া সূফী প্রথার নামকরণ করা হয় এবং এর আধ্যাতিক অনুশীলন ও বিধিবিধানের আদি উৎস তার উপর আরোপ করা হয়। (Shorter Encyclopedia of Islam, pp 5-7 and 202-205)

শুনার সম্ভবনা বেশী। মধ্যস্থতাকারী সম্বন্ধে বিকৃত বিশ্বাসের কারণে শিয়া সম্প্রাদায়ের বেশীর ভাগ লোক সপ্তাহের কয়েকটি দিন এবং দিনের কয়েক ঘন্টা আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হোসেন- এর প্রতি প্রার্থনার জন্য নির্ধারিত রেখেছে। [১৯]

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইবাদতে (ইবাদাহ্) শুধু রোজা রাখা, যাকাত প্রদান, হজ্জ এবং পশু কোরবানী করা ছাড়াও অনেক কিছু অন্তুর্ভূক্ত। এর মধ্যে ভালবাসা, বিশ্বাস এবং ভয়ের মত আবেগ অন্তর্ভুক্ত, যেগুলির বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে এবং যা শুধুমাত্র স্রষ্টার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হতে হবে। আল্লাহ এই সব আবেগের বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে উলেখ করেছেনঃ

"তথাপি কেহ কেহ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাহাদিগকে ভালবাসে; কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহর প্রতি তাহাদের ভালবাসা দৃঢ়তম।" *(সূরা আল-বাকারা ২ঃ ১৬৫)*

"তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিবে না, যাহারা নিজেদিগকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে ও রাসুলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করিয়াছে? উহারাই প্রথম তোমাদিগের বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছে। তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় কর? মুমিন হইলে আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে সমীচীন।" *(সুরা আত্-তাওবা ৯ঃ ১৩)*

"আর তোমরা মুমিন হইলে আল্লাহর উপরেই নির্ভর কর।" *(সুরা আল্-মায়েদা, ৫ঃ ২৩)*

ইবাদত (ইবাদাহ্) শব্দের অর্থ সম্পুর্ণভাবে আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহকে চুড়ান্ত আইন প্রণেতা হিসাবে গণ্য করা। কাজেই স্বর্গীয় আইনের (শারীয়াহ) উপর ভিত্তি না করে ধর্মনিরপেক্ষ আইন বিধান বাস্তবায়ন স্বর্গীয় আইনের প্রতি অবিশ্বাস এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার পর্যায়ে পড়ে। এই ধরনের বিশ্বাস আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের উপাসনা করার নামান্তর (শির্ক)। আল্লাহ কোরআনে উলেখ করেছেনঃ

"আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদানুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফিরুন)।" *(সুরা আল-মায়েদা ৫ঃ ৪৪)*।

সাহাবী আদি ইবনে হাতিম, যিনি খৃস্টান ধর্ম হতে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, রাসুল (সাঃ) কে কোরআনের আয়াত পড়তে শুনেন **"তাহারা আল্লাহ ব্যতীত তাহাদিগের পন্ডিতগণকে ও সংসার-ত্যাগীগণকে (rabbis and monasticism) তাহাদিগের প্রভু (আরবাব) রূপে গ্রহণ করিয়াছে।"** *(সুরা আত্-তওবা ৯ঃ৩১)*

তিনি রাসুল (সাঃ) কে বললেন, "নিশ্চয়ই আমরা তাদের উপসনা করি না।" রাসূল (সঃ) তার দিকে তাকিয়ে বললেন "আল্লাহ যা কিছু হালাল করেছেন তারা কি তা হারাম ঘোষনা করেনি এবং তোমরা সকলে তা হারাম করনি এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা কি তারা হালাল করেনি এবং তোমরা সকলে তা হালাল করনি?" তিনি উত্তরে বললেন নিশ্চয়ই আমরা তা করেছি। রাসূল (সঃ) তখন উত্তর দিলেন, "ঐ ভাবেই তোমরা তাদের উপসনা করেছিলে।" *(আত তিরমিজি কর্তৃক সংগৃহীত)*

অতএব তাওহীদ আল ইবাদাহ এর একটি উলেখযোগ্য অংশ হল শরীয়াহ বাস্তবায়ন, বিশেষ করে যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা মুসলিম। বহু তথাকথিত মুসলমান দেশ, যেখানে সরকার আমদানীকৃত গনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত এবং যেখানে স্বর্গীয় আইন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত অথবা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ক্ষেত্রে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে ইসলামি আইন চালু করতে হবে। অনুরূপভাবে মুসলিম দেশ সমূহ যেখানে ইসলামি আইনকানুন চালু রয়েছে সেখানেও শরীয়াহ আইনকানুন প্রবর্তন করতে হবে কারণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই আইনকানুন সম্পর্কযুক্ত। মুসলিম দেশে শরীয়াহ আইনের পরিবর্তে অনৈসলামিক আইনকানুনের স্বীকৃতি হল শির্ক এবং এটা একটি কুফরী কাজ। যাদের ক্ষমতা আছে তাদের অবশ্যই এই অনৈসলামিক আইনকানুন পরিবর্তন করা উচিত। যাদের সে ক্ষমতা নেই তাদের অবশ্যই কুফর এর বিরুদ্ধে এবং শরীয়াহ আইন বাস্তবায়নের জন্য সোচ্চার হওয়া উচিত। যদি এটাও সম্ভব না হয়, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তৌহিদ সমুন্নত রাখার জন্য অনৈসলামিক সরকারকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে হবে।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে আল্লাহ একক ইলাহ হিসেবে নিম্নের ইবাদতগুলি একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। ইবাদতের প্রকার সমূহ যা আল্লাহ তাআ'লা নির্দেশিত করেছেন তা হচ্ছেঃ

(ক) الإسلام (আল- ইসলাম)- আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণ করা।
(খ) الإيمان (আল-ঈমান)- বিশ্বাস স্থাপন করা।

১৯.ফাতেমা, রাসূল (সঃ) এর কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন যার রাসূলের চাচতো ভাই আলী ইবনে আবু তালিব এর সঙ্গে বিবাহ হয় এবং হাসান ও হোসেন তাঁদের পুত্র ছিলেন।

(গ) الاحسان (আল-ইহসান)-নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। দয়া-দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন, উপকার সাধন করা।
(ঘ) الدعاء (আদ-দো'য়া) প্রার্থনা, আহবান করা।
(ঙ) الخوف (আল-খাওফ) ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা ।
(চ) الرجاء (আর-রাজা) আশা-আকাংখা করা ।
(ছ) التوكل (আত্-তাওয়াক্কুল) নির্ভরশীলতা, ভরসা করা ।
(জ) الرغبة (আর-রাগ্বাহ) অনুরাগ, আগ্রহ।
(ঝ) الرهبة (আর-রাহ্বাহ) ভয় ভীতি।
(ঞ) الخشوع (আল-খূশূ) বিনয়-নম্রতা।
(ট) الخشية (আল-খাশিয়াত) অমংগলের আশংকা।
(ঠ) الإنابة (আল- ইনাবাহ) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে ফিরে আসা।
(ড) الاستعانة (আল-ইস্তে'আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা।
(ঢ) الاستعاذة (আল-ইস্তে-আযা) আশ্রয় প্রার্থনা করা।
(ণ) الاستغاثة (আল-ইস্তেগাসাহ) নিরুপায় ব্যাক্তির বিপদ উদ্ধারের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা।
(ত) الذبح (আয্-যাবাহ) আত্মত্যাগ বা কুরবানী করা।
(থ) النذر (আন্-নযর) মান্নত করা।

এগুলি এবং অন্যান্য যে পদ্ধতি সমূহের আদেশ ও নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন সবকিছুই তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে। উপোরোল্লিখিত ইবাদতগুলির কোন একটি যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য নিবেদন করে তবে সে মুশরিকে পরিণত হবে।

আল কুরআনে ইলাহের (إِلَـهَ)পরিচয়

কালেমা لَآ إِلَـــهَ إِلَّا ٱللَّـــهُ এর স্বীকৃতির মাধ্যমে আল্লাহকে একমাত্র إِلَـهَ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ জন্য আমাদের ইলাহের إِلَـه পরিচয় জানা প্রয়োজন। আল কুরআনে সুস্পষ্টভাবে إِلَـهَ হিসেবে আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

সূরা বাক্বারার উক্ত আয়াতটি (*সূরা বাক্বারা ২ঃ ২৫৫*) আয়াতুল কুরসী নামে খ্যাত। সে আয়াতের প্রথমে বলা হয়েছে اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ অর্থাৎ **"আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ إِلَـهَ নেই"** যিনি-

- الْحَيُّ বা **"চিরঞ্জীব"**, আল্লাহ ছাড়া আর এমন কেউই নেই যে চিরঞ্জীব কারণ প্রত্যেক প্রানীকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। অপরদিকে আল্লাহ الْقَيُّومُ বা **"চির প্রতিষ্ঠিত"** তিনি ছাড়া আর কেউই নেই যে চির প্রতিষ্ঠিত কারণ প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংসশীল আর আল্লাহ হচ্ছেন অবিনশ্বর সত্ত্বা। যেহেতু আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ চিরঞ্জীব এবং চির প্রতিষ্ঠিত নয় সেহেতু আল্লাহ ছাড়া আর কেউ إِلَـهَ হবার যোগ্যতা রাখে না।

- অতঃপর বলা হয়েছে لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ অর্থাৎ **"তাঁকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করে না"**। আল্লাহর তো ঘুম আসেই না এমনকি ঘুমের যে ঝিমুনি ভাব সেটাও আসে না, তিনি এসব দূর্বলতা থেকে মুক্ত। কারণ যিনি ইলাহ তিনি যদি এসব দূর্বলতা থেকে মুক্ত না হতেন তবে তো আসমান-যমীন সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যেত। অথচ সৃষ্টির যত প্রানী আছে তারা কেউই এসব দূর্বলতা থেকে মুক্ত নয়, এজন্যই আল্লাহই একমাত্র যোগ্য إِلَـهَ

- لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ অর্থাৎ **"আকাশ এবং পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর"**। এই আসমান-যমীন এবং এর মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবকিছুর একচ্ছত্র মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কেউই এ মালিকানা দাবী করতে পারে না, দাবী করার কোন অধিকারও নেই। এ কারণে তিনিই একমাত্র إِلَـهَ

- الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ অর্থাৎ **"কে আছে এমন যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ব্যতীত"**। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী যে তাঁর সামনে কেউ সুপারিশ করার অধিকার রাখে না, তিনি যাকে অনুমতি দেন সে ব্যতীত। এমনকি কোন নবীও আল্লাহর সামনে মুখ খোলার বা সুপারিশ করার

অধিকার রাখেন না যতক্ষন না আল্লাহ তাদের অনুমতি দেবেন। আল্লাহ ছাড়া এমন মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব আর কারো নেই, এ জন্যই আল্লাহই একমাত্র إِلَـهَ

- অতঃপর বলা হয়েছে يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ অর্থাৎ **"তাদের সম্মুখে এবং পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন।"** আল্লাহই একমাত্র সত্ত্বা যিনি মানুষের অগ্র-পশ্চাত সবকিছুই জানেন, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। এ জন্যই আল্লাহ ব্যতীত কেউ إِلَـهَ হবার যোগ্য নয়।
- وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء অর্থাৎ **"যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তাঁর জ্ঞান ভান্ডার থেকে কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না।"** আল্লাহ হচ্ছেন পরিপূর্ণ জ্ঞানী, তিনি সৃষ্টি জীবকে দয়া করে যতটুকু জ্ঞান দিয়েছেন সেটুকু জ্ঞানই সৃষ্টির আছে। সুতরাং সৃষ্টির মধ্যে যতকিছু আছে সবাই হচ্ছে অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞানী, আবার এ সামান্য জ্ঞানটুকুও আল্লাহর দেয়া। সুতরাং আল্লাহ পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী বলেই তিনি আমাদের একমাত্র إِلَـهَ, তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ হতে পারে না।
- وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ অর্থাৎ **"তাঁর কুরসী আকাশ এবং পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত"**। আল্লাহর 'কুরসী' আকাশ এবং পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে।
- وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا অর্থাৎ **"এদের (আকাশ এবং পৃথিবীর) রক্ষনা-বেক্ষনে তাঁকে ক্লান্ত করে না।"** আল্লাহই একমাত্র সত্ত্বা যিনি আসমান-যমীন এবং এর মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করছেন অন্যথায় সবকিছু মূহুর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেত। আর এসব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণে আল্লাহকে বিন্দু মাত্র ক্লান্ত করে না। তিনি যাবতীয় দূর্বলতা-অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত এবং পবিত্র। এ জন্যই আল্লাহই একমাত্র إِلَـهَ।

সবশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন- وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ অর্থাৎ **"আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।"** উপরে উল্লেখিত কর্তৃত্ব এবং গুনাবলীগুলোর অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর কেউই এরূপ শ্রেষ্ঠত্ব এবং কর্তৃত্বের অধিকারী নেই। এ কারণে আল্লাহই আমাদের একমাত্র إِلَـهَ তনি ব্যতীত আর কেউ إِلَـهَ নেই, হওয়ার যোগ্য নয়, হতে পারে না।

আল্ কুরআনে অপর এক আয়াতে إِلَـهَ হিসেবে আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থাৎ **"তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন إله নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতিত কোন إله নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্মশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা' আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নাম সমূহ তাঁরই। নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।"** *(সূরা, হাশর ৫৯ঃ২২-২৪)*

আল্লাহই একমাত্র إِلَـهَ, আল-কুরআনে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ-

১ম চ্যালেঞ্জঃ

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ
مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

অর্থাৎ **"বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেছেন পানি; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। অতএব, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন إله (ইলাহ্) আছে কি? বরং তারা সত্যবিচ্যুত সম্প্রদায়।"** *(সূরা, নামল ২৭ঃ ৬০)*

২য় চ্যালেঞ্জঃ

أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ **"বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থিত রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন إله (ইলাহ্) আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।"** *(সূরা, নামল ২৭ঃ ৬১)*

৩য় চ্যালেঞ্জঃ

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

অর্থাৎ **"বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পুর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর।"** *(সূরা, নামল ২৭ঃ৬২)*

৪র্থ চ্যালেঞ্জঃ

أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থাৎ **"বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? অতএব, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন إله (ইলাহ্) আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।"** *(সূরা নামল ২৭ঃ৬৩)*

৫ম চ্যালেঞ্জঃ

أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

অর্থাৎ **"বল তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও মর্ত্য থেকে রিযিক দান করেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন إله (ইলাহ্) আছে কি? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।"** *(সূরা নামল ২৭ঃ৬৪)*

৬ষ্ঠ চ্যালেঞ্জঃ

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

অর্থাৎ- **"তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন إله নেই। ইহকাল ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তাঁরই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন إله কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন إله কে আছে যে, তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না?"** *(সূরা, কাসাস ২৮ঃ ৭০-৭২)*

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

অর্থাৎ- **"তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সুর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে। অতঃপর তা থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে। তিনি আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোন إلـه নেই। অতএব, তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ?"** *(সূরা যুমার ৩৯ঃ৫-৬)*

ইলাহ বনাম ক্ষমতা

যে ব্যক্তি কাউকে সাহায্যকারী, অভাব পূরণকারী, দোয়া শ্রবনকারী, ভাল-মন্দ সাধনকারী বলে মনে করে, তার এমনটি মনে করার কারণ এই যে তার মতে ঐ ব্যক্তি বিশ্ব-জাহান পরিচালনায় কোন না কোন ক্ষমতার অধিকারী। অনুরূপভাবে কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে ভয় করে এবং মনে করে যে তার অসন্তুষ্টি আমার ক্ষতির কারণ এবং সন্তুষ্টি কল্যানের কারণ। তার এ বিশ্বাস ও কর্মের কারণ এছাড়া আর কিছু নয় যে, তার মনে সে ব্যক্তির সম্মন্ধে এক ধরনের শক্তির ধারণা রয়েছে। অপরদিকে কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনকে স্বীকার করার সত্বেও এভাবে অন্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তার এহেন কর্মের কারণ শুধু এই যে, সে অন্যকে কোন না কোনভাবে আল্লাহর সাথে অংশীদার বনিয়ে নেয় বা এরূপ অংশীদারিত্বের ধারণা করে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কারো নির্দেশকে আইন এবং অবশ্য পালনীয় মনে করে, সে তাকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী স্বীকার করে। সুতরাং উলুহিয়্যাতের অর্থাৎ ইলাহ হিসেবে আল্লাহর একত্বের প্রকৃত স্পিরিট হচ্ছে ক্ষমতা। প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহই একক এবং নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী তিনি একাই। আসমান-যমীনের সকল ক্ষমতা তাঁরই ইখতিয়ারে। সৃষ্টি করা, নিয়ামত দান করা, নির্দেশ দেয়া, শক্তি-সামর্থ সবকিছুই তাঁর হাতে নিহিত। সবকিছুই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁর আনুগত্য করছে। তিনি ছাড়া কারো কোন ক্ষমতা নেই, নেই নির্দেশ দানের অধিকার, সৃজন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার রহস্য সম্পর্কেও কেউ অবগত নয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্যতীত অন্য কোন إلـه নেই, হবার যোগ্যতা রাখে না, হতে পারেনা।

এ কারণেই আল-কুরআনে একক إلـه ইলাহ হিসেবে আল্লাহর নিরংকুশ ঘোষণাঃ

وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

"আর তোমাদের إلـه একমাত্র إلـه। তিনি ব্যতীত অন্য কোন إلـه নেই। **তিনি মহা করুণাময়, দয়ালু।"** *(সূরা, বাক্বারা ২ঃ ১৬৩)*

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

"তিনিই إلـه নভোমন্ডলে এবং তিনিই إلـه ভূমন্ডলে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।" *(সূরা, যুখরুফ ৪৩ঃ ৮৪)*

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

"যদি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য إلـه থাকত, তবে উভয়ের ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র।" *(সূরা, আম্বিয়া ২১ঃ ২২)*

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন إلـه নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী।" *(সূরা, আনআম ৬ঃ ১০২)*

তাওহীদের শর্তাবলী তথা "لا إله إلا الله" এর শর্তাবলী

শর্ত এমন একটি বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্যের অনুপস্থিতি অপরিহার্য এবং যার অস্তিত্বে অন্যের অস্তিত্ব অপরিহার্য নয়। যেমন- সলাতের একটি শর্ত হচ্ছে ওজু বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল করা। এখন কেউ যদি ওজু না করেই সলাতে দাড়িয়ে যায় তাহলে তার সলাত কবুল হবে না এজন্য যে সে সলাতের অপরিহার্য একটি শর্ত পূরণ করে নাই। শর্ত হচেছ কোন জিনিসের বাইরের বিষয় এবং ঐ জিনিসটি শুরু করার পূর্বেই তা পূরণ করতে হয়।

অনুরূপভাবে তাওহীদের ও অনেকগুলো শর্ত আছে। এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং এর শর্তগুলো পূরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। এটা এজন্য যে, কারো মাঝে তাওহীদের কোনো শর্ত না পাওয়া গেলে তার মধ্যে ঈমান ও ইসলামের মূলই পাওয়া গেলো না বলে বিবেচিত হবে। যেমন নামাজ সহীহ হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে যদি কোনো একটি শর্ত যেমন কেবলামুখী হওয়া অথবা ছতর ঢাকা ইত্যাদি না পাওয়া যায় তাহলে নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে। শর্ত যেহেতু বাইরের বিষয় এবং জিনিসটি শুরু করার পূর্বেই তা পূরণ করতে হয় সেহেতু কোন ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবী করলে তাকে অবশ্যই তাওহীদের নিম্নের শর্তাবলী নিজের মধ্যে পূরণ করতে হবে।

তাওহীদের শর্ত ৭ (সাত) টি

প্রথম শর্তঃ এলেম বা জ্ঞান

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

"তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।" *(মুহাম্মদঃ১৯)*

এটা এ জন্য যে, 'আল্লাহ এক এবং একমাত্র তিনিই ইবাদতের হকদার'- এ কথা না জানা, বান্দার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথে বিরাট অন্তরায়। এ কারণেই (তাওহীদের) এলেম বা জ্ঞানকে বান্দার ইসলাম কবুলের শর্ত নিধারণ করা হয়েছে।

রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই"একথা জানা অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো সে জান্নাতে যাবে।" *(মুসলিম)*

আল্লামা শাইখ আব্দুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ (রহঃ) বলেছেনঃ লা ইলাহা ইল্লালাহর অর্থসহ সেই এলমে ইয়াকীনী বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যা نفى اثبات (কি অস্বীকার করা হয় আর কি সাব্যস্ত করা হয় তা) সহ জানা আল্লাহ ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

ওয়াজির আবুল মুজাফফর ইফছাহ নামক গ্রন্থে বলেছেনঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বাক্ষ্য দানের দাবী হচ্ছেঃ স্বাক্ষ্যদানকারীর অবশ্যই লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ فاعلم أنه لا إله إلا الله **"তুমি জেনে নাও যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই"**।

তিনি আরো বলেনঃ আরবী গ্রামারের দৃষ্টিতে لا শব্দের পরে الله শব্দের পেশ হওয়ার দ্বারা এটাই বুঝনো হয়েছে যে, উলুহিয়্যাত (ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা) একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। অতএব আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ উলুহিয়্যাতের হকদার হতে পারে না। তিনি বলেনঃ এখানে সারকথা হচ্ছে, তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করা উভয় বিষয়ই এ কলেমার অন্তর্ভুক্ত এ কথাটি জেনে নেয়া। তাগুতের ক্ষেত্রে আপনার উলুহিয়্যাতের অস্বীকৃতি আর আল্লাহর জন্য উলুহিয়্যাতের স্বীকৃতি দ্বারা আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেন, যারা তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করেছে আর আল্লাহর প্রতি (ইলাহ হিসেবে) ঈমান এনেছে। *(আদ দারু সুন্নাহ)*

শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আবদির রাহমান আবা বাতিন (রহঃ) বলেনঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

"বস্তুতঃ সকল মানুষের জন্য এটা একটা পয়গাম। আর এটা পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, এর দ্বারা তাদেরকে সাবধান করা হবে এবং তারা জেনে নিবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ শুধু একজনই, আর বুদ্ধিমান লোকেরা যেন চিন্তা-ভাবনা করে।" *(ইবরাহীমঃ৫২)*

উপরোক্ত আয়াতে ليقولوا أنما هو إله واحد (যাতে তারা বলে, প্রকৃত পক্ষে ইলাহ একজনই) বলা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেনঃ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون

"যারা জেনে শুনে সত্যের স্বাক্ষ্য দিয়েছে তাদের কথা ভিন্ন "অর্থাৎ তারা অন্তরে যা জানে তাই মুখে স্বাক্ষ্য দিয়েছে। রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই" এ কথা জানা অবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করেছে সে জান্নাতে যাবে। এসব আয়াত দ্বারা ওলামায়ে কেরাম এটাই প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের ওপরে সর্বপ্রথম ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহকে জানা। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে, যে সবচেয়ে বড় ফরজ হচ্ছে "অর্থ সহ লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহর জ্ঞানার্জন আর সবচেয়ে বড় মূর্খতা হচ্ছে অর্থসহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর জ্ঞান না থাকা। অতএব অর্থসহ কলেমার জ্ঞান লাভ যেমনি ভাবে সবচেয়ে বড় ওয়াজিব, তেমনিভাবে কলেমার অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা হচ্ছে বড় মূর্খতা।

শেখ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব বলেছেন, অর্থ জানা ব্যতীত এবং কালেমা (লা-ইলাহা- ইল্লাল্লাহ) এর দাবী মোতাবেক কর্ম সম্পাদন ব্যতীত শুধুমাত্র শাব্দিক স্বাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না, বরং এ মৌখিক স্বাক্ষ্য আদম সন্তানের বিরুদ্ধে একটি দলিল হিসেবে বিবেচিত। অবশ্য যারা শুধু মৌখিক স্বীকৃতিকে ঈমান বলে থাকে যেমন কাররামিয়া সম্প্রদায় এবং যারা আন্তরিক স্বীকৃতি ও বিশ্বাসকে ঈমান বলে যেমন জাহামিয়া সম্প্রদায়, তারা এ মতের বিরোধিতা করে।

আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের কর্ম ও দাবীর ব্যাপারে তাদের মৌখিক স্বাক্ষ্য প্রদানকে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছেন। অথচ স্বাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাক্যের মধ্যে তারা কয়েক ধরণের "তাগিদ" (emphasis) ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

إذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

"আপনার কাছে মুনাফিকরা যখন আসে তখন বলেঃ আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল। আর আল্লাহ স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী"। *(মুনাফিকুনঃ ১)*

মুনাফিকরা তাদের মৌখিক স্বাক্ষ্যকে আরবী গ্রামারের দৃষ্টিকোন থেকে তিনটি- أن (নিশ্চয়ই) ل (অবশ্যই) এবং جمله اسمية (বিশেষ্য প্রধান বাক্য) এর মাধ্যমে তাগিদ (emphasis) ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তায়ালাও তাদের স্বাক্ষ্যকে বাক্যের মধ্যে হুবহু তাগিদ (emphasis) দিয়ে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছেন। এর সাথে সাথে তাদেরকে বিশ্রী উপাধিতে ভূষিত করার ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাদের ভয়ংকর ও বীভৎস জ্ঞানের কথা বলেছেন। এ তথ্যের মাধ্যমে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, ঈমান নামটির মধ্যে অবশ্যই আন্তরিক স্বীকৃতি এবং তদানুযায়ী আমল (কর্ম) পাওয়া যেতে হবে।

যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বাক্ষ্য দিলো আবার গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছু) ইবাদত করলো, তার এ স্বাক্ষ্যের কোনো মূল্য নেই, যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং ইসলামের কিছু কাজ কর্ম করে। যে ব্যক্তি কিতাবের (ইসলামের) কিছু মানবে আর কিছু মানবে না তার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

"তোমরা কি কিতাবের কিয়দংশ বিশ্বাস করো আর কিয়দংশ অবিশ্বাস করো?" *(আল বাক্বারাহঃ ৮৫)*

দ্বিতীয় শর্তঃ ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস)

তাওহীদ (আল্লাহর একাত্ববাদ) জানার পর এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানার পর এ কলেমার প্রতি বান্দার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এবং এর দ্বারা সব ধরণের ইবাদত যে একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হবে এ কথার প্রতিও তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এ কলেমা দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে সে ক্ষেত্রে বান্দার অন্তরে কোনো ধরণের দ্বিধা ও সন্দেহ থাকতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

"প্রকৃতপক্ষে মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের (সঃ) প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর কোন সন্দেহ পোষন করেনি এবং জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ লোক।" *(আল-হুজুরাতঃ১৫)*

মুসলিম থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে বান্দা স্বাক্ষ্য দেয়, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) (সঃ) আল্লাহর রাসুল" আর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ না করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে (মৃত্যু বরণ করে), তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তৃতীয় শর্তঃ কবুল (গ্রহণ করা)

তাওহীদ জানার পর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানা এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার পর কলেমাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে কোনো প্রকার ইবাদতের মাধ্যমেই তা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। অর্থাৎ কোনো প্রকার ইবাদতই তাওহীদের পরিপন্থি হবে না।

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ
وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ

"এসব লোকেরা এমন ছিলো যে, তাদেরকে যখন বলা হতোঃ "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই"তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়তো। তারা বলতোঃ আমরা এক পাগল কবির কথায় নিজেদের মাবুদগুলোকে পরিত্যাগ করবো? " *(সাফফাতঃ ৩৫-৩৬)*

কেউ যদি তাওহীদ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানার পরে গ্রহন না করে তার অবস্থা হবে উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত মুশরিকদের মত।

চতুর্থ শর্তঃ ইনকিয়াদ (সমর্পন করা)

তাওহীদ জানার পর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, ইবাদতের মাধ্যমে কলেমা গ্রহণ করার পর অবশ্যই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন করতে হবে। এ সমর্পন হবে সকল তাগুতের সাথে কুফরী করার মাধ্যমে এবং তাগুত থেকে নিজেকে মুক্ত করার মাধ্যমে, এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেনঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

"না, হে মুহাম্মদ, তোমার রবের নামে কসম, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারেনা, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যাই ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং ফয়সালার সামনে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করবে।" *(আন-নিসাঃ ৬৫)*

তৃতীয় শর্ত ও চতুর্থ শর্তের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তৃতীয় শর্ত (কবুল) হচ্ছে কথার মধ্যে, আর চতুর্থ শর্ত (ইনকিয়াদ) হচ্ছে কর্মের মধ্যে।

আল্লামা আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ (রহঃ) বলেছেনঃ ইসলাম শুধুমাত্র একটি দাবী এবং মৌখিক উচ্চারণের নাম নয়। বরং ইসলামের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর একত্বকে মেনে নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ ও সোপর্দ করা, একমাত্র আল্লাহর রবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের কাছে আত্মসমর্পন করা (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর রবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতকে অস্বীকার করা)। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেনঃ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ

"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সেই শক্ত রজ্জু আকড়ে ধরলো।" *(আল বাক্বারাহঃ ২৫৬)*

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেনঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

"বস্তুত সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, স্বয়ং তাঁকে ছাড়া তোমরা কারো দাসত্ব ও বন্দেগী করবে না। এটাই সঠিক ও খাটি জীবন বিধান। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।" *(ইউসুফঃ ৪০) (আদ্ দুরার আস্ সুন্নিয়া কিতাবুত তাওহিদ ২/২৬৪পৃঃ)*

পঞ্চম শর্তঃ (ছিদ্‌ক) সত্যতা)

তাওহীদ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানার পর এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, তা মনে প্রাণে কবুল করা, এর প্রতি নিজেকে সমর্পন করার পর অবশ্যই বান্দাকে কলেমার ক্ষেত্রে স্বীয় সত্যতাকে প্রমাণ করতে হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিম থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তিই সত্যনিষ্ঠ অন্তরে স্বাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।

রাসূল (সঃ) আরো ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি সত্যতার সাথে খাঁটি অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (*আহমদ*)

যে ব্যক্তি এ কলেমা শুধু মুখে উচ্চারণ করবে কিন্তু এ কলেমা দ্বারা যা বুঝানো হয় তা যদি অন্তরে অস্বীকার করে তবে সে নাজাত (মুক্তি) লাভ করতে পারবে না, যেমনটি আল্লাহর বর্ণনা অনুযায়ী মুনাফিকরা লাভ করতে পারবে না। মুনাফিকরা শুধু মুখে বলেছিলোঃ نشهد انك لرسول الله আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল" এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

"আল্লাহও জানেন, আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচেছন যে মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" *(মুনাফিকুনঃ১)*

এমনি ভাবে আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে বর্ণনা করেছেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

"আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়।" *(আল বাক্বারাহঃ৮)*

৬ষ্ঠ শর্তঃ ইখলাস (সততা ও একনিষ্ঠতা)

তাওহীদ, লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ, এর কাছে নিজেকে সমর্পণ এবং ঈমানের সত্যতা যাচাই এর পর বান্দাকে অবশ্যই কলেমার ব্যাপারে মুখলেস বা একনিষ্ঠ হতে হবে। আর ইখলাস হচ্ছে বান্দার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হওয়া, গাইরুল্লাহর জন্য ইবাদতের বিন্দুমাত্র অংশও নিবেদিত হবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء

"তাদেরকে এ ছাড়া কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে, একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে।" *(বাইয়্যিনাহঃ ৫)*

ইখলাসের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, বান্দা এ কলেমা কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কিংবা কোনো ব্যক্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলবেও না আকড়েও ধরবে না। রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করেছে।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

রাসূল (সঃ) আরো বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ অন্তরে বললো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেই হচ্ছে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভের জন্য সবচেয়ে সৌভাগ্যবান।' *(বুখারী)*

সপ্তম শর্তঃ মুহাব্বত (ভালবাসা)

তাওহীদ জানার পর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ, এর কাছে নিজেকে সমর্পন, ঈমানের সত্যতার যাচাই, কলেমার ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার পর বান্দাকে অবশ্যই কলেমাকে মুহাব্বত করতে হবে। অন্তর দিয়ে কলেমাকে মুহাব্বত করতে হবে, আর মুখে কলেমার প্রতি মুহব্বতকে প্রকাশ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

"আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি মুহব্বত বা ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা উচিৎ একমাত্র আল্লাহকে। কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা সবচেয়ে বেশী। আর কতইনা ভাল হতো যদি এ জালেমরা পার্থিব কোনো কোনো আযাব প্রত্যক্ষ করে

অনুধাবন করে নিতো যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য এবং শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর।" *(আল বাকারাহঃ ১৬৫)*

শাইখ সুলাইমান বিন সামহান (রহঃ) বলেনঃ এ সব বিষয়ে কথা বলা এবং জবাব দেয়ার পূর্বে আমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ, এবং উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে যা বলেছেন তা উল্লেখ করতে চাই। কলেমার সেই শর্তাবলীর কথাও উল্লেখ করতে চাই যেসব শর্তাবলী পূরণ করা ব্যতীত কোনো মানুষের ইসলাম সঠিক হবে না। একজন মানুষের মধ্যে যখনই এ শর্তগুলোর সমাবেশ ঘটবে এর জ্ঞান, আমল ও ধ্যান ধারণার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে এ কলেমাকে উচ্চারণ করবে, সাথে সাথে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) এর উল্লেখকৃত ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক দশটি বিষয় থেকে সে মুক্ত থাকবে, তখনই তার ইসলাম সঠিক বলে বিবেচিত হবে। কারণ, এটাই হচ্ছে কলেমার মূল, যার উপর ভিত্তি করে এসব মাসআলার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা এবং হুকুমের উদ্ভব হয়েছে। *(আদ্ দুরার আস সুন্নিয়া কিতাবুত তাওহীদ)*

আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ বলেনঃ তুমি কলেমার ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছো তাতে আমি খুশী। তোমার জানামতে, অধিকাংশ লোকেই লা-ইলাহা ইল্লাহর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের অবস্থা এই যে, যদি মুখে কলেমার কথা উচ্চারণ করে, তাহলে অর্থের দিকটা অস্বীকার করে। তাই ছয়টি অথবা সাতটি বিষয়ে তোমাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। এ ছয়টি বিষয়ের সমাবেশ ব্যতীত একজন বান্দা কুফ্‌রী ও মুনাফেকী থেকে মুক্ত থাকতে পারেনা। একজন বান্দার মধ্যে ছয়টি বিষয়ের সমাহার এবং তদানুযায়ী আমল করার মাধ্যমেই সত্যিকারে মুসলিম হওয়া সম্ভব। তাই জ্ঞান, আমল, বিশ্বাস, গ্রহণ, মুহাব্বত ও আনুগত্যের দিক থেকে বান্দার অন্তর ও জবানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

অতএব একজন মুসলমানের জ্ঞান এমন হতে হবে, যেখানে মুর্খতার অবকাশ নেই। তার ইখলাস হবে শিরক মুক্ত, সত্যতা হবে মিথ্যাচার মুক্ত, তার চরিত্র হতে হবে শিরক এবং নিফাক মুক্ত। তার বিশ্বাস হতে হবে সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত। সে কলেমা উচ্চারণ করবে অথচ তার মনে কালেমা দ্বারা যা বুঝায় তার ব্যাপারে এবং এর দাবীগুলোর ব্যাপারে কোনো প্রকার সংশয় থাকবে না। তার মনে থাকবে সেই ভালবাসা, যার মধ্যে থাকবে না কোনো ঘৃণা, থাকবে এমন গ্রহণ যোগ্যতা যার মধ্যে থাকবে না কোনো অস্বীকৃতি। সেই আরব মুশরিকদের মতো তার অবস্থা হবে না যারা কলেমার অর্থ বুঝতো অথচ তা গ্রহন করেনি।

একজন মুসলিমের মধ্যে থাকা চাই সেই আনুগত্য, যার মধ্যে থাকবে না শিরকের অস্তিত্ব, যে শিরকের উদ্ভব হয়েছে কালেমার দাবী, অপরিহার্য বিষয় ও অধিকার পরিত্যাগ করার কারণে। কলেমার এসব দাবী ও অপরিহার্য বিষয়গুলোর মাধ্যমেই বান্দার ইসলাম ও ঈমান পরিশুদ্ধ হয়।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতিফলন যথার্থ ভাবে যার জীবনে ঘটবে, সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। সাথে সাথে সে তার জ্ঞান 'প্রজ্ঞা' ভাল-মন্দের বিচার বুদ্ধি, হেদায়াত ও স্থিরতার সাহায্যে তার দ্বীনকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

তাওহীদের মৌলিক উপাদান (রুকন) তথা *لا إله إلا الله* 'র মৌলিক উপাদান

রুকন হচ্ছে এমন বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্য একটি বিষয়ের অনুপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে উঠে। রুকন অবশ্যই মূল বিষয়টির অন্তর্গত হওয়া চাই। যেহেতু রুকন কোন জিনিসের আভ্যন্তরীণ বা ভেতরের বিষয়, সেহেতু শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি এর উপর নির্ভরশীল। অতএব কোন জিনিসের রুকন ব্যতীত তা সহীহ বা শুদ্ধ হয় না।

রুকন কি জিনিস, এটা জানার পর আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, যে তাওহীদ আল্লাহ তায়ালা আপনার ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন, সে তাওহীদেরও নামাজের মতোই রুকন আছে। নামাজ যেমন তার রুকন যথা- তাকবীরে তাহরিমা, রুকু, সেজদা, শেষ বৈঠক ইত্যাদি আদায় করা ব্যতীত শুদ্ধ হয় না, কোনো ব্যক্তি যদি নামাজের কোনো রুকন বাদ দেয় তাহলে তার নামাজ যেমন ভাবে বাতিল হয়ে যায়, তেমনি ভাবে কোনো ব্যক্তি যদি তাওহীদের কোনো একটি রুকন বাদ দেয়, তাহলে সে ব্যক্তিও আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তার কোনো কাজে আসবে না, সে আর মুসলিম থাকবে না বরং সে কাফেরে পরিণত হয়ে যাবে।

তাওহীদের দুটি রুকন (মৌলিক উপাদান)

তাওহীদের প্রথম রুকন বা মৌলিক বিষয় হচ্ছে "কুফর বিত ত্বাগুত বা তাগুতকে অস্বীকার করা"।

আর দ্বিতীয় রুকন বা মৌলিক বিষয় হচ্ছে "ঈমান বিল্লাহ বা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা"।

এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার নিম্মোক্ত বানীঃ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا

"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে যাবার নয়"। *(আল-বাক্বারাহ ২ঃ ২৫৬)*

উপরোক্ত আয়াতের فمن يكفر بالطاغوت হচ্ছে ১ম রোকন, ويؤمن بالله হচ্ছে ২য় রোকন এবং العروة الوثقى (শক্ত রজ্জু) বলতে কলেমা لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ কে বুঝানো হয়েছে। আর এটাই মূলতঃ তাওহীদের কলেমা। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

"যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললো আর আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল উপাস্যকে অস্বীকার করলো তার জান ও মাল পবিত্র "(অর্থাৎ কাফেরদের জান ও মালের মতো গনিমতের মাল নয়।) এবং তার হিসাবের ভার আল্লাহর ওপরই ন্যস্ত (অর্থাৎ মনের কুফরীর বিচার আল্লাহই করবেন।)

প্রথম রুকনঃ তাগুতকে অস্বীকার করা

প্রিয় ভ্রাতা, (আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথের দিশা দান করুন) আপনাকে জেনে রাখতে হবে যে, তাগুতের কুফরী ব্যতীত একজন বান্দা কখনো "মুওয়াহ্যিদ" (আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী) হতে পারে না। আর তাগুত কি জিনিস তা জানা ব্যতীত, তাগুতকে অস্বীকার করা কখনো সম্ভব নয়।

□□□ □□ এর আভিধানিক সংজ্ঞাঃ

□□□□□ শব্দের অর্থ হচ্ছে সীমালংঘন কারী, আল্লাহদ্রোহী, বিপথে পরিচালনাকারী। □□□□□ শব্দটি আরবী □□□□□ (তুগইয়ান) শব্দ থেকে উৎসারিত, যার অর্থ সীমালংঘন করা, বাড়াবাড়ি করা, স্বেচ্ছাচারিতা। □□□□□ শব্দের ক্রিয়ামূল □□□ (ত্বগা) এবং বহুবচন □□□□□□ ।

যেমন পানির একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। নূহ (আঃ) এর সময় যখন জলোচ্ছাস হয়েছিল তখন পানি তার এ সীমা অতিক্রম করেছিল, এ ঘটনাকে কোরআনে এভাবে বলা হয়েছেঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ

"যখন জলোচ্ছাস হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহন করিয়েছিলাম"। *(সূরা, হাক্কা-৬৯ঃ১১)*

আয়াতের طَغَا ٱلْمَآءُ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যখন পানি বৃদ্ধি পেয়ে তার সীমা অতিক্রম করেছিল। কোরআনে □□□ শব্দটি ৫০ বার এসেছে আর □□□□□ শব্দটি এসেছে ৮ বার। □□□ ক্রিয়াটি এবং এ থেকে উদগত শব্দ কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতায়ালা সাধারণ সীমালংঘন এবং সুনির্দিষ্ট সীমালংঘনের বর্ণনা দিতে ব্যবহার করেছেন। যেমন সাধারন সীমালংঘন অর্থে কোরআনে ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয়েছে-

كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى অর্থাৎ **"বস্তুত মানুষতো সীমালংঘন (لَيَطْغَىٰٓ) করেই থাকে।"** *(সূরা, 'আলাক- ৯৬ঃ৬)*

أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ **"যাতে তোমরা সীমালংঘন (لَا تَطْغَوْا) না কর মানদন্ডে।"** *(সূরা, আর্ রহমান-৫৫ঃ৮)*

সুনির্দিষ্ট সীমালংঘন অর্থে ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয়েছে (হালাল খাবার সম্পর্কে)ঃ

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى

"তোমাদিগকে আমি যা দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং لَا تَطْغَوْا সীমালংঘন করো না, তাহলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে এবং যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে সে ধ্বংস হয়ে যায়।" *(সূরা, ত্ব-হাঃ ৮১)*

যারা অবিশ্বাসী হয়ে সীমালংঘন করে আল্লাহ তাদের জন্যও এ ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে রব এবং ইলাহ (ইবাদতের যোগ্য) হিসেবে গ্রহন করে সীমালংঘন করেছে কোরআনে সে কাফিরদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা □□□ (ত্বা-গি-ন) বলেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ

“আর সীমালংঘনকারীদের (لِلطَّاغِينَ) জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম।” *(সূরা, ছোয়াদ-৩৮ঃ৫৫)*

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى
فَأَمَّا مَن طَغَى
وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

“প্রকাশ করা হবে জাহান্নাম, অনন্তর যে (□□□) সীমালংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয়।” *(সূরা, নাযিয়াত-৭৯ঃ ৩৬-৩৮)*

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا

অর্থাৎ **“ছামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতায় (بِطَغْوَاهَا) অস্বীকার করেছিল।”** *(সূরা, শাম্‌স-৯১ঃ১১)*

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে বর্জনের অপরিহার্যতা

প্রত্যেক ব্যক্তির এই জ্ঞান থাকা উচিৎ যে, সমস্ত জীব ও জড়ের সূচনা ও কর্তৃত্ব মহান আল্লাহর। সালাত, যাকাত বা অন্যান্য ইবাদতের পূর্বে যে দৃঢ় ব্যাপার মহান আল্লাহ আদম (আঃ) এর সন্তানদের আদেশ করেছেন তা হল আল্লাহ তা'য়ালা একত্বের প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং অন্য সমস্ত উপাস্যগুলোকে (তাগুত) পরিত্যাগ ও অস্বীকার করা। এর জন্যই আল্লাহ জীব সৃষ্টি করলেন, নবীদের প্রেরণ করলেন, আসমানী কিতাবগুলো নাযিল করলেন এবং আদেশ দিলেন জিহাদ ও শাহাদাতের। এর জন্যই মহান আল্লাহর বান্দা ও শয়তানের অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে শত্রুতা আর এর দ্বারাই মুসলিম জাতি ও সঠিক খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ **“আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানুষকে এইজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।”** *(সূরা-যারিয়াত: ৫৬)*

এর অর্থ একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করা তিনি আরও বলেনঃ **“আল্লাহর ইবাদত করিবার ও তাগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি------।”** *(সূরা-নাহল: ৩৬)*

কোন ইলাহ নাই আল্লাহ ব্যতীত (আক্ষরিক কোন উপাস্য বা ইবাদতের যোগ্য কোন কিছু বা কেউ নাই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া), এই বিশ্বাস হচ্ছে ইসলামের মূল বা ভিত্তি।

এই বিশ্বাসের অবর্তমানে কোন দাওয়া, জিহাদ, সালাত, সওম, যাকাত বা হজ্জ কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তিকেই জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাঁনো যাবে না যদি না সে এই ভিত্তির প্রতি ঈমান না এনে থাকে। কারণ এটাই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি আদেশকৃত অলঙ্ঘনীয় ভিত্তি। এই ভিত্তির অবর্তমানে দ্বীন-ইসলামের অন্যান্য স্তম্ভগুলো কোন ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন হতে নিরাপদে রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। মহান আল্লাহ বলেনঃ **“----যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহে ঈমান আনবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।”** *(সূরা-বাকারা:২৫৬)*

মহান আল্লাহ আরও বলেনঃ **“যারা ত্বাগুতের ইবাদত হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমূখী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।”** *(সূরা-যুমার:১৭)*

লক্ষ্য করুন কেমন করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের প্রতি ঈমান আনার পূর্বে সকল (মিথ্যা) উপাস্যদের অস্বীকার ও অবিশ্বাস করার কথা বলেছেন, যেমন তিনি ঈমান আনয়নের পূর্বে কুফরকে ত্যাগ করার কথা বলেছেন।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- এই শব্দগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের আদেশ দিয়েছেন যা কিনা ইসলামের এই মজবুত ভিত্তির গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির দিকে লক্ষ্য আরোপ করে। অতএব, সকল (মিথ্যা) উপাস্যদের চরম মাত্রায় অস্বীকার করা ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ঈমান পোষণ করা যায় না।

তাগুতকে চেনার পর নিশ্চয়ই তাগুতকে অস্বীকার করার অপরিহার্যতা কি বুঝতে পারছেন। কারণ এটা অসম্ভব যে, কোন ব্যাপারে বিশ্বাস করা, যতক্ষন না এ বিশ্বাসের বিপরীত কিছুকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করা হয়। উদাহরণস্বরুপ কেউ যদি দাবী করে, 'আমি এক ইলাহকে বিশ্বাস করি।' অত:পর সে বলল, 'আমি দুই ইলাহকে বিশ্বাস করি'। ঐ ব্যক্তির দ্বিতীয় উক্তি প্রথম স্বীকারোক্তিকে মিথ্যায় পরিণত করে বা অস্বীকার করে। কারণ দ্বিতীয় উক্তি প্রথম উক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। এর অর্থ হচ্ছে তার একটা দাবী মিথ্যা অথবা উভয়টিই মিথ্যা। এজন্যই ঐরকম উক্তি সত্যকে মিথ্যা এবং অগ্রহনযোগ্য করে দেয়। সুনিশ্চিত সত্য একটা ব্যাপারে দু'টি বিপরীতমুখী দিক থাকতে পারে না, যা ঐ নিশ্চিত বিষয়কে অস্বীকার করে।

তাগুতকে অস্বীকার করা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের অনিবার্য দাবী। তাওহীদের প্রথম রোকনই হচ্ছে তাগুতকে অস্বীকার করা, সুতরাং তাগুতকে বর্জন না করলে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী হবে অর্থহীন। ঈমানের প্রথম স্তম্ভ আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষনা দেয়া لَآ إِلَـــهَ إِلَّا اللَّـــهُ। প্রথম অংশ لَآ إِلَـــهَ অস্বীকার করে দ্বিতীয় অংশ إِلَّا اللَّـــهُ এর বিরোধী বা বিপরীত কোন কিছুকে। নীচের আয়াতটি এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয় যে, ত্বাগুতকে মেনে নেয়া এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করার সম্পূর্ণ বিপরীত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

অর্থাৎ **"আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসুল প্রেরণ করেছি আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য।"** *(সূরা, নাহল-১৬ঃ৩৬)*

সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করল না সে নবীদের মূল দাওয়াতকে অস্বীকার করল এবং মূলতঃ আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করল। কারণ প্রত্যেক নবী তাদের কওমকে তাগুতের ইবাদতকে পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করার আহবান জানিয়েছিলেন।

এখন কেউ যদি নিজেকে ঈমানদার দাবী করে তাকে অবশ্যই তাগুতকে বর্জন করতে হবে। কারণ যে কালেমার স্বীকৃতি দিয়ে সে ইসলামে এসেছে সে কলিমার প্রথমাংশ لَآ إِلَـــهَ ঘোষণা করার মাধ্যমে যাবতীয় বাতিল মা'বুদকে অর্থাৎ তাগুত বর্জনের দৃঢ় ঘোষণা দিয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশ إِلَّا اللَّـــهُ ঘোষণার মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহকেই ইলাহ হিসাবে মেনে নিয়েছে। সুতরাং তাগুতকে বর্জন না করলে ঈমানের দাবী মিথ্যা প্রমানিত হবে। যারা এই তাগুতদের মানে তারা আল্লাহকে মানতে পারে না, আর যারা আল্লাহকে মানে তারা তাগুতদের মানতে পারে না। তবে হ্যা এমন অনেক ব্যক্তি আছে আল্লাহকে মানে আবার তাগুতদেরকেও মানে, কিন্তু আসলে যে আল্লাহকে মানা হয় না এ বোধ তাদের নেই। আর বর্তমানে অধিকাংশ লোকদের অবস্থাই এরকম। উদাহরণস্বরূপ, কোরআন মাজীদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা ঐ ব্যক্তির ঈমানের মূল্যহীনতার কথা বলেছেন যে ব্যক্তি নিজেকে ঈমানদার দাবী করে আবার তাগুতের কাছে বিচার-ফায়সালা চায়, আল্লাহতা'য়ালা বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن
يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ

"আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়কে ফয়সালার জন্য তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি তাকে (তাগুতকে) অমান্য করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" *(আন-নিসাঃ ৬০)*

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কিংবা আল্লাহর পাশাপাশি তাগুতের ইবাদত করে তাদের উপর আল্লাহর লানৎ বর্ষিত হবে। আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও তাগুতকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের উপর লা'নত করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যার উপর লা'নত করেন তুমি তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।" *(সূরা নিসা ৪ঃ৫১-৫২)*

পূর্ববর্তী জাতি যারা তাগুতের ইবাদত করেছিল তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেনঃ

"বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহ্র কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা তাগুতের ইবাদত করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে।" *(সূরা মায়েদাহ-৫ঃ৬০)*

আর যারা তাগুতের ইবাদতকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তাদের সুসংবাদ প্রদান করেনঃ

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

"যারা তাগুতের থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্ অভিমুখী হয়, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।" *(সূরা যুমার ৩৯ঃ১৭-১৮)*

যারা তাগুতের ইবাদতকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তাদের ওয়ালী হবেনঃ

"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে" *(সূরা বাকারা ২ঃ২৫৭)*

□□□□□ শব্দের শর'য়ী সংজ্ঞা

এখানে আমরা আলোচনা করব □□□□□ শব্দের শার'য়ী অর্থ নিয়ে তা, এজন্য যে কোরআন-সুন্নায় যখন কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় তখন তার একটা নির্দিষ্ট শার'য়ী অর্থ দাড়ায়। □□□□□ শব্দটি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ওহী দ্বারা সাব্যস্ত, যা আক্বীদার সাথে সম্পৃক্ত। □□□□□ এর ভাষাগত মূল □□□ (ত্বা-গি-ন) এর মত একই রকম মূল হলেও □□□□□ হচ্ছে সীমালংঘনের (□□□) সুনির্দিষ্ট ধরণ। সীমালংঘন করলেই ত্বাগুত হয়ে যায়না, যেমন আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন পবিত্র (হালাল) খাবার খাওয়ার জন্য এবং এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন না করার জন্য *(সূরা, ত্ব-হা ২০ঃ৮১)*। এখন কেউ যদি হারাম খায় তাহলে সে ত্বাগুত হয়ে যাবে না, বরং সে অবাধ্য হবে। এরকম অন্যান্য পাপের ক্ষেত্রেও □□□ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরনের পাপ বা সীমালংঘন কুফর, শিরক্, নিফাক্ পর্যন্ত পৌছতে পারে কিন্তু এ কারণে কেউ ত্বাগুত হয়ে যায় না। বরং ত্বাগুত হবে ঐ রকম সীমালংঘনের ক্ষেত্রে যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর সাথে শরীক্ করে। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট, যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে সে মুশরিক কিন্তু সে ত্বাগুত নয়। আল্লাহ তাকে ত্বা-গি-ন বলেছেন। আর তাগুত হচ্ছে সে যে নিজেকে (মিথ্যা) রব এবং ইলাহ (অর্থাৎ ইবাদতের যোগ্য) বানিয়ে নেয়। এজন্যই সব তাগুতেরা ত্বা-গি-ন কিন্তু সব ত্বা-গি-নেরা তাগুত নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর অধিকার, গুনাবলী, কার্যাবলী ও সত্তার দাবীতে সীমালংঘন করে সে তাগুত। আল্লাহ ব্যতীত যে কেউ ইবাদত গ্রহন করে বা দাবী করে সে তাগুত এবং যে কেউ আল্লাহর গুনাবলী দাবী করে সেও ত্বাগুত। তাগুত হচেছ সেই ব্যক্তি যে নিজের প্রতি আল্লাহর কার্যাবলী বা গুনাবলী আরোপ করে। যেমন ফেরাউন আল্লাহদ্রোহী হয়েছিল এবং সীমালংঘন করেছিল, আল্লাহ সার্বভৌমত্বের মালিক অথচ সে নিজে মিসরের সার্বভৌমত্ব দাবী করেছিল। সে লোকদেরকে জড়ো করে ভাষণ দিয়েছিল যা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ

"ফেরাউন তার জাতির উদ্দেশ্যে (এক) ভাষণ দিলো। সে বললো, মিশরের সার্বভৌমত্ব কি আমার নয়? তোমরা কি দেখছো না যে, এই নদীগুলো আমার (রাজত্বের) অধীনেই বয়ে চলছে--------।" (সূরা যুখরুফ ৪৩:৫১)

আল্লাহতা'য়ালা তাকে □□□□□ বলেছেন সূরা ত্বাহার ২৪ নং আয়াতে এবং মুসা (আঃ) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার কাছে যাওয়ার জন্য- اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى **"ফেরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে।"**

শরীয়তের পরিভাষায়, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই "□□□□□" (তাগুত) যে, আল্লাহদ্রোহী হয়েছে এবং সীমালংঘন করেছে, আর আল্লাহর কোনো হককে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছে এবং এমন বিষয়ে নিজেকে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানিয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস।

সুস্পষ্ট ভাবে □□□□□ এর অর্থ হচ্ছে, কোন মাখলুক (সৃষ্টি) নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়কে (আল্লাহর স্থলে) নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করাঃ-

- কোন মাখলুক (সৃষ্টি) কর্তৃক আল্লাহতা'য়ালার কার্যাবলীর যে কোন কার্য সম্পাদনের বিষয়টি নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা। যেমন সৃষ্টি করা, রিজিক দান অথবা শরীয়ত (বিধান) রচনা। এসব বিষয়গুলো সম্পাদনের ব্যাপারকে যে ব্যক্তি নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করবে (অর্থাৎ কেউ যদি বলে, আমি সৃষ্টি করি, আমি বিধান দেই) সেই □□□□□ ।
- কোন মাখলুক (সৃষ্টি) আল্লাহতা'য়ালার কোন সিফাত বা গুন কে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা। যেমন ইলমে গায়েব জানা। যদি কেউ তা করে (অর্থাৎ বলে আমি এলমে গায়েব জানি) তাহলে তাকে তাগুত হিসেবে গন্য করা হবে।
- যে কোন ইবাদত মাখলুক কর্তৃক (বা সৃষ্টির) এর উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা। যেমনঃ দোয়া, মানত, নৈকট্য লাভের জন্য পশু জবাই অথবা বিচার ফায়সালা চাওয়া। যদি (কোন মাখলুক) এসব ইবাদত গ্রহন করে, দাবীকরে, আকাঙ্খা করে

অথবা (নিজের জন্য) সম্পাদন করে, তাহলে সেই তাগুত। এমনকি কেউ তার জন্য ইবাদত নিবেদন করলে যদি সে নীরব থাকে তাহলেও সে ত্বাগুত বলে গন্য হবে, যতক্ষন পর্যন্ত না সে নিজেকে এ থেকে পবিত্র ও মুক্ত করে নেয় এবং এ হক্ আল্লাহর একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়।

উপরোক্ত যে তিনটি বিষয়ে আলোচনা করেছি, তার যে কোন একটি যদি কেউ নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বা নিজের জন্য সম্পাদন করে তাহলে সে তাগুত হিসেবে গন্য এবং নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ করে নিল।

ইমাম আত্ তাবারী (রহঃ) বলেন, "আল্লাহর দেয়া সীমালংঘনকারী মাত্রই তাগুত বলে চিহ্নিত, যার অধীনস্থ ব্যক্তিরা চাপের মুখে তার ইবাদত করে বা তাকে তোষামোদ করার জন্য বা তার আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য তার ইবাদত করে। এ (তাগুত) উপাস্যটি মানুষ কিংবা শয়তান বা মূর্তি অথবা অন্য যেকোন বস্তু হতে পারে।" *(তাফসীরে তাবারী, ইফাবা/৫ম খন্ড, ২৫৬ নং আয়াতের তাফসীর)*

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী তাহফীমুল কোরআনে সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতের তাফসীরে তাগুতের ব্যাখ্যায় বলেন, "আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাগুত বলা হবে, যে নিজের বৈধ অধিকারের সীমালংঘন করেছে। কোরআনের পরিভাষায় তাগুত এমন এক বান্দাকে বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভূ এবং রব হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের বন্দেগী এবং দাসত্বে নিযুক্ত করে। কোন ব্যক্তি এই তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কোন দিন সঠিক অর্থে আল্লাহর মু'মিন বান্দা হতে পারে না।"

আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ তকীউদ্দীন হেলালী ও আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ মুহসিন খান কর্তৃক অনুদিত কুরআন মাজীদের ইংরেজী অনুবাদের সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে উল্লেখিত □□□ □□ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

"The word `Taaghoot` covers a wide range of meaning: it means anything worshipped otherthan Allah. i.e. all false deities. It may be satan, devil`s, idols, stones, sun, stars, human beings. অর্থাৎ "তাগুত" শব্দটি বিস্তৃত অর্থ বোঝায়ঃ এটার অর্থ আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয়। যেমন সকল মিথ্যা উপাস্য; এটা শয়তান, মৃত ব্যক্তির আত্মা, মুর্তি, পাথর, সূর্য, তারকা, অথবা কোন মানুষও হতে পারে। *(The Noble Quran English translation, P.58)*

সাইয়্যেদ কুতুব (রহ:) বলেন, "তাগুত বলতে সেইসব ব্যক্তি ও ব্যবস্থাকে বোঝায় যেগুলো ঐশী দ্বীন এবং নৈতিক, সামাজিক ও আইন-শৃঙ্খলাকে অবমাননা করে এবং আল্লাহ নির্দেশিত বা তার দেয়া দিক-নির্দেশনা থেকে উদ্ভুত নয় এমন সব মূল্যবোধ ও রীতিনীতির ভিত্তিতে এই জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করে।" *(তাফসীরে ফি যিলালিল কোরআন)*

ইমাম মালেক (রহ:) তাগুতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ "مِّن دُونِ ٱللَّهِ □ □□ □ □□ □□□ □□ □□"

"এমন প্রত্যেক জিনিসকেই তাগুত বলা হয়, আল্লাহতা'য়ালাকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত করা হয়।" *(ফতহুল ক্বাদীর, আল্লামা শওক্বানী)*

এ সংজ্ঞাটি উত্তম এবং ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক। আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয় সেই এ সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত।

যেসব উপাস্যকে □□□ □□ হিসেবে গন্য করা হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

- মৃতী, এমন সব কবর, গাছ, পাথর ও অচেতন পদার্থ যে গুলোর উপাসনা করা হয়;
- আল্লাহর আইন ব্যাতীত এমন সব আইন যার মাধ্যমে বিচার ফায়সালা চাওয়া হয়;
- এমনসব বিচারক তাগুতের অন্তর্ভূক্ত যারা আল্লাহর আইনের বিরোধী আইনদ্বারা মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করে;
- শয়তান, যাদুকর, গনক (যারা ইলমে গায়েবের ব্যাপারে কথা বলে);
- উপাস্য হতে যে রাজী;
- যারা আইন রচনা বা মানুষের জন্য হালাল-হারাম নির্ধারণ করে কিংবা করার অধিকার রাখে বলে মনে করে;

প্রধান প্রধান তাগুত

ইমাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন, তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে পাঁচ ধরণের তাগুত নেতৃত্বের আসনে রয়েছেঃ

১. গায়রুল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবানকারী শয়তান;

২. আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালেম শাসক;

৩. আল্লাহ তা'য়ালার নাযিলকৃত বিধান ছাড়া যে বিচার-ফায়সালা করে;

৪. আল্লাহ ব্যতীত যে ব্যক্তি এলমে গায়েব জানে বলে দাবী করে;

৫. আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয়;

১। গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু) ইবাদতের দিকে আহ্বানকারী শয়তান

এর প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করোনা, কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।" *(ইয়াসীন: ৬০)*

শয়তান দুই প্রকার- মানুষ শয়তান এবং জ্বিন শয়তান। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

"বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের মালিকের, মানুষের ইলাহর। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে ।"

জ্বিন শয়তান এবং *মানুষ শয়তান* তাদের কর্মের কারণে এ শ্রেনীর তাগুতের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা-বাতীন (রহঃ) বলেন, "আল্লাহ ব্যতীত সকল মা'বুদ (উপাস্য), সব গোমরাহীর প্রধান, যে বাতিলের দিকে আহবান জানায়, বাতিলকে সৌন্দর্য্য মন্ডিত করে এরা সকলেই তাগুতের অন্তর্ভূক্ত। এর সাথে সাথে গণক, যাদুকর ও কবরবসীসহ অন্যান্য বস্তুর উপাসনার ক্ষেত্রে যারা অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে (কবর, মাযার ইত্যাদির খাদেম) তারাও তাগুতের মধ্যে শামিল।" *(মাজমুআতুত্ তাওহীদ ১৭৩/১পৃঃ)*

জ্বিন শয়তান শ্রেনীর তাগুত হচ্ছে-

জ্বিন শয়তানদের মধ্যে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের দিকে আহবান করে অথবা অন্যের ইবাদত করতে প্রেরণা যোগায় বরং দৃষ্টির অন্তরাল থেকে নিজেই ইবাদত নেয় তারা তাগুতের অন্তর্ভূক্ত। জ্বিন শয়তানেরা যেভাবে অন্যের ইবাদতের দিকে আহবান করে কিংবা প্রেরণা যোগায়-

গনকদেরকে গায়েবের (অদৃশ্য) সংবাদ প্রদানের নামে সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত খবর প্রদান করে যার কারণে মানুষ গনকদের কাছে যায় এমন বিষয় (গায়েব) জানার জন্য যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না ।

শয়তান মানুষকে ধোকা দেয়, প্ররোচনা দেয়, মানুষের মনে কুহক জাল সৃষ্টি করে মূর্তি, মাজার, পীর-ফকির, গাছ-পাথর ইত্যাদির জন্য মানত, সেজদা, দো'য়া এসব ইবাদত করার জন্য এবং দৃষ্টির অন্তরাল থেকে শয়তানই এসব ইবাদত গ্রহন করছে।

বিভিন্ন চরমপন্থী সুফী (মরমী) বিধানের শাইখগন (সর্দারগণ)। তাদের অনেকে দেহকে শূন্যে ভাসাতে, মুহর্তের মধ্যে বহু দুরুত্বে অতিক্রম করতে, শূন্য হতে খাদ্য অথবা অর্থ হাজির করতে পারে বলে মনে হয়। তাদের অজ্ঞ অনুসারীরা ঐ সব জাদুর ভেলকিকে স্বর্গীয় অলৌকিক ঘটনা বলে বিশ্বাস করে। তাদের উপর মানুষ আল্লাহর ক্ষমতা আরোপ করে, পীরদের জন্য তাদের অর্থ ও জীবন স্বেচছায় উৎসর্গ করে। এই সব ঘটনার পিছনে গোপন এবং অশুভ জিন জগৎ লুকিয়ে রয়েছে। এবং

মানুষ শয়তান শ্রেনীর তাগুত হচ্ছে-

মানুষদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদতের আহ্বান জানায়, উৎসাহিত করে তারা এ শ্রেনীর তাগুতের অন্ত র্ভূক্ত। এরা হচ্ছে-

সেসব পীর এবং মাজারের খাদেমরা যারা মানুষকে পীর ও মাজারকে সিজদা দিতে, মানত করতে, দোয়া করতে, ভয় করতে আহ্বান জানায় এবং উৎসাহিত করে, এগুলোকে সুন্দর করে মানুষের সামনে উত্থাপন করে তারা এ শ্রেনীর অন্ত র্ভূক্ত।

সেসব নেতা যারা মানুষকে প্রচলিত গনতান্ত্রিক দলের অন্তর্ভূক্ত হতে এবং প্রার্থীকে নির্বাচিত করার জন্য আহবান জানায়, উৎসাহিত করে, চাপ প্রয়োগ করে, বাধ্য করে তারা এ শ্রেনীর অন্তর্ভূক্ত। কারণ সে নেতা মানুষকে কুফরীর এবং শিরকের দিকে আহবান করে এবং বাধ্য করে। যেহেতু আল্লাহই একমাত্র আইন-বিধান দাতা, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। সে তার দলের নেতাদের সার্বভৌম ক্ষমতায় বা আইন-বিধান রচনাকারীর আসনে বসাবার জন্য আহ্বান করে, চাপ প্রয়োগ করে প্রকারান্তরে সে তার দলীয় নেতাদের রবের আসনে বসাতে আহ্বান করে এবং চাপ প্রয়োগ করে।

২। *আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালেম শাসক*

এর দলিল; আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ

"আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়কে ফয়সালার জন্য তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি তাকে (তাগুতকে) অমান্য করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" *(আন-নিসাঃ ৬০)*

আল্লাহ আমাদের একমাত্র রব। তিনি তাঁর কার্যাবলী, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে একক। যে কেউ আল্লাহর কার্যাবলী, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের কোন একটি তাঁর নিজের জন্য দাবী করবে বা এরুপ কাজ করবে যেটা আল্লাহর অধিকার সে ত্বাগুতে পরিণত হবে। আল্লাহ সার্বভৌমত্বের একক অধিকারী, আল্লাহর এ কর্তৃত্বে কেউ বিন্দুমাত্র শরীক নেই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

"যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোন সন্তান গ্রহন করেননি; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।" *(সূরা, ফোরকান-২৫ঃ২)*

সার্বভৌমত্বের অধিকারী আল্লাহই একমাত্র আইন-বিধানদাতা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

"বিধান দেবার অধিকার আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" *(সূরা, ইউসুফ-১২ঃ৪০)*

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেছেনঃ

أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ **"জেনে রেখো সৃষ্টি এবং বিধান তাঁরই।"** *(সূরা, আরাফ -৭ঃ৫৪)*

আল্লাহর বিধান দানের সার্বভৌম কর্তৃত্বে কেউই শরীক নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেনঃ

وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ **"সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই।"** *(সূরা, ফোরকান-২৫ঃ২)*

আল্লাহর আইন-বিধান কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেছেনঃ

وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"আল্লাহ্ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপ বা রদকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।" *(সূরা, রাদ-১৩ঃ৪১)*

সুতরাং আল্লাহর আইন-বিধানদানের এ সার্বভৌম অধিকারের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিই সীমালংঘন করবে সে ত্বাগুতে পরিণত হবে। কারণ সে আল্লাহর খাস অধিকারের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করেছে। কোরআনে আল্লাহ ফেরাউনকে ত্বাগুত বলেছেন। সে প্রকাশ্য নিজেকে 'রব' ঘোষণা করেছিলো তা কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেঃ

"দেশবাসীকে জড় করে সে ভাষণ দিলো, অতপর সে বললো, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় 'রব'।" *(সূরা নাযিয়াত ৭৯: ২৩-২৪)*

এখন কথা হলো, ফেরাউন নিজেকে 'রব' বলতে কী বুঝিয়েছে? সে কি দাবী করেছিলো যে, সে আসমান যমীন সৃষ্টি করেছে, মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছে কিংবা পাহাড়-পর্বত যমীনের বুকে গেড়ে যমীনকে সে স্থিতিশীল করে রেখেছে?

না, এমন দাবী সে কখনো করেনি। সে যদি এমন দাবী করতো তাহলে তার সংগী-সাথীরাই তাকে পাগল বলে উড়িয়ে দিতো। বরং সে নিজেও বিভিন্ন পূজা-পার্বনে অংশ নিতো। তারও অনেক ধরনের ইলাহ, মাবুদ বা উপাস্য ছিলো। কোরআন থেকেই এর প্রমাণ দেখে নিনঃ

"ফেরাউনের জাতির নেতারা (ফেরাউনকে) বললো, আপনি কি মূসা ও তার দলবলকে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির সুযোগ দিবেন আর তারা আপনাকে ও আপনার ইলাহদের এভাবে বর্জন করে চলবে?" *(সূরা আরাফ ৭: ১২৭)*

দেখুন আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, তারও অনেক ইলাহ বা উপাস্য ছিলো। তাহলে তার 'রব' দাবী বলতে আসলে কী বুঝায়? রব বলে সে কী দাবী করেছিলো? সরাসরি আল্লাহর কালাম কোরআনই আমাদেরকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে যে, ফেরাউনের দাবী ছিল সার্বভৌমত্বের দাবী। সারা পৃথিবীতে নয় তার দাবী ছিল কেবল মিশরের শাসন ক্ষমতার উপর নিরংকুশ আধিপত্যের দাবী। তার দাবী ছিলো মিশরের সাধারণ জনগণের জন্যে তার ইচ্ছানুযায়ী যেমন খুশী তেমন আইন-কানুন ও মূল্যবোধ নির্ধারণের ক্ষমতার দাবী। দেখুন কোরআন কী বলেছেঃ

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي
مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ

"ফেরাউন তার জাতির উদ্দেশ্যে (এক) ভাষণ দিলো। সে বললো, মিশরের সার্বভৌমত্ব কি আমার নয়? তোমরা কি দেখছো না যে, এই নদীগুলো আমার (রাজত্বের) অধীনেই বয়ে চলছে--------।" *(সূরা যুখরুফ ৪৩:৫১)*

কোরআনের আয়াতগুলো এবং বাস্তব প্রেক্ষাপট যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, চক্র বা যে কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া মানেই হলো তাকে বা তাদেরকে 'রব' বানিয়ে নেয়া। কারণ অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া মানেই হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে আইন-কানুন রচনা করার অধিকারসহ নিরংকুশ শাসন কর্তৃত্ব তাদের হাতে তুলে দেয়া। কোরআনের আলোকে মানুষ কিভাবে মানুষের 'রব' হয়ে যায় তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে মানব জাতির অতীত ইতিহাসেই শুধু নয় বর্তমান বিশ্বেও অসংখ্য (মিথ্যা) রবের পদচারণা আমরা সচরাচর দেখতে পাই। তবে তারা শুধু মুখ দিয়ে বলে না যে, আমরা তোমাদের 'রব'। বর্তমানে যারা এ ত্বাগুত শ্রেনীর অন্তর্ভূক্ত-

- যেসব জালেম শাসকেরা আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে নিজেরা আইন দিচ্ছে । যেমন আল্লাহ চুরির ক্ষেত্রে বিধান দিয়েছেনঃ

  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

  "যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ্‌ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়।" *(সূরা, মায়েদা-৫:৩৮)*

  অথচ বর্তমানে এসব শাসকরা বিধান দিয়েছে চুরির শাস্তি হচ্ছে জেল বা জরিমানা। এমনিভাবে অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে দেখুন ডাকাতির দন্ড, ব্যভিচারের দন্ড, সন্ত্রাস দমন আইন, বিবাহ বিধিসহ আরো অনেক বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা যে বিধান আল-কোরআনের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন, তা বাদ দিয়ে তারা নিজেদের মনমতো দন্ড বিধি বা আইন তৈরী করে নিয়েছে।

- যেসব শাসকেরা আল্লাহর হালাল-হারামের বিধানকে পরিবর্তন করেছে তারাও তাগুতের অন্তর্ভূক্ত। তারা নিজেদের মিথ্যা রবের আসনে বসিয়েছে। তারা কিভাবে তাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নিয়েছিলো তা আমরা সরাসরি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর করা এই আয়াতের তাফসীরের আলোকে একেবারে স্পষ্ট করে বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ। তিরমিযীতে উদ্ধৃত হাদিসে হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে এসে দেখলাম তিনি সূরা তওবার এই আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেনঃ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা তাদের সন্ন্যাসী ও ধর্মযাজক (পীর, নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে) আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে----- ।" *(সূরা তওবা ৯:৩১)*

অতপর রাসূল (সাঃ) বলেন তোমরা শোনো তারা তাদেরকে (শাব্দিক অর্থে) পূজা/ উপাসনা করতো না, কিন্তু তারা যখন মনগড়া ভাবে কোনো কিছুকে বৈধ ঘোষণা করতো, জনগণ তা মেনে নিতো, আর যখন কোনো কিছুকে অবৈধ ঘোষণা করতো তখন তারা তা অবৈধ বলে মেনে নিতো ।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে ইমাম আহমদ তিরমিযী ও ইবনে জারীরের সূত্রে আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তার কাছে ইসলামের দাওয়াত আসার পরে প্রথমে তিনি সিরিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন, পরে যখন রাসূল (সঃ) এর কাছে তিনি এলেন তখন তার গলায় ক্রুশ ঝুলানো ছিলো । তখন রাসূল (সঃ) উল্লেখিত আয়াতটি পড়ছিলেন । হযরত আদী (রাঃ) বলেন, আহলে কিতাবরা (ইহুদী ও খৃষ্টানরা) তো আলেম/ দরবেশদের (তথা নেতাদের) পূজা উপাসনা করতো না! রাসূল (সঃ) বললেন, তা সত্য । তবে তারা মনমতো কোনো কিছুকে বৈধ কিংবা অবৈধ ঘোষণা করলে জনগণ তা নির্বিচারে মেনে নিতো । এটাই তাদের পূজা-উপাসনা/ ইবাদত ।

বর্তমান তাগুতী (সীমালঙ্ঘনকারী) সরকার ব্যবস্থায় এর উদাহরণ দেখুনঃ মদ, জুয়া, লটারী, সুদ, বেপর্দা, নারী নেতৃত্ব, বেশ্যাবৃত্তি (ব্যভিচার) এমন আরো অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা কঠোর ভাবে অবৈধ ঘোষণা করেছেন, পক্ষান্তরে, তারা এগুলোকে বৈধতার সার্টিফিকেট দিয়েছে ।

৩ । আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধান ছাড়া যে বিচার-ফয়সালা করে

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালা করে না তারাই কাফের ।" *(আল-মায়েদাহঃ ৪৪)*

এর দ্বারা এমন বিচারক বুঝানো হয়েছে, যে আল্লাহর শরীয়তকে পরিবর্তনকারী কোনো বিধানের সাহায্যে বিচার-ফয়সালা করে ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, "আল্লাহর কিতাব ছাড়া যার কাছে বিচারফায়সালা চাওয়া হয়, তাকেই তাগুত নামে আখ্যায়িত করা হয়" - অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ছাড়া বিচার ফায়সালাকারীই তাগুত *(মাজমু উল ফতোয়া ৭০১/ ৭৮পৃঃ)*

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, "প্রত্যেক কওমের ঐ ব্যক্তিই হচ্ছে তাগুত, কওমের লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে (সঃ) বাদ দিয়ে যার কাছে বিচার-ফয়সালা চায় ।" *(এ'লামু মুকিঈন৪০/১পৃঃ)*

আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা-বাতীন (রহঃ) বলেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের পরিপন্থী সব জাহেলী আইনের মাধ্যমে যারা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে তারাও তাগুতের মধ্যে শামিল ।" *(মাজমুআতুত্ তাওহীদ ১৭৩/১পৃঃ)*

পুর্ববর্তী শ্রেনীর তাগুতের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্টভাবে দেখেছি যে আইন-বিধান দান হচ্ছে রব হিসেবে আল্লাহর একক অধিকার, এ ক্ষেত্রে কেউই তাঁর শরীক নেই, হতে পারে না । কারণ তিনিই একমাত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী । তিনি মানব জাতির কল্যানার্থে বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন শাস্তির বিধান দিয়েছেন । অথচ বর্তমানে এমন অনেক বিচারক আছে যারা আল্লাহর এসব বিধান বাদ দিয়ে নিজেরা বিধান দিচ্ছে, এ কারণে তারা ত্বাগুতে পরিণত হয়েছে । বর্তমানে যারা এ শ্রেনীর ত্বাগুত-

সমাজের মধ্যে এরূপ কিছু নেতা শ্রেনীর লোক আছে যারা মনগড়া বিধানে বিচার-ফায়সালা করে । সমাজে যখন কোন অপরাধ সংঘটিত হয় তখন মানুষ এদেরকে জড়ো করে এদের কাছে ফায়সালা চায়, তখন এরা নিজেদের মনমত বিধান দিয়ে অপরাধের বিচার করে । যেমন চুরির অপরাধের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান হচ্ছে হাত কাটা । কিন্তু এদের কাছে যখন মানুষ যায়, তখন এরা চুরির অপরাধের জন্য বিধান দেয় - চোরকে এতটা জুতার বাড়ি, এত টাকা জরিমানা কিংবা জুতার মালা গলায় দিয়ে হাটানো, পায়ে আকদেয়া নাকে খত দেয়া ইত্যাদি । আবার যেনা-ব্যভিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহর ফায়সালা হচ্ছে- যেনাকার অবিবাহিত হলে একশ দোররা মারা আর যদি বিবাহিত হয় তবে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুতে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা (রজম করা) এবং একদল মু'মিন সেটা প্রত্যক্ষ্য করা । অথচ এদের কাছে যখন উক্ত অপরাধের বিচার চায় তখন এরা বিধান দেয় - জেনাকারের এত হাজার টাকা জরিমানা, সমাজ বহির্ভূত করা অথবা ছেলে-মেয়ের বিয়ে পড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি । এরূপভাবে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেরা বিধান

দিয়ে এরা তাগুতে পরিণত হয়েছে আর মানুষ তাদের সেই বিধানকে গ্রহন করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে রব রূপে গ্রহন করছে। আল্লাহতায়ালা বলেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে দ্বীন সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" *(সূরা, শূরা-৪২ঃ২১)*

৪। আল্লাহ ব্যতীত যে ব্যক্তি এলমে গায়েব জানে বলে দাবী করে

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا

"তিনি আলিমুল গায়েব (অদৃশ্যের জ্ঞানী) বস্তুতঃ তিনি স্বীয় গায়েবের (অদৃশ্য) বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না।" *(আল জ্বিনঃ ২৬)*

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেনঃ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ **"তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এ গুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।"** *(সূরা, আনআম -৬ঃ৫৯)*

সুতরাং عالم الغيب বা অদৃশ্যের জ্ঞানী একমাত্র আল্লাহই, এটা তাঁর একক ক্ষমতা। এখন কেউ যদি দাবী করে সে গায়েব জানে কিংবা দাবী না করেও যদি কেউ গায়েবের কথা বলে সে নিশ্চিতভাবে ত্বাগুতে পরিণত হবে।

বর্তমানে একশ্রেনীর গনক টিয়াপাখি বা এই জাতীয় জিনিস দিয়ে হাত গণনা করে এবং ভবিষ্যতে তার কি বিপদ বা শুভ সংবাদ আছে এ ব্যাপারে সংবাদ প্রদান করে। কোন কোন গনক হাতের রেখা কিংবা রাশিচক্রের মাধ্যমে মানুষের হায়াত-মউত, সফলতা-ব্যর্থতা এ জাতীয় গায়েব বা অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করে। একশ্রেনীর পীরেরাও এরূপ গায়েবের ব্যাপারে কথা বলে। তাদের কাজে আসা লোকদের অতীত জীবনের সংবাদ, কিংবা পীরের কাছে আসার আগে বাড়িতে কি পরিকল্পনা করেছিল, অপরিচিত লোকের নাম ঠিকানা, বয়স ইত্যাদি বলে দেয়ার মাধ্যমে লোকদের চমৎকৃত করে দেয়। মানুষ তাদের ব্যাপারে এরূপ ধারণা করে যে তারা গায়েব জানে, যা একমাত্র আল্লাহর একমাত্র জন্যই প্রযোজ্য। এ কারণে তারা তাগুতে পরিণত হচ্ছে।

কেউ কেউ বলে আমরা গনকের কাছে যাই এ জন্য যে, তাদের প্রদানকৃত সংবাদ সত্য হয় এবং এতে আমরা উপকৃত হই। তাদের জবাবে বলছি- এটা সত্য যে তাদের প্রদানকৃত সংবাদের কিছু কিছু সত্য হয় বটে। তারা এরূপ সংবাদ প্রদান করে দুষ্ট জিনদের সাহায্যে। গনকরা জিনদের সাথে বেশীর ভাগ সময়ই নিষিদ্ধ বা ধর্মদ্রোহী কাজের মাধ্যমেই যোগাযোগ করে। এভাবে তলব করে আনা দুষ্ট জিন তাদের সঙ্গীদের গুনাহ করতে এবং স্রষ্টাকে অবিশ্বাস করতে সাহায্য করতে পারে। তাদের লক্ষ্য হল স্রষ্টা ছাড়া অথবা স্রষ্টার পাশাপাশি অন্যকে উপাসনা করার মত গুরুতর গুনাহ করতে যত বেশী জনকে পারা যায় তত জনকে আকৃষ্ট করে। একবার গণকদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং চুক্তি হয়ে গেলে, জিন ভবিষ্যতের সামান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জানাতে পারে। রাসুল (সঃ) বর্ণনা দিয়েছেন জিনরা কিভাবে ভবিষ্যত সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করে। তিনি বর্ণনা দেন যে, জিনরা প্রথম আসমানের উপর অংশ পর্যন্ত ভ্রমণ করত এবং ভবিষ্যতের উপর কিছু তথ্যাদি যা ফিরিশতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত তা শুনতে সক্ষম হত। তারপর তারা পৃথিবীতে ফিরে এসে তাদের পরিচিতি মানুষের কাছে ঐ তথ্যগুলি পরিবেশন করত। *(বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত)* মুহাম্মদ (সঃ) এর নবুওত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এই ধরণের বহু ঘটনা সংঘটিত হত। এবং গণকরা তাদের তথ্য প্রদানে নির্ভূল ছিল। তারা রাজকীয় আদালতে আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এমনকি পৃথিবীর কিছু অঞ্চলে তাদের পুজাও করা হত।

রাসুল (সঃ) কর্তৃক ধর্ম প্রচার শুরু করার পর হতে অবস্থার পরিবর্তন হয়। আল্লাহ ফিরিশতাদের দিয়ে আসমানের নীচের এলাকা সতর্কতার সঙ্গে পাহাড়া দেবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর হতে বেশীরভাগ জিনদের উল্কা এবং ধাবমান নক্ষত্ররাজি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হত। আল্লাহ এই বিস্ময়কর ঘটনা কোরআনের ভাষায় বর্ণনা করেছেনঃ

"এবং আমরা চাহিয়াছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কা পিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ ; আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে সংবাদ শুনিবার জন্য বসিতাম কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনিতে চাহিলে সে তাহার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কা পিন্ডের সম্মুখীন হয়।" *(সুরা আল-জ্বিন ৭২ঃ৮-৯)*

আল্লাহ আরও বলেনঃ **"প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি উহাকে রক্ষা করিয়া থাকি; আর কেহ চুরি করিয়া সংবাদ শুনিতে চাহিলে উহার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।"** *(সূরা আল হিজর ১৫ঃ১৭-১৮)*

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "যখন রাসুল (সাঃ) এবং তাঁর একদল সাহাবা উকাধ বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন শয়তানদের ঐশী খবরাখবর শোনায় বাধা প্রদান করা হল। উল্কাপিন্ড তাদের উপর ছেড়ে দেয়া হল। ফলে তারা তাদের লোকদের কাছে ফিরে এল। যখন তাদের লোকরা জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছিল, তারা তাদের জানালো। কেউ কেউ পরামর্শ দিল যে নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে, কাজেই তারা কারণ খুজে বের করার জন্য পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের কয়েকজন রাসুল (সঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণের সালাত রত অবস্থা দেখতে পেল এবং তারা তাদের কোরআন পড়া শুনলো। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে নিশ্চয় এটাই তাদের শোনায় বাধা প্রদান করেছিল। যখন তারা তাদের লোকদের মধ্যে ফিরে গেল তখন তারা বলল, **"আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করিয়াছি। যাহা সঠিক পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনও আমাদিগের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করিব না।"** *(সুরা আল জিন ৭২ঃ১-২) (বুখারী, মুসলিম)* এইভাবে রাসূল (সঃ) কর্তৃক ধর্ম প্রচারের পূর্বে জীনরা যেভাবে সহজে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করত তা আর আর পারেনি। ঐ কারণে তারা এখন তাদের খবরাখবরের সঙ্গে অনেক মিথ্যা মিশ্রিত করে। রাসুল (সঃ) বলেন, "জাদুকর অথবা গনকের মুখে না পৌছান পর্যন্ত তারা (জিনরা) খবরাখবর নীচে ফেরত পাঠাতে থাকবে। কখনও কখনও তারা খবর চালান করার আগেই একটি উল্কা পিন্ড তাদের আঘাত প্রাপ্ত করার পূর্বে পাঠাতে পারলে এর সঙ্গে তারা একশটা মিথ্যা যোগ করবে। *(বুখারী, মুসলিম)*

আয়েশা বর্ণনা দেন যে তিনি আল্লাহর রাসূলের (সঃ) কাছে গণকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞসা করলে তিনি উত্তর দেন যে ওরা কিছু না। আয়শা (রাঃ) তখন উল্লেখ করলেন যে গণকরা কখনও কখনও যা বলে সত্য হয়। রাসুল (সঃ) বলেন ''ওতে সত্যতার কিছু অংশ যা জিনরা চুরি করে এবং তার বন্ধুর কাছে বলে কিন্তু সে এর সাথে একশটি মিথ্যা যোগ করে।"

জিনরা তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী মানুষকে আপতঃ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবহিত করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ একজন গণকের কাছে আসে সে আসার আগে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তা গণকের জিন আগত লোকটির ক্বারিনের (প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে নিয়োজিত জিন) কাছ থেকে জিন জেনে নেয়। সুতরাং গণক লোকটিকে বলতে সক্ষম হয় যে সে এটা করবে অথবা অমুক অমুক জায়গায় যাবে। এই প্রক্রিয়ায় একজন সতিকার গণক অপরিচিত লোকের অতীত পরিপূর্ণ ভাবে জানতে সক্ষম হয়। সে একজন অচেনা ব্যক্তির পিতামার নাম, কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল এবং তার ছেলে বেলার আচরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বলেতে সক্ষম হয়। অতীত সম্বন্ধে পরিপূর্ণ বর্ণনা দেবার ক্ষমতা জিন এর সঙ্গে মুহুর্তের মধ্যে বহু দুরত্ব অতিক্রম করতে এবং গোপন বিষয় হারানো জিনিস, অদেখা ঘটনা বলি সম্বন্ধে বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করতেও সক্ষম। কোরআনে বর্ণিত পয়গম্বর সুলায়মান এবং সিবার বাণী বিলকিসের গল্পে মধ্যে এই ক্ষমতার সত্যতা পাওয়া যায়। সুলায়মান (আঃ) একটি জিনকে রাণীর দেশ থেকে তার সিংহাসন নিয়ে আসতে বললেন। **"এক শক্তিশালী জিন বলল, আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বে আমি উহা আনিয়া দিব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান বিশ্বস্ত।"** *(সূরা আন নামল ২৭ঃ৩৯)*

৫। আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় এবং এ ইবাদত গ্রহণে যে রাজী বা সন্তুষ্ট থাকে

এর দলীল, আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

"তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ ব্যতীত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দিব। আমি জালিমদেরকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।" *(আম্বিয়া-২৯)*

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন, "তাগুত হচ্ছে এমন যে কেউ যার প্রতি বান্দাহ (আবদ) সীমালংঘন করে, সেটা কাউকে ইবাদত করা (মা'বুদিন) বা অনুসরণ করা (মাতবুইন) বা মান্য করা (মুতাইন) যাই হোক না কেন।" *(এ'লামুল মুকিঈন)*

ইমাম মালেক (রহ:) তাগুতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ "مِن دُونِ ٱللَّهِ □ □□ □ □□ □□□ □□ □□"

"এমন প্রত্যেক জিনিসকেই তাগুত বলা হয়, আল্লাহতা'য়ালাকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত করা হয়।" *(ফতহুল ক্বাদীর, আল্লামা শওক্বানী)*

এ শ্রেনীর ত্বাগুত হচ্ছে-

সে পীর-ফকির তথাকথিত ওলি- আওলিয়ারা যাদেরকে মানুষ সেজদা দেয়, তাদের কাছে দোয়া করে, তাদের নামে মানত করে, তাদেরকে ভয় করে, তাদের কাছে মানুষ সাহায্য চায়, বিপদ-আপদে আশ্রয় চায়, তাদেরকে আল্লাহর

চাইতে বেশী মুহাব্বত করে, কোরআন-সুন্নাহর চাইতে তাদের কথাকে বেশী প্রাধান্য দেয় তথা আনুগত্য করে এবং তারা সন্তুষ্টি চিত্তে সেগুলো মেনে নিচ্ছে কিংবা সে যদি নীরবও থাকে তবুও সে এ শ্রেনীর তাগুতের অন্তর্ভূক্ত হবে। এ ইবাদত গুলোর কোন একটিও যদি কেউ কারও নিবেদন করে আর সে সেটা মেনে নেয় তাহলেও সে তাগুতের অন্তর্ভূক্ত হবে।

তাগুতকে কিভাবে অস্বীকার করবেন

পাঁচ ভাবে তাগুতকে অস্বীকার করা অপরিহার্যঃ

১। তাগুতের ইবাদত বাতিল এ আক্বীদা পোষণের মাধ্যমে

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

“এটা এ জন্য যে, আল্লাহই প্রকৃত সত্য। আর আল্লাহ ছাড়া তারা যাকে ডাকে তা বাতিল ও অসত্য। আল্লাহই সবার উচ্চে এবং আল্লাহই মহান।” *(হজ্জঃ ৬২)*

তাগুতের জন্য মানুষ যে ইবাদত নিবেদন করে, যেমন পীর-মাজারকে সিজদা দেয়া, দো'য়া করা, তাদের নামে মানত করা এসবই বাতিল এগুলো কোন কাজে আসবে না। এসব কে মানুষ যে মনে মনে ভয় করে, এগুলো থেকে মঙ্গলের আশা করে আবার অমঙ্গলের আশংকা করে সবই বাতিল ধারণা। এসব ধারণা তাগুতের ব্যাপারে করা যাবে না। এরূপভাবে মানুষ যত ধরনের ইবাদতই তাগুতের জন্য নিবেদন করুক তা সবই বাতিল এ আক্বীদা বা বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে।

২। তাগুতকে পরিত্যাগ ও তাগুত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে

এর অর্থ হচ্ছে তাগুতের ইবাদত পরিত্যাগ করা, পরিহার করা। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

“আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকো।” *(নাহলঃ ৩৬)*

- যে ব্যক্তি আক্বীদাগত ভাবে তাগুতকে পরিত্যাগ করে কিন্তু কাজের মাধ্যমে পরিত্যাগ কওে না তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মতো যে, তাগুতকে সেজদা করে অথবা তার উদ্দেশ্যে মান্নত করে, অথবা বিচার ফয়সালার জন্য তাগুতের কাছে যায়, আবার এ দাবীও করে যে তার আক্বীদা শুদ্ধ আছে।
- তাগুত যদি এমন শ্রেণীর হয় যার কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয় তাহলে বান্দার করণীয় হচ্ছে তার কাছে বিচার-ফয়সালার জন্য না যাওয়া।
- তাগুত যদি এমন শ্রেনীর হয় যে সে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে নিজেই আইন দেয় বান্দার করণীয় হচ্ছে তার আইনকে না মানা, তাকে বিধান দাতা হিসাবে না মানা, ভোটের মাধ্যমে তাকে আইনদাতার আসনে না পাঠানো।

এমনিভাবে যে কোন ইবাদত যা আল্লাহর জন্য খাস সে ইবাদতগুলো তাগুতের জন্য নিবেদন না করা। কারণ কেউ যদি উপরোল্লিখিত ইবাদতসহ অন্য যেকোন ইবাদত তাগুতের জন্য নিবেদন করে তার মুসলিম দাবী করা বৃথা, তার সলাত, যাকাত, হাজ্জ কোন ইবাদতই কবুল হবে না। কারণ সে তাগুতকেও পরিত্যাগ করে নাই এজন্য আল্লাহর প্রতি তার ঈমানও আনা হয়নি। অতীব দুঃখজনক হলেও সত্য যে বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের অবস্থাই এই যে তারা কোন না কোন ভাবে তাগুতের ইবাদত করছে বা তার অনুসরণ করছে বা তাকে সাহায্য সহযোগিতা করছে। অথচ প্রত্যেক নবী-রাসুলই এই তাগুতের ইবাদতকে পরিত্যাগ করে একক ভাবে আল্লাহর ইবাদত করার আহবান নিয়ে তাদের উম্মাতের কাছে এসেছিলেন। এটাই ছিল নবী-রাসুলদের মূল দাওয়াত।

৩। দুশমনি বা শত্রুতার মাধ্যমে

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর ঘটনা বর্ণনা করতঃ বলেন-

قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ
أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

"ইবরাহীম বললোঃ তোমরা এবং তোমাদের অতীত বাপ-দাদারা যে সব জিনিসের ইবাদত করে আসতেছো, সে গুলি কি কখনো তোমরা চোখ মেলে দেখেছো? এরা সবাইতা আমার দুশমন একমাত্র রাব্বুল আলামীন ছাড়া।" *(আশ্ শুআরাঃ ৭৫-৭৭)*

তাগুতের সাথে থাকবে সুস্পষ্ট শত্রুতা। কারণ তাগুত আল্লাহর বান্দাদের তার দাসত্বে নিয়োগ করে প্রকারান্তরে সে নিজেকে রব এবং ইলাহের আসনে বসায়। যে ব্যক্তির ন্যুনতম জ্ঞান আছে এবং দাবী করে যে সে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে সে কখনো তাগুতকে বন্ধু হিসেবে নিতে পারে না। বরং তাগুতের সাথে থাকবে তার দুশমনি বা শত্রুতা। তাওহীদের রোকন বা মৌলিক দাবী তাগুতকে বর্জন করা, তাগুতের সাথে শত্রুতা করা ব্যতীত এ রোকন মানা সম্ভব হয় না।

আল্লাহতায়ালা বলেনঃ **"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।"** *(সূরা বাকারা ২ঃ২৫৭)*

আল্লাহতায়ালা আরও বলেনঃ **"যারা ঈমানদার তারা যে, কিত্বাল করে আল্লাহ্র পথে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা ক্বিতাল করে তাগুতের পথে।"** *(সূরা নিসা ৪ঃ৭৬)*

সুতরাং তাগুতের সাথে ঈমানদারদের থাকবে সুস্পষ্ট শত্রুতা, তাগুতের বিরোধিতা করতে হবে এবং প্রচেষ্টা থাকবে তাগুতের দাসত্বকে মিটিয়ে দিয়ে কিভাবে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে মানুষকে নিয়ে আসা যায়।

৪। ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমে

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সংঙ্গীগণের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলোঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা যতক্ষণ না এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, ততক্ষণ তোমাদের ও আমাদের মধ্যে থাকবে চির শত্রুতা, ক্রোধ ও ঘৃণা।" *(আল মুমতাহিনাঃ ৪)*

الدرر السنية لعلماء النجد নামক গ্রন্থের ১/৯৩ পৃষ্ঠায়

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এ আয়াতটি এ কথারই প্রমাণ যে, মানুষ যদি তার রবের আনুগত্য, মুহাব্বত এবং তিনি যা পছন্দ করেন তার মুহাব্বতে ইবাদত করে, কিন্তু মুশরিকদেরকে (যারা তাগুতের দাসত্ব করে) এবং তাদের কাজকে ঘৃণা কওে না, বিরোধিতা করে না, তবে সে তাগুতকে পরিত্যাগ করতে পারেনি। আর যে ব্যক্তি তাগুতকে পরিত্যাগ করতে পারেনি সে ইসলামেও প্রবেশ করতে পারেনি। অতএব সে কাফের যদিও সে রাত জেগে ইবাদত করার মাধ্যমে আর দিনে রোযা রাখার মাধ্যমে উম্মতের সবচেয়ে বড় আবেদ ও বুজুর্গ ব্যক্তি হয়ে থাকে। তার অবস্থা হচ্ছে ঐ নামাজী ব্যক্তির মত, যে ফরজ গোসল ব্যতীত নামাজ আদায় করলো অথবা তীব্র গরমের দিনে নফল রোযা রেখে রমযান মাসে দিনের বেলা অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকলো।

সুতরাং তাগুতকে অস্বীকারের দাবী হচ্ছে তাগুত এবং যে ব্যক্তি তার ইবাদত করে কাফেরে পরিণত হয়েছে উভয়কেই পরিত্যাগ করতে হবে এবং উভয়ের সাথে ঈমানদারদের থাকবে দুশমনি, ঘৃণা-বিদ্বেষ। উপরোক্ত আয়াত থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। লক্ষ্য করুন ইব্রাহীম (আঃ) এর ঘোষণা 'তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর' প্রথমে তিনি তাগুতের যারা পুজারী তাদের সাথে অতপর তাগুতের সাথে সম্পর্কচেছদের ঘোষণা দিয়েছেন।

এটা অসম্ভব যে কোন ঈমানদার তাগুতের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ, শত্রুতা-দুশমনি রাখবেনা, সম্পর্কচ্ছেদ করবে না এটা বোঝার পর যে সে আল্লাহর শত্রু, সে আল্লাহর বান্দাদের তার দাসত্বে নিয়োগ করেছে।

৫। অস্বীকার বা কুফরী করার মাধ্যমে

তাগূতকে অস্বীকার করা। তাগুতের যারা উপাসনা করে এবং নেতৃত্বের আসনে বসায় তাদেরকে অস্বীকার করা এবং যে ব্যক্তি কুফরী মতবাদের প্রবর্তন করে অথবা কুফরীর দিকে আহবান জানায় তাকে অস্বীকার করা।

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেনঃ "আদম সন্তানের ওপর আল্লাহ তাআ'লা সর্বপ্রথম যে ফরজটি চাপিয়ে দিয়েছেন তা হচ্ছে, তাগূতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।" এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

"আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে এ মর্মে রাসুল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আর তাগূত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকে।" *(নাহলঃ ৩৬)*

তাগুতকে অস্বীকার করার ধরণ বা প্রকৃতি হচ্ছে-

- গাইরুল্লাহর ইবাদত বাতিল বলে বিশ্বাস করা;
- গাইরুল্লাহর ইবাদত পরিহার করা;
- গাইরুল্লাহর ইবাদতকারীদেরকে অস্বীকার বা কুফরী করা; এবং
- তাদের বিরোধিতা করা;

তিনি আরো বলেনঃ তাগুতের সাথে কুফরী করা অর্থাৎ তাগুতকে অস্বীকার করা ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারবে না। এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে সেই সুদৃঢ় হাতল ধারণ করেছে।" *(আল বাক্বারাহ্ঃ ২৫৬) (মাজমুআতুত্ তাওহিদ আররিসালাতুল উলা ১৪-১৫পৃঃ)*

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেনঃ ভাই সব, আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি-

- আপনারা আপনাদের দ্বীনের মূলকে আঁকড়ে ধরুন, আঁকড়ে ধরুন অদ্যোপান্ত এবং আপদমস্তক;
- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য প্রদান করুন। এর অর্থ অনুধাবন করুন। এ কলেমাকে ভালবাসুন;
- ভালবাসুন এর ধারক ও বাহকদেরকে। তাদেরকে আপনারা আপনাদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নিন যদিও তারা আপনাদের কাছ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে;
- তাগুতগুলোকে আপনারা অস্বীকার করুন, তাদের বিরূদ্ধাচরণ করুন, তাদেরকে ঘৃণা করুন। ঘৃণা করুন ঐ সব লোকদেরকে, যারা তাদেরকে ভালবাসে, তাদের পক্ষে যারা তর্ক করে অথবা যারা তাদেরকে অস্বীকার করে না;
- অথবা একথা বলে যে, তাদের (তাগুত) ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই;
- অথবা একথা বলে যে, তাদেরকে কিছু বলা বা করার দায়িত্ব আল্লাহ আমাকে দেননি। একথা বললে অবশ্যই সে আল্লাহর প্রতি জঘণ্য মিথ্যা আরোপ করেছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা তার ওপর দায়িত্ব অর্পন করেছেন। তাদেরকে অস্বীকার করা আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। যদি তারা ভাই কিংবা সন্তানও হয় তবু তাদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে বলেছেন;

আল্লাহর ওয়াস্তে এ আদর্শকে আকড়ে ধরুন। আপনাদের রবের সাথে আপনাদের সাক্ষাৎ ঘটবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেন না। হে আল্লাহ, মুসলমান হিসেবে আমাদের মৃত্যুদান করুন এবং নেককার লোকদের সাথে আমাদেরকে মিলিয়ে দিন।

তাগুতের ইবাদতকারী কাফের, মুশরিকদের সাথে আচরণ নীতি

যারা আল্লাহর পাশাপাশি তাগুতের ইবাদত করে তারা মুশরিক এবং কাফের, তাদের বেলায় আল বারা (শত্রুতা, ঘৃনা, বিদ্বেষ) প্রযোজ্য। তাদের সাথে একজন ঈমানদারের আচরণ হবে নিম্নরূপ-

১। তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করা যাবে না

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেনঃ **"হে ঈমানদারগন! মু'মিনদের পরিবর্তে কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহন করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমান দিতে চাও?"** *(সূরা নিসা ৪ঃ১৪৪)*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেনঃ **"মু'মিনগন যেন মু'মিনগন ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহন না করে। যে কেউ এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে সতর্কতা অবলম্বন কর।"** *(সূরা আলে ইমরান ৩ঃ২৮)*

২। তাদের শাসন কর্তৃত্ব মেনে নেয়া যাবে না

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়াতা আলা) বলেনঃ

"আল্লাহ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের কোন পথ রাখবেন না।" *(নিসা ৪ঃ ১৪১)*
"আর তুমি কাফের এবং মুনাফিকদের কথা মানবে না" *(আল আহযাব ৩৩ঃ৪৮)*

"তিনি তাঁর রাসুলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন যেন একে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" *(সূরা সফ ৬১ঃ৯)*

৩। তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহন করা যাবে না, তাদের আনুগত্য করা যাবে না যদিও তারা পিতা কিংবা ভাই হয়

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা যালেম।" *(সূরা তাওবা ৯ঃ২৩)*

"যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরেক হয়ে যাবে।" *(সূরা আন'আম ৬ঃ১২১)*

"আপনি কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন ও আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন। আল্লাহ্ কার্যনির্বাহীরূপে যথেষ্ট।" *(আহযাব ৩৩ঃ৪৮)*

৪। তারা ত্বাগুত প্রত্যাখ্যান না করা পর্যন্ত তাদের নিকট থেকে কোন নুসরাহ (দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার ও রক্ষা করার জন্য বস্তুগত সমর্থন) চাওয়া যাবে না

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "আমি একজন মুশরিক এর কাছে কখনই সাহায্য চাইবো না" *(মুসলিম)*

তাদের থেকে নুসরাহ নেয়া যাবে না এ জন্য যে যাদের কাছে নুসরাহ চাওয়া হয় তাদের সাথে উইলিয়া (বন্ধুত্বের) সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, আর মু'মিনদের সাথে কাফেরদের কখনই বন্ধুত্ব হতে পারে না। নুসরাহ যে এক ধরনের উইলিয়া, যা এই আয়াতের মাধ্যেমে প্রমানিত-

"যেসব লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছে হিজরত করিয়াছে এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল উৎসর্গ করিয়াছে, আর যাহারা হিজরত কারিদের (নাসারু) আশ্রয় দিয়াছে এবং তাহাদের সাহায্য করিয়াছে, তাহারাই আসলে পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক।" *(আল-আনফালঃ ৭২)*

পুর্বেকার ও নিম্নলিখিত আয়াতের মত বহু আয়াতে দেখা যায় উইলিয়া (বন্ধুত্) মুমিনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আল্লাহ (সুবহানা ওয়াতাআলা) বলেন, **"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের (বন্ধুও পৃষ্ঠপোষক) হইতেছেন কেবলমাত্র আল্লাহ, তাহার রাসুল এবং সেইসব ঈমানদার লোক যারা সালাহ কায়েম করে, যাকাত দেয়, এবং আল্লাহর সম্মুখে অবনমিত হয়।"** *(আল মায়েদা ৫ঃ৫৫)* এবং **"হে ঈমানদারগন মুমিনদের কে ত্যাগ করিয়া কাফিরদের কে নিজেদের আউলিয়া (বন্ধুরুপে) গ্রহন করিও না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট সুস্পষ্ট প্রমান তুলিয়া দিতে চাও।?"** *(নিসাঃ ৪ঃ১৪৪)*। অন্যান্য বহু আয়াতে নুসরাহকে ঈমানদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, উদাহরণস্বরুপ, **"যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং নিজেদের ঘর বাড়িসমুহ আল্লাহর পথে ত্যাগ করিয়াছে (হিজরাহ) এবং চেষ্টা সাধনা করিয়াছে, আর যাহারা আশ্রয় দিয়াছে, সাহায্য করিয়াছে (নাসারূ) তাহারাই খাটি এবং প্রকৃত মুমিন"** *(আল-আনফাল ৮ঃ৬২)*। অসংখ্য হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, নবী (সঃ) বলেছেন তিনি সর্বপ্রথম ক্ষমতাবান আনসারদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন ।

৫। মুসলিমরা তাদের নারীদের বিয়ে করতে পারবে না

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেনঃ

"তোমরা মুশরিক মেয়েদেরকে কখনো বিয়ে করবে না, যতক্ষন না তারা ঈমান না আনিবে। বস্তুত একজন মু'মিন কৃতদাসী নারী, একজন মুশরিক শরীফজাদি নারী অপেক্ষাও উত্তম, যদিও সে তোমাদের মোহিত করে।" *(আল বাক্বারা ২ঃ ২২১)*।

৬। মুসলিম নারীদেরকেও তাদের সাথে বিয়ে দেওয়া যাবে না

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

"আর তোমাদের নিজেদের কন্যাদিগকেও মুশরিক পুরুষদের সহিত বিবাহ দিবে না, যতক্ষন না পর্যন্ত তারা ঈমান আনিবে। কেননা একজন ঈমানদার কৃতদাস একজন উচ্চবংশীয় মুশরিক অপেক্ষা অনেক ভাল, যদিও প্রথমত লোকটিকে তারা অধিক পছন্দ করিয়া থাকে। কেননা তাহারা তোমাদিগকে জাহান্নামের দিকে টানিয়া নেয়। আর আল্লাহ তাহার নিজের অনুমতিক্রমে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান জানান।" *(আল বাক্বারা ২ঃ ২২১)*

"দুঃশ্চরিত্রের স্ত্রীলোক দুঃশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য যোগ্য, এবং দুঃশ্চরিত্র পুরুষ লোক দুঃশ্চরিত্র স্ত্রী লোকদের জন্য যোগ্য। অনুরূপ ভাবে পবিত্র চরিত্রের স্ত্রী লোকদের জন্য পবিত্র পুরুষ যোগ্য, এবং পবিত্র চরিত্রের পুরুষদের জন্য পবিত্র স্ত্রীলোক যোগ্য।" *(আন নুর ২৪ঃ ২৬)*

৭। মুসলিমরা তাদের উত্তরাধিকারী হতে পারেনা, তারা মুসলিমদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না

উসামা বিন যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন, "একজন মুসলিম একজন কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না অথবা একজন কাফির একজন মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না।" *(বুখারী, মুসলিম)*

৮। মুসলিমরা মুশরিকদের জবাই করা গোশত খেতে পারে না

৯। মুসলিমরা তাদের পিছনে সলাত আদায় করতে পারে না

আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের উপর প্রত্যেক মুসলিমের পিছনে নামায আদায় বাধ্যতামুলক করা হয়েছে।" *(আবু দাউদ)*

১০। তারা মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া যাবে না

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, "একজন মুসলিমের প্রতি আরেক জন মুসলিমের ছয়টি কর্তব্য রয়েছে---- (একটি হচ্ছে) এবং যখন সে মারা যায় তার দাফন কার্য অনুসরণ করা।" *(মুসলিম)*

আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন, "একজন নেককার মুসলিমের প্রতি আরেক জন মুসলিমের ছয়টি কর্তব্য রয়েছে-----সে মারা গেলে সে তার দাফন ক্রিয়া অনুসরণ করবে।" *(তিরমিজি)*

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) মুনাফিকদের সর্ম্পকে বলেন, **"আর তাদের কোন লোক মারা গেলে তাদের জানাযা তুমি কখনও পড়বে না, তার কবরের পাশে কখনও দাড়াবে না। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অবিশ্বাস করেছে। আর তারা মরেছে এমন অবস্থায় যে তারা ফাসেক ছিল।"** *(আত তাওবা ৯ আয়াত ৮৪)*

১১। মুশরিকরা যখন মারা যায় তখন মুসলিমরা তাদের জন্য ক্ষমা চাইতে পারবেনা

"নবী ও ঈমানদারদের পক্ষে শোভা পায়না যে তাহারা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে, তাহারা তাহাদের আত্নীয়-স্বজনই হোক না কেন; যখন তাহাদের সামনে একথা উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহারা জাহান্নামে যাবারই উপযুক্ত।" *(আত তাওবা আয়াত ১১৩)*

১২। তাদের কে মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা যাবেনা

১৩। তারা মক্কায় হারাম শরীফে প্রবেশ করতে পারবে না

আল্লাহ (সুবাহানা ওয়া তায়ালা) বলেন, **"হে ঈমানদার ব্যক্তিগন মুশরিক লোকেরা নাপাক। অতএব এই বৎসরের পর যেন তারা মসজিদে হারামের পাশেও না আসতে পারে।"** *(আত তাওবা ৯ঃ ২৮)*

১৪। ভাতৃত্বের অধিকার ও কর্তব্য তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়

আল্লাহ (সুবাহানা ওয়া তায়ালা) বলেন, **"নিশ্চই শুধুমাত্র মুমিনরা পরস্পরের ভাই।"** *(আল হুজরাত ৪৯ঃ ১০)*

১৫। তাদের হত্যার জন্য কিসাস নিতে একজন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না

বর্ণিত আছে যে, আলী (রাঃ) বলেছেন, "সকল ঈমানদারদের রক্ত সমান, তাদের মধ্যে সবচেয়ে নীচতম ব্যক্তি তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে এবং তারা অন্যান্যদের বিরুদ্ধে এক হাত। একজন মুমিনকে একজন কাফিরের জন্য হত্যা

উচিত নয়, অথবা কেউ চুক্তিবদ্ধ থাকলে তার চুক্তি জারি থাকা পর্যন্ত তাকে হত্যা করা যাবে না।" *(আহমদ, আবু দাউদ, নাসাই ওয়াল হাকিমের গ্রেড সহীহ যেমন ইবনে হাজার আসকালানি, ---------আদিল্লাতুল আহকাম বর্ননা করেছেন), (কিতাবুল জিলাইয়াত নম্বর ৯৯৮)*

১৬। তাদের ইবাদতের সকল কর্ম বাতিল (অকার্যকর) বলে গন্য হবে

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেন, **"তোমার প্রতি এবং তোমার পুর্ববর্তীদের প্রতি এই অহী অবতীর্ণ হয়েছে যে, তুমি যদি শির্ক কর তাহলে তোমার সমস্ত আমল তো বরবাদ হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্তভুক্ত।"** *(যুমার ৩৯ঃ৬৫)*

১৭। তাদের ঐসব বৈঠকাদিতে যোগদান করা যাবে না যেখানে দ্বীন ইসলামের কোন বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করে

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেনঃ **"আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা' আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে।"** *(সূরা নিসা ৪ঃ১৪০)*

আল বারার (সম্পর্কচ্ছেদের) এসব বিধান আত্মীয় স্বজন এমনকি পরিবার এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আল্লাহ (সুবহানা ওয়া তায়ালা) বলেন, **"হে ইমানদার লোকেরা, নিজেদের পিতা ও ভাইকেও বন্ধুরূপে গ্রহন করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে বেশি ভালবাসে। তোমাদের যে লোকই তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহন করবে সে-ই যালেম হইবে।"** *(আত তাওবা ৯ আয়াত ২৩)*

"তোমরা কখনো আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী এমন লোকদের পাবে না যে তারা ভালবাসে আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে, তারা হউক না তাদের পিতা, পুত্র অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র, ইহারা সেই লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ থেকে একটি 'রুহ' দান করে তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের কে এমন সব জান্নাতে দাখিল করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্নাধারা প্রবাহিত হবে। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এরা আল্লাহর দল। জেনে রেখ আল্লাহর দলের লোকই কল্যান প্রাপ্ত হবে।" *(আল মুজাদালাহ ৫৮ঃ ২২)*

ত্বাগুত ও তার বন্ধুদের প্রত্যাখ্যান এবং ঈমানদারদের সাথে ওয়ালার (বন্ধুত্ব) মাধ্যেমেই কেবল উভয় জগতে বিজয় আসতে পারে। আল্লাহ (সুবহানা ওয়া তায়ালা) বলেন, **"আর যে ব্যক্তি বস্তুতই আল্লাহ, তাহার রাসুল এবং ঈমানদার লোকদিগকে নিজেদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানাবে তাদের জেনে রাখা দরকার যে আল্লাহর দলই জয়ী হবে।"** *(আল মায়েদা ৫ঃ ৫৬)*

"যাহারা সত্য অমান্যকারী তারা একে অপরকে সাহায্য করে। তোমরা (ঈমানদার লোকেরা) পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না এলে জমিনে ফিৎনা ও চরম বির্পযয় সৃষ্টি হবে।" *(আল আনফাল ৮ঃ ৭৩)*

"যাহারা ঈমান আনে, তাদের ওয়ালী হচ্ছেন আল্লাহ; তিনি তাদের কে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে ফিরিয়ে আনেন। আর যারা কুফরী করে তাদের ওয়ালী হচ্ছে 'ত্বাগুত' উহারা তাদের কে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরা জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" *(আল বাক্বারা ২ঃ ২৫৭)*

পক্ষান্তরে আল্লাহ বলেনঃ **"যারা তাগুতের ইবাদত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে-যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং এর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহন করে। উহাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহারাই বোধশক্তি সম্পন্ন।"** *(সূরা, যুমার ৩৯ঃ ১৭-১৮)*

তাওহীদের দ্বিতীয় রুকনঃ এক আল্লাহর প্রতি ঈমান

তাওহীদের দ্বিতীয় রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করা।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা হচেছ আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এবং তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী (আসমা ও সিফাত) এর ক্ষেত্রে একত্বকে স্বীকার করে নেয়া এবং এমন সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর একত্বকে মেনে নেয়া যা একমাত্র তাঁরই জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান তিনটি ভাগে বিভক্ত।

আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি ঈমান;
আল্লাহ তায়ালার আসমা ও সিফাত (নাম ও গুনাবলীর) প্রতি ঈমান;
আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়্যাতের প্রতি ঈমান;

আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি ঈমান

এর অর্থ হচেছ আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের সাথে খাস (বিশেষিত) আল্লাহর এমন যাবতীয় কর্মের প্রতি ঈমান পোষণ করা। যেমন: সৃষ্টি করা, রিযিক প্রদান, বিধান রচনা করা ইত্যাদি আল্লাহ তায়ালার কর্মের অন্তর্ভূক্ত। এ কাজগুলো আল্লাহর একক ক্ষমতার অধীন। তাই এ কাজগুলো এক আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। এ সব কাজে গাইরুল্লাহর অংশ গ্রহণকে অস্বীকার করতে হবে। এ সব কাজের বিন্দুমাত্র অংশও গাইরুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা যাবে না।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দিবেন। এরপর জীবিত করবেন। তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোনো একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।" *(আর-রূমঃ ৪০)*

আল্লাহ তায়ালার আসমা ও সিফাত (নাম ও গুনাবলীর) প্রতি ঈমান

এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ঐ সমস্ত নাম ও গুনাবলীর (আসমা ও সিফাত) প্রতি ঈমান আনয়ন করা যেগুলো আল্লাহ নিজেই নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রাসুল তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কোনো নাম ও গুণকে আকৃতি বিশিষ্ট বলা যাবেনা, নিরর্থক বা অকার্যকর বলা যাবে না, পরিবর্তন করা যাবে না, (সৃষ্টির) সমতুল্য বলা যাবে না।

আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়্যাতের প্রতি ঈমান

এর অর্থ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন "ইলাহ এবং মা'বুদ" (উপাস্য) একথা বিশ্বাস করা। দোয়া, রুকু, সেজদা, মানতসহ যাবতীয় ইবাদতের নিরঙ্কুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। যাবতীয় ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদন করতে হবে। ইবাদতের বিন্দুমাত্র অংশও গাইরুল্লাহর জন্য নিবেদিত করা যাবেনা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

"তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত করবে কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না।" *(সূরা নিসা ৪ঃ৩৬)*

তাওহীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল তাওহীদ আল-ইবাদাহ অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে এককত্ব বজায় রাখা। যেহেতু একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত প্রাপ্য এবং মানুষের ইবাদতের ফল হিসাবে একমাত্র তিনিই মঙ্গল মঞ্জুরী করতে পারেন, সেজন্য সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহকে উদ্দেশ্য করেই করতে হবে। অধিকন্তু, মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যে যে কোন ধরণের মধ্যস্থতাকারী অথবা যোগাযোগকারীর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ একমাত্র তাঁকে উদ্দেশ্য করেই ইবাদতের গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এটাই সকল পয়গম্বর কর্তৃক প্রচারিত বার্তার সারমর্ম। আল্লাহ বলেছেন-

"আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে।" *(সুরা আয-যারিয়াত ৫১ঃ ৫৬)*

"আল্লাহর ইবাদত করিবার ও তাগুতকে (মিথ্যা দেবদেবীকে) বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠাইয়াছি।" *(সুরা আন-নাহল ১৬ঃ ৩৬)*

মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারই ইবাদত করে সেই কি তাগুতের অন্তর্ভূক্ত?

আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া যার ইবাদত করা হয় তাকে বলে মাবুদ বা উপাস্য। এ ধরনের মাবূদ বা উপাস্যের সংখ্যা হচ্ছে চার। যথাঃ সানাম (মূর্তি), ওয়াসান (প্রতিমা), ইলাহ (আল্লাহ ছাড়া যাকে ইলাহ মনে করে ইবাদত করা হয়) এবং রব (আল্লাহ ছাড়া যাকে রব মনে করা হয়)।

এ চার উপাস্য যখন একত্রিত হয় তখন বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার যখন তারা আলাদা বা বিচ্ছিন্ন থাকে তখন অন্যদিক থেকে তাদের মধ্যে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। অতএব তারা যখন বিচ্ছিন্ন ভাবে আসে তখন তাদের "কারণ" পর্যালোচনা করলে একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে ঐক্য পাওয়া যায় আর তা হচ্ছে তারা সকলেই (আল্লাহ ছাড়া) উপাস্য। তারা যখন একত্রে আসে তখন তাদের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়। এ দৃষ্টিকোন থেকে তারা বিচ্ছিন্ন।

সানাম (মূর্তি)ঃ সানাম হচ্ছে ঐ সব খোদাই করা অচেতন পদার্থ, যা মানুষ কিংবা কোনো পশু বা অন্য কোনো কিছুর আকৃতিতে তৈরী করে (আল্লাহকে বাদ দিয়ে) উপাসনা করা হয়।

ওয়াছান (প্রতিমা)ঃ হচ্ছে ঐ সমস্ত বস্তু আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত করা হয়। চাই তা চেতন পর্দাথ হোক অথবা অচেতন পর্দাথ হোক, খোদাইকৃত হোক অথবা না হোক। যেমন গাছ, পাথর, কবর, মানব রচিত সংবিধান এবং এ সাদৃশ্যপূর্ণ যা কিছু আছে। এর প্রমাণ হচ্ছে রাসুল (সঃ) এর বাণীঃ "হে আল্লাহ তুমি আমার কবরকে এমন প্রতিমাতে পরিণত করো না যার ইবাদত করা হয়। সেই জাতির ওপর আল্লাহর গজব তীব্র হয়েছে যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে (অর্থাৎ কবর উপাসনালয় বানিয়েছে (মুত্তয়াত্তা মালেক) খোদাই করে নির্মিত মূর্তি "ওয়াসান " (আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয়) হতে পারে। কারণ যে সব স্থবির ও অচেতন পদার্থের উপাসনা করা হয় সবই "ওয়াসান" এর অন্তর্ভূক্ত। প্রত্যেক মূর্তি "ওয়াসান " কিন্তু প্রত্যেক "ওয়াসান " মূর্তি নাও হতে পারে। কেননা মূর্তি এবং অন্যান্য যে সব বস্তুকে আল্লাহ ব্যতীত ইবাদত করা হয় এর সবই ওয়াসানের অন্তর্ভূক্ত।

ইলাহঃ আল্লাহর উলুহিয়াতের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ইবাদত যারই উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় তাকেই 'ইলাহ' বলা হয়। চাই তা জ্যান্ত মানুষ হোক, অথবা খোদাই করা অথবা অখোদইকৃত কোনো অচেতন পদার্থ হোক। এর দলিল বা প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

"তারা বলে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদা সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক এবং নসরকে।" *(নূহঃ২৩)*

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ
قَالَ سُبْحَانَكَ

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا
وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

অনেকেই মনে করেন তাগুত হবে কেবল জীবন্ত ব্যক্তি যারা ইবাদত গ্রহন করে সন্তুষ্টচিত্তে এ ছাড়া মানুষ আর যাদের ইবাদত কওে, যেমন-গাছ, পাথর, তারকা ইত্যাদি তাগুত হবে না। এ ব্যাপারে শাইখ সোলাইমান বিন আবদুর রহমান (রহঃ) বলেনঃ "তাগুত বলা হয় এমন প্রত্যেক অস্তিত্ব সম্পন্ন বস্তুকে যার জন্য আল্লাহর কোন একটি ইবাদত সরাসরি নিবেদন করা হয়, এটা হচ্ছে বিবেক-বুদ্ধিহীন, চিন্তা ও মেধাহীন কোন বস্তুর ক্ষেত্রে, যেমন কবর-মাজার, গাছ-পাথর, মূর্তি, আগুন, গরু বা অন্য কোন পশু, ভাস্কর্য, গ্রহ-তারকা, শরীয়া বহির্ভূত কোন বিধান ইত্যাদি। অপরদিকে, বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা ও মেধা সম্পন্ন ব্যক্তি, যাকে সরাসরি ইবাদত করা হয় সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্ত বিদ্যমান রয়েছে। এরূপ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন একটি ইবাদত সরাসরি নিবেদন করা হয় এবং সে যদি এতে রাজী বা সন্তুষ্ট থাকে (তবেই সে তাগুত হবে)। এই শর্তটি বাধা দেয় ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) বা আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) কে তাগুত বলতে। কারণ ঈসা (আঃ) কখনও তার ইবাদত করার নির্দেশ দেননি বরং তিনি একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত নিবেদন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি শেষ বিচারের দিন তিনি তাদের পরিত্যাগ করবেন এবং তাদের সাথে শত্রুতা করবেন। *(দেখুন সূরা, মায়েদা-৫ঃ৭২-৭৮;১১৬-৭;আনফাল-৮ঃ৬)*। অনূরূপভাবে আলী (রাঃ) ও (শিয়াদের নিবেদিত ইবাদত) থেকে মুক্ত। *(আদ দালাইল ফি মো'য়ালাত আহলে আল ইশরাক)*

ইলাহ এবং রব থেকে ঐ সমস্ত আম্বিয়া কেরাম এবং পূর্ণ্যবান ব্যক্তিরা ব্যতিক্রম, আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ইবাদত করা হয়, কিন্তু তারা এ ইবাদতে রাজি ও সন্তুষ্ট নয়। আল্লাহকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির মধ্যে যাদেরই ইবাদত করা হয় তারা যদি এ ইবাদত সন্তুষ্ট না হন বা রাজী না হন তাহলে তারা তাগুত হওয়ার অন্যায় এবং গুনাহ থেকে রেহাই পেলেন। আক্বীদাগত দিক থেকে,

কথার দিক থেকে এবং আমলের দিক থেকেও তারা এ অন্যায় নিষ্কৃতি পেলেন। আল্লাহ্ ব্যতীত এসব মাবুদ বা উপাস্যগুলোর কথা যখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন অবশ্যই জেনে রাখা উচিৎ যে, সকল মূর্তিই তাগুত এবং সকল আওসান বা প্রতিমাও তাগুত। অতএব ঐসব সংবিধান এবং বিধি-বিধান আওসান নামক তাগুতের মধ্যে শামিল যেগুলো আল্লাহ তায়ালার বিধানের পরিপন্থী, এবং বিচার-ফয়সালার জন্য ও এগুলোর কাছে মানুষ যায়।

আল্লাহকে বাদ দিয়ে বা আল্লাহর পাশাপাশি মানুষ যাদেরকে আল্লাহর মর্যাদায় গ্রহন করে

১। *আরবাবঃ*

আরবাব শব্দটি রুবুবীয়াহ শব্দ থেকে এসেছে, রবের বহুবচন হচ্ছে আরবাব। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের একমাত্র রব। তিনি (১) মালিক ও প্রভু। (২) অভিভাবক, প্রতিপালনকারী, রক্ষণা-বেক্ষণকারী ও সংরক্ষণকারী। (৩) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, শাসনকর্তা, পরিচালক ও সংগঠক। এসকল বিষয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই করেন বা দিয়ে থাকেন সে হিসেবে তাঁর যে গুণবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত হয় তা'ই হল; রুবুবিয়্যাহ্। যেমন: সৃষ্টি করা, রিজিক দেওয়া, বিধান দেওয়া, সন্তান দেওয়া, জন্ম ও মৃত্যু দেওয়া, হালাল ও হারাম করা, গায়েব জানা সাহায্য করা ইত্যাদিই হল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রুবুবিয়্যা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রুবুবিয়্যার কোন অংশ যদি কেউ দাবী করে বা বলে যে, আমি রিজিক দেই, আমি হুকুম দেই, জীবন ও মৃত্যু দেই, আমি গায়েব জানি বা আমি আইন বিধানদাতা কিংবা দাবী না করেও যদি কেউ তার কর্মের মাধ্যমে এসব জিনিস সম্পাদন করতে পারে বলে ইঙ্গিত দেয়, তাহলে সে মিথ্যা রুবুবিয়্যাহ দাবী করল, তাকে একজন আরবাব হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। আর তার এ দাবী যদি কেউ মেনে নেয় তাহলে তাকে ঐ ব্যক্তি আরবাব হিসেবে গ্রহন করল। মূলকথা, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একমাত্র রব, তাঁর কাজগুলো অন্যেরাও করতে পারে বা দিতে পারে এই বিশ্বাসে যাদের কাছে যাওয়া বা চাওয়া হয় অথবা এসবের অংশ যাদেরকে দেওয়া হয় তাদেরকেই আরবাব বলে। আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন আল-কুরআনে বলেনঃ

اتَّخَذُوا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

অর্থাৎ: **"তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পন্ডিত ও দরবেশগণকে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।"** *(সূরা তওবাঃ৩১)*

আদী বিন হাতিম (তিনি তখনো মুসলিম হননি) জিজ্ঞেস করলেন: হে মুহাম্মাদ! (সঃ) তারা তো পন্ডিত ও দরবেশগণের ইবাদত কওে না, তাহলে তাদেরকে কিভাবে রব গ্রহণ করা হলো? মুহাম্মাদ (সঃ) বললেন: 'পন্ডিত ও দরবেশগণ আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম এবং যা হারাম করেছেন তা হালাল করে আল্লাহর আইন পরিবর্তন কওে না? এবং জনগন কি তা অন্ধভাবে মানেনা? আদী বিন হতিম উত্তর দিলেন; জি হ্যাঁ মানে, তখন মুহাম্মাদ (সঃ) বললেন; ইহাই হলো তাদের ইবাদত করা'। *(ইবনে কাসীর)*। মুহাম্মাদ (সঃ) এর উম্মতের মধ্যে যারা আলেম তারা হলেন ওয়ারাসাতুল-আম্বিয়া। তাদের মর্যাদা অনেক, যা আল-কুরআনের বহু আয়াত ও রাসূলের (সঃ) অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমরা তাদের থেকে সঠিক ইল্‌ম হাসিলের মাধ্যমে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদাত্ করে তারই সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করি। কিন্তু যদি তারা আমাদেরকে ভুল ইল্‌ম শিক্ষা দেয় আর আমরা অন্ধভাবে গ্রহণ করি এবং তাদেও আনুগত্য করি তাহলে কি আমরা তাদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করলাম না? রবের আসনে তাদের বসা হলো না? আজও দুনিয়ায় ভুল শিক্ষাদাতা এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী নামধারী আলেম ও তাদের ভুল রায় গ্রহণকারী একদল লোক বিদ্যমান। এ শির্কের ভয়াল গ্রাস থেকে বাঁচার জন্য বিচক্ষণতার সাথে হুশিয়ার থাকতে হবে। অন্যদিকে যারা মানবরচিত সংবিধানের মাধ্যমে আল্লাহর হারাম করা জিনিসগুলোকে হালাল করছে, যেমন- সুদ, মদ ইত্যাদি আল্লাহ হারাম করেছেন, আর সংবিধানের মাধ্যমে এগুলোকে বৈধ বা হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। আর মানুষ তাদেরকে মেনে নিয়ে আল্লাহর পাশাপাশি আরবাব হিসেবে গ্রহন করছে। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا۟ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ اشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

অর্থাৎ **"তুমি বল, হে আহলে কিতাবগণ! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ যেন কাউকে আল্লাহ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে লয় তবে বল তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম।"** *(সূরা আলে ইমরানঃ ৬৪)*। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেনঃ

وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا۟ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ

অর্থাৎ **"ফিরিশতাগণকে ও নবীগণকে রব রূপে গ্রহণ করতে তিনি তোমাদেরকে নিদের্শ দিতে পারেন না। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নিদের্শ দিবেন?"** *(সূরা আলে ইমরানঃ ৮০)*

লক্ষ্য করার বিষয় যে, সব ক'টি আয়াতেই আরবাব শব্দটি গুরুত্ব সহকারে এসেছে। এ'দ্বারা এ কথাই প্রমানিত হয় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে রব হিসেবে গ্রহণ করতে হলে, বর্জন করতে হবে সকল আরবাবকে। একটি গ্লাসে যদি বিষ থাকে সে গ্লাস দ্বারা পানি পান করতে হলে যেভাবে প্রথমে গ্লাসটি যথাযথ ভাবে পরিষ্কার করে তারপর পানি পান করতে হয়; তা'নাহলে বিষ থেকে পরিপূর্ণ আত্মরক্ষা করা যায় না, ঠিক তেমনিভাবে নিজের জবান, মন, মগজ ও কর্ম থেকে আরবাব সমূহকে পরিপূর্ণ বের না করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রুবুবিয়া তথায় প্রবেশ করে না। তাইতো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ

অর্থাৎ **"তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত না করে।"** *(সূরা ইউসুফ: ১০৬)*

২। *আলিহাঃ*

ইলাহ্ শব্দের বহুবচন 'আলিহা'। রব এবং ইলাহর মধ্যে পার্থক্য হল, আল্লাহ রব হিসেবে তাঁর বান্দার হক বা কাজগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার থেকে তাঁর সৃষ্টির দিকে আসে। ইলাহ্‌র ব্যাপারটা হল বান্দার কাছ থেকে অর্থাৎ সৃষ্টির থেকে স্রষ্টার দিকে ইবাদাত হিসেবে যায়। এক ইলাহ্‌র স্থলে অন্যান্য ইলাহ সাব্যস্ত করার ফলে উলুহিয়্যায় সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে রুবুবিয়্যার ধারণা অনেকটা সঠিক থাকলেও উলুহিয়্যা অর্থাৎ ইবাদাত করার ব্যাপারে সমস্যাটি প্রকট। কেউ কেউ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে রব হিসেবে মানলেও ইবাদাত করার ক্ষেত্রে অন্যান্যকে শরীক করে ফেলে। এর কারণ সে মনে করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া অন্যরাও তার প্রয়োজনে, বিপদাপদে এবং মানসিক অশান্তির সময় তাকে সাহায্য করতে পারে। সে ঐসমস্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে তার চেয়ে উন্নততর মনে করে উলুহিয়্যার কিছু অংশ তাদেরকে দিয়ে দেয়। অনেকে জানেও না যে এতে শির্ক হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বর্তমান সমাজের অনেক ব্যক্তিই মাযারে গিয়ে মান্নত করে, মৃত ব্যক্তির কাছে সন্তান ইত্যাদি চাওয়ার মত শির্কে লিপ্ত হয়। জাহেলিয়াত যুগের মুশরিক আরবরাসহ প্রাচীন জাতিসমূহের এসব ধারণা খণ্ডন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا

অর্থাৎ **"তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব ইলাহ এজন্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা (ইলাহরা), তাদের শক্তির কারণ হতে পারে।"** *(সূরা মারইয়াম: ৮১)*

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ

অর্থাৎ **"তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব ইলাহ এজন্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।"** *(সূরা ইয়াসীন: ৭৪)*

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আলিহা শব্দ দুটো শক্তির কারণ এবং সাহায্যকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন প্রকারের শক্তি ছাড়া কাউকে সাহায্য করা যায় না। মক্কার মুশরিকরা মুর্তিগুলোকে সৃষ্টিকর্তার কাছে সুপারিশকারী হিসেবে মনে করতো। অথচ তারা স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকে মানতো। রুবুবিয়্যার ব্যাপারে অনেকেরই ধারণা থাকলেও সকল সমস্যা দেখা যায় উলুহিয়্যার ব্যাপারে। সুরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াত অনুযায়ী বিধান দেওয়ার মালিক শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় ঈমানের দাবীদার বেশকিছু লোকেরাও জেনে অথবা না জেনে অহরহ মানুষের দেওয়া কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী বিধান মেনে চলছে। এমনকি তারা কতিপয় পীর, অলী, বুজুর্গ, গাউস, কুতুব, দরবেশদাবীদার, এমন কি কবর, মাজার, গাছ-পাথরকে তাদের ভয়, মানত, সেজদা সহ অনেক ইবাদত নিবেদন করে আলিহা রূপে গ্রহন করছে।

মানুষ তার নফসকেও ইলাহরূপে গ্রহন করতে পারে। কারণ মানুষকে গোমরাহ করার মত যত জিনিস আছে তার মধ্যে মানুষের নফসই হচ্ছে তার সর্বপ্রধান পথভ্রষ্টকারী শক্তি। যে ব্যক্তি নিজের খাহেশাতের দাসত্ব করবে, আল্লাহ্‌র বান্দাহ হওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কারণ যে কাজে টাকা পাওয়া যাবে, যে কাজ করলে সুনাম ও সম্মান হবে, যে জিনিসে অধিক স্বাদ ও আনন্দ লাভ করা যাবে, কেবল সে কাজই করতে সে প্রাণ-পণ চেষ্টা করবে। সেসব কাজ করতে যদি আল্লাহ্ নিষেধও করে থাকেন, তবুও সে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। আর এসব জিনিস যেসব কাজে পাওয়া যাবে না সেসব কাজ করতে সে কখনও প্রস্তুত হবে না। আল্লাহ্ তাআলা যদি সেই কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবুও সে তার কিছুমাত্র পরোয়া করবে না। এমতাবস্থায় একথা পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে, সে আল্লাহ্ তাআলাকে তার ইলাহ রূপে স্বীকার করেনি বরং তার নফসকেই সে তার একমাত্র ইলাহের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। কাজেই এমন ব্যক্তি কোন প্রকারে আল্লাহ্‌র হেদায়াত লাভ করতে পারে না। কুরআন শরীফে একথা অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে।

"(হে নবী!) যে ব্যক্তি নিজের নফসের খাহেশাতকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, তুমি কি তার সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? তুমি কি এ ধরনের মানুষের পাহারাদারী করতে পার? তুমি কি মনে কর যে, এদের মধ্যে অনেক লোকই (তোমার দাওয়াত) শোনে এবং বুঝে? কখনও নয়। এরা তো একেবারে জন্তু-জানোয়াররের মত বরং তা অপেক্ষাও এরা নিকৃষ্ট।" *(আল-ফুরকান ৪৩-৪৪)*

যে ব্যক্তি নফসের দাস, সে যে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট তাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না। কোন পশুকে আপনারা নির্ধারিত সীমালংঘন করতে দেখবেন না। প্রত্যেক পশু সেই জিনিসই আহার করে এবং ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্য খায় যে পরিমাণ আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু এই মানুষ এমনই এক শ্রেণীর পশু যে, সে যখন নফসের দাস হয়ে যায়, তখন সে এমন সব কাজ করে যা দেখে শয়তানও ভয় পেয়ে যায়। মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার এটাই প্রথম কারণ।

৩। আনদাদঃ

আনদাদ অর্থ সমকক্ষ অথবা আরো সুনির্দিষ্টভাবে এমন কোনকিছু যাতে আল্লাহর সমকক্ষ বানান হয়েছে। এটা যে কোন আকারে হতে পাবে যেমন সম্পদ, পরিবার, সমাজ, নেতৃত্ব ও অন্যান্য। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহর কাছ থেকে একটি আদেশ এলো এবং আপনি আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আদেশ মানার পরিবর্তে আপনার পিতার, মাতার, দেশের, সমাজের অথবা নেতার আদেশ মানলেন এক্ষেত্রে আপনি আল্লাহর সাথে একজন বা একটি আনদাদ বানালেন কারণ আপনি অন্য কোনকিছু অনুসরণ করতে আল্লাহর আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কোনকিছুকে ভালবাসা স্বাভাবিক কিন্তু আপনি যদি এই জিনিসকে আল্লাহর জন্য আপনার যে ভালবাসা তার সমান অথবা তার চেয়ে বেশী ভালবাসেন তাহলে এটা এমন শরীক হয়ে যায় যা আপনি আল্লাহকে বাদ দিয়ে ইবাদত করেন। সব জিনিসের প্রতি আমাদের ভালবাসা অবশ্যই আল্লাহও আল্লাহর রাসূলের প্রতি আমাদের ভালবাসার পরে আসতে হবে। শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আমাদের সবরকম আনদাদ প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আরও বলেনঃ

"আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর আনদাদ (সমকক্ষ) সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুন বেশী। আর কতইনা উত্তম হত যদি এ যালেমরা পার্থিব কোন কোন আজাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্দি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহর আজাবই সবচেয়ে কঠিনতর।" *(সূরা বাক্বারা ২ঃ১৬৫৪)*

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) কুরআনে বলেনঃ

"হে নবী বলে দাও যে,ঃ যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীরা এবং তোমাদের আত্মীয়-স্বজন তোমাদের সেই ধন-মাল যাহা তোমরা উপার্জন করেছ, সেই ব্যবসায় যার মন্দা হওয়াকে তোমরা ভয় কর, আর তোমাদের সেই ঘর যাকে তোমরা খুবই পছন্দ কর-তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা করা অপেক্ষা প্রিয় হয়, তা হলে তোমরা অপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন। আর আল্লাহ তো ফাসেক লোকদের কখনই হেদায়াত করেন না।" *(সূরা ৯ আত-তাওবাহ, আয়াত ২৪)*

সবকিছুর প্রতি আমাদের ভালবাসা অবশ্যই আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এবং তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি আমাদের ভালবাসার পরে আসতে হবে। এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য সব ধরনের আনদাদ ত্যাগ করতে হবে।

*৪। ত্মাগুতঃ **(পূর্বে আলোচিত হয়েছে)***

তাওহীদের শত্রুতা

যুগ, জাতি, নবী রাসূল অনেককিছু পাল্টালেও তাদের এই শত্রুতার ধরণ কখনোই পাল্টায়নি। আর একারণেই আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

"তোমার সম্বন্ধে তো তাই বলা হয় যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণ সম্পর্কে।" *(সূরা ফুস্সিলাত ৪১ঃ ৪৩)*

এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তারা তাকে বলেছে, 'তুমি তো এক যাদুকর না হয় উন্মাদ'। তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রনাই দিয়েছে (বংশানুক্রমে শিখিয়েছে)? বস্তুত তারা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।"** *(সূরা যারিয়াত ৫১ঃ ৫২-৫৩)*

তাদের এই শত্রুতার রয়েছে নানারূপঃ

অন্তরের অস্বীকৃতি (তাক্বছিব); আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ **"নিশ্চয় তোমার পূর্বে অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল; কিন্তু তারা ধৈর্যধারণ করেন.. .. ।"** *(সূরা আন'আম ৬ঃ ৩৪)*

ঠাট্টা (সুখ্‌রিয়াহ) এবং বিদ্রুপ (ইসতিহ্‌জা) করা; আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"যারা অপরাধী তারা তো মু'মিনদেরকে উপহাস করত ।"** *(সূরা মুতাফ্‌ফিফীন ৮৩ঃ ২৯)*
এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেনঃ **"পরিতাপ বান্দাদের জন্য; তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে বিদ্রুপ করেছে ।"** *(সূরা ইয়াসীন ৩৬ঃ ৩০)*

মু'মিনদেরকে পাগল (জুনুন) বলে অপবাদ দেয়া; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"তারা বলে, 'ওহে যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ ।"** *(সূরা হিজ্‌র ১৫ঃ ৬)*

মু'মিনদের কর্তৃত্ব (হুক্‌ম) ও ক্ষমতালোভী (রিয়াসাহ) হিসেবে অভিযুক্ত করা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"তারা বলতে লাগলোঃ তুমি কি আমাদের নিকট এইজন্য এসেছ যে, আমাদেরকে সরিয়ে দাও সেই তরিকা থেকে, যাতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি, আর পৃথিবীতে তোমাদের দুইজনের আধিপত্য স্থাপিত হয়ে যায় ।"** *(সূরা ইউনুস ১০ঃ ৭৮)*

মু'মিনদের ধর্মত্যাগ ও বিশৃঙ্খলা (ফাসাদ) সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত করা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"ফিরাউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালকের স্মরণাপন্ন হোক । আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ।"** *(সূরা মু'মিন ৪০ঃ ২৬)*

মু'মিনদের দারিদ্র ও অসহায়ত্বের সুযোগে গালমন্দ করা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"তারা বললঃ আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব অথচ নিচু শ্রেনীর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে ।"** *(সূরা শূরা ৪২ঃ ১১১)*

তারা এটি করত যাতে অন্য মানুষেরা মু'মিনদের কাছে না ভেড়েঃ **"... কাফিররা মু'মিনদের বলেঃ দু'দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসেবে কোনটি উত্তম ।"** *(সূরা মারইয়াম ১৯ঃ ৭৩)*

মু'মিনরা অভিশপ্ত এবং মু'মিনদের কারণে তাদের উপর গযব আসবে এমন অভিযোগঃ **"তারা বললঃ আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি এবং যদি তোমরা বিরত না হও তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব;.. .."** *(সূরা ইয়াসীন ৩৬ঃ ১৮)*

সত্য প্রত্যাখ্যান এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা যুক্তি প্রদর্শন; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"... কিন্তু কাফিররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতন্ডা করে, এর দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেই সমস্তকে তারা বিদ্রুপের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহন করে থাকে ।"** *(সূরা কাহ্‌ফ ১৮ঃ ৫৬)*

এগুলোর মাঝে লুকিয়ে ছিল তাদের বিভ্রান্তিসমূহ যা দ্বারা তারা আল্লাহর পথে বাঁধা সৃষ্টি করত ।

- সাধারণ মানুষকে মু'মিনদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ "তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী প্রধানরা বললঃ **"তোমরা যদি শুআ'ইবকে অনুসরণ কর তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্থ হবে' ।"** *(সূরা আ'রাফ ৭ঃ ৯০)*
  তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"ফিরাউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালকের স্মরণাপন্ন হোক । আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ।"** *(সূরা মু'মিন ৪০ঃ ২৬)*

- মু'মিনরা মুষ্টিমেয় হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ জনগণের উপর তাদের মতবাদ চাঁপিয়ে দিচ্ছে এমন অভিযোগ উত্থাপন । এর উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ **"এরপর ফিরাউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠালো এই বলেঃ 'ইহারা তো ক্ষুদ্র একটি দল । ইহারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে এবং আমরা তো সকলেই সদা শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সদা সতর্ক' ।"** *(সূরা শু'আরা ২৬ঃ ৫৩-৫৬)*

- তারা দাবী করে যে, সত্য দ্বীনের ব্যাপারে তাদের অবস্থান মু'মিনদের চেয়ে উত্তম । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"ফিরাউন বললঃ আমি যা বুঝি, আমি তোমাদেরকে তাই বলছি । আমি তোমাদেরকে কেবল সৎপথই দেখিয়ে থাকি ।"** *(সূরা মু'মিন ৪০ঃ ২৯)*
  তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"তারা বললঃ নিশ্চয়ই এরা দুইজন যাদুকর, তারা চায় তাদেও যাদু দিয়ে তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থা ধ্বংস করতে ।"** *(সূরা ত্বাহা ২০ঃ ৬৩)*

তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"তাদের কাছে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল আসত তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত ।"** *(সূরা মু'মিন ৪০ঃ ৮৩)*
নানাবিধ চক্রান্ত ও পরিকল্পনা করে সাধারণ মানুষকে মু'মিনদের অনুসরণ থেকে বিরত রাখা । আল্লাহ (সুব) বলেনঃ **"যাদেরকে দুর্বল বলা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবেঃ 'প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি । যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলায় শৃঙ্খল পরাব । তাদেরকে তারা যা করত তারই প্রতিফল দেয়া হবে ।"** *(সূরা সাবা ৩৪ঃ ৩৩)*

- মু'মিনদেরকে সুবিধাবঞ্চিত করে দ্বীন থেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"তারা বলেঃ আল্লাহর রাসুলের সহচরদের জন্য ব্যয় কর না যতক্ষন না তারা তার থেকে সরে পড়ে । আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধনভান্ডার তো আল্লাহরই কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝেনা ।"** *(সূরা মুনাফিকূন ৬৩ঃ ৭)*

- মু'মিনদেরকে নানাবিধ সমস্যায় ফেলে দ্বীন থেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"তারা চায় তুমি নমনীয় হও; তাহলে তারাও নমনীয় হবে ।"** *(সূরা কালাম ৬৮ঃ ৯)*
  তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"...তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও যাতে আল্লাহ যা প্রতি নাযিল করেছেন তা থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে ।"** *(সূরা মা'য়িদা ৫ঃ ৪৯)*
  কাফিররা কখনো মু'মিনদের এমন আহবান করেনা যাতে তারা সত্য থেকে কিছু সরে আসে । কিছু সময়ের জন্য এমনটি চাইলেও, তাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আসেনা যতক্ষণ না মু'মিনগণ সত্য থেকে পুরোপুরি সরে আসে । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা তোমার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষন না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর ।"** *(সূরা বাকারা ২ঃ ১২০)*
- মু'মিনরা যদি তাদের দ্বীন থেকে না সরে অথবা কাফিরদের সাহায্য সহযোগীতা না করে তবে তাদেরকে জেল ও মৃত্যুদন্ডের ভয় দেখানো । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"কাফিররা তাদের রাসূলগণকে বলেছিলঃ আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদেও দেশ থেকে বহিষ্কৃত করব ।"** *(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪ঃ ১৩)*
  আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ **"তারা যদি তোমাদের ব্যাপারে জানতে পারে তাহলে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনোই সফলকাম হবে না ।"** (সূরা কাহ্‌ফ ১৮ঃ ২০)

- মু'মিনদের উপর অত্যাচার, হত্যা এবং সংঘাত চাঁপিয়ে দেয়া । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"তারা বললঃ তাকে পুড়িয়ে দাও; সাহায্য কর তোমাদের দেবতাদেরকে.. .. ।"** *(সূরা আম্বিয়া ২১ঃ ৬৮)*

  তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"আর স্মরণ কর যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যে, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা নির্বাসিত করবে... "** *(সূরা আন্‌ফাল ৮ঃ ৩০)*

  তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয় ।"** *(সূরা বাকারা ২ঃ ২১৭)*

তাই মু'মিন ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, কাফিদের শত্রুতা ও বিরোধিতার কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে যা কখনো বদলাবে না । তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ "তারা কি এক অপরকে এই মন্ত্রনাই দিয়েছে (বংশানুক্রমে শিখিয়েছে)? বস্তুত তারা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় ।" *(সূরা যারিয়াত ৫১ঃ ৫৩)*

আর সবচেয়ে বড় কথা হলো মু'মিনদের ঈমানের কারণেই কাফিররা মু'মিনদের সাথে যুদ্ধ করে এবং শত্রুতা পোষণ করে । তিনি (সুবঃ) বলেনঃ **"তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এই কারণে যে তারা বিশ্বাস করত পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহতে- আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যার সর্বময় কর্তৃত্ব; আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বদ্রষ্টা ।"** *(সূরা আল বুরুজ ৮৫ঃ ৮-৯)*

এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"তারা এটাই কামনা করে যে, তারা যেমন কুফরী করেছে তোমরা সেরকম কুফরী কর; যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও ।"** *(সূরা নিসা ৪ঃ ৮৯)*

সুতরাং অবিশ্বাসীগণ মু'মিনগণকে শত্রু হিসেবে নেয় তাদের ঈমানের জন্য । একজন মুমিনের ঈমান যত বৃদ্ধি পায় তাঁর প্রতি কাফিরদের শত্রুতা ততই বৃদ্ধি পায় । এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ **"সবচাইতে বেশী পরীক্ষিত মানুষ হলেন নবীগণ, এরপর তাদের নিকটবর্তী (ঈমানের স্তরভেদে), তারপর তাদের নিকটবর্তী (ঈমানের স্তরভেদে) । মানুষ তার ঈমান অনুযায়ী পরীক্ষিত হবে.. .. .. ।"** *(আত তিরমিযী; সহীহ্)*

আর এটি বান্দা নিজেও বুঝতে পারে যে, তার ঈমান বৃদ্ধির সাথে সাথে তার প্রতি কাফির ও ফাসিকদের শত্রুতাও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং সে তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে নিষেধ করে, এতে শত্রুতা আরো বৃদ্ধি পায়। আর তার ঈমান যত হ্রাস পায় তাদের শত্রুতাও ততই হ্রাস পায়।

তবে মু'মিনরা যতদিন ঈমানের উপর থাকবে তাদের প্রতি কাফিরদের শত্রুতা ততদিন পর্যন্ত শেষ হবে না; যদিও এতে কিছু থাকে তবুও। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা তোমার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষন না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর।"** *(সূরা বাকারা ২ঃ ১২০)*

তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়।"** *(সূরা বাকারা ২ঃ ২১৭)*

لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ'র দাবী

لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ'র দাবী বলতে এই কালেমার প্রতি ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় দাবী ও করণীয় হুকুম আহকাম পালন করা এবং ঈমানের বিপরীত যাবতীয় বিশ্বাস ও কর্ম বর্জন করাকে বুঝায়। কিন্তু দুঃখজক হলেও সত্য যে, বর্তমান মুসলিম সমাজ এ কালেমার দাবী সমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ। আমাদের সমাজ বংশ পরম্পরায় মুসলিম দাবীদার বলে ইসলামকে সম্যকরূপে বুঝে নিতে আমদের অনেকাংশেই ব্যর্থতা রয়েছে। অথচ ইসলাম এমন কিছু নয় যে তা সম্পত্তির মত উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যাবে। আমরা যদি ইসলামের মূল ভিত্তি কালেমা لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ'র দাবী সমূহ সম্পর্কে না জানি তবে আমরা নিজেদের জন্য ব্যর্থতাই ডেকে আনব। আসুন আমরা জেনে নেই এ কালেমার অত্যাবশ্যকীয় দাবীসমূহ সম্পর্কে-

যাবতীয় ইবাদত স্রেফ আল্লাহর জন্য খালেস করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেনঃ

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ

"তোমার রবের চুড়ান্ত ফায়সালা যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে------।" *(সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ঃ২৩)*

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء

"আর তাদেরকে ইহা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করবে।" *(সূরা বাইয়্যেনাহ ৯৮ঃ৫)*

"আল্লাহর ইবাদত কর, দ্বীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য খালেস করে। সাবধান খালেস দ্বীন তো স্রেফ আল্লাহরই প্রাপ্য।" *(সূরা যূমার ৩৯ঃ২)*

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে মানবজতি! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদত কর যিনি তোমাদরেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্ট করেছেন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও। যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার।" *(সূরা বাক্বারা ২ঃ২১)*

যাবতীয় শির্ক এবং ত্বাগুতকে বর্জন করা

উক্ত আহ্বানই ছিল সমস্ত নবী-রাসুলদের আহ্বান। আর এটাই কালেমার চুড়ান্ত দাবী। শির্ক এবং ত্বাগুতকে বর্জন করতে না পারলে ঈমানের দাবী কোন অবস্থাতেই আদায় হবে না বরং কালেমা পাঠকারীকে মুশরিক এবং কাফের হিসেবে বেঁচে থাকতে হবে, যার পরিণাম হিসেবে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যেতে হবে। সমস্ত নবী-রাসূলদের আহ্বান সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

"আমি প্রত্যেক উম্মাতের কাছেই এ মর্মে রাসুল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাগুত থেকে দূরে থাকবে ।" *(নাহলঃ ৩৬)*

শিরক থেকে সতর্ক করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই ওহী হয়েছে তুমি তুমি আল্লাহর সাথে শরীক্ করলে তোমার আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্য তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থ ।" *(সূরা-যুমার-৩৯ঃ৬৫)*

শিরক মুক্তভাবে আল্লাহর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক্ করবে না ।" *(সূরা, নিসা-৪ঃ৩৬)*

শিরক্ করলে জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিতঃ

اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

"তোমরা আমার রব এবং তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর। কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম ।" *(সূরা, মায়েদা-৫ঃ৭২)*

আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশকে সকল কিছুর উর্দ্ধে অগ্রাধিকার দেয়া

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রনী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ ।" *(সূরা হুজরাত ৪৯ঃ১)*

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

"বলুনঃ আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর।" *(সূরা নূর ২৪ঃ৫৪)*

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

"কোন মু'মিন ও মু'মিন নারীর এ অধিকার নেই যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা করে দেন, সে বিষয়ে নিজেদের কোন ইখতিয়ার পেশ করবে, কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয় ।" *(সূরা আহযাব ৩৩ঃ৩৬)*

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে ।" *(সূরা নিসা ৪ঃ৬৫)*

অতএব আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশকে সকল কিছুর উর্দ্ধে স্থান দেয়া এ কালেমার দাবী, কেউ যদি এ দাবী পূরণ না করে তবে কস্মিনকালেও সে মুসলিম হতে পারবে না ।

কোন ব্যক্তি বিশেষ বা দলের অন্ধ অনুসরণ না করা

বিনা দলীলে (কোরআন ও সুন্নাহর বাইরে) কারো কোন কথা মানাকে অন্ধ অনুসরণ বলে। আল্লাহর নির্দেশ-

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

"তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য আউলিয়াদের অনুসরণ করো না।" *(সূরা আরাফ ৭ঃ৩)*

কোরআন সুন্নাহর বাইরে কারো কথা মানা বা অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের চাইতে তাকে বেশী প্রাধান্য দেয়া, যা সুস্পষ্ট কুফরী। এরূপ ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না।

কালিমার দাবীর বিপরীত অবস্থানকারীর সাথে কোনরূপ সম্পর্ক না রাখা

কালেমার স্বাক্ষ্যদানকারী মুসলিম কখনো কোন কাফির-মুশরিকের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে পারবে না। কারণ যারা কাফের- মুশরিক তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের শত্রু। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রু কখনো কোন ঈমানদারের বন্ধু হতে পার না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাা বলেনঃ

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"যারা আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে।" *(সূরা মুজাদালা ৫৮ঃ২২)*

এ ব্যাপারে উত্তম উদাহরণ হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা উল্লেখ করেনঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

"তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেনঃ আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।" *(সূরা মুমতাহিনা ৬০ঃ৪)*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেনঃ **"হে ঈমানদারগন! মু'মিনদের পরিবর্তে কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহন করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমান দিতে চাও?"** *(সূরা নিসা ৪ঃ১৪৪)*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেনঃ **"মু'মিনগন যেন মু'মিনগন ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহন না করে। যে কেউ এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে সতর্কতা অবলম্বন কর।"** *(সূরা আলে ইমরান ৩ঃ২৮)*

আল্লাহ্ (সুবঃ) ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর মহব্বত

১) আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেনঃ **"হে নবী আপনি বলেনঃ যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাসতে চাও তবে আমার অনুসরণ কর। তবেই আল্লাহ্ (সুবঃ) তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ্ (সুবঃ) অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"** *(সূরা আলি-ইমরান ৩ঃ ৩১)*

নবী (সঃ) বলেনঃ **"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষ হতে বেশি ভালবাসার পাত্র হই।"** *(সহীহ বুখারী)*

২) এ আয়াত আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে, আল্লাহ্র (সুবঃ) মহব্বত একমাত্র নবী (সঃ) যা নিয়ে এসেছেন তার আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে। তিনি যা হুকুম করেছেন তা মান্য করার মধ্যেই। যা করতে নিষেধ করেছেন তা ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে। যা আমরা সহীহ হাদীসের মধ্যে পাই যা তিনি মানুষের জন্য ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। মুখের কথার দ্বারা কখনই মহব্বত হতে পারে না, তাঁর কথার উপর আমল করা ব্যতীত এবং তাঁর হুকুম পালন ব্যতীত ও তাঁর সুন্নাত মত নিজেকে গড়া ব্যতীত।

৩) সহীহ হাদীস আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, মুসলমানের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ না নবী (সঃ)-কে ভালবাসে নিজের ছেলে, বাপ ও মানুষের প্রতি ভালবাসার থেকে বেশি। এমনকি তাঁকে নিজের জীবনের থেকে বেশি ভালবাসবে। যেভাবে অন্য হাদীসে এসেছে। সত্যই তাঁকে নিজের জীবনের থেকে বেশি হচ্ছে কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন নবী (সঃ)-এর হুকুমের ও নিষেধের বিরুদ্ধে নিজের নফসের খায়েশকে কুরবানী করা হয়; নিজের স্ত্রী, সন্তান ও চারিপার্শ্বের মানুষদের থেকে যদি বেশি ভালবাসা হয়, যদি সে সত্যিকারের নবীর আশেক হয় তবে সে তাঁর হুকুম আহকামকে অগ্রাধিকার দেয় এবং নিজের প্রবৃত্তি ও পরিবারের ভালবাসার বিরোধিতা করে এবং চারিপার্শ্বের অন্যদেরও। যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে রাসূল (সঃ)-এর বিরোধিতা করে, নিজের খায়েশ ও শয়তানের আনুগত্য করে।

৪) যদি কোন মুসলমানকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কি নবীকে ভালবাসো? সাথে সাথে বলবে, হ্যাঁ, তার জন্য আমার জান ও মাল কুরবান হোক। তখন যদি বলা হয় তাহলে দাড়ি কাট এবং তাঁর হুকুমের বাহিরে চল, আর তার সাথে কেন তোমার বাহ্যিক রূপকে মিলাও না, চরিত্রকে মিলাও না, এমন কি তাঁর একত্ববাদের সাথে নিজেকে মিলাও না। তখন সে তোমাকে উত্তর দিবেঃ 'ভালবাসা অন্তরের মধ্যে এবং আমার অন্তর পবিত্র, আল-হামদুলিল্লাহ'। আমরা তাকে বলিঃ 'যদি তোমার দিল সাফ থাকে তবে অবশ্যই তা তোমার শরীরে প্রকাশ পাবে।' কারণ নবী (সঃ) বলেনঃ

"ওহে শরীরের ভিতরে এমন একটা অঙ্গ আছে যদি তা ঠিক হয়ে যায় তবে পুরা শরীরই ঠিক হয়ে যায়। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, পুরা শরীরই নষ্ট হয়ে যায়, আর তা হল কলব বা অন্তর।" *(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)*

৫) লেখক বলছেনঃ একবার আমি এক মুসলমান ডাক্তারের চেম্বার প্রবেশ করলাম। তখন দেখলাম তার দেয়ালে পুরুষ ও মেয়েদের ছবি ঝুলানো। তখন তাকে বললাম, নবী (সঃ) ছবি ঝুলাতে নিষেধ করেছেন। তখন সে এই বলে আমাকে অস্বীকার করল যে, এরা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথীরা। এটা জেনেও যে তারা বেশির ভাগই কাফের। বিশেষ করে ঐ মেয়েরা যারা চুলকে খোলা রেখেছেন এবং তাদের সৌন্দর্যকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছে এবং তারা কম্যুনিস্ট দেশের। এই ডাক্তার দাড়ি কাটা। তখন তাকে উপদেশ দিয়ে বললাম, এতে গুনাহ হবে। তখন সে বললঃ মৃত্যু পর্যন্তও আমি দাড়ি রাখব না। কিন্তু বড়ই অবাক হওয়ার বিষয় এই যে, এ ডাক্তার যিনি নবী (সঃ)-এর শিক্ষার বিপরীত চলেছেন। তিনি নবী (সঃ)-এর প্রতি তার মিথ্যা ভালবাসার দাবি করেন এবং আমাকে বলেনঃ বল হে আল্লাহ্ রাসূল, আমি আপনার সীমার মধ্যে। মনে মনে বললামঃ তুমি নবী (সঃ)-এর হুকুম অমান্য কর এবং তারপর তাঁর সীমার মধ্যে প্রবেশ কর। নবী (সঃ) কি এই জাতীয় শির্কে খুশী হন?

৬) নবী (সঃ)-এর প্রতি ভালবাসা শুধু তাঁর মিলাদ পড়ার মধ্যে না এবং নাত পড়ার মধ্যে না যাতে অনেক ধর্মবিরোধী কথা থাকে এবং অন্যান্য বেদ'আত থাকে যার কোন হুকুম নাই। ভালবাসার প্রমাণ হল তার হেদায়াত মত চলা এবং সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং তাঁর শিক্ষা জীবনের সর্বঅংশে ফুটিয়ে তোলার মধ্যে।

আল ওয়ালা ওয়াল বারা

(আল্লাহর জন্যই ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃনা করা)

আল ওয়ালা (ভালবাসা, সাহায্য করা, রক্ষা করা, অনুসরণ করা ইত্যাদি) এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কথা, কাজ ও ঈমানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা যা আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করে এবং ঐ সমস্ত মানুষদের সাথে একমত হওয়া যাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন। 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা' এমন একটি বিশ্বাস যা মুসলমানদের সকল কাজ ও কথাকে পরিচালিত করে এবং এটার অনুশীলন ও বাস্তবায়নের উপর মু'মিনদের মর্যাদার স্তরের তারতম্য ঘটে। এই বিশ্বাস মুসলিমদের মনমানসিকতার ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থহীন হবে যা তার সমস্ত কার্যে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে কাফেরদের সাথে সমস্ত রকমের সাহায্য

সহযোগীতা প্রদর্শন নিষধ করেছেন। এটা তাদের সাথে স্পষ্ট ভালবাসা ও করুনার সম্পর্ককে অথবা আত্মীয়তার পরিচিতির কারণে তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগীতার সম্পর্ককে মজবুত বা শক্তিশালী করে। মু'মিনরা আল্লাহ্‌র শত্রুদের বন্ধু হতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও তার শত্রুদের ভালবাসাকে একত্রিত করা একজন মানুষের পক্ষে অসম্ভব কারণ এটা হচ্ছে বিপরীত দুই বস্তু অথবা ব্যাপারের সমন্বয় সাধন; সেজন্য যে আল্লাহ্‌কে ভালবাসে, সে অবশ্যই তাঁর (আল্লাহ্) শত্রুদের ঘৃণা করবে। কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতা করা, সাহায্য করা এবং মু'মিনদের ত্যাগ করা মুসলিমদের জন্য হারাম। ঈমান ও কুফরের যে কোন ব্যাপারে কোন সাহায্য সহযোগীতা অথবা সম্বন্ধ নাই।

শরীয়তের পরিভাষায় 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র সংজ্ঞা

'আল ওয়ালা' (অর্থাৎ ভালবাসা, সমর্থন করা, সাহায্য করা, অনুসরণ)ঃ এর শরীয়ী অর্থ হচ্ছে, যে শুধু আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে ভালবেসে কথা, কাজ ও বিশ্বাসে সম্পূর্ণ একমত হয়। *'আল বারা'* (অর্থাৎ ঘৃণা করা, ত্যাগ করা, দূরে থাকা ইত্যাদি)ঃ হচ্ছে 'আল-ওয়ালা'র সম্পূর্ণ বিপরীত এবং ঐ সমস্ত সব কিছুর সাথে বিরোধিতা করা, ভিন্নমত পোষণ করা যা আল্লাহ্ ঘৃণা করেন এবং দোষারোপ করেন। 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র বিশ্বাসের ক্ষেত্রে চারটি বিষয় জড়িত, যথাঃ কথা, কাজ, বিশ্বাস এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বগণ। কিছু জিনিস যা আল্লাহ্‌কে (সুবঃ) সন্তুষ্ট করে সেগুলো হচ্ছে- আল্লাহ্‌র স্মরণ (যিকির), আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা, আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস করা।" *(আল-ক্বাওয়ায়িদুন-নূরানিয়্যাহ আল-ফিক্বিয়াহ)* এবং মু'মিনদের ভালবাসা। গীবত, যিনা, শির্ক এবং কুফর হচ্ছে এমন কতগুলো জিনিস যা আল্লাহ্ (সুবঃ) ঘৃণা করেন এবং এগুলো মু'মিনদেরও অবশ্যই ঘৃণা করতে হবে।

আল ওয়ালা ওয়াল বারা ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় অংশ

'ওয়ালা'র উৎস হচ্ছে ভালবাসা এবং 'বারা'র উৎস ঘৃণা; অন্তর এবং কাজ এই দুটি দ্বারাই এটি বাস্তবে পরিণত হয়। 'ওয়ালা' অন্তরঙ্গতায়, উদ্বিগ্নতায় এবং সাহায্যের দিকে উৎসাহিত করে। 'বারা' বাধা, প্রতিবন্ধকতা, শত্রুতা এবং অস্বীকারকে ইন্ধন যোগায়। 'ওয়ালা' এবং 'বারা' দুটোই ঈমানের ঘোষণার সাথে জড়িত এবং এর আবশ্যকীয় মূল সূত্রগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে। কুরআন এবং হাদীস থেকে এর প্রমাণ লক্ষনীয় যা নিম্নোক্ত কিছু আয়াতে উল্লেখ করা হলোঃ

"মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন।" *(সূরা আলি 'ইমরান ৩ঃ ২৮)*

এবং তিনি বলেনঃ **"বল, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদর অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বল, আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখো, আল্লাহ্ তো কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না।"** *(সূরা আলি 'ইমরান ৩ঃ৩১-৩২)*

আল্লাহ্ তাঁর শত্রুদের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে বলেনঃ **"তারা এটাই কামনা করে যে, তারা যেরূপ কুফরী করেছে তোমরাও সেইরূপ কুফরী কর, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। তাই তোমরা তাদের মধ্যে থেকে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে।"** *(সূরা নিসা ৪ঃ ৮৯)*

এবং তিনি আরও বলেনঃ **"হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"** *(সূরা মা'য়িদা ৫ঃ ৫১)*

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ঈমানদার ব্যতীত অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না; যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা হলো, যদি তোমরা অনুধাবন কর। দেখ, তোমরাই তাদেরকে ভালবাস কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না অথচ তোমরা সমস্ত কিতাবে ঈমান রাখ আর তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করি; কিন্তু তারা যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দাঁতে কাটতে থাকে। বল, 'তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর'। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। তোমাদের মঙ্গল হলে তারা তাদেরকে কষ্ট দেয় আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা এতে আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।" *(সূরা আলি 'ইমরান ৩ঃ ১১৮-১২০)*

আমরা এই বিষয়ে অনেকগুলো হাদীসের মধ্যে অল্প কয়েকটি হাদীস এবং সাহাবীদের আলোচনা উল্লেখ করবো যেমনঃ

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'মুহাম্মাদ (সঃ) তাদেরকে, প্রত্যেক মুসলমানকে পরামর্শ দেয়ার এবং প্রত্যেক কাফেরকে পরিহার করার শপথ করাতেন।' *(মুসনাদ ইমাম আহমদ -৪/৩৫৭-৮)*

আল-বাররা বিন আজিব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী (সঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধন।' *(আহমাদ)*

ইবনে শায়বা বলেন যে মুহাম্মাদ (সঃ) বলেছেনঃ "ঈমানের দৃঢ়তম বন্ধন হলো শুধুমাত্র তাঁরই জন্য ভালবাসা এবং তাঁরই জন্য শত্রুতা।" *(তাবারানী, আল কবির, ইবনে শায়বা এটা ইবনে মাসউদ থেকে মারফু রূপে বর্ণনা করেছেন এবং এটা হাসান রূপে আখ্যায়িত করেছেন)*

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ "ঈমানের দৃঢ়তম বন্ধন হচ্ছে আল্লাহ্‌র জন্য আনুগত্য এবং তাঁর জন্য বিরোধিতা, আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা এবং তাঁর জন্য শত্রুতা।" *(আত তাবারানী, আল কাবির। সুয়ূতী (রহঃ) এটা তাঁর আল জামি আস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং আলবানি এটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন)*

ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরো বলেছেন, "যে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসে এবং আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করে, এবং যে আল্লাহ্‌র জন্য বন্ধুত্ব নষ্ট করে অথবা তার জন্য শত্রুতা ঘোষণা করে, সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিরাপত্তা পাবে। এটা ছাড়া কেউ প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পাবে না, যদিও তার সওম ও সালাত অনেক হয়। মানুষ দুনিয়াবী বিষয়ে সম্পর্ক গড়ে তোলে, যা তাদেরকে কোন উপকারই করতে পারবে না।" *(ইবনে রজব আল হাম্বালী, জামি আল উলূমওয়াল হাকিম, পৃঃ৩০)*

শাঈখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল ওহ্হাব ইবনে আব্বাস কর্তৃক– 'আল্লাহ্‌র জন্য বন্ধুত্ব নষ্ট করা' এই কথাটির ব্যাখ্যায় বলেন যে, এটি আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসার ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক গড়ে তোলায় আবশ্যকতা নির্দেশ করে, এটাই আল্লাহ্‌র জন্য বন্ধুত্ব। এটা আরও নির্দেশ করে যে, সাধারণ আবেগ বা অনুভূতি এখানে যথেষ্ট নয়; এখানে যা বুঝানো হয়েছে তা হচ্ছে ভালবাসা মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা সাহায্য, সম্মান এবং ভক্তির অপরিহার্যতা নির্দেশ করে। এটার অর্থ তাদের সাথে থাকা যাদেরকে সে কথায় ও কাজে ভালবাসে। 'আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতা' এটি আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতার আবশ্যকতা নির্দেশ করে যা আল্লাহ্‌র জন্য বিরোধিতা। এটা কাজের মাধ্যমে তাদের সাথে বিরোধিতা ঘোষণা করা, তাঁর (আল্লাহ্‌র) শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা, তাদেরকে পরিত্যাগ করা এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের থেকে দূরে থাকা। এটা প্রমাণ করে যে, সাধারণ বিরোধিতা যথেষ্ট নয় এবং এটা তোমার প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন, কারণ আল্লাহ্ বলেনঃ

"তোমাদের জন্য ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে ঈমান আন।" *(সূরা মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪)*

এই সব হলো আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছার যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌কে ভালবাসা এবং তাঁর দ্বীনের সাহায্যে এগিয়ে আসা; তাদেরকে ভালবাসা যারা তাঁর (আল্লাহ্‌র) প্রতি আনুগত্যপরায়ণ এবং তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। আল্লাহ্‌র জন্য বিরোধিতা হচ্ছে আল্লাহ্‌র শত্রুদের ব্যাপারে ক্রোধান্বিত হওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, এই কারণে আল্লাহ্ প্রথম দলটিকে 'আল্লাহ্‌র দল' এবং দ্বিতীয় দলটিকে 'শয়তানের দল' বলেছেনঃ

"যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করে তাগুত তাদের অভিভাবক, এরা তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।" *(সূরা বাকারা ২ঃ ২৫৭)*

এবং আল্লাহ্ বলেনঃ **"যারা মু'মিন তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কাফির তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।"** *(সূরা নিসা ৪ঃ ৭৬)*

এটা সুবিদিত যে, যখনই আল্লাহ্ তাঁর উদ্দেশ্য সাধনার্থে কোন নবী প্রেরণ করেছেন, তখনই তাদের (নবীদের) বিরুদ্ধাচরণকারীদেরও তিনি (আল্লাহ্) প্রস্তুত করেছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ **"এইভাবেই আমি মানুষ ও জ্বিনের মধ্যে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে। যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা এসব করতো না; সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন কর।"** *(সূরা আন'আম ৬ঃ ১১২)*

হতে পারে যে, এই সমস্ত ঐশী বাক্যের বিরুদ্ধাচরণকারীরা অহীর কিছু অংশ আয়ত্ত করেছে এবং সাথে কিছু প্রমানাদিও আছে। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ **"তাদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল আসতেন তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত তাই তাদেরকে বেষ্টন করবে।"** *(সূরা মু'মিন ৪০ঃ ৮৩)*

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ্‌র দ্বীন শিক্ষা করা আবশ্যকীয় যা তার জন্য একটি মারণাস্ত্র হিসাবে শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সাহায্য করবে। এটাতে তার কোন ভয় ও আশংকা থাকবে না, যেহেতু শয়তানের কৌশল সব সময় দুর্বল। আল্লাহ্ বলেনঃ **"অবশ্যই আমার বাহিনীই বিজয়ী।"** *(সূরা সাফ্‌ফাত ৩৭ঃ ১৭৩)*

আল্লাহ্‌র সাহায্যকারীদের বিজয় হতে পারে কথাবার্তায়, বিতর্কে, তেমনি যুদ্ধ ও শত্রুতায়। এইভাবে এক ইলাহর দল থেকে একজন সাধারণ মানুষও কাফেরদের হাজারও জ্ঞানীদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে *(কাশফ আশ-সুবুহাত, আব্দুল ওহ্‌হাব, তৃতীয় সংস্করণ-পৃঃ ২০)*

বর্তমান সময়ে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পরিষ্কার যে, আনুগত্য হচ্ছে কালেমার (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) দাবী। যেহেতু এটা হচ্ছে কালেমার প্রকৃত অর্থেও অপরিহার্য অংশ। যেমন ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন, "ঈমানের ঘোষণা- 'নাই কোন ইলাহ, ইবাদত যোগ্য আল্লাহ্ ছাড়া'- এর দাবী হচ্ছে তুমি শুধু আল্লাহ্‌র জন্য কাউকে ভালবাসবে, কাউকে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করবে, নিজেরা বন্ধুত্ব করবে আল্লাহ্‌র জন্য, কারও সাথে শত্রুতা ঘোষণা করবে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য; এর দাবী হচ্ছে তুমি ভালবাসবে যা আল্লাহ্ ভালবাসেন, তুমি ঘৃণা করবে যা আল্লাহ্ ঘৃণা করেন" *(ইবনে তাইমিয়্যাহ, আল-ইহ্‌তিজাল ফিল ক্বদর, পৃঃ ৬২)*

আল ওয়ালা ওয়াল বারা'য় বিশ্বাসের মর্যাদা

ইসলামী আক্বীদায় 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা'য় বিশ্বাস একটি উচ্চ মর্যাদা দখল করে আছে। এটি নিম্নলিখিত কারণগুলো হতে বুঝা যেতে পারেঃ

- একটি অংশ যেমনঃ "কোন ইলাহ নেই" যা হলো "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই"-এর অংশ। যাতে বুঝায়ঃ আল্লাহ ছাড়া যে সবকিছুর ইবাদত করা হয় সে সব হতে মুক্ত এবং নিরাপদ থাকা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ **"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রাসূল পাঠিয়েছি, এই নির্দেশ প্রচারের জন্য যে, তোমরা কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক...।"** *(সূরা নাহ্‌ল ১৬ঃ ৩৬)*

- 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা' অন্যতম প্রধান আক্বীদা যা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ়তম বন্ধন। আল-বাররা বিন আজিব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী (সঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধন।' *(আহমাদ)*

- এটা হচ্ছে এমন একটা ভিত্তি যেটার দ্বারা অন্তর ঈমানের সৌন্দর্য্য এবং পরম আশ্বস্ততা অনুভব করে। নবী (সঃ) বলেনঃ "যারই নিম্ন লিখিত তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের মাধুর্য লাভ করবেঃ (১) তার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অন্য যেকোন কিছুর তুলনায় অধিক প্রিয় হবে। (২) যে একজনকে ভালবাসে এবং তাকে ভালবাসে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। (৩) এবং সে কুফরীতে ফেরত যাওয়াকে এমনভাবে ঘৃণা করে যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে।" *(সহীহ্ বুখারী, মুসলিম)*

- এটা হচ্ছে বুনিয়াদ যেটার উপর মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্ত সম্বন্ধ এবং আদান-প্রদান নির্ভর করে, যেমন মুহাম্মাদ (সঃ) বলেনঃ "তোমাদের ঈমান নাই যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার ভাই (মুসলিম) এর জন্য পছন্দ করে।" *(বুখারী)*

  এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেনঃ **"মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই ছাড়া আর কিছু নয়; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।"** *(সূরা হুজুরাত ৪৯ঃ ১০)*

- তাদের জন্য অনেক বড় ও অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে যাদের বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা যখন কাউকে ভালবাসে শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসে। নবী (সঃ) স্পষ্টভাবে বলেছেনঃ "যারা আমাকে ভালবাসে তারা কিয়ামতের দিন একটি নূরের মিম্বরের উপর দাড়াবে।" তিনি (সঃ) আরও বলেনঃ "সাত প্রকারের লোক যাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌র জন্য একে অন্যকে ভালবাসত, তারা আল্লাহ্‌র জন্য মিলিত হত এবং আল্লাহ্‌র জন্য বিচ্ছিন্ন হত।"

- এটা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন বা সম্পর্ক যা মানুষের মধ্যে পরস্পর বন্ধন তৈরী করে। আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে সব ধরনের বন্ধনের উপর প্রাধান্য দিয়ে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেনঃ **"বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।"** *(সূরা তওবা ৯ঃ ২৪)*

- এই 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা' আক্বীদা হচ্ছে আল্লাহ্‌র 'ওয়ালাহ (আত্মরক্ষা, ক্ষমতা, কতৃত্ব, রাজত্ব) পাবার একটি মাধ্যম। ইবনে জারীর ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেনঃ "যে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসে এবং আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করে যে

আল্লাহ্র জন্য 'মুয়ালাত' (সাহায্য করা, সমর্থন করা) করে এবং আল্লাহ্র জন্য শত্রুতা পোষণ করে, সে আল্লাহ্র 'ওয়ালায়াহ' অর্জন করবে।"

- আল ওয়ালা ওয়াল বা'রার সম্পর্ক কেয়ামতের দিনেও থাকবে যা আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা আমাদের পূর্বেই জানিয়েছেনঃ **"যারা অনুসৃত হয়েছে- তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।"** *(সূরা বাকারা ২ঃ ১৬৬)*

- যে আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীন ছাড়া অন্য কিছুকে ভালবাসে এবং তাকে (আল্লাহ্), তার দ্বীনকে অথবা তার অনুসারীদের ঘৃণা করে, সে নিশ্চিত কাফের। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ **"হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।"** তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা' হচ্ছে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এর পূর্ণতার জন্য এটি প্রয়োজনীয়। একটি হাদীসে রয়েছেঃ "যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করে আল্লাহ্র জন্য দান করে এবং আল্লাহ্র জন্য (দান করা হতে) বিরত থাকে, ঐ ব্যক্তি তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে।" *(আহমাদ ও তিরমিযী, হাসান হাদীস)*

'আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র দাবী সমূহ

কোন মুসলিম যে ঈমানের দাবী করে তাকে এই আখ্যার (আল ওয়ালা) উপযুক্ত হওয়ার জন্য অবশ্যই এর শর্ত ও দাবীসমূহ পূরণ করতে হবে, নিঃসন্দেহে 'আল ওয়ালা' (ইসলাম ও মুসলিমকে ভালবাসা, সমর্থন করা, সাহায্য করা, অনুসরণ করা, রক্ষা করা ইত্যাদি) এবং 'আল বারা' (কুফর এবং কাফেরদের অবজ্ঞা করা, পরিত্যাগ করা, প্রকাশ্য বর্জন, দোষারোপ করা, তাদের থেকে নিরুৎসাহী ও নিরাপদ থাকা ইত্যাদি) দাবীসমূহ পূরণ একজন মুসলিমের দ্বীনের সাথে লেগে থাকার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

ইসলাম ও মুসলিমের প্রতি 'আল ওয়ালা'র দাবীসমূহঃ

- দ্বীন রক্ষার্থে অমুসলিম ভূমি থেকে মুসলিম ভূমিতে হিজরত করা, শুধুমাত্র যারা দুর্বল ও অত্যাচারিত এবং যারা ভৌগলিক ও সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে হিজরত করতে পারে না তারা ছাড়া।

- দ্বীন এবং দুনিয়ার যে কোন বিষয়ে, যে কোন মুসলিম সম্প্রদায়কে সমর্থন ও সাহায্য করা, যা কিনা আমাদের কথার মাধ্যমে হোক, অন্তর দিয়ে হোক বা সম্পদের মাধ্যমে হোক। আল্লাহ্ বলেনঃ **"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু----- ।"** *(সূরা আনফাল ৮ঃ ৭২)*

- অন্যান্য মুসলিম ভাইদের আনন্দে এবং দুর্দশার সময়ের সাথী হওয়া। নবী (সঃ) বলেনঃ "পারস্পরিক ভালবাসার দিক দিয়ে মু'মিনদের দৃষ্টান্ত একটি মানব দেহের মত, যদি তার চক্ষু পীড়িত হয় তখন মাথা অসুস্থ হয় তাহলে সমগ্র শরীরই অসুস্থ হয়ে পড়ে।" *(সহীহ্ মুসলিম)*

  মুসলিমদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকা এবং তাদের খবরা-খবর মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

- একজন মুসলিম তার ভাইয়ের ভাল কিছু অর্জন করা এবং খারাপ কিছু থেকে বিরত হওয়া অবশ্যই পছন্দ করবে, যেভাবে সে এগুলো নিজের জন্য পছন্দ করে। নবী (সঃ) বলেনঃ "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(সহীহ্ মুসলিম)*

- অন্যান্য মুসলিমদের গালি দেওয়া, ঠাট্টা করা এবং গীবত করা থেকে বিরত থাকা, আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে মুসলিমদের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ **"হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি খারাপ। যারা তওবা না করে তারাই যালিম। হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভায়ের গোশত খেতে চাইবে। বস্তুত তোমরা তো তা ঘৃণা কর। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।"** *(সূরা হুজুরাত ৪৯ঃ ১১-১২)*

- মুসলিম জামা'আ-র সাথে একতায় থাকা এবং দলাদলি, ভাগাভাগি, মতদ্বৈততা পরিহার করা যেমন আল্লাহ্ হুকুম করেছেনঃ **"তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎ পথ পেতে পার।"** *(সূরা আলি 'ইমরান ৩ঃ ১০৩)*

  রাসূল (সাঃ) বলেনঃ "যে মুসলিম জামা'আ থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যাওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করবে।" *(সহীহ্ মুসলিম)*

'আল বারা' -এর দাবীসমূহঃ

মু'মিন হওয়ার জন্য একজন মুসলিমের ইসলাম ও মুসলিমের প্রতি শুধুমাত্র আল ওয়ালা'র দাবীসমূহ সঠিকভাবে পূরণ করা যথেষ্ট নয়, তাকে কুফর ও কাফেরদের প্রতি 'আল বারা'র দাবীসমূহও আন্তরিকতার সাথে পূরণ করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ দাবীসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

- কুফর, শির্ক এবং তৎসংলগ্ন লোকদের ঘৃণা করা; তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করা যেমন আল্লাহ্র কালামে বর্ণিত হয়েছেঃ **"তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা এক আল্লাহ্তে ঈমান আন---- ।"** *(সূরা মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪)*

- কাফেরদেরকে আউলিয়া (মদদদানকারী, সাহায্যকারী ইত্যাদি) হিসাবে গ্রহণ না করা এবং তাদের সাথে স্নেহ, ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে না তোলা কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা হুকুম করেনঃ **"হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ, অথচ তারা, তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্তে বিশ্বাস কর------ ।"** *(সূরা মুমতাহিনা ৬০ঃ ১)*

- তাদের (কাফের) ভূমি থেকে হিজরত করা এবং বিশেষ কারণ ছাড়া তাদের ভুমিতে ভ্রমন করা। সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যে কেউ মুসলিমদের মধ্যে থেকে মুশরিকদের সাথে সাক্ষাত করে, তাদের মাঝে বাস করে থাকে এবং তাদের জীবনযাত্রাকে সমর্থন করে সেও (মুসলিম) তাদের মধ্যে একজন (অর্থাৎ মুশরিক)।" *(আবু দাউদ)*

- কাফেরদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং জীবন ব্যবস্থাকে অনুসরণ না করা। যেমনঃ নবী (সঃ) হতে বর্ণিত আছেঃ "যে কেউ অন্য কোন (জাতীর) লোকের অনুসরণ করে, সে তাদের মধ্যে একজন।" নবী (সঃ) আরও বলেনঃ "আমাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ইহুদী এবং খৃষ্টানরা তাদের চুলে খিজাব লাগায় না, অতএব তারা যা করে তোমরা তার বিপরীত কর।" *(সহীহ্ বুখারী)*

- তাদের সঙ্গ এবং বন্ধুত্ব ত্যাগ করা যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ **"যারা সীমালংঘন করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড় না, তাহলে অগ্নি তোমদিগকে স্পর্শ করবে। এই অবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্য করা হবে না।"** *(সূরা হূদ ১১ঃ ১১৩)*

  বিশেষ করে তাদের সাথে যারা ইসলামকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে।

- কাফেরদের সাথে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার এবং সম্মানের খাতিরে দ্বীনের মধ্যে কোন আপোষ-মিমাংসা করা হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ **"তারা (কাফির) চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তা হলে তারাও নমনীয় হবে।" (সূরা কালাম ৬৮ঃ ৯)**। অধিকন্তু, একত্ববাদীরা কাফেরদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করবে না, যেমন আল্লাহ্ হুকুম করেছেনঃ **"আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামী।"** *(সূরা তওবা ৯ঃ ১১৩)*

এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, কাফেরদের সাথে আমাদের 'আল বারা' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে শত্রুতা রয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, মুসলিমরা তাদের প্রতি ন্যায়বান হবে না এবং ঐ সমস্ত কাফেরদের আক্রমন করবে যারা সীমালংঘনকারী নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায় এবং বদান্যতার হুকুম করেনঃ **"দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে**

বহিষ্কার করে নাই তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।" *(সূরা মুমতাহিনা ৬০ঃ ৮)*

স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের জানিয়ে দিয়েছেন, কাফেরদের সাথে দয়া দেখাতে ও ন্যায় আচরণ করতে কিন্তু তাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে অথবা তাদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করার জন্য বলেন নি।

অবশেষে, আমাদেরকে তাদের মধ্যে থেকে হতে হবে যাদের আল্লাহ্ প্রশংসা করেছেনঃ

"তুমি পাবে না আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারিদেরকে– হউক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের আত্মীয়-স্বজন। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ দ্বারা। তিনি তাদেরকে দাখিল করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় তারা স্থায়ী হবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারা আল্লাহ্র দল। জেনে রেখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে।" *(সূরা মুজাদালা ৫৮ঃ ২২)*

সূত্র সমূহঃ *(তাহফীমুল কুরআন; সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, ফী যিলালিল কুরআন; সাইয়েদ কুতুব, ইসলামে 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা; মুহাম্মাদ আল ক্বাহতানী)*

কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন প্রমাণ করে এমন ২০টি নিদর্শন

১. কাফিরদের উপর সন্তুষ্ট থাকা

কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতার প্রথম ধরণটি হল কাফিরদের উপর সন্তুষ্ট থাকা বা তাদের কুফরি কর্মে রাজি-খুশি থাকা–এমনকি তাদের স্বীকৃত কুফরি কর্মকে প্রত্যাখানের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া বা সন্দেহ পোষণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। সহজ কথায়, কাফিরদের কুফরি কর্মকান্ডের যে কোন বিষয়ের স্বীকৃতি-ই কুফরি হিসেবে গণ্য হবে। এটি খুবই স্পষ্ট যে, কাফিরদের যে সাহায্য-সহযোগিতা করে, তাদের সঙ্গে চলাফেরা- উঠাবসা করে সে তো তাদেরই একজন। এ বিষয়ে আলেমদের সর্বসম্মত মত হল, যে কাফিরদের কিংবা তাদের কুফরী কর্মকান্ডকে ভালবাসে সে-ও কাফির। কেননা, হৃদয়ের ভালবাসা এবং ঘৃণা এমন দুটি জিনিস যা নিখাঁদ বা খাঁটি হলে স্বীয় বিশ্বাস-চিন্তা-চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়ে এদিক সেদিক যেতে পারে না। এ অর্থে কাফিররা স্বভাবতঃই কুফরি ভালবাসবে এবং ঈমানদারগণ ঈমান ভালবাসবেন। আল্লাহ্ (সুব) বলেন:**"যদি তারা আল্লাহ্, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস রাখত, তবে তারা কখনোই তাদেরকে (কাফিরদের) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করত না (রক্ষাকারী এবং সাহায্যকারী হিসেবে), কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসিক (বিদ্রোহী, আল্লাহ্র অবাধ্য)"।** (৫: ৮১)

২. কাফিরদের উপর নির্ভরতা

কোন ধরণের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার জন্য কিংবা নিরাপত্তার খাতিরে কাফিরদের উপর নির্ভর করাও কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতার পরিচয় বহন করে । এটি কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতার দ্বিতীয় নির্দশন।

আল্লাহ্ (সুব) এই বলে এ সম্পর্কে নিষেধ করেনঃ **"মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন।** (৩:২৮)

এবং **"হে মুমিনগণ ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না"।** (৫ : ৫১)

ইবনে তাইমিয়া তার বর্ণনায় হুবহু অনুরূপ বাক্যগুলির উল্লেখ করে অতিরিক্ত আরেকটি আয়াতের উল্লেখ করেছেন : **"যদি তারা আল্লাহ্ , নবী এবং তাঁর প্রতি যা অবতীর্ন হয়েছে তাতে বিশ্বাস রাখতো তবে তারা কখনোই তাদেরকে (কাফিরদেরকে) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করত না"।** (৫:৮১)

৩. কুফরির কোন বিষয়ে একমত পোষণ

কুফরি কোন বিষয়ের সঙ্গে একমত পোষণ করার অর্থ হল আল্লাহর বক্তব্যের বিরূদ্ধে তাদের বক্তব্য মেনে নেয়া। তাদের বিশ্বাসহীনতা সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুব) বলেন : **"আপনি কি তাদের দেখেননি যাদের কিতাবের একাংশ দেয়া হয়েছিল; তারা জিব্‌ত ও তাগুতে বিশ্বাস করে ? এরা কাফিরদের সম্পর্কে বলে, এদের পথ মুমিনদের পথ অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর"। (৪:৫১)**

এবং **" যখন আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদের নিকট রাসূল আসল, যে তাদের নিকট যা আছে তার সমর্থক; তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্র কিতাবটিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, যেন তারা জানে না। এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করত"**।(২: ১০১-১০২)

এই আয়াতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ (সুব) আমাদের জানিয়েছেন কিভাবে ইহুদিরা আল্লাহর কিতাবকে পরিত্যাগ করে যাদুর অনুসরণ করেছিল। অনুরূপভাবে আজও মুসলিম উম্মাহর মধ্য থেকে যে বা যারাই কাফিরদের সঙ্গে যোগ দিবে এবং তাদের অপকর্মের সঙ্গী হবে সে-ই মুনাফিকির কারণে নিজের জন্য ডেকে আনবে দুঃসহ যন্ত্রণা ও আযাব। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এরপরও যারা তাদের মুসলিম মনে করে তারা তো গোলক ধাঁধায় জড়িয়ে পড়েছে। আজ এই উম্মাহর এতই বেহাল দশা যে, তারা আজ সত্যের লেশমাত্র কোন মতে ধরে আছে। আজ এই উম্মাহর সন্তানদের অবস্থা ঐ তোতাপাখিগুলির মতো যারা কিছু না বুঝেই বুলি আওড়ায়, 'আমি কমিউনিজম কে একটি দর্শন হিসেবে বিশ্বাস করি', কিংবা ' আমি সোশালিজমে বিশ্বাসী' কিংবা বলে , 'গণতন্ত্র একটি সুন্দর রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সংবিধান সেক্যুলার হওয়া উচিত।' কাফিররা কুফরের এই মূলনীতিগুলো মুসলমানদের আবাসভূমিতে বাস্তবায়নের এজেন্ডা নিয়েছে: এবং, এই লক্ষ্যে জনগণকে এরা এ সমস্ত শয়তানি বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কেননা, কাফিরদের নীলনক্সা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন এই উম্মাহর তরুন-যুবক-তরুণীদের নিঃশর্ত আনুগত্য ,তাঁবেদারি ও সেবাদাসগিরি

মনোভাব। যখন কোন মুসলিম আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহর দিকে লোকদের ফিরে আসার জন্য আহ্বান করে, তখন এরাই তাদেরকে গণশত্রু বা জনগণের শত্রু হিসেবে ঘোষনা দেয়।

আল্লাহ্ (সুব) বলেন : **"ইহুদী এবং খৃষ্টানরা কখনোই আপনার ওপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন"**।(২:১২০)

৪. কাফিরদের সান্নিধ্যের অণ্বেষণ

কাফিরদের মমতা-ভালবাসা পাওয়ার চেষ্টা করার অর্থ হল তাদের সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কযুক্ত করা। আল্লাহ্ (সুব) এ রকম কাজে নিষেধ করেন, আল্লাহ্ (সুব) বলেন: **" আপনি এমন কোন সম্প্রদায়কে খুঁজে পাবেন না, যে আল্লাহ এবং শেষ দিবসের ভয় করে অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যারা বিরোধিতা করে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, হোক সে তার পিতা, পুত্র, ভ্রাতা কিংবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র ।"** (৫৮:২২)

ইবনে তাইমিয়া বলেন, ' আল্লাহ্ আমাদের সুস্পষ্ট জানিয়েছেন, কোন ঈমানদারই আল্লাহ্ ও রাসূলকে চ্যালেঞ্জকারীদের আনুকূল্য প্রত্যাশী হয় না। দুটি বিপরীত ধর্মী জিনিষ যেমন একে অপরকে তাড়িত করে, মুমিনের ঈমানও তদ্রূপ মুমিনকে এরুপ কাজ থেকে বিরত রাখে। সুতরাং, ঈমান থাকা অবস্থায় আল্লাহর শত্রুদের প্রতি অনুকুল মনোভাব পোষন অসম্ভব। যদি কেউ অনুভব করেন যে তার ভিতর এই মনোভাবের ঘাটতি রয়েছে , তাহলে বুঝতে হবে যে, তার ঈমানে গলদ রয়েছে।' আল্লাহ্ (সুব) বলেন: **"হে মুমিনগণ ! তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের প্রতি মমতা পোষণ করছো, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে"**। (৬০:১)

৫ কাফিরদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ

কাফিরদের সঙ্গে কেউ একাত্মতা প্রকাশ করলে সন্দেহাতীতভাবে সে কাফিরদের মিত্রে পরিণত হয়ে যায়। । আল্লাহ্ (সুব) বলেন : **"যারা ভ্রষ্টতা করে তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করোনা, অন্যথায় অগ্নি তোমাদের স্পর্শ করবে, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোনই রক্ষক নেই, এবং তোমরা সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না"**।

আল কুরতুবি বলেন, 'কোন কিছুর প্রতি একাত্মতা প্রকাশের অর্থ হল তার ওপর নির্ভর করা এবং সমর্থনের জন্য তার দারস্থ হওয়া এবং এভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরী করা যা তোমাকে তুষ্টি দেয়।' কাতাদাহ্ বলেন, 'এই আয়াতের অর্থ হল, কোন মুসলিমের পক্ষেই কাফিরদের পছন্দ করা কিংবা তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করা সঙ্গত নয়।' যারা চিন্তা-ধারণায় পরিবর্তনশীলতাকে ভালবাসে এবং ধর্ম-বিদ্রোহীতায় উৎসাহী তারা দু'ধরণের ; তারা হতে পারে কাফির অথবা পুরোপুরি মুরতাদ। আর এর নির্ধারণ সাহচর্যের মাধ্যমেই তৈরী হয়; অর্থাৎ একজন কাফিরের বন্ধু কাফির, এবং একজন মুরতাদ বা অবাধ্যের বন্ধু আরেকজন অবাধ্য। আল্লাহ্ (সুব) নবীকে (সঃ) উদ্দেশ্য করে বলেন : **" আমি আপনাকে অবিচলিত না রাখলে আপনি তাদের দিকে ঝুকেই পড়তেন প্রায়; আর তা হলে অবশ্যই আমি আপনাকে ইহজীবনে দ্বিগুণ এবং পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম; তখন আমার বিরূদ্ধে আপনি কোন সাহায্যকারী পেতেন না"**।(১৭ : ৭৪-৭৫)

আমাদের এটি মনে রাখতে হবে যে, এভাবে সৃষ্টির সেরা নবীকে (সঃ) যে রকম ধমকের সুরে আল্লাহ্ (সুব) এ ব্যাপারে সম্বোধন করেছেন, সেক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা কিরকম হতে পারে। *(মুজমুআত তাওহীদ*)

৬. কাফিরদের কুফরি বিশ্বাসের প্রশংসা- প্রশস্তি

কাফিরদের কুফরি বিশ্বাসের প্রশংসা- প্রশস্তি করার মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়।

আল্লাহ্ (সুব) বলেন: **"তারা ইচ্ছা পোষণ করে যে, আপনি তাদের সঙ্গে এক ধরণের সমঝোতায় (ধর্মীয় বিষয়ে সৌজন্যতা সহকারে) আসেন, সুতরাং তারাও আপনার সঙ্গে সমঝোতা করবে"** । (৬৮ : ৯)

যখন মুসলিমরা কাফিরদের শক্তিমত্তায় অনেক বেশি শক্তিশালী দেখতে পায় তখন তারা তা দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং এটি তাদের মনে এই ধারণার জন্ম দেয় যে, কাফিররা তাদের থেকে সর্বদিক থেকেই শ্রেষ্ঠতর : সুতরাং তারা কাফিরদের মুকাবিলায় তাদের দ্বীনের শিক্ষা পরিত্যাগ করে, এবং এভাবে তারা বিচ্যুত হয়ে পড়ে, এই ভয়ে যে, পাছে লোকে তাদের 'ফ্যানাটিক' বলে । নবী (সঃ) এরকম লোক দেখে উল্লেখ করেছেন, " তোমরা সেই জাতিসমূহের অনুসরণ করবে যারা তোমাদের পূর্বে ছিল, এবং অনুসরণ করবে শিরায়-শিরায়, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, এমনকি তারা যদি তোমাদের গোখরে সাপের গর্তেও নিয়ে যায়, তোমরা তার অনুসরণ করবে । আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! (আপনি কি বুঝাতে চান) ইহুদী এবং খৃষ্টানদের ? তিনি বললেন, 'তারা ছাড়া আর কে' ? কাফিরদের এই অতিতোষণের ফাঁদটি শয়তান সুকৌশলে পেতে রেখেছে যাতে করে শয়তান মানুষকে ইসলাম থেকে দুরে সরিয়ে রাখতে পারে । এই পরিপ্রেক্ষিতে, মুসলিমদের শয়তানের পক্ষ থেকে পেতে রাখা এই অপ্রত্যাশিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ফাঁদ থেকে সর্তকতার সঙ্গে দূরে থাকতে হবে এবং তাকে আত্মসচেতন হতে হবে । আর তাকে এই জ্ঞান দিতে হবে যে, আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে আল্লাহর পথে অটল থাকলে সে-ই টিকে থাকবে এবং মূলতঃ সে-ই হবে শক্তিশালী ।

৭. কাফিরদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা

কাফিরদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা তাদের সাথে মৈত্রী বন্ধনের নিদর্শক ।

আল্লাহ (সুবঃ) বলেন: **"হে মুমিনগণ ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না । তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না ; যা তোমাদের বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে । তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরো গুরুতর । তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর ।"** (৩ঃ১১৪)

এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল মুসলিমদের সেই দল সম্পর্কে যারা মুনাফিক এবং ইয়াহুদিদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বজায় রাখত, কেননা সে সময়ে তারা (মুনাফিক ও ইয়াহুদি) তাদের (মুসলিমদের) প্রতিবেশী ও বন্ধু ছিল । আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করে মুসলিমদের কাফির-মোনাফিকদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করলেন ।

অন্তরঙ্গতা শব্দটি দ্বারা বিশ্বাস ও আস্থার নৈকট্য বুঝানো হয় । পৃথিবীতে বরাবরই এমন কিছু লোক থাকে যারা মানুষের কাছে অন্যদের থেকে বেশি বিশ্বস্ত হয় । মুসলিমরা যেন কাফিরদের অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত মনে করে প্রতারিত না হতে পারে সে লক্ষেই আল্লাহ্ (সুব) মুসলিমদের কাফিরদের আসল রূপটি পূর্বেই উন্মোচিত করলেন । আল্লাহ্ (সুব) বলেন, ' তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে কিছু মাত্র পিছপা হবে না । রাসূলের সময়ে কাফিররা মুসলিমদের সম্পর্কে যা কিছু আবিষ্কার করতো তা-ই বাকি সকল কাফিরদের মাঝে রটিয়ে দিতো । আবু দাউদে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলেন,

"একজন ব্যক্তির দ্বীন তার সহচর বন্ধুদের মতই হয়ে থাকে, সুতারাং তোমাদের যে কেউ যেন সতর্ক হয় কাকে সে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে ।"

৮. কাফিরদের অনুগত হওয়া

কাফিরদের ইচ্ছা-আকাঙ্খার আনুগত্য তাদের সঙ্গে মৈত্রীর আরেকটি নিদর্শন । **আল্লাহ (সুবঃ) বলেন ঃ-"তুমি তার আনুগত্য করো না – যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি । যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে এবং যার কার্যক্রম হারিয়ে গেছে ।"**(১৮ঃ২৮)

এবং **"হে মু'মিনগণ ! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে ।"** (৩ঃ১৪৯)

আল্লাহ (সুবঃ) আরও বলেনঃ"নিশ্চয়ই শয়তানেরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয় । যদি তোমরা তাদের কথামত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে ।"(৬ঃ১২১)

ইবনে কাছির এই সর্বশেষ আয়াত সম্পর্কে বলেন, যখন অন্যদের কথা মত আল্লাহ এবং তাঁর শরীয়াকে তাদের বক্তব্যের সমপর্যায়ে নিয়ে আসা হয় তখনই তা শির্ক হয়ে যায় । এটি এই আয়াতেও প্রতিয়মান হয়,

"তারা (ইহুদী ও খৃষ্টানরা) তাদের রাববী ও সন্নাসীদের আল্লাহর পাশে তাদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে"

৯. কুরআন তাচ্ছিল্যকারীদের সঙ্গে একত্রে বসা

কাফিরদের সঙ্গে বসলে যখন তারা কোরানকে তাচ্ছিল্য করে তখন তাদেরই দলভুক্ত হতে হয় । আল্লাহ আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন । আল্লাহ (সুবঃ) বলেন ঃ

"কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে তখন যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হবে তোমরা তাদের সাথে বস না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। মুনাফিক এবং কাফিরদের তো আল্লাহ্ জাহান্নামে একত্র করবেন।" (৪:১৪০)

ইবনে জারীর আত তাবারী ব্যাখ্যা করেন যে, এর অর্থ হল এই যে, যদি আপনি তাদের এ কাজ করতে দেখেন এবং এ সম্পর্কে কিছুই না বলেন, তখন এটি সুস্পষ্ট হয় যে , আপনার আনুগত্য তাদের জন্য যা আপনাকে তাদের মত করে দেয়। তিনি আরো বলেন,এই আয়াতের মাধ্যমে মুসলিমদের প্রতি পরিষ্কার ভাবে কাফিরদের ধর্মদ্রোহী যাবতীয় কর্মকান্ডে বসার ব্যপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে নবী (সাঃ) বলেন," যারা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত তাদের বাড়ী যেও না, অন্যথায় তোমরা অনুরূপ দুর্ভাগ্যের জন্য ক্রন্দন করবে, নতুবা তা(দুর্ভাগ্য) তাদের কাছে যেভাবে এসেছে তোমাদের কাছেও অনুরূপভাবে আসবে।"(বুখারী)

১০. মুসলিমদের উপর কাফিরদের কর্তৃত্ব প্রদান

মুসলিমদের উপর কাফিরদের কতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে মুসলিমদের কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হতে বাধ্য করা হয় । কেননা কর্তৃত্বশীল কাফিরদের প্রতি আনুগত্যের কারনে তাদের কুফরী কর্মকান্ডের বিরোধিতা করা মুসলিমদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর তাদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার অর্থ হল তাদের পদ মর্যাদার প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা যা ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে কোন ক্রমেই সঙ্গতিপূর্ণ নয় ।আল্লাহ বলেনঃ **"এবং কখনই মু'মিনদের বিরূদ্ধে কাফিরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না।"** (৪ঃ১৪১)

১১. কাফিরদের উপর বিশ্বাস স্থাপন

কাফিরদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ হল তাদেরকে নিজেদের মিত্র বা বন্ধু মনে করা। অথচ, স্বয়ং আল্লাহ্ (সুব) এদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন ;**"কিতাবিদের মধ্যে এমন লোক আছে যে, বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও ফেরত দিবে, আবার এমন লোকও আছে যার নিকট একটি দিনারও আমানত রাখলে তার পিছনে লেগে না থাকলে সে ফেরত দিবে না, তা এ কারণে যে, তারা বলে,' নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই'। এবং তারা জেনেশুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।"** (৩:৭৫)

১২. কাফিরদের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করা

কাফিরদের কার্যক্রমের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা, তাদের পোষাকের অনুসরণ কিংবা তাদের লেবাস ও ফ্যাশনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেদের লেবাসের ষ্টাইল পরিবর্তন করা–এই জিনিসগুলি তাদের সঙ্গে মিত্রতার বিষয়টিকে পরিষ্কার করে।(মুজমুআত তাওহীদ)

১৩. কাফিরদের কাছে টানা

কাফিরদের সাহচর্যে আনন্দ অনুভব করা, তাদের কাছে নিজেদের অন্তর্নিহিত অনুভূতি ব্যক্ত করা, তাদেরকে কাছে টানা এবং তাদের সম্মান করা তাদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনেরই পরিচয় বহন করে। (*মুজমুআত তাওহীদ*)

১৪. কাফিরদের ভ্রষ্টতার কাজে কোন কিছু দিয়ে সহযোগিতা করা

তাদের ভ্রষ্টতায় সাহায্য করা কিংবা সাহায্য যুগিয়ে তাদের উৎসাহিত করার অর্থ হল নিজেকে তাদের মিত্রে পরিণত করা। কুরআন দুটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই বিষয়টি পরিষ্কার করেছে, একটি হল লূত (আঃ) এর স্ত্রী সংক্রান্ত এবং অপরটি নূহ্ (আঃ) এর স্ত্রী সম্পর্কিত। লূত (আঃ) এর স্ত্রী তার শহরের লোকদের লূত (আঃ) এর বিরূদ্ধে সমর্থন যুগিয়েছিল এবং লূত (আঃ) এর লোকদের দুর্দশায় উৎফুল্ল হয়েছিল; এমনকি লূত (আঃ) এর অতিথিদের সম্পর্কে গোপনীয় তথ্য সরবরাহ করেছিল। অনুরূপ ঘটনা নূহ্ (আঃ) এর স্ত্রীর ক্ষেত্রেও সংঘটিত হয়েছিল। (*তাফসীর ইবনে কাছীর)*

১৫. কাফিরদের উপদেশ-পরামর্শ চাওয়া

কাফিরদের উপদেশ পরামর্শ শ্রবণ করা, তাদের উচ্চ আসনে আসীন করা কিংবা তাদের বন্দনা করা (মুজমু'আত তাওহীদ) তাদের সঙ্গে মিত্রতার কতিপয় নিদর্শন যা বর্তমান সময়ে বেশি করে পরিলক্ষি হচ্ছে। ইতোমধ্যে আমরা প্রাচ্যবাদী দার্শনিকদের (Orientalsm তত্ত্বের ধারক বাহকদের যেমন, Edward said) উত্থান লক্ষ করেছি। এরা অতি চাতুর্যের সঙ্গে অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের দাবী করেছে। এই তত্ত্বের অনুসরণে এরা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াশীল, পুরনো যুগের ফসিল ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের লেবেল এঁটে দিয়ে তথাকথিত প্রগতি ও সভ্যতার নতুন যুগের ঘোষণা দিয়েছে। আর এভাবে অতি চাতুর্যের সঙ্গে ইসলাম ও মুসলমানদের এরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে।

১৬. কাফিরদের সম্মান করা

কাফিরদের বেশি বেশি সম্মানিত করা এবং নির্বোধের মত বিশাল বিশাল টাইটেলে ভূষিত করা তাদের প্রতি মিত্রতা প্রর্দশনেরই নামান্তর। আমরা লক্ষ্য করি, কিছু লোক তাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশের ভঙ্গি হিসাবে তাদের সঙ্গে দেখা করার সময় তাদের সিনায় হাত রাখে; কেউবা আনুগত্যের নমুনা স্বরপ তাদের মাথার হ্যাট নামিয়ে রাখে। সব কাফিরদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ তো দূরের কথা তাদের হৃদয়ে এদের (কাফিরদের)সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার হওয়া উচিত ছিল।(হামুদ আত তাবিজরি)

আল্লাহ (সুবঃ) বলেন ঃ **"যারা মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদের আউলিয়া (রক্ষাকারী,সাহায্যকারী,বন্ধু)হিসাবে গ্রহণ করবে, তারা কি তাদের কাছে ইজ্জাত অন্বেষণ করে ? নিঃসন্দেহে সকল ইজ্জাত আল্লাহরই"**। (৪:১৩৯)

প্রকৃতপক্ষে এই কাফিররা মুসলিমদের থেকে যা প্রাপ্য তা হল ভয়াবহ সমালোচনা এবং তাচ্ছিল্য। এটা বর্ণিত আছে যে,নবী (সাঃ) আমাদেরকে তাদের সংবর্ধিত করার উদ্যোগ নিতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ"**তোমরা তাদের সালাম দিয়ো না (ইহুদী ও খৃষ্টানদের) এবং যখন তোমরা তাদের সঙ্গে রাস্তায় সাক্ষাৎ কর, তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণ পাশ দিয়ে যেতে বাধ্য কর** । (মুসলিম)

১৭. কাফিরদের সঙ্গে বসবাস করা

কাফিরদের আবাসস্থলকে বসবাসের জন্য সাব্যস্ত করা এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটানোও তাদের মিত্রে পরিণত হওয়ার শামিল। নবী (সঃ) বলেন, " যে-ই কাফিরদের সাথে যোগ দেয় এবং তাদের মাঝে বসবাস করে সে তাদেরই একজন।" (আবু দাউদ) এবং "কাফিরদের সঙ্গে বসবাস করনা কিংবা তাদের সঙ্গে যোগ দিও না : যে-ই তাদের সঙ্গে বসবাস করে কিংবা তাদের মাঝে বাস করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (আল-হাকিম)

১৮. কাফিরদের সঙ্গে জোগসাজস করা

কাফিরদের সঙ্গে জোগসাজস করা, তাদেরকে বিভিন্ন স্কীমে সাহায্য করা, তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া, তাদের পক্ষ হয়ে গোয়েন্দাগিরি করা, মুসলিমদের সম্পর্কে তাদের তথ্য দেয়া কিংবা তাদের কোন পদে অধিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ করা এগুলো সবই তাদের মিত্রদের কাজ। বর্তমান মুসলিম বিশ্ব এখন সব থেকে নিকৃষ্ট যে অসুখে ভুগছে এটি সেগুলোর অন্যতম। এটাকেই প্রায় সময়ই বলা হয় ঋরভরঃয ঈড়ষঁসহ। এটি পুরো প্রজন্মকে নষ্ট করেছে, এবং শিক্ষা থেকে শুরু করে রাজনীতিসহ সরকারের সকল পর্যায়কে কলুষিত করেছে। মিশরে ইংরেজ দখলদারির শেষে মুহাম্মদ কুতুব বলেছিলেন, " সাদা ইংরেজরা চলে গেছে কিন্তু বাদামী ইংরেজরা এখনো আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান। মুসলমানদের পশ্চাত্যীকৃত (ডবংঃবৎহরুবফ) সন্তানেরা আজ মুসলিম বিশ্বের প্লীহায় (চষধমঁব) রূপ নিয়েছে। তারা তা-ই সম্ভব করেছে যা আল্লাহর শত্রুরা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি যে তারা সম্ভব করতে পারবে। কিন্তু এতে তারা সফলকাম হবে না।" আল্লাহ্ (সুব) বলেন," আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে। (৩৭:১৭১-১৭৩)

১৯. মুসলিমদের ঘৃণা এবং কাফিরদের ভালবাসা

যারা ইসলামের পবিত্রভূমি থেকে কাফিরদের ভুমিতে পলায়ন করে, তাদের চিন্তাধারা-ধ্যানধারণার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে, তারা মূলতঃ তাদেরই বন্ধু যাদের কাছে তারা গিয়েছে। (আর রিদ্দাহ বাইনা আল-আমস ওয়াল ইয়াওম)

২০. কাফিরদের মতাদর্শকে সমর্থন করা

যারা সেক্যুলার রাজনীতি, কমিউনিজম, সোশালিজম, জাতীয়তাবাদ,ইত্যাদি মতাদর্শের পিছে দৌড়ায় এবং এই মতাদর্শগুলোর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে, তারাও মূলতঃ তাদেরই বন্ধু যাদের শরণাপন্ন তারা হয়েছে। (আর রিদ্দাহ বাইনা আল-আমস ওয়াল ইয়াওম)

গ্রহণযোগ্য এবং অগ্রহণযোগ্য ওজর সমূহ (Excuses):

কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনকারীরা প্রায়শঃই অজুহাত প্রদর্শন করে যে, তারা তাদের চাকুরি, জাগতিক সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণ, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদির ক্ষতির আশঙ্কায় কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতা করে। তাদের এই অজুহাতগুলি কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা তাদের এই অজুহাতে পৃথিবীর প্রতি মোহাচ্ছন্নতা ব্যতিত আর কিছু নেই। যে বা যারা কাফিরদের অনুগত হয়, তাঁবেদারী করে ও স্বেচ্ছায় তাদের সেবাদাস হিসেবে নিয়োজিত থাকে এবং তাদের কুফরি কর্মকান্ডকে প্রকাশ্যে সর্মথন করে তাদের আল্লাহ্ (সুব) ক্ষমা করবেন না। তবে যারা কাফিরদের শক্তি প্রয়োগের কারণে বাধ্য হয়ে এরূপ করে তারা এর ব্যতিক্রম। আল্লাহ্ (সুব) বলেন: **"কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার ওপর আল্লাহর গযব আপতিত হবে এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরির জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত। এটি এজন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"** (১৬:১০৬-১০৭)

এবং আল্লাহ্ (সুব) এই বলে এ সম্পর্কে নিষেধ করেন: **''মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন।** (৩:২৮)

হৃদয়ের ভালবাসা অনুভূতিজাত একটি বিষয়। এই বিষয়ে কারো ওপর জবরদস্তি করা যায় না। ভিতরে ভিতরে কাফিরদের প্রতি সংশ্লিষ্টতার এই প্রবণতা কোনক্রমেই শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রোধ করা সম্ভব নয়। কেননা কেউ জানে না অন্য জনের হৃদয়ে কি আছে। আল্লাহ (সুব) বলেন- 'হৃদয় বিশ্বাসের সাথেই অবস্থান করে'। সুতরাং তাদের পক্ষাবলম্বন করার কোন অবকাশই নেই। এরকম যে-ই করবে সে সর্বাবস্থাতেই একজন কাফির। যদি তারা প্রকাশ্যে কোন রাখঢাক ছাড়াই তাদের সমর্থন দেবার কথা ঘোষণা করে এবং তদনুযায়ী কাজ করে, তবে তারা কাফির হয়ে যাবে এবং চিরন্তন ক্ষতিই হবে এদের পরিণাম। আর যদি তারা অন্তরে তাদের প্রতি কোন ধরনের দুর্বলতা পোষণ করে (তারা তা স্বঘোষিতভাবেই করুক কিংবা ইসলামের লেবাস ধারণ করে গোপনেই করুক) তবে তো তারা সেক্ষেত্রে মুনাফিকে পরিণত হয়ে গেল। আর মুনাফিকদের পরিণাম হল সর্বনিম্ন স্তরের জাহান্নাম বা জাহান্নামের অন্ধকারময় তলদেশ ।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর অনুসারী সাহাবা (রাঃ) এবং পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের সকলের ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

কথা ও কাজে لا إلـــــه إلا اللـــــه

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব বলেনঃ

একথা অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, আপনাকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন "তাঁর ইবাদত করার জন্য।" তাঁর আনুগত্য আপনার ওপর ফরজ করে দিয়েছেন। তাঁর ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফরজ হচ্ছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহকে এলেম, কথা ও কাজের দিক থেকে জানা। আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী এর প্রমাণ বা দলীলঃ

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে আকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না)।"

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى
أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

আরো জেনে রাখা দরকার যে, বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার অছিয়ত (উপদেশ) হচ্ছে সেই তাওহীদের কলেমাকে নিশ্চিত করা, যা কুফর এবং ইসলামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। এখানেই লোকজন মূর্খতাবশতঃ অথবা অন্যায়ভাবেঃ কিংবা বিরোধিতা করে বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। তোমরা দ্বীন কায়েম করো এ ব্যাপারে তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আল্লাহ তায়ালার এ বাণী অনুযায়ী (মুসলিম) জাতির ঐক্যই তাদেরকে একীভূত করতে পারে এর আরো প্রমাণ হচ্ছেঃ

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"বলে দিন, এটাই আমার পথ, আমি এবং আমার অনুসারীরা আল্লাহর দিকে বুঝে শুনে দাওয়াত দেই। আল্লাহ পবিত্র। আমি মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত নই।" *(ইউসুফঃ ১০৮)*

প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে যখন তাওহীদ সম্পর্কে সে জানতে পারবে এবং তা স্বীকার করে নিবে, তখন তাওহীদ ভালবাসবে অন্তর দিয়ে এবং একে সাহায্য করবে তার জবান ও হাত দিয়ে। তাওহীদের সাহায্যকারী এবং সহযোগিতাকারীকে সে সাহায্য করবে। আবার যখন শিরক সম্পর্কে সে জানতে পারবে এবং শিরককে শিরক হিসেবে স্বীকার করবে, তখন অন্তর দিয়ে সে শিরককে ঘৃণা করবে। এরকম হলেই বান্দা সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে আকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না)।"

অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, তাওহীদের স্বীকৃতি অবশ্যই হতে হবে অন্তর দিয়ে (যার অপর নাম জ্ঞান), স্বীকৃতি হতে হবে জবান দিয়ে কথার মাধ্যমে, এবং স্বীকৃতি হতে হবে আমল দিয়ে বিধি-নিষেধ গুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে, যদি বান্দার মধ্যে এ বিষয়গুলোর কোনো একটি না পাওয়া যায়, তাহলে সে মুসলমান হতে পারবে না। যদি সে তাওহীদকে স্বীকার করে নিলো কিন্তু স্বীকৃতি অনুযায়ী কাজ করলো না, তাহলে সে ফেরাউন ও ইবলিসের মতো বিদ্রোহী কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি বান্দা বাহ্যিক দিক থেকে তাওহীদের আমল করে কিন্তু গোপনে বা অন্তরে তা বিশ্বাস করে না, তাহলে সে খাটি মুনাফিক হিসেবে বিবেচিত হবে, যার অবস্থা কাফেরের চেয়েও খারাপ। তিনি (মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ)) আরো বলেনঃ তাওহীদ দুই প্রকার। তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ (রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত তাওহীদ) এবং তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ (ইবাদত সংক্রান্ত তাওহীদ)

রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত তাওহীদ কাফের এবং মুসলিম উভয়েই স্বীকার করে। আর উলুহিয়্যাত সংক্রান্ত তাওহীদই কুফরী এবং ইসলামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। অতএব প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে উভয় তাওহীদের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থাকা। তার অবশ্যই জানা উচিৎ যে, আল্লাহ তায়ালাই "সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা এবং নিয়ন্ত্রক" এ কথা কাফেররা অস্বীকার করেনা।

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

"যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে কে কর্মে নিয়োজিত রেখেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, "আল্লাহ"। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?" *(আল আনকাবুতঃ ৬১)*

এটা যখন সুস্পষ্ট ভাবে জানা গেলো যে, কাফেররাও একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহই সৃষ্টি করেন, রিযিক দান করেন এবং সব বিষয়ের পরিকল্পনা আল্লাহ ছাড়া কেউ করেনা' তোমার একথা তোমাকে মুসলমান বানাতে পারবে না যতক্ষণ না তুমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ দ্বারা যে অর্থ বুঝায় সে অনুযায়ী আমল করবে। আল্লাহর এ সব নামের প্রতিটির একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। আল্লাহকে তুমি 'খালেক' বলছো। 'খালেক' এর অর্থ হচ্ছে, যিনি অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে সমগ্র সৃষ্টিকে অস্তিত্বে এনেছেন, তখন থেকেই তার রিযিকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আর মুদাব্বির অর্থ হচ্ছে তিনিই ফেরেস্তাগণকে তার পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান, আবার তাঁরই নির্দেশে তারা আকাশে উড্ডয়ন করে। তাঁরই নির্দেশনায় মেঘ আকাশে ভাসে তাঁরই নির্দেশনায় বাতাস প্রবাহিত হয়। এমনিভাবে তাঁর সকল সৃষ্টি পরিচালিত হয়। তিনিই তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক সকল সৃষ্টিকে পরিচালিত করেন। আল্লাহ তায়ালার এ সব নাম, যেগুলো কাফেররাও স্বীকার করে সেগুলো রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত তাওহীদের সাথে সম্পৃক্ত। তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ (ইবাদত সংক্রান্ত তাওহীদ) হচ্ছেঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত নামগুলোর অর্থ জানার মতোই 'ইলাহ' সংক্রান্ত নামগুলোর অর্থ জানা। তাই 'লা-ইলাহা ইল্লাহ এর মধ্যে ইতিবাচক নেতিবাচক দুটি দিক আছে। তা হচ্ছে উলুহিয়্যাত (ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা) কে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহর জন্যই তা সাব্যস্ত করা। একমাত্র ইলাহ, মা'বুদ (উপাস্য) যিনি ব্যতীত ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা আর কারো নেই তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। তাই যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে মানত করলো, অথবা পশু জবাই করলো, সেই গাইরুল্লাহর ইবাদত করলো। এমনি ভাবে যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করলো, সেই গাইরুল্লাহর ইবাদত করলো।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ

"আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভাল করতে পারবে না মন্দও করতে পারবে না। বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ করো তাহলে তুমিও জালেমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।" *(ইউনুছঃ ১০৬)*

এমনিভাবে যে ব্যক্তি তার নিজের ও আল্লাহর মাঝে কাউকে মাধ্যম বানিয়ে নিলো এবং একথা দাবী করলো যে, উক্ত মাধ্যম তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে, সেও গাইরুল্লাহর (মাধ্যমের) ইবাদত করলো। আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের ব্যাপারে এ বিষয়টিই উল্লেখ করেছেনঃ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর উপাসনা করে, যা তাদের না করতে পারে কোনো ক্ষতি, না করতে পারে কোনো উপকার। আর তারা বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করতে চাও, যে সম্পর্কে তিনি আসমান ও জমীনের মাঝে অবহিত নন? তিনি পুতঃপবিত্র ও মহান সে সমস্ত জিনিস থেকে, যেগুলোকে তোমরা শরীক করছো।" *(ইউনুছঃ ১৮)*

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

"জেনে রাখো, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এজন্যই করি যেনো তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" *(আয্-যুমারঃ ৩)*

বান্দা কিভাবে আল্লাহর মুওয়াহহিদ (একত্বের) অনুসারী হবে

একথা অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, বান্দা দু'টি বিষয় ব্যতীত আল্লাহর মুওয়াহহিদ বা একত্বের অনুসারী হতে পারবে না।

আল্লাহর হক বা অধিকার সম্পর্কে জানা এবং তাঁর হককে তাঁরই জন্য সাব্যস্ত করা;
আল্লাহর একাত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান এবং বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁরই ইবাদত করা;

আল্লাহর হক বা অধিকার সম্পর্কে জানা এবং তাঁর হককে তাঁরই জন্য সাব্যস্ত করা

আল্লাহ তাআ'লার বিশেষ হক বা অধিকার তিনটিঃ

প্রথম হকঃ সেইসব কর্ম যেগুলো একমাত্র আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। সেগুলো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সাথেই খাস, অন্যের সাথে নয়। এ জাতীয় কর্মগুলো গাইরুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা কোনো মানুষের জন্য জায়েজ নয়, চাই সে গাইরুল্লাহ কোনো সম্মানী ফেরেস্তা হোক অথবা কোনো নবীই হোক। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া যে কাজগুলো অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ত করা জায়েয নেই সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনা। আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করেন। তিনিই রিযিক দান করেন, জীবন দান করেন, মৃত্যু দান করেন, উপকার ও ক্ষতি সাধনের একমাত্র মালিক তিনি। সকল বিষয় নিয়ন্ত্রন করেন এবং গোটা বিশ্ব তিনি পরিচালনা করেন। তিনি হুকুম জারি করেন, বিধান রচনা করেন। তাঁর হাতেই নিবদ্ধ প্রতিটি জিনিসের সার্বভৌম ক্ষমতা।

দ্বিতীয় হকঃ আল্লাহ তায়ালার সেই সব আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী) যেগুলো দ্বারা তিনি বিশেষিত এবং একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। এ সব নামও গুণাবলীর কোন অংশই গাইরুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা কারো জন্যই জায়েজ নয়। চাই সে গায়রুল্লাহ কোনো সম্মানী ফেরেস্তা হোক অথবা কোনো নবীই হোক। আল্লাহ তায়ালার খাস নামগুলোর মধ্যে 'আল্লাহ' আহাদ, সামাদ, রাহমান কুদ্দুস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কারীম, রাহীম এবং মালিক (রাজা) নামগুলো আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যে সব সিফাত বা গুণাবলী একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ كمال القدر (কামালে কুদরাত) অর্থাৎ ক্ষমতা ও শক্তির পূর্ণাঙ্গতা। কেননা, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আরো একটি গুণ হচ্ছে كمال العلم (কামালে এলেম) অর্থাৎ জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গতা, কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর জ্ঞান দিয়ে সব কিছুই পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই যেমনি ভাবে এলমে গায়েব জানার মতো গুণ একমাত্র আল্লাহরই আছে। كمال السمع (কামালুস সামই) পূর্ণাঙ্গ শ্রবনের গুণ একমাত্র আল্লাহর অর্থাৎ তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রোতা। তিনি দূরে ও কাছের সব কিছুই শুনতে সক্ষম এগুলো ছাড়া আরও বহু সিফাত বা গুণ এমন রয়েছে যেগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য।

তৃতীয় হকঃ নিরঙ্কুশ ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই খাস। ইবাদত হচ্ছে বান্দর ওপর আল্লাহর হক বা অধিকার। বান্দারা তাদের ইবাদতকে একমাত্র তাঁরই জন্যে নিবেদন করবে। অন্য কিছুকেই তাঁর সাথে ইবাদতের মাধ্যমে শরীক করবে না। কেননা একমাত্র তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে রিযিক দান করেছেন, তাদের জীবন ও মৃত্যু দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

“আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর রিযিক দান করেছেন এরপর তোমাদের মৃত্যু দিবেন আবার জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোনো একটিও করতে সক্ষম হবে? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।” *(আর রূমঃ ৪০)*

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেছেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববতী লোকদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এর ফলে তোমরা খোদা-ভীতি অর্জন করতে সক্ষম হবে। তিনিই তোমাদের জন্য মাটিকে বিছানা আর আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করেছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে খাদ্য হিসেবে তোমাদের জন্য নানা প্রকার ফল উৎপাদন করেছেন। অতএব আল্লাহর সাথে তোমরা জেনে-শুনে অন্য কাউকে সমকক্ষ করো না।” *(আল-বাকারাহ্ঃ ২১-২২)*

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হযরত মুআয (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূল (সঃ) এর পিছনে একই গাধার পিঠে সওয়ারী অবস্থায় ছিলাম। তখন রাসূল (সঃ) আমাকে বললেনঃ হে মুআয তুমি কি জানো বান্দার ওপর আল্লাহর কি হক (অধিকার) আর আল্লাহর ওপর বান্দার কি হক রয়েছে? তিনি বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সঃ) বললেনঃ বান্দার ওপর আল্লাহর হক হচ্ছে, বান্দারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর ওপর বান্দার হক হচ্ছে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করবে, তাকে তিনি শাস্তি দিবেন না। হযরত মুআয বললেনঃ আমি কি এ শুভ সংবাদটি লোকদেরকে জানিয়ে দেবো না? তিনি বললেনঃ তুমি তাদেরকে এ শুভ সংবাদ জানিও না, তাহলে তারা আমল ছেড়ে দিয়ে শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে।

যেসব ইবাদত একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নিবেদন করা যায় না সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ দোয়া, রুকু, সেজদা, মহাব্বত, তাজীম (ভক্তি), ভয়, আশা, আকাংখা, তাওবার মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন, আসক্তি ও আগ্রহ, ভীতি, বিনয়, মিনতি, তাওয়াক্কুল (ভরসা) সাহায্য চাওয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করা, নযর বা মানত করা, যবাই করা, তাওয়াফ করা, বিচার প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয়গুলো ইবাদত হিসেবে গণ্য। এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি বিষয় যদি গাইরুল্লাহর জন্য সম্পাদন করা হয়, তাহলে সে মুশরিক ও কাফের হিসেবে গণ্য হবে যদিও সে নামাজ পড়ে, রোযা রাখে, হজ্জ করে আর নিজেকে একজন মুসলিম হিসেবে দাবী করে।

আল্লাহর একাত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান এবং বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁরই ইবাদত করা (কেননা আল্লাহর ইবাদত এবং তাওহীদ দুটি রুকন বা স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত)

তাগুতের সাথে কুফরী;
আল্লাহর প্রতি ঈমান;

(১) *তাগুতের সাথে কুফরীঃ* এ বিষয়টি তাওহীদের রুকন (অত্যাবশ্যকীয় স্তম্ভ) গুলোর মধ্যে প্রথম রুকন। এ অত্যাবশ্যকীয় স্তম্ভটি বিশ্বাস, কথা এবং কাজের মাধ্যমে তাগুতের সাথে কুফরী করা ব্যতীত কখনো সহীহ (শুদ্ধ) হবে না। বান্দা যখনই তার বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাধ্যমে তাগুতের সাথে কুফরী করবে তখনই সে তাগুতকে অস্বীকারকারী হিসেবে গণ্য হবে। এ তিনটি অপরিহার্য বিষয়ের কোনো একটিতে যদি গন্ডগোল থাকে, তাহলে বান্দা তাগুতের অস্বীকারকারী হিসেবে গণ্য হবে না। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

“আমি প্রত্যেক উম্মাতের কাছেই এ মর্মে রাসুল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাগুত থেকে দূরে থাকবে ।” *(নাহলঃ ৩৬)*

ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, তাগুত থেকে দূরে থাকতে হবে বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাধ্যমে । এর উদাহরণ হচ্ছে, কোন মানুষ বিশ্বাস করলো যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই বিধান রচনার মালিক এবং এ কথা মুখে উচ্চারণও করলো । কিন্তু পরবর্তীতে একথার ওপর সে প্রতিষ্ঠিত থাকলো না বরং কোনো কুফরী কাজ করে ফেললো, যেমন কাজের মাধ্যমে বিধান রচনার শক্তি ও অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নিলো । আইন ও বিধান রচনার নিরঙ্কুশ অধিকারের ক্ষেত্রে যা একমাত্র আল্লাহরই অধিকার রয়েছে- নিজেকে জড়ানোর জন্য সে কর্মক্ষেত্রে আল্লাহর রুবুবিয়াতের মধ্যে শিরককারী বা মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে । ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেনঃ দ্বীন বান্দার অন্তরে থাকবে বিশ্বাস, মুহাব্বত ও (তাগুতের প্রতি) ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমে । দ্বীন মুখে থাকবে হক কথা উচ্চারণ আর কুফরী কথা পরিত্যাগের মাধ্যমে । আর অঙ্গেও মধ্যে দ্বীন থাকবে ইসলামের রুকন (অপরিহার্য মৌলিক শর্তাবলী) গুলো পালন করা এবং কুফরী কার্যাবলী পরিত্যাগ করার মাধ্যমে । এ তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটিতে গন্ডগোল থাকলে সে কুফরী করলো এবং দ্বীন থেকে বের হয়ে গেলো ।

(২) আল্লাহর প্রতি ঈমানঃ এটা হচ্ছে তাওহীদের দ্বিতীয় রুকন (মৌলিক স্তম্ভ) । এ স্তম্ভটি সহীহ বা শুদ্ধ ততক্ষন পর্যন্ত হবেনা যতক্ষন না বান্দা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাধ্যমে এবং তাঁরই ইবাদত করবে । বান্দা আল্লাহর প্রতি যখনই তার আক্বীদা (বিশ্বাস) কথা ও কাজের মাধ্যমে তার রবের প্রতি ঈমান আনবে তখনই তাকে মুমিন বিল্লাহ (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী) বলা হবে । এ তিনটি অপরিহার্য বিষয়ের কোনো একটিতে গন্ডগোল থাকলে বান্দা মুমিন বিল্লাহ হতে পারবে না । ইমাম আল্ আজরী (রহঃ) তার “আশ শারীয়াহ” নামক গ্রন্থে এ সংক্রান্ত একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন । উক্ত অধ্যায়ে তিনি বলেনঃ ঈমান হচ্ছে আন্তরিক ভাবে সত্যায়ন, মৌখিক স্বীকৃতি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন । একত্রে এ তিনটি বিষয়ের সমাবেশ ব্যতীত বান্দা মুমিন হতে পারবে না (অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, মুখে স্বীকার করবে, শরীর দিয়ে তাঁর বিধান কায়েম করবে) । অতএব বান্দা আল্লাহর মুওয়াহহিদ‘ (আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী) হিসেবে গন্য হবে দুটি বিষয়ের মাধ্যমেঃ

-
-

كشف الشبهات

তিনি আরো বলেনঃ এ ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই যে, তাওহীদ অবশ্যই হতে হবে অন্তর দিয়ে, যার অর্থ হচ্ছে তাওহীদ সংক্রান্ত জ্ঞান । তাওহীদ হতে হবে জবান দিয়ে যার অর্থ হচ্ছে তাওহীদ সংক্রান্ত কথা । তাওহীদ হতে হবে আমল বা কর্ম দ্বারা যার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর বিধি-নিষেধ বাস্তবায়ন করা । যদি কেউ এর চেয়ে কম করে, তাহলে সে মুসলিম হতে পারবে না । যদি কেউ আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে কিন্তু স্বীকৃতি মোতাবেক আমল কও না, তাহলে সে ফেরাউন এবং ইবলিসের মতো বিদ্রোহী কাফের হিসেবে গণ্য হবে । আর যদি বাহ্যতঃ তাওহীদ অনুযায়ী আমল করে কিন্তু গোপনে তা বিশ্বাস করে না তাহলে সে খাটি মুনাফিক হিসাবে গণ্য হবে । এমতাবস্থায় সে কাফেরের চেয়েও খারাপ । *(আদ দুরার আস্ সুন্নিয়া ১৭৪/৭পৃঃ)*

শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আবা-বাতিন (রহঃ) বলেনঃ

لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

"তোমরা টাল বাহানা করো না। তোমরা ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করেছো।" *(আত-তাওবাহঃ ৬৬)*

আল্লাহ তায়ালা অন্যদের ব্যাপারে বলেনঃ

وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

"তারা অবশ্যই কুফরী কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী করেছে।" *(আত-তাওবাহঃ ৭৪)*

আল্লামা সুলাইমান বিন সাহমান (রহঃ) বলেনঃ

আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান বিন আল শাইখ (রহঃ) বলেনঃ

মুরতাদদের হুকুমের (বিধান) ব্যাপারে ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, একজন ব্যক্তি যে কথা বলে সে কথার দ্বারা কুফরী করতে পারে অথবা সে যে কাজ করে সে কাজ দ্বারাও কুফরী করতে পারে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাক্ষ্য দান করা, নামাজ পড়া, রোজা ও যাকাত আদায়ের পরও উক্ত কুফরীর কারণে সে মুরতাদ (ধর্ম ত্যাগি) হয়ে যেতে পারে। এর ফলে বাতিল হয়ে যেতে পারে তাঁর যাবতীয় নেক আমল, বিশেষ করে যদি সে (তওবা ছাড়া) মৃত্যুবরণ করে। বান্দার আমল বাতিল বা নষ্ট হওয়ার পক্ষেই ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত অভিমত। তবে যদি মৃত্যুর পূর্বেই বান্দা তওবা করে সে ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। *(আদ্ দুরার আস্ সুন্নিয়াহ ১১/৫৮৬)*

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ ঘোষণার সারমর্ম / মূলকথা

আমরা জানি لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ তাওহীদের চূড়ান্ত ঘোষণা কালেমা, এ কালেমাকে স্বীকার করার পর আমাদের আক্বীদা বা বিশ্বাস এবং কাজ-কর্ম হবে নিম্নরূপঃ

- আল্লাহ এক, একক, অনন্য, অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করব;
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, রিযিক দাতা, জীবন-মৃত্যুর মালিক এবং রক্ষাকারীরূপে বিশ্বাস করব না;
- একমাত্র আল্লাহকেই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, গায়েবের ব্যাপারে ওয়াকেফহাল বলে বিশ্বাস করব। আর কাউকে এরূপ বিশ্বাস করব না;
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে উপকার- অপকার / লাভক্ষতির মালিক বলে বিশ্বাস করব না;
- আল্লাহ তায়ালাকেই আমরা একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করব। এবং আর কেউ তার এ একচ্ছত্র ক্ষমতার শরীক নেই বলে বিশ্বাস করব;
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে রব, আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করব না। একমাত্র আল্লাহকেই আমাদের রব, আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করব;
- আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইবাদত -বন্দেগীর অধিকারী, সাহায্যকারী, বিপদ হতে উদ্ধারকারী, মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করব না;
- আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দা বা দাস হয়ে থাকব না। নিজের প্রবৃত্তি ও দেশে চলিত প্রথার অন্ধ অনুসরণ করব না;
- জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহর বিধানকে একমাত্র ভিত্তি বলে মানব এবং সে অনুযায়ী প্রত্যেকটি কাজ করব;
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট দোয়া এবং সাহায্য ও প্রার্থনা করব না ;
- আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর এবং কারও নিকট আশা পোষণ করব না এবং কাউকে ভয় করব না;

- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সবচেয়ে প্রিয় জানব না এবং তাঁকেই অসীম প্রেমময় এবং অসীম করুনার অধিকারী বলে বিশ্বাস করব;
- কোন মানুষ, দল, সমাজ বা শাসন কর্তৃপক্ষকে আল্লাহর আইন, বিধান, শরীয়তের পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকারী বলে স্বীকার করব না;
- জীবনের প্রত্যেক কাজের জবাবদিহি শুধু আল্লাহর নিকট করতে হবে এ বিশ্বাস হৃদয়-মনে সবসময় জাগ্রত রাখব এবং যে কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন যে কাজ করতে এবং যে কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সে কাজ থেকে বিরত থাকতে সর্বদা চেষ্টা করব;
- আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সকল প্রয়োজন পূরণকারী, ক্ষমার অধিকারী এবং হেদায়েত দানকারীরূপে বিশ্বাস করব না;
- নবী, ফেরেশতা, ওলী-আউলিয়া, সাধু-স্বজন কে ইলাহী ব্যবস্থাপনার মধ্যে পরিবর্তন ও সংযোজন করবার এবং আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার অধিকারী বলে বিশ্বাস করব না। তবে সুপারিশ এর ক্ষেত্রে পরকালে শুধু যার জন্য অনুমতি হবে (যেমন নবী এবং ঈমানদাররা) তারাই শুধু সুপারিশ করতে পারবে;
- আমরা কাউকে আল্লাহর সন্তান, আত্নীয়, অংশীদার বা শরীক বলে বিশ্বাস করব না। আমরা বিশ্বাস করব এসব থেকে নিশ্চয় আল্লাহ মুক্ত এবং পবিত্র। যিনি এক, একক তার শরীক কেউ নেই;
- কোন বস্তু বা প্রানীর মধ্যে মিশ্র বা অবিমিশ্র ভাবে আল্লাহর অস্বিত্ব বা অবতারত্ব স্বীকার করব না। যেমন- হিন্দুরা রামকে ভগবানের অবতার মনে কওে;
- আল্লাহ প্রতি মুহুর্তে জীবন্ত, জাগ্রত এবং সৃষ্টিজগতের সব অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তাঁকে সবচেয়ে নিকটবর্তী বলে বিশ্বাস করব। ছোট বড় সকল কাজই আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় বলে আমরা বিশ্বাস করব;
- নিজেকে কোন বস্তুর মালিক বা অধিকারী বলে জানব না। এমনকি স্বীয় প্রাণ, অঙ্গ-প্রতঙ্গ, দৈহিক এবং মানসিক শক্তিকেও আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত গচ্ছিত বস্তু মনে করব;

তাওহীদ বিনষ্টকারী বিষয় তথাঃ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ বিনষ্টকারী বিষয়

'নাকেদ্ব' বা বিনষ্টকারী বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, যার অস্তিত্বের কারণে অন্য কোনো জিনিস বিনষ্ট বা বাতিল হয়ে যায়। এ কথা অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, নামাজ বিনষ্ট বা বাতিল হওয়ার যেমন কিছু কারণ ও বিষয় আছে, তেমনিভাবে তাওহীদ বিনষ্টকারী কিছু কারণ ও বিষয় আছে। মুসল্লি যদি নামাজ বিনষ্টকারী বিষয়গুলোর যে কোনো একটিতে পতিত হয়, তাহলে সাথে সাথে তার নামাজ বাতিল হয়ে যায়। যেমন নামাজের মধ্যে শব্দ করে হাসা, কিছু আহার করা বা পান করা ইত্যাদি। এমনি ভাবে তাওহীদ বিনষ্টকারী কিছু কারণ ও বিষয় রয়েছে যার মধ্যে বান্দা পতিত হলে তার তাওহীদ বিনষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে সে কাফের মুশরিক হিসেবে গণ্য হয়।

তাওহীদ বিনষ্টকারী কতিপয় বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১। আল্লাহর সাথে শরীক করা

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি এ প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আপনি আল্লাহর সাথে শরীক (কাউকে) করেন, তবে আপনার সকল আমল বাতিল বা নিস্ফল হয়ে যাবে। এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন।" *(আয-যুমারঃ ৬৫)*

আল্লাহ আরও বলেনঃ **"নিশ্চই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতকে হারাম করে দিবেন আর তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।"** *(সুরা মায়েদাহঃ ৭২)*

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, কাউকে ভয় করা, অন্যের উপর ভরসা করা, অন্যের উদ্দেশ্যে মানত-মানসা করা, অন্যকে উপকার ও অপকারের মালিক মনে করা, আল্লাহর যেমন ক্ষমতা, অন্য কারো এরূপ ক্ষমতা রয়েছে বিশ্বাস করা ইত্যাদি সবই শির্ক।

২। আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে এমন মাধ্যম স্থির করা যার কাছে বান্দা সুপারিশ কামনা করে এবং তার ওপর তাওয়াক্কুল করা

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ

“তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর উপাসনা করে, যা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পাওে না উপকারও করতে পাওে না। তারা বলেঃ এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী।” *(ইউনুসঃ ১৮)*

আল্লাহ অন্যত্র আরোও বলেনঃ **“আর যারা তাকে ব্যতীত অলী আউলিয়া ধারণ করেছে (এবং প্রার্থনা ও মান্নত মানসা ইত্যাদি ইবাদত সাব্যস্ত করে) তারা বলে আমরা তাদের উপাসনা করি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিবে।”** *(সুরা যুমারঃ ৩)*

এটা হচ্ছে আউলিয়া এবং নেককার লোকদের কবরের উদ্দেশ্যে যারা যায় তাদের অবস্থা। তারা সেখানে গিয়ে কবরবাসিকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত হয়, কবরবাসী আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে এ বিশ্বাসে যেমনঃ তাদের কাছে দোয়া করা, তাদের উদ্দেশ্যে মানত করা, পশু যবাই করা, তাদের কাছে সাহায্য কামনা করা এবং কবরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করা।

৩। মুশরিকদেরকে কাফের মনে না করা অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের কুফরী মতবাদকে সহীহ মনে করা

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ **“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।”** *(আল ইমরান-১৯)*

অন্যত্র বলেনঃ **“যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করবে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।”** *(সুরা আল ইমরান ৩ঃ ৮৫)*

এখানে সন্দেহ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, মুসলিম উম্মাহ যার কাফের হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে তার কুফরীর ব্যাপারে কোনো মুসলমানের সন্দেহ পোষণ করা যেমনঃ ইহুদী নাসারা মুশরিক (অর্থাৎ ইহুদী নাসারা ও মুশরিকদের কুফরীর ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর কোনো দ্বিমত নেই, তাই কোনো মুসলমান এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। করলে সেও কুফরী মতবাদে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে)। এ দৃষ্টি কোন থেকে জাহেলি যুগের মুশরিক যারা নিজেদের মুশরিক হওয়ার ব্যাপারে নিজেরাই স্বাক্ষ্য প্রদান করেছিলো, আর বর্তমান যুগের মুশরিক যারা ইসলাম ও ঈমানের দাবী করে অথচ আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট হককে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, এই দুই ধরনের মুশরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

ইমাম শওকানী (রহঃ) বলেনঃ শিরক নামকরণকৃত কতিপয় বিষয়ের ওপর শুধু মাত্র শিরক নাম জুড়ে দিলেই শিরক বলা যায় না, বরং শিরক হচ্ছে গাইরুল্লাহর জন্য এমন কাজ করা যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই নির্দিষ্ট। চাই সে কাজ জাহেলী যুগের কোনো নামেই হোক, অথবা বর্তমান যুগের অন্য কোনো নামেই হোক। এক্ষেত্রে নামে কিছুই আসে যায় না। (অর্থ্যৎ কোনো কাজ যদি শিরকের অন্তর্ভূক্ত হয়। তাহলে সেটা যে যুগেই হোক, আর যে নামেই হোক, শিরক হিসেবেই গণ্য হবে। যেমনঃ ভক্তির নামে গাইরুল্লাহকে সেজদা করা)।

৪। রাসূল (সঃ) এর দ্বীন, অথবা (পুন্য কাজের) সাওয়াব অথবা (পাপের জন্য) শাস্তি এবং দ্বীনের যে কোনো বিষয় রং-তামাশা বিদ্রুপ করা কুফরী

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ
لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর আয়াত সমূহের সাথে, তার রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? তামাশা করো না, তোমরা তো ঈমান প্রকাশ করার পর কাফের হয়ে গেছো।” *(আত-তাওবাহঃ ৬৫-৬৬)*

ইমাম মোহাম্মদ বিন আঃ ওয়াহ্হাব তাঁর কাশফুশ শুবহাত পুস্তিয়কায় বলেনঃ “এটা যখন নিশ্চিত ভাবে প্রমানিত যে কতিপয় মুনাফিক যারা রাসুল (সঃ) এর সাথে রূমের যুদ্ধে অংশগ্রহন করে ও তাদের ঠাট্টা বিদ্রুপাত্মক কথা দ্বারা কুফরী করেছে, তখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, যে ব্যক্তি সম্পদের স্বল্পতার আশংকায় কিংবা কিছু প্রাপ্তির আশায় অথবা কারো মনতুষ্টির জন্য কুফরী কথা বলল অথবা কুফরী কর্ম করল, সে অবশ্যই ঐ ব্যক্তির চেয়ে জঘন্য কাজ করেছে যে ঠাট্টা ও বিদ্রুপাত্মক কথা বলেছে।

এমন অবস্থা আজকাল অনেক নামধারী মুসলিমদের যারা পর্দা করা, দাড়ি রাখা অথবা দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করে প্রকারান্তরে তারা যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের সাথে ঠাট্টা করে ।

৫ । যাদু

যাদুর মধ্যে রয়েছে (যাদু-মন্ত্র দ্বারা) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিছিন্নতা সৃষ্টি করা; উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করা । তাছাড়া "তাওলার" আশ্রয় নেয়া । তাওলা হচ্ছে (যাদু মন্ত্রের সাহায্যে) স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে বশীভূতকরণ, যাতে স্ত্রীর ভালবাসায় স্বামী পাগল প্রায় হয়ে থাকে । এটা শিরক হওয়ার কারণ হচ্ছে, এর দ্বারা বিপদাপদ দূর করা এবং উপকার বা কল্যাণ সাধনের বিষয়টিকে গাইরুল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা হয় । এটা নিঃসন্দেহে কুফরী ।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ

"তারা উভয়েই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিতো না যে, দেখো, আমরা নিছক পরীক্ষা মাত্র অতএব তুমি কুফরী করো না ।" *(আল-বাকারাহঃ ১০২)*

৬ । মুসলমানদের বিরূদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নেয়া ও সহযোগিতা করা

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে । নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা জালেমদেরকে হেদায়াত করেন না ।" *(মায়েদাহঃ ৫১)*

৭ । মূর্তি, প্রতিমা, মানব রচিত সংবিধান ইত্যাদি সহ অন্যান্য তাগুতকে সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করার জন্য শপথ করা

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেনঃ অন্তরে আল্লাহর দ্বীনের স্থান হবে ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে, দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং গাইরুল্লাহর প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমে, দ্বীনের স্থান হবে মুখে স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং কুফরী কথা পরিত্যাগের মাধ্যমে । এমনি ভাবে দ্বীনের স্থান হবে অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কার্যকর করা এবং যাবতীয় কুফরী কর্ম পরিত্যাগ করার মাধ্যমে । এ তিনটি বিষয়ের কোনো একটি বিষয় যদি বান্দা পরিত্যাগ না করে তাহলে সে কুফরী করলো এবং দ্বীন পরিত্যাগ করলো বলে বিবেচিত হবে । *(আদ্দোরার অস্সুন্নিয়া (৮/৭৮)*

৮ । মুহাববত ও ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথবা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِّلَّهِ

"আর কোনো কোনো লোক এমনও রয়েছে, যারা অন্যন্যকে আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে । কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় অনেক বেশী ।" *(বাকারা; ১৬৫)*

৯ । যে ব্যক্তি মনে করে যে, নবী (সঃ) এর নিয়ে আসা বিধানের চেয়ে অন্য বিধান পরিপূর্ণ বা উত্তম

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ **"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হলে ইসলাম ।"** *(আল ইমরান-১৯)*

অন্যত্র বলেনঃ **"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করবে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে ।"** *(সুরা আল ইমরান ৩ঃ ৮৫)*

হাদীসে বর্ণনা আছে, নবী মুহাম্মাদ (সঃ) বলেছেনঃ "ঐ জাতের শপথ যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত রয়েছে, এই উম্মাতের ইহুদী হোক আর খ্রিষ্টান হোক আমার সম্পর্কে শোনার পর যদি আমার প্রতি এবং আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে তবে অবশ্যই সে জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে গন্য হবে ।" *(মুসলিম)*

১০ । আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া

আল্লাহ বাণীঃ **"যে ব্যক্তিকে তার রবের আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছে অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে তার চেয়ে বড় যালিম কে? নিশ্চয় আমি অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী ।"** *(সুরা সাজদাহঃ ২২)*

এসব ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়ের ক্ষেত্রে অবহেলাকারী বা ভয় দ্বারা প্রভাবিতদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই । তবে যে ব্যক্তি নিরূপায় ও বাধ্য তার কথা ভিন্ন । এগুলো সবই অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সচরাচরই ঘটে থাকে । মুসলমানের উচিত এগুলোতে পতিত হওয়ার আশংকায় ভীত এবং সতর্ক থাকা । যে সব কাজ আল্লাহর ক্রোধ এবং তার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে অপরিহার্য করে দেয় সেগুলো থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি ।

সংশয় নিরসনঃ যারা বলে لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ মুখে উচ্চারণই যথেষ্ট

(যারা মনে করে যে لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট, বাস্তবে তার বিপরীত কিছু করলে ক্ষতি নেই, তাদের একথার জবাব, সূত্রঃ কাশফুশ শুবহাত, ইমাম মোহাম্মদ বিন আঃ ওয়াহ্হাব)

মানুষের মনে একটা সংশয় বদ্ধমূল হয়ে আছে । তাহলো এই যে, তারা বলে থাকে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমা পাঠ করা সত্ত্বেও হযরত উসামা (রাঃ) যাকে হত্যা করেছিলেন, নবী (সাঃ) সেই হত্যাকান্ডটাকে সমর্থন করেননি ।

এইরূপ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এই হাদীসটিও তারা পেশ করে থাকে যেখানে তিনি বলেছেনঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে (মুখে উচ্চারণ করে) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' । লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর উচ্চারণকারীদের হত্যা করা সম্বন্ধেও আরও অনেক হাদীস তারা তাদের মতের সমর্থনে পেশ করে থাকে ।

এই মূর্খদের এসব প্রমান পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যারা মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করবে তাদেরকে কাফের বলা যাবে না এবং তারা যা ইচ্ছা তাই করুক, তাদেরকে হত্যা করাও চলবে না ।

এই সব জাহেল মুশরিকদের বলে দিতে হবে যে, একথা সর্বজনবিদিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইয়াহুদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাদেরকে কয়েদ করেছেন যদিও তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলত ।

আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবাগণ বানূ হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যদিও তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল; তারা নামাযও পড়তো এবং ইসলামেরও দাবী করত ।

ঐ একই অবস্থা তাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য যাদেরকে হযরত আলী (রাঃ) আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন । এছাড়া ঐ সব জাহেলরা স্বীকার করে যে, যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তারা কাফের হয়ে যায় এবং হত্যারও যোগ্য হয়ে যায়– তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সত্ত্বেও । অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের যে কোন একটিকে অস্বীকার করে, সে কাফের হয়ে যায় এবং সে হত্যার যোগ্য হয় যদিও সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে । তা হলে ইসলামের একটি অঙ্গ অস্বীকার করার কারণে যদি তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর উচ্চারণ তার কোন উপকারে না আসে, তবে রাসূলগণের দ্বীনের মূল ভিত্তি যে তাওহীদ এবং যা হচ্ছে ইসলামের মুখ্য বস্তু, যে ব্যক্তি সেই তাওহীদকেই অস্বীকার করল তাকে ঐ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর উচ্চারণ কেমন করে বাঁচাতে সক্ষম হবে? কিন্তু আল্লাহর দুশমনরা হাদীস সমূহের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে না ।

হযরত ওসামা (রাঃ) হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তিনি একজন ইসলামের দাবীদারকে হত্যা করেছিলেন এই ধারণায় যে, সে তার জান ও মালের ভয়েই ইসলামের দাবী জানিয়েছিল ।

কোন মানুষ যখন ইসলামের দাবী করবে তার থেকে ইসলামবিরোধী কোন কাজ প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে । এ সম্বন্ধে কুরআনের ঘোষণা এই যে,

"হে মু'মিন সমাজ! যখন তোমরা আল্লাহর রাহে বহির্গত হও, তখন (কাহাকেও হত্যা করার পূর্বে) সব বিষয় তদন্ত করে দেখিও ।" (সুরা নিসাঃ ৯৪)

অর্থাৎ তার সম্বন্ধে তথ্যাদি নিয়ে দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত হইও । এই আয়াত পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এরূপ ব্যাপারে হত্যা থেকে বিরত থেকে তদন্তের পর স্থির নিশ্চিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য । তদন্তের পর যদি তার ইসলামবিরোধিতা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তবে তাকে হত্যা করা যাবে । যেমন আল্লাহ বলেছেন, (ফাতাবাইয়ানূ) অর্থাৎ তদন্ত করে দেখ । তদন্ত করার পর দোষী সাব্যস্ত হলে হত্যা করতে হবে । যদি এই অবস্থাতে হত্যা না করা হয় তা হলেঃ 'ফাতাবাইয়ানু'– তাসাব্বুত (অর্থ) অর্থাৎ স্থির নিশ্চিত হওয়ার কোন অর্থ হয় না ।

এইভাবে অনুরূপ হাদীসগুলোর অর্থ বুঝে নিতে হবে । ঐগুলোর অর্থ হবে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি । অর্থাৎ যে ব্যক্তির মধ্যে তাওহীদ ও ইসলাম প্রকাশ্যভাবে পাওয়া যাবে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকতে হবে- যে পর্যন্ত বিপরীত কোন কিছু

প্রকাশিত না হবে। এ কথার দলীল হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কৈফিয়তের ভাষায় ওসামা (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ তুমি হত্যা করেছ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও?

এবং তিনি আরও বলেছিলেনঃ 'আমি লোকদেরকে হত্যা করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলবেঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। সেই রাসূলই কিন্তু খারেজীদের সম্বন্ধে বলেছেনঃ

অর্থাৎ "যেখানেই তোমরা তাদের পাবে, হত্যা করবে, আমি যদি তাদের পেয়ে যাই তবে তাদেরকে হত্যা করব 'আদ জাতির মত সার্বিক হত্যা।" (*বুখারী ও মুসলিম*); যদিও তারা ছিল লোকদের মধ্যে অধিক ইবাদতগুযার, অধিক মাত্রায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সুবাহানাল্লাহ উচ্চারণকারী।

খারেজীরা এমন বিনয়-নম্রতার সঙ্গে নামায আদায় করত যে, সাহাবাগণ পর্যন্ত নিজেদের নামাযকে তাদের নামাযের তুলানায় তুচ্ছ মনে করতেন। তারা কিন্তু ইলম শিক্ষা করেছিল সাহাবাগণের নিকট হতেই। কিন্তু কোনই উপকারে আসল না তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, তাদের অধিক পরিমাণ ইবাদত করা এবং তাদের ইসলামের দাবী করা, যখন তাদের থেকে শরী'আতের বিরোধী বিষয় প্রকাশিত হয়ে গেল।

ঐ একই পর্যায়ের বিষয় হচ্ছে ইয়াহুদদের হত্যা এবং বানু হানীফার বিরুদ্ধে সাহাবাদের যুদ্ধ ও হত্যাকান্ড। ঐ একই কারণে নবী (সঃ) বানু মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন যখন তাঁকে একজন লোক এসে খবর দিল যে, তারা যাকাত দিবে না। এই সংবাদ এবং অনুরূপ অবস্থায় তদন্তের পর স্থির নিশ্চিত হওয়ার জন্য আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেনঃ

"হে মুমিন সমাজ! যখন কোন ফাসেক ব্যক্তি কোন গুরুতর সংবাদ নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করে, তখন তোমরা তার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখো।" (*সুরা হুজরাতঃ ৬*)

উপরোক্ত সংবাদদাতা তাদের সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিল।

এইরূপে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে সমস্ত হাদীসকে তারা হুজ্জত রূপে পেশ করে থাকে তার প্রত্যেকটির তাৎপর্য্য তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি।

সংশয় নিরসনঃ যে ব্যক্তি দ্বীনের কতিপয় ফরয ওয়াজেব অর্থাৎ অবশ্যকরণীয় কর্তব্য পালন করে, সে তাওহীদ বিরোধী কোন কাজ করে ফেললেও কাফের হয়ে যায় না। যারা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তাদের ভ্রান্তির নিরসন এবং তার বিস্তারিত প্রমাণপঞ্জী

উপরের আলোচনায় একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, যাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিহাদ করেছেন তারা এদের (আজকের দিনে শির্কী কাজে লিপ্ত- নামধারী মুসলমানদের) চাইতে ঢের বেশী বুদ্ধিমান ছিল এবং তাদের শির্ক অপেক্ষাকৃত লঘু ছিল। অতঃপর একথাও তুমি জেনে রাখো যে, এদের মনে আমাদের বক্তব্যের ব্যাপারে যে ভ্রান্তি ও সন্দেহ-সংশয় রয়েছে সেটাই তাদের সব চাইতে বড় ও গুরুতর ভ্রান্তি। অতএব এই ভ্রান্তিও অপনোপদন ও সন্দেহের অবসান কল্পে নিম্নের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনঃ

তারা বলে থাকেঃ যাদের প্রতি সাক্ষাৎভাবে কুরআন নাযিল হয়েছিল (অর্থাৎ মক্কার কাফির-মুশরিকগণ) তারা আল্লাহ ছাড়া কোনই মা'বুদ নেই একথার সাক্ষ্য প্রদান করে নাই, তার রাসূল (সঃ)-কে মিথ্যা বলেছিল, তারা পুররুত্থানকে অস্বীকার করেছিল, তারা কুরআনকে মিথ্যা বলেছিল এবং বলেছিল এটাও একটি যাদু মন্ত্র। কিন্তু আমরা তো সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, আল্লাহ ছাড়া নেই কোন মাবুদ এবং (এ সাক্ষ্যও দেই যে,) নিশ্চয় মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর রাসূল, আমরা কুরআনকে সত্য বলে জানি ও মানি আর পুনরুত্থান এর বিশ্বাস রাখি, আমরা নামায পড়ি এবং রোযাও রাখি, তবু আমাদেরকে এদের (উক্ত বিষয়ে অবিশ্বাসী কাফেরদের) মত মনে কর কেন?

এর জওয়াব হচ্ছে এই যে, এ বিষয়ে সমগ্র আলেম সমাজ তথা শরীআতের বিদ্বান মন্ডলী একমত যে, একজন লোক যদি কোন কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সত্য বলে মানে আর কোন কোন বিষয়ে তাকে মিথ্যা বলে ভাবে, তবে সে নির্ঘাত কাফের, সে ইসলামে প্রবিষ্টই হতে পারে না; এই একই কথা প্রযোজ্য হবে তার উপরেও যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করল, আর কতক অংশকে অস্বীকার করল, তাওহীদকে স্বীকার করল কিন্তু নামায যে ফরয তা মেনে নিল না। অথবা তাওহীদও স্বীকার করল, নামাযও পড়ল কিন্তু যাকাত যে ফরয তা মানল না; অথবা এগুলো সবই স্বীকার করল কিন্তু রোযাকে অস্বীকার করে বসল কিংবা ঐ গুলো সবই স্বীকার করল কিন্তু একমাত্র হজ্বকে অস্বীকার করল, এরা সবাই হবে কাফের।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় কতক লোক হজ্জকে ইনকার করেছিল, তাদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেনঃ

"(পথের কষ্ট সহ্য করতে এবং) রাহা খরচ বহনে সক্ষম যে ব্যক্তি (সেই শ্রেণীর) সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহের (কা'বাতুল্লাহর) হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য, আল্লাহ হচ্ছেন সমুদয় সৃষ্টি জগত হতে বেনেয়াষ।" *(আল ইমরানঃ ৯৭)*

কোন ব্যক্তি যদি এগুলো সমস্তই (অর্থাৎ তাওহীদ, নামায, যাকাত, রামাযানের সিয়াম, হজ্জ) মেনে নেয় কিন্তু পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যাবে। তার রক্ত এবং তার ধন-দৌলত সব হালাল হবে (অর্থাৎ তাকে হত্যা করা এবং তার ধন-মাল লুট করা সিদ্ধ হবে) যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

"নিশ্চয় যারা অমান্য করে আল্লাহকে তাঁর রাসূলদেরকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের (আনুগত্যের) মধ্যে প্রভেদ করতে চায় আর বলে কতককে আমরা বিশ্বাস করি আর কতককে অমান্য করি এবং তারা ঈমানের ও কুফরের মাঝামাঝি একটা পথ আবিষ্কার করে নিতে চায়–এই যে লোক সমাজ সত্যই তারা হচ্ছে কাফের, বস্তুতঃ কাফেরদিগের জন্য আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি এক লাঞ্ছনা দায়ক শাস্তি।" *(আন নিসাঃ ১৫০)*

আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কালাম পাকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের কিছু অংশকে মানবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে, সে সত্যিকারের কাফের এবং তার প্রাপ্য হবে সেই বস্তু (শাস্তি) যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। এতদ্বারা এ সম্পর্কিত ভ্রান্তিও অপনোদন ঘটছে।

আর এই একথাও বলা যাবেঃ তুমি যখন স্বীকার করছ যে, যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলকে সত্য জানবে আর কেবল নামাযের ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হবে, আর তার জান-মাল হালাল হবে, ঐরূপ সব বিষয় মেনে নিয়ে যদি পরকালকে অস্বীকার করে তবুও কাফের হয়ে যাবে।

ঐরূপই সে কাফের হয়ে যাবে যদি ঐ সমস্ত বস্তুর উপর ঈমান আনে আর কেবল মাত্র রমযানের রোযাকে ইনকার করে। এতে কোন মাযহাবেরই দ্বিমত নেই। আর কুরআনও এ কথাই বলেছে, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। সুতরাং জানা গেল যে, নবী (সঃ) যে সব ফরয কাজ নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে তাওহীদ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় এবং তা নামায, রোযা ও হজ্জ হতেও শ্রেষ্ঠতর।

যখন মানুষ নবী (সঃ) কর্তৃক আনীত ফরয, ওয়াজেব সমূহের সবগুলোকে মেনে নিয়ে ঐগুলোর একটি মাত্র অস্বীকার করে কাফের হয়ে যায় তখন কি করে সে কাফের না হয়ে পারে যদি রাসূল, সমস্ত দ্বীনের মূল বস্তু তাওহীদকেই সে অস্বীকার করে বসে? সুবহানাল্লাহ! কি বিস্ময়কর এই মূর্খতা!

তাকে এ কথাও বলা যায় যে, মহানবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ বানু হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, অথচ তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা সাক্ষ্য প্রদান করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই আর মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল। এ ছাড়া তারা আযানও দিত এবং নামাযও পড়ত।

সে যদি তাদের এই কথা পেশ করে যে, তারা তো মুসায়লামা (কায্যাব)-কে একজন নবী বলে মেনেছিল।

তবে তার উত্তরে বলবেঃ ঐটিই তো আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে নবীর মর্যাদায় উন্নীত করে তবে সে কাফের হয়ে যায় এবং তার জান মাল হালাল হয়ে যায়, এই অবস্থায় তার দুটি সাক্ষ্য (প্রথম সাক্ষ্যঃ আল্লাহ ছাড়া নেই অপর কোন ইলাহ, দ্বিতীয় সাক্ষ্যঃ মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল) তার কোনই উপকার সাধন করবে না।

নামায ও তার কোন কোন উপকার করতে সক্ষম হবে না। অবস্থা যখন এই, তখন সেই ব্যক্তির পরিমান কি হবে যে, শিমসান, ইউসুফ (অতীতে নাজদে এদের উদ্দেশ্যে পূজা করা হত) বা কোন সাহাবা বা নবীকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করে? পাক পবিত্র তিনি, তাঁর শান-শাওকাত কত উচ্চ ।

"আল্লাহ এই ভাবেই যাদের জ্ঞান নেই তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন।" *(সুরা রূমঃ ৫৯)*

প্রতিপক্ষকে এটাও বলা যাবেঃ হযরত আলী (রাঃ) যাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে মেরেছিলেন তারা সকলেই ইসলামের দাবীদার ছিল এবং হযরত আলীর অনুগামী ছিল, অধিকন্তু তারা সাহাবাগণের নিকটে শিক্ষা লাভ করেছিল। কিন্তু তারা হযরত আলীর সম্বন্ধে ঐরূপ বিশ্বাস রাখত যেমন ইউসুফ, শিসমান এবং তাদের মত আরও অনেকের সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ করা হত। (প্রশ্ন হচ্ছে) তাহলে কি করে সাহাবাগণ তাদেরকে (ঐভাবে) হত্যা করার ব্যাপারে এবং তাদের কুফরীর উপর একমত হলেন? তাহলে তোমরা কি ধারণা করে নিচ্ছ যে, সাহাবাগণ মুসলমানকে কাফেরের রূপে আখ্যায়িত করেছেন? জানি তোমরা ধারণা করছ যে, তাজ এবং এবং অনুরূপ ভাবেই অন্যান্যের উপর বিশ্বাস রাখা ক্ষতিকর নয়, কেবল হযরত আলীর প্রতি ভ্রান্ত বিশ্বাস রাখাই কুফরী?

আর এ কথাও বলা যেতে পারে যে, যে বানু ওবায়দ আল কান্দাহ বানু আব্বাসের শাসন কালে মরক্কো প্রভৃতি দেশে ও মিসরে রাজত্ব করেছিল, তারা সকলেই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কালেমার সাক্ষ্য দিত–ইসলামকেই তাদের ধর্ম বলে

দাবী করত। জুমা ও জামাআতে নামাযও আদায় করত। কিন্তু যখন তারা কোন কোন বিষয়ে শরী'আতের বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণের কথা প্রকাশ করল, তখন তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর আলেম সমাজ একমত হলেন। আর তাদের দেশকে দুরুল হরব বা যুদ্ধের দেশ বলে ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ যুদ্ধ করলেন। আর মুসলমানদের শহরগুলোর মধ্যে যেগুলো তাদের হস্তগত হয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করে নিলেন।

তাকে আরও বলা যেতে পারে যে, পূর্ব যুগের লোকদের মধ্যে যাদের কাফের বলা হত তাদের এজন্যই তা বলা হত যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে শির্ক ছাড়াও রাসূল (সঃ) ও কুরআনকে মিথ্যা জানতো এবং পুনরুত্থান প্রভৃতিকে অস্বীকার করত। কিন্তু এটাই যদি প্রকৃত এবং একমাত্র কারণ হয় তাহলে বাবু হুকমিল মুরতাদ--- মুরতাদের হুকুম নামীয় অধ্যায় কি অর্থ বহন করবে যা সব মাযহাবের আলেমগণ বর্ণনা করেছেন? "মুরতাদ হচ্ছে সেই মুসলিম, যে ইসলাম গ্রহণের পর কুফরীতে ফিরে যায়।"

তারপর তারা মুরতাদের বিভিন্ন প্রকরণের উল্লেখ করেছেন আর প্রত্যেক প্রকারের মুরতাদকে কাফের বলে নির্দেশিত করে তাদের জান এবং মাল হালাল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এমন কি তারা কতিপয় লঘু অপরাধ যেমন অন্তর হতে নয়, মুখ দিয়ে একটা অবাঞ্ছিত কথা বলে ফেলল অথবা ঠাট্টা মশকরার ছলে বা খেল-তামাশায় কোন অবাঞ্ছিত কথা উচ্চারণ করে ফেলল। এমন অপরাধীদেরও মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের এ কথাও বলা যেতে পারেঃ যে তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেনঃ

অর্থাৎ **"তারা আল্লাহর নামে হলফ করে বলছেঃ কিছুই তো আমরা বলিনি" অথচ কুফরী কথাই তারা নিশ্চয় বলছে, ফলে ইসলামকে স্বীকার করার পর তারা কাফের হয়ে গিয়েছে।"** *(সুরা তওবাঃ ৭৪)*

তুমি কি শুননি মাত্র একটি কথার জন্য আল্লাহ এক দল লোককে কাফের বলছেন, অথচ তারা ছিল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমসাময়িক কালের লোক এবং তারা তাঁর সঙ্গে জিহাদ করেছে, নামায পড়েছে যাকাত দিয়েছে, হজ্জব্রত পালন করেছে এবং তাওহীদের উপর বিশ্বাস রেখেছে?

আর ঐসব লোক যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেনঃ

"তুমি বলঃ তোমরা কি ঠাট্টা তামাশা করছিলে আল্লাহ ও তাঁর আয়াতগুলোর এবং তাঁর রাসূলের সম্বন্ধে? এখন আর কৈফিয়ত পেশ করো না। তোমরা নিজেদের ঈমান প্রকাশ করার পরও তো কুফরী কাজে লিপ্ত ছিলে।" *(তওবা ৬৫-৬৬)*

এই লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেনঃ তারা ঈমান আনার পর কাফের হয়েছে। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তারা তো মাত্র একটি কথাই বলেছিল এবং সেটা হাসি ও ঠাট্টার ছলে।

অতএব, তুমি এ সংশয় ও ধোঁকাগুলোর ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ। সেটা হলঃ তারা বলে, তোমরা মুসলমানদের মধ্যে এমন লোককে কাফের বলছ যারা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তারা নামায পড়ছে, রোযা রাখছে। তারপর তাদের এ সংশয়ের জওয়াবও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ। কেননা এই পুস্তকের বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে এটাই উপকারজনক। এই বিষয়ের আর একটা প্রমাণ হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত সেই কাহিনী যা আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাইলের সম্বন্ধে বলেছেন। তাদের ইসলাম, তাদের জ্ঞান এবং সত্যাগ্রহ সত্বেও তারা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছিলঃ

"আমাদের জন্যও একটা ঠাকুর বানিয়ে দাও তাদের ঈশ্বরগুলোর-মত।" *(সুরা আরাফঃ ১৩৮)*

ঐরূপ সাহাবাগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেনঃ

"আমাদের জন্য যাতে আনওয়াত প্রতিষ্ঠা করে দিন। তখন নবী (সঃ) হলফ করে বললেনঃ এটা তো বনী ইসরাইলদের মত কথা যা তারা মূসা (আঃ)-কে বলেছিলঃ আমাদের জন্যও একটা ইলাহ বানিয়ে দাও তাদের মূর্তির মত।"

শিরকের প্রকারভেদ এবং প্রচলিত শিরক

শিরকের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানার পূর্বে তাওহীদের ধরণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাওহীদের প্রধান তিনটি ধরণ হচ্ছে-

- তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বা কার্যাবলীতে আল্লাহর এককত্ব;
- তাওহীদুজ জাত ওয়াল আসমা ওয়াস সিফাত বা আল্লাহর সত্ত্বা, নাম এবং গুনাবলীর ক্ষেত্রে এককত্ব;
- তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব;

অনুরূপভাবে শিরক ও এ তিন ভাবেই হয়ে থাকে-

- রুবুবিয়্যাহ বা কার্যাবলীতে আল্লাহর সাথে শিরক;

- জাত ওয়াল আসমা ওয়াস সিফাত বা আল্লাহর সত্ত্বা, নাম এবং গুনাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শিরক;
- উলুহিয়্যাহ বা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শিরক;

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ

আল্লাহর কার্যাবলী, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব মেনে নেয়াই হচ্ছে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এর প্রতি ঈমানের দাবী। এর ভিত্তি হচ্ছে যখন কিছুই ছিলনা তখন আল্লাহ একাই সকল সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দেন; সৃষ্টি থেকে অথবা সৃষ্টির জন্য কোন প্রয়োজন মেটানোর কারণ ব্যতিরেকেই আল্লাহ সৃষ্ট জগৎ প্রতিপালন করেন। তিনি সমগ্র বিশ্ব ও এর অধিবাসীদের একমাত্র রব এবং তাঁর সার্বভৌমত্বের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আল্লাহই একমাত্র সর্বশক্তিমান, তিনিই সকল বস্তুর চলাফেরা ও পরিবর্তনের ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি যেটুকু ঘটনা ঘটাতে দেন সেটুকু ব্যতীত সৃষ্টি জগতে কিছুই ঘটে না। আরবী ভাষায় "রবুবিয়াহ" শব্দটির মূল ধাতু হচ্ছে "রব" (প্রতিপালক) যা একই সাথে সৃষ্টি ক্ষমতা এবং প্রতিপালন উভয় গুণের পরিচয় বহন করে। তাওহীদুর রুরুবিয়্যার প্রতি ঈমানের দাবী হচ্ছে নিম্নোলিখিত ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব মেনে নেয়াঃ

১. আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা- সূরা আন'আম ৬ঃ১০২/ আরাফ ৭ঃ৫৪/ যুমার ৩৯ঃ৬৫/ সাফফাত ৩৭ঃ৯৬।

২. তিনিই আসমান, যমীন এবং এর মধ্যবতী সবকিছুর প্রতিপালক- সূরা ফাতিহা ১ঃ১/ শুয়ারা ২৬ঃ২৪/ নাসঃ১।

৩. তিনিই সবপ্রানীর একমাত্র জীবিকা দাতা- সূরা হুদ ১১ঃ৬/ যারিয়াত ৫১ঃ৫৮।

৪. সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র মালিকানা তাঁরই- সূরা বাকারা ২ঃ২৫৫/ মু'মিনুন ২৩ঃ৮৪-৮৫।

৫. আল্লাহই আসমান-যমীন সহ সব কিছুর পরিচালনাকারী- সূরা সাজদা ৩২ঃ৫।

৬. আল্লাহই আসমান, যমীন এবং এর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী- সূরা মু'মিনুন ২৩ঃ৮৮।

৭. আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী- সূরা আলে ইমরান ৩ঃ২৬/ ফোরকান ২৫ঃ২/ আরাফ ৭ঃ১৫৮।

৮. আল্লাহই একমাত্র আইন বিধান দাতা, হালাল-হারাম ঘোষণাকারী- সূরা ইউসুফ ১২ঃ৪০/ আরাফ ৭ঃ৫৪/ রাদ ১৩ঃ৪১/ কাসাস ২৮ঃ৭০, ৮৮/ আন'আম ৬ঃ৫৭/ ১০ঃ৫৯/ ৯ঃ৩৭/ ৫ঃ৫০।

৯. তিনিই ভাল-মন্দ নির্ধারণকারী, সাহায্যকারী, বিপদাপদদাতা এবং মুক্তিদাতা, রক্ষাকর্তা- সূরা তাগাবুন ৬৪ঃ১১/ ইউনুস ১০ঃ১০৭/ আন'আম ৬ঃ৬৪/ আলে ইমরান ৩ঃ২৬/ ৭ঃ১৮৮/ ৩ঃ১৫০/ ৩৬ঃ৭৪-৭৫।

১০. তিনিই একমাত্র গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞানী- সূরা আন'আম ৬ঃ৫৯/ নামল ২৭ঃ৬৫/ লুকমান ৩১ঃ৩৪।

আমরা ছক আকারে দেখে নেব তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বা কার্যাবলীতে আল্লাহর এককত্ব সম্পর্কে এবং কিভাবে এ ক্ষেত্রে শিরক হয়।
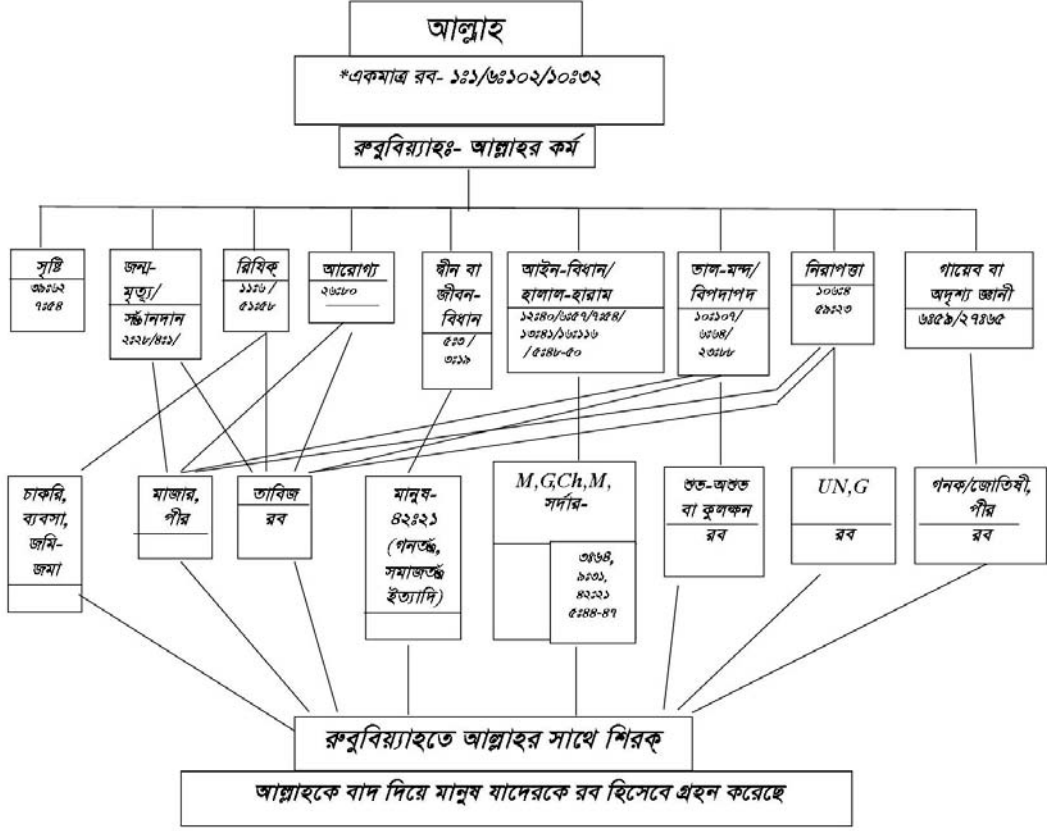
মানুষ যেভাবে মানুষের 'রব' হয়ে যায়

যে শিরোনাম দিয়ে আমি লেখাটি শুরু করেছি, তা শুনে হয়তো আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন। আসলেই তো! মানুষ আবার মানুষের 'রব' হয় কি করে? আমরা তো জানি 'রব' একমাত্র আল্লাহ তা'আয়ালা। অথচ তিনি নিজেই বলেছেনঃ

"তারা তাদের সণ্যাসী ও ধর্মযাজক (পীর, নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে) আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে-----।" *(সূরা তওবা ৯: ৩১)*

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আয়ালা তাঁর নবীকে দাওয়াতী পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়েও বলেছেনঃ

"বলো (হে নবী), 'হে আহলে কিতাবরা! এসো এমন একটি কথার ওপর আমরা একমত হই, যে ব্যাপারে তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন বিরোধ নেই। তা হলো আমরা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো গোলামী করবো না, তার সাথে কাউকে শরীক করবো না এবং আমরা একে অপরকে আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নেবো না।" *(সূরা আলি-'ইমরান ৩: ৬৪)*

সরাসরি কোরআনের আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, মানুষ মানুষকে 'রব' বানিয়ে নেয়। যদিও কারো পক্ষে 'রব' হওয়া সম্ভব নয়, তাই এখানে বুঝতে হবে যে অজ্ঞতা, জ্ঞানের স্বল্পতা, একগুয়েমী কিংবা বিভিন্ন কারণে অনেক সময় মানুষ কোনো কোনো মানুষকে এমন স্থানে বসিয়ে দেয়, এমন ক্ষমতা মানুষের হাতে তুলে দেয়; যার কারণে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত ক্ষমতার আসনে মানুষকে বসিয়ে 'রব' বানিয়ে ফেলে। আর এভাবে নিজেদের কর্মকান্ডের দ্বারা তারা নিজেদের জন্য চিরকালীন জাহান্নাম কিনে নেয়। অথচ এই লোকগুলোর ভেতরে হয়তো এমন মানুষও আছে যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্জ করে, যাকাত দেয়, দাড়ি আছে, একান্ত নিষ্ঠার সাথে তাসবীহ জপে, এমনকি তাহাজ্জুদ, এশরাক, আওয়াবীন নামাযও পড়ে। তাই মানুষ কিভাবে মানুষের 'রব' হয়ে যায়, অর্থাৎ কোন বৈশিষ্ট, গুণাবলী ও ক্ষমতা হাতে তুলে দিলে মানুষকেই রবের আসনে বসিয়ে দেয়া হয়, এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকার কারণে এই জঘন্যতম অপরাধ যদি আমরা কেউ করে বসি, তাহলে যত নেক আমলই করি না কেন তা কোনো কাজে আসবে না এবং কোনো ইবাদতই কবুল হবে না। এ ব্যাপারে কেয়ামতের দিন কোনো ওজর ওজুহাত চলবে না, জানতাম না বলেও পার পাওয়া যাবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে কোরআনে বলে দিয়েছেনঃ

"(হে মানবজাতি) স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন তোমাদের 'রব' আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের পরবর্তী বংশধরদের বের করে এনেছেন এবং তাদেরকেই তাদের নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য রেখে বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের একমাত্র 'রব' নই? তারা সবাই বললো, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম (যে আপনিই আমাদের একমাত্র 'রব')', এই সাক্ষ্য আমি এজন্যই নিলাম যে, হয়তো কেয়ামতের দিন তোমরা বলে বসবে যে, আমরা আসলে বিষয়টি জানতামই না। অথবা তোমরা হয়তো বলে বসবে যে, আমরা তো দেখেছি আমাদের বাপ-দাদারা আগে থেকেই এই শেরকী কর্মকান্ড করে আসছে (সুতরাং আমরা তো অপরাধী না, কারণ) আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর মাত্র। তারপরও কি তুমি পূর্ববর্তী বাতিলপন্থীদের কর্মকান্ডের কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে?" *(সূরা আরাফ ৭:১৭২-১৭৩)*

আল্লাহ (সুবঃ) কোরআনের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে কোনো অজুহাত চলবে না, জানতাম না বলেও কোন লাভ হবে না। তাই আসুন আমরা কোরআনের উপস্থাপিত বাস্তব ঘটনার আলোকে বুঝতে চেষ্টা করি কিভাবে মানুষ মানুষের 'রব' হয়ে যায়। কেননা কোরআনের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করলে আমাদের জন্য বিষয়টি নির্ভুলভাবে বোঝা অনেক সহজ হয়ে যাবে। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি বিষয় জেনে নিন, কোরআনে যখন কোন ব্যক্তি বা জাতির ইতিহাস তুলে ধরা হয় তখন বুঝতে হবে ইতিহাস বা গল্প শোনানোই এখানে উদ্দেশ্য নয়, বরং ব্যক্তি কিংবা জাতি কী কাজ করেছিলো এবং এর ফলে তাদের কী পরিণতি হয়েছে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে ঐ কাজের পুনরাবৃত্তি থেকে উম্মতে মুহাম্মদীকে সতর্ক করাই ইতিহাস তুলে ধরার উদ্দেশ্য। আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, কোরআনে যখনই কোন চরিত্রের উল্লেখ হবে, বুঝতে হবে এ ধরনের চরিত্র কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকবে।

কোরআনের আলোকে মানুষ কিভাবে মানুষের 'রব' হয়ে যায় তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে মানব জাতির অতীত ইতিহাসেই শুধু নয় বর্তমান বিশ্বেও অসংখ্য (মিথ্যা) রবের পদচারণা আমরা সচরাচর দেখতে পাই। তবে তারা শুধু মুখ দিয়ে বলে না যে, আমরা তোমাদের 'রব'।

'রব' দাবী করা বলতে মূলতঃ কী দাবী করা হয় তা যদি আমরা সত্যিই বুঝতে চাই তাহলে কিছুক্ষণের জন্যে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে ফেরাউনের ইতিহাসের দিকে। কারণ সে যে প্রকাশ্য নিজেকে 'রব' ঘোষণা করেছিলো তা কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেঃ

"দেশবাসীকে জড় করে সে ভাষণ দিলো, অতপর সে বললো, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় 'রব'।" *(সূরা নাযিয়াত ৭৯: ২৩-২৪)*

এখন কথা হলো, ফেরাউন নিজেকে 'রব' বলতে কী বুঝিয়েছে? সে কি দাবী করেছিলো যে, সে আসমান যমীন সৃষ্টি করেছে, মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছে কিংবা পাহাড়-পর্বত যমীনের বুকে গেড়ে যমীনকে সে স্থিতিশীল করে রেখেছে?

না, এমন দাবী সে কখনো করেনি। সে যদি এমন দাবী করতো তাহলে তার সংগী-সাথীরাই তাকে পাগল বলে উড়িয়ে দিতো। বরং সে নিজেও বিভিন্ন পূজা-পার্বনে অংশ নিতো। তারও অনেক ধরনের ইলাহ, মাবুদ বা উপাস্য ছিলো। কোরআন থেকেই এর প্রমাণ দেখে নিনঃ

"ফেরাউনের জাতির নেতারা (ফেরাউনকে) বললো, আপনি কি মূসা ও তার দলবলকে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির সুযোগ দিবেন আর তারা আপনাকে ও আপনার ইলাহদের এভাবে বর্জন করে চলবে?" *(সূরা আরাফ ৭: ১২৭)*

দেখুন আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, তারও অনেক ইলাহ বা উপাস্য ছিলো। তাহলে তার 'রব' দাবী বলতে আসলে কী বুঝায়? রব বলে সে কী দাবী করেছিলো? আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র, মানব জাতিসহ কোনো সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা বলে কেউ কোনো দিন দাবী তোলেনি। মক্কার কাফের মোশরেকরাও এসবের সৃষ্টিকর্তা যে আল্লাহ তা'আলা এটা সর্বান্তঃকরণে মানতো। যেমনঃ

"জিজ্ঞাসা কর, 'এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যারা আছে তারা কার, যদি তোমরা জান?' তারা বলবে 'আল্লাহর'। বল, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?' জিজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্ত আকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি?' তারা বলবে 'আল্লাহ'। বল, 'তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?' জিজ্ঞাসা কর, 'সকল কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার উপরে আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জান?' তারা বলবে 'আল্লাহর'। বল, 'তবুও তোমরা কেমন করে মোহগ্রস্থ হয়ে আছ?" *(সূরা মু'মিনুন ২৩ঃ ৮৪-৮৯)*

এমন আরো অসংখ্য আয়াত আছে যা প্রমাণ করে যে, তারা সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, লালনকর্তা, পালনকর্তা ও রিযিকদাতা হিসাবে আল্লাহকে মানতো, সুতরাং সমস্যাটা কোথায়? এই বিশ্বাস থাকার পরও কেন তারা কাফের-মোশরেক, কেন তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত? ফেরাউন তাহলে কী দাবী করেছিলো? এই প্রশ্নগুলো শুনে হয়তো অনেকে বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবেন। কিন্তু বিভ্রান্ত হওয়ার কিংবা অন্ধকারে হাতড়ে মরার কোনো প্রয়োজনই নেই। সরাসরি আল্লাহর কালাম কোরআনই আমাদেরকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে যে, ফেরাউনের দাবী ছিল সার্বভৌমত্বের দাবী। সারা পৃথিবীতে নয় তার দাবী ছিল কেবল মিশরের শাসন

ক্ষমতার উপর নিরংকুশ আধিপত্যের দাবী। তার দাবী ছিলো মিশরের সাধারণ জনগণের জন্যে তার ইচ্ছানুযায়ী যেমন খুশী তেমন আইন-কানুন ও মূল্যবোধ নির্ধারণের ক্ষমতার দাবী। দেখুন কোরআন কী বলেছেঃ

"ফেরাউন তার জাতির উদ্দেশ্যে (এক) ভাষণ দিলো। সে বললো, মিশরের সার্বভৌমত্ব কি আমার নয়? তোমরা কি দেখছো না যে, এই নদীগুলো আমার (রাজত্বের) অধীনেই বয়ে চলছে--------।" *(সূরা যুখরুফ ৪৩:৫১)*

"এসব বলে সে তার জাতিকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুললো, এক পর্যায়ে তারা তার আনুগত্য মেনেও নিলো। এটি প্রমাণ করে যে, নিঃসন্দেহে তারা নিজেরাও ছিলো এক পাপীষ্ঠ জাতি।" *(সূরা যুখরুফ ৪৩:৫৪)*

কোরআনের আয়াতগুলো এবং বাস্তব প্রেক্ষাপট যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, চক্র বা যে কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া মানেই হলো তাকে বা তাদেরকে 'রব' বানিয়ে নেয়া। কারণ অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া মানেই হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে আইন-কানুন রচনা করার অধিকারসহ নিরংকুশ শাসন কর্তৃত্ব তাদের হাতে তুলে দেয়া।

তারা কিভাবে তাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নিয়েছিলো তা আমরা সরাসরি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর করা এই আয়াতের তাফসীরের আলোকে একেবারে স্পষ্ট করে বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ। তিরমিযীতে উদ্ধৃত হাদিসে হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে এসে দেখলাম তিনি সূরা তওবার এই আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেনঃ

"তারা তাদের সন্ন্যাসী ও ধর্মযাজক (পীর, নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে) আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে------।" *(সূরা তওবা ৯:৩১)*

অতপর রাসূল (সঃ) বলেন তোমরা শোনো তারা তাদেরকে (শাব্দিক অর্থে) পূজা/ উপাসনা করতো না, কিন্তু তারা যখন মনগড়া ভাবে কোনো কিছুকে বৈধ ঘোষণা করতো, জনগণ তা মেনে নিতো, আর যখন কোনো কিছুকে অবৈধ ঘোষণা করতো তখন তারা তা অবৈধ বলে মেনে নিতো।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে ইমাম আহমদ তিরমিযী ও ইবনে জারীরের সূত্রে আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তার কাছে ইসলামের দাওয়াত আসার পরে প্রথমে তিনি সিরিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন, পরে যখন রাসূল (সঃ) এর কাছে তিনি এলেন তখন তার গলায় ক্রুশ ঝুলানো ছিলো। তখন রাসূল (সঃ) উল্লেখিত আয়াতটি পড়ছিলেন। হযরত আদী (রাঃ) বলেন, আহলে কিতাবরা (ইহুদী ও খৃষ্টানরা) তো আলেম/ দরবেশদের (তথা নেতাদের)পূজা উপাসনা করতো না! রাসূল (সঃ) বললেন, তা সত্য। তবে তারা মনমতো কোনো কিছুকে বৈধ কিংবা অবৈধ ঘোষণা করলে জনগণ তা নির্বিচারে মেনে নিতো। এটাই তাদের পূজা-উপাসনা/ ইবাদত।

বর্তমান তাগুতী (সীমালঙ্ঘনকারী) সরকার ব্যবস্থায় এর উদাহরণ দেখুন, মদ, জুয়া, লটারী, সুদ, বেপর্দা, নারী নেতৃত্ব, বেশ্যাবৃত্তি (ব্যভিচার) এমন আরো অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা কঠোর ভাবে অবৈধ ঘোষণা করেছেন, পক্ষান্তরে, তারা এগুলোকে বৈধতার সার্টিফিকেট দিয়েছে। দন্ডবিধির বিষয়টি দেখুন, চুরি ও ডাকাতির দন্ড, ব্যভিচারের দন্ড, সন্ত্রাস দমন আইন, বিবাহ বিধিসহ আরো অনেক বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা যে বিধান আল-কোরআনের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন, তা বাদ দিয়ে তারা নিজেদের মনমতো দন্ড বিধি বৈধ করছে। এই অধিকার তারা পেলো কোথা থেকে। কে দিলো তাদেরকে এই অধিকার। যারা এদেরকে সমর্থন, রক্ষনাবেক্ষণ, সম্মান এবং প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য হচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো! ঐ দিন (বিচার দিবস) আসার পূর্বেই নিজেদের আমলকে শুধরে নাও, যেদিন কেউ কারো সাহায্য করবে না এবং প্রত্যেককে তার নিজের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তওবা করে আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থায় (ইসলামে) ফিরে এসো। কেননা আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে ঈমান আনার পূর্বে শর্ত দিয়েছেন এসব তাগুতী সরকারদের সাথে কুফরী/ অস্বীকার করার এবং এসব শয়তানী মতাদর্শকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে একমাত্র ইসলামকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

কোরআনের আয়াতের আলোকে তাওহীদ এবং শিরকের সংজ্ঞা নির্ধারণে ইসলামের আইন কানুন ও আক্বীদা বিশ্বাস একই গুরুত্ব বহন করে। আক্বীদা বিশ্বাস থেকেই এর আইন কানুন উৎসারিত। আরো সতর্কভাবে বলতে গেলে, এর আইন কানুন অবিকল এর আক্বীদা বিশ্বাস। আইন কানুন আক্বীদা বিশ্বাসেরই বাস্তব রূপ। এই মৌলিক সত্যটি কোরআনের আয়াতসমূহ থেকে এবং কোরআনের বর্ণনাভংগি থেকে সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ শত শত বছর ধরে মুসলমানদের মনে বিরাজমান ধর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাস থেকে এই সত্যটিকে অত্যন্ত সুক্ষ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এমনকি পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এতোদূর গড়িয়েছে যে, ইসলামের শত্রুরা তো দূরের কথা, এর উৎসাহী ভক্তরা পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বকে ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন একটা ব্যাপার বলে মনে করতে আরম্ভ করেছে। ইসলামের খুঁটিনাটি আমলের জন্য তারা যেমন উতলা ও আবেগদীপ্ত হয়, রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের জন্যে কিছুতেই তেমন হয় না। ইসলামের ছোটখাটো আমল আখলাক থেকে বিচ্যুতিকে যেমন তারা বিচ্যুতি গণ্য করে, ইসলামের রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় বিধান থেকে বিচ্যুতিকে

সে ধরনের বিচ্যুতি গন্য করে না। অথচ ইসলাম এমন একটা জীবন বিধান, যার আক্বীদা, আমল আখলাক, চরিত্র ও আইন কানুনে কোন বিভাজন নেই। কিছু কুচক্রী মহল সুপরিকল্পিত পন্থায় শত শত বছর ধরে এর মধ্যে বিভাজন ঢুকানোর চেষ্টা করেছে। এরই ফলে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত এমন মৌলিক বিষয়টি এতো তুচ্ছ ও ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, এমনকি ইসলামের সবচেয়ে আবেগাপুত ভক্তরাও আজকাল একে কম গুরুত্বপূর্ণ ও ঐচ্ছিক বিষয় ভাবতে শুরু করেছে।

যারা মূর্তিপূজা করাকে শেরেক বলে অভিহিত করে, অথচ আল্লাহদ্রোহী শক্তির শাসন মান্য করাকে শেরেক বলে আখ্যায়িত করে না এবং মূর্তি পূজারীকে মোশরেক মনে করে, কিন্তু তাগুতী শক্তি তথা মানবরচিত আইনের অনুসারীদের মোশরেক মনে করে না, তারা আসলে কোরআন অধ্যায়ন করে না এবং ইসলামকে চেনে না। রাসূল (সঃ)-এর ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনকে পর্যবেক্ষণ করে না। তাদের উচিত যেভাবে আল্লাহ তা'আলা কোরআন নাযিল করেছেন, সেই ভাবেই তা পড়া।

আরো দুঃখজনক ব্যাপার হলো, ইসলামের এই দরদী ভক্তদের কেউ কেউ প্রচলিত তাগুতী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কিছু কিছু আইন, পদক্ষেপ ও কথাবার্তা সম্পর্কে মাঝে মধ্যে খুঁত ধরেন যে, অমুক কাজ ইসলাম বিরোধী। কোথাও কোথাও কিছু ইসলাম বিরোধী আইন বা বিধি ব্যবস্থা দেখে তারা রেগে যান। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, যেন ইসলাম তো পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েই আছে, তাই অমুক অমুক ত্রুটি যেন তার পূর্ণতার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে আছে।

এই সকল দ্বীনদরদী (!) ব্যক্তি তাদের অজান্তেই ইসলামের ক্ষতি সাধন করে থাকেন। তাদের সেই মূল্যবান শক্তিকে তারা এসব অহেতুক কাজে অপচয় করেন, অথচ তা ইসলামের মৌলিক আক্বীদা বিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করা যেতো। এসব কাজ দ্বারা তারা আসলে জাহেলী সমাজ রাষ্ট্রের পক্ষেই সাফাই গান। কেননা, এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ইসলাম তো এখানে কায়েম আছেই, কেবল অমুক অমুক ত্রুটি শুধরালেই তা পূর্ণতা লাভ করবে। অথচ এখানে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্থাৎ আইন প্রনয়ন, শাসন ও বিচার ফয়সালার সর্বময় চূড়ান্ত ক্ষমতা ও এখতিয়ার যতক্ষণ মানুষের হাত থেকে পরিপূর্ণভাবে ছিনিয়ে এনে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত না হবে, ততক্ষণ ইসলামের অস্তিত্ব বলতেই এখানে কিছু নেই। কারণ অন্যের সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া অর্থই হলো আল্লাহকে অস্বীকার করা। আর যেখানে আল্লাহকে অস্বীকার করা হয় সেখানে ইসলামের অস্তিত কিভাবে থাকে। এটি কাফের মোশরেকদের এমন এক সূক্ষ-ষড়যন্ত্র, যার মাধ্যমে আল্লাহকে কার্যত অস্বীকার করা সত্তেও সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না। আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পারেন, তারা বলে না তোমরা ইসলাম ছাড়ো, তারা বলে, গণতন্ত্র (জনগনের আইন) গ্রহণ কর, কেননা তারা ভালো করেই জানে, গণতন্ত্র গ্রহণ অর্থই হলো ইসলামকে বর্জন করা।

মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বহাল থাকলেই অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র নিরংকুশ আইনদাতা মানলেই ইসলামের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন থাকে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বজায় না থাকলে সেখানে ইসলামের অস্তিত এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, আজকের পৃথিবীতে ইসলামের একমাত্র সমস্যা এই যে, আল্লাহর যমীনে আল্লাহদ্রোহী তাগুতী শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্বের ওপর ভাগ বসাচ্ছে, তা ছিনতাই করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে আর নামাযী, দাড়ী-টুপিওয়ালা, তাসবীহ ওয়ালা লোকরা তাদেরকে সমর্থন দেয়া থেকে শুরু করে সরকারের অধীনে বিভিন্ন পদ গ্রহণ করে তাদের সহায়তা করে বৈষয়িক ফায়দা লুটছে।

এই শাসক শ্রেনী তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নিশ্চিত করছে এবং স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমাজ, পরিবার তথা সাধারণ মানুষের জীবন, সহায় সম্পদ ও তাদের মধ্যে বিবাদমান বিষয়ে নিজেদের খেয়ালখুশী মতো বিধি নিষেধ প্রয়োগ করছে। এটাই সেই সমস্যা যার মোকাবেলা করার জন্য কোরআন নাযিল হয়েছে এবং সে আইন প্রণয়ন ও বিধি নিষেধ প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতাকে দাসত্ব ও প্রভুত্বের সাথে সম্পৃক্ত করেছে এবং স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এর আলোকেই সিদ্ধান্ত আসবে কে মুসলিম-কে অমুসলিম, কে মু'মিন ও কে কাফির।

ইসলাম তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রথম যে লড়াই চালিয়েছে, তা নাস্তিকতার বিরুদ্ধে পরিচালিত লড়াই ছিলনা। এ লড়াই সামাজিক ও নৈতিক উচ্ছৃংখলতার বিরুদ্ধেও ছিল না। কেননা এসব হচ্ছে ইসলামের অস্তিত্বের লড়াইয়ের পরবর্তী লড়াই। বস্তুতঃ ইসলাম নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম যে লড়াই করেছে, তা ছিল সার্বভৌমত্বের অধিকারী কে হবে সেটা স্থীর করার লড়াই। এজন্য ইসলাম মক্কায় থাকা অবস্থাতে এ লড়াইয়ের সূচনা করেছিল। সেখানে সে কেবল আক্বিদা বিশ্বাসের পর্যায়ে এ কাজ করেছিল, রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা বা আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেনি। তখন কেবল মানুষের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধ মূল করার চেষ্টা করেছে যে, সার্বভৌমত্ব তথা প্রভুত্ব ও সর্বময় ক্ষমতা এবং আইন বা হুকুম জারির ক্ষমতা ও শর্তহীন আনুগত্য লাভের অধিকার একমাত্র আল্লাহর। কোন মুসলমান এই সার্বভৌমত্বের দাবী করতে পারে না এবং অন্য কেউ দাবী করলে জীবন গেলেও সেই দাবী মেনে নেবে না। মক্কায় অবস্থান কালে মুসলমানদের মনে যখন এই আক্বিদা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হলো, তখন আল্লাহ তা'আয়ালা তাদেরকে তা বাস্তবে প্রয়োগের সুযোগ দিলেন মদিনায়।

সুতরাং আজকালকার ইসলামের একনিষ্ঠ ও আবেগোদ্দীপ্ত ভক্তরা ভেবে দেখুন, তারা ইসলামের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করেছেন কি না?

যারা একমাত্র আল্লাহর গোলামী করে এবং মানুষকে 'রব'-এর আসনে বসায় না তারাই মুসলমান। এই বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে দুনিয়ার সকল জাতি ও গোষ্ঠির উর্ধে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে এবং দুনিয়ার সকল জাতির জীবন যাপন পদ্ধতির মধ্য থেকে তাদের জীবন পদ্ধতির স্বকীয়তার নির্দেশ করে। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে থাকলে তারা মুসলমান, নচেত তারা অমুসলিম, চাই তারা যতই নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করুক না কেন।

মানবরচিত সকল জীবন ব্যবস্থায় মানুষ মানুষকেই আল্লাহর আসনে বসায়। কোন দেশে সর্বোচ্চমানের গণতন্ত্র কিংবা সর্বনিম্নমানের স্বৈরাতন্ত্র- যা-ই থাকুক সর্বত্র এই একই অবস্থা। প্রভূত্বের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হলো মানুষকে গোলাম বানানোর অধিকার এবং মানুষের জন্য আইন-কানুন, মূলবোধ ও মানদন্ড রচনার অধিকার। পরিমার্জিত পরিশোধ বা অঘোষিতভাবে হোক, মানবরচিত সকল ব্যবস্থায় একটি মানবগোষ্ঠী কোন না কোন আকারে এই অধিকারের দাবীদার। এতে করে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর লোকেরা অবৈধভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে পড়ে। এই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীটি বাদ বাকী দেশবাসীর দন্ডমূন্ডের কর্তা হয়ে তাদের জন্য আইন-কানুন, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ও মানদন্ড নির্ধারণ করে। কোরআনের আয়াতে একেই বলা হয়েছে মানুষকে মানুষের 'রব' বানিয়ে নেয়া। এভাবেই বর্তমান বিশ্বের সকল দেশের সাধারণ জনগণ তাদের শাসক শ্রেণীর ইবাদত/অনুগত্য/গোলামী করে, যদিও তারা তাদের উদ্দেশ্যে রুকু-সিজদা করে না।

এই অর্থেই ইসলাম আল্লাহর দেয়া একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। দুনিয়ার সকল নবী ও রাসূল এই ইসলাম নিয়েই এসেছিলেন। আল্লাহ তা'আয়ালা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তার নিজের দাসত্বের অধীন করার জন্য এবং মানুষকে যুলুম থেকে মুক্ত করে আল্লাহর ন্যায়-বিচারের ছায়াতলে আশ্রয় দানের জন্যই নবীদেরকে যুগে যুগে ইসলামী বিধান সহকারে পাঠিয়েছেন। যারা তা অগ্রাহ্য করে, তারা মুসলমান নয়, তা সে যতই সাফাই গেয়ে নিজেকে মুসলমান প্রমাণ করার চেষ্টা করুক না কেন এবং তাদের নাম আব্দুর রহমান, আব্দুর রহিম যাই হোক না কেন।

আল্লাহ আমাদের হক্ককে হক্ক হিসেবে চেনার ও তা পালন করার তৌফিক দান করুন এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে চেনার ও তা থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন। হে আল্লাহ! সমস্ত তাগুতী শক্তিকে ধ্বংস করুন। ---------- আমিন।

গনতন্ত্র কে মেনে নেয়া, এই পদ্ধতিতে ভোট দেয়া, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আইন-বিধান দানের অধিকারকে মেনে নেয়া শিরক এবং কুফরী

গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত কুফর এবং সুস্পষ্ট শিরকের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

গণতন্ত্রের ইংরেজী শব্দ হল Democracy. Democracy শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ Demos ও Cratus থেকে উদ্ভুত। Demos শব্দের অর্থ হল 'মানুষ/জনগণ' এবং Cratus অর্থ 'পরিচালনা'। Democracy এমন একটা পদ্ধতি যেখানে জনগণ তাদের নিজেদের জন্য আইন তৈরী করে তাদের নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা। এই কাজটি হয় কোন সভা অথবা সংসদে। এবং এই পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে ঐ সকল আইন ও নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার পূর্ণ প্রতিফল ঘটে।

আব্দুল ওয়াহ্হাব আল-কিলালি বলেছেনঃ "সকল প্রকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মূলে রয়েছে একটি কাল্পনিক মতবাদ যার কর্তৃত্ব জনগণের উপর আরোপ করে এবং এই কর্তৃত্ব থাকে জনগণের উপরে তার নেতৃত্বে। সংক্ষেপে জনগণের দ্বারা গঠিত সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মাধ্যমে তৈরী সমষ্টিই হল গণতন্ত্র"। *(মাওসু'আত আস্-সিয়াসাহঃ২য় খন্ড, পৃ:২৫৬)*

আইনের অধ্যাপক ডক্টর আবদুল হামিদ মিতওয়ালী বলেনঃ শাসন ব্যবস্থায় 'গনতন্ত্র' জাতির প্রভূত্বের (রবের) নীতিতে পরিণত হয়েছে, অধিকন্তু সংজ্ঞানুযায়ী প্রভুত্ব হচ্ছে সেই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যার উপর অন্য কোন কর্তৃত্ব নেই। (*Dr. Hamid Mitwali's Ruling System in Devoloping Country সংস্করণ ১৯৮৫, পৃঃ ৬২৫)*

পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ যোসেফ ফ্রাংকেল বলেনঃ প্রভূত্বের অর্থ হচ্ছে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যা এর উপরে অন্য কোন কর্তৃত্ব স্বীকার করে না এবং যার পশ্চাতে সিদ্ধান্তসমূহ পূনর্বিবেচনা করার মত কোন বৈধ কর্তৃত্বেও অধিকারী নেই। (*যোসেফ ফ্রাংকেলেরঃhe International Relationship তুহামা পাবলিশিং, ১৯৮৪, পৃঃ ২৫)*

অতএব 'গনতন্ত্র' সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনা যেই পড়বেন, ইসলাম সম্পর্কে যার ন্যুনতম জ্ঞান আছে তিনি বুঝতে পারবেন মানুষকে মানুষের 'রব' হিসেবে উপস্থাপন করেছে এই গনতন্ত্র। কারণ 'গণতন্ত্র' এমন একটা পদ্ধতি যার দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সংরক্ষিত অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় এবং যা আল্লাহ্র ঐ অধিকারের বিপক্ষে আচরণ করতে শেখায় যা একমাত্র আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত। এবং এটা মানুষকে আল্লাহ্র পরিশুদ্ধ একটি ইবাদত হতে ফিরিয়ে শির্কের রাজ্যে অনুপ্রবেশ

করায়। এটি মানুষকে আইন প্রণয়নকারীর স্তরে পৌছে দেয়। অথচ একমাত্র আইন প্রণয়নকারী হলেন আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"এবং আল্লাহ্ হুকুম দেন, তাঁর হুকুমকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।" *(সূরা রা'দ ১৩:৪১)*। তিনি আরও বলেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ
الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"ওদের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি?" *(সূরা শূরা ৪২:২১)*

এই সকল আইন প্রণয়নকারী জনপ্রতিনিধিরা যখন জনগণের জন্য আইন নির্ধারণ করে তা দ্বিধাযুক্ত অবস্থায় অথবা নির্দিধায়ে তারা সেটা মানতে বাধ্য থাকে। এভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাসমূহ প্রতিনিধিত্ব পায় আল্লাহ্ প্রদত্ত আদেশ গুলোর উপর।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

"তুমি কি দেখ না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে? তুমি কি মনে কর যে ওরা অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো পশুরই মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট।" *(সূরা ফুরকান ২৫: ৪৩-৪৪)*

অতএব মানবাধিকারের নামে বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে এবং বিচারের ভার সে মিথ্যা উপাস্যের কাছে অর্পন করে, আর তারাই হল 'তাগুত' এই অন্যায় অধিকার বাস্তবায়নের অপর নামই হল আল্লাহ্র বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করা। যে সব মানুষ অথবা পদ্ধতিগুলো আল্লাহ্র নাযিলকৃত আইনের বিরুদ্ধে শাসন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেই 'তাগুত' বলে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ
إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا

"আপনি কি তাদেরকে দেখেছেন যারা দাবী করে যে তারা বিশ্বাস করে আপনার উপর এবং আপনার পূর্ববর্তীদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর তারা তাগুতের কাছে তাদের বিবাদপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে যেতে চায়, যদিও তাদেরকে এর (তাগুতের সাথে) কুফরী করার আদেশ দেয়া হয়েছিল---।" *(সূরা নিসা ৪:৬০)*

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেনঃ "আল্লাহ্র ইবাদত বাদ দিয়ে অথবা সত্য পথনির্দেশনা বাদ দিয়ে যে ব্যক্তির উপাসনা বা ইবাদত করা হয়; অথবা ঐ ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোনও আদেশ দেয় তাহলে সেই হল 'তাগুত'। এই কারণে যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত শাসন করে তারাই হল 'তাগুত'।" *(আল-ফাতওয়া, খন্ড-২৮, পৃ:২০০)*

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেনঃ "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) শাসন পদ্ধতি ব্যতীত যারা অন্য কোন পদ্ধতিতে শাসন করে তারাই তাগুত। মানুষ আল্লাহ্র পাশাপাশি যাদের ইবাদত করে অথবা মানুষ যে ব্যক্তির ইবাদত করে আল্লাহ্র ইবাদতের মাধ্যম মনে করে এদেরকেও তাগুত বলে বিবেচনা করা যায়। যদিও এক্ষেত্রে তারা নিশ্চিত নয় যে তারা আল্লাহ্র একক ইবাদত করছে না দ্বৈত ইবাদত করছে। সুতরাং এরাই হল তাওয়াগীত (তাগুতের বহু বচন) এবং যদি আপনি এই সকল তাগুতের প্রতি এবং এদের সাথে জনগণের শর্তাবলীর দিকে লক্ষ্য করেন তাহলে এটা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, জনগণ আল্লাহ্র ইবাদত হতে তাগুতের ইবাদতের দিকে, আল্লাহ্র শাসন হতে তাগুতের শাসনের দিকে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য হতে তাগুতের আনুগত্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে"। *('ইলাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন, খন্ড ২৮, পৃ:৫০)*

মুহাম্মদ আল-আমিন আশ-শানক্বিতি (রহঃ) বলেনঃ 'এবং কুরআনের এই আয়াতগুলো যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রণীত এবং রাসূল (সঃ) এর মুখ নিঃসৃত আইনের পরিবর্তে শয়তান ও তার

সাহায্যকারীদের মুখ নিঃসৃত স্বরচিত আইনের আনুগত্য স্পষ্ট কুফর এবং শির্ক। এতে কোন সন্দেহ নেই’। *(আদ্‌ওয়া আল-বাইয়ান, ৪র্থ খন্ড, পৃ:৮২-৮৫)*

এখন সত্যিকার অর্থে মুসলমানরা জেনে গেছে গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য কি? এর মূল লক্ষ্য হল অধিকাংশের ইচ্ছার ভিত্তিতে জনসাধারণকে শাসন করা যা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের বৈপরিত্যে ঘোষণা করে। এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে লুক্কায়িত শির্কের ব্যাখ্যা দানের প্রয়োজন অনুভব এই মুহূর্তে আমরা করছি না।[২০]

নির্বাচন পদ্ধতি এবং ভোটারদের উপর এর প্রয়োগ

নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি জনগণের নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ততার উপর নির্ভরশীল যার ফলে এটা পরিষ্কার করা যায় কারা কাউন্সিলে অথবা সংসদে এই জনগণের প্রতিনিধিত্ব দান করে। এই নির্বাচন পদ্ধতি আরও প্রয়োজনীয় ক্ষমতাশীল দল, প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী কে হবে তা নির্ধারণ করার জন্য। এই নির্বাচন পদ্ধতিটি জনগণের নেতা পছন্দের উপর গঠিত যারা তাদের পক্ষে আইন প্রণয়ন এবং এর প্রয়োগ করবে। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কোন অস্তিত্বই থাকবে না নির্বাচন ব্যতীত। জনগণ যদি নির্বাচন পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। যেহেতু কেউ কোন প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিবে না তাই নির্বাচিত কোন সাংসদ পাওয়া যাবে না যারা জনগণের পক্ষে আইন প্রণয়ন করবে অথবা সরকারের নীতিমালার বাস্তবায়ন করবে।

আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আল-কিলালী বলেনঃ “তাই বুঝা যাচ্ছে যে, জনগণ যাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তারা তাদের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে। বরং তারা এমন সব সাংসদদের হাতে কর্তৃত্ব দান করে যাদেরকে তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে। *(মাওসুআত আস-সিয়াসাহ, ২য় খন্ড, পৃ:৭৫৭)*

শা্ইখ আবু বাসির মুস্তফা হালিমাহ বলেনঃ ‘প্রথমতঃ যে নীতির উপর গণতন্ত্র স্থাপিত তা হল জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এই ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, সাধারণ জনগণের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন, যে প্রতিনিধিরা আইন তৈরী ও প্রণয়নের কাজ করবে। অন্য কথায় গণতন্ত্রে যে আইন প্রণয়নকারী এবং যার আনুগত্য করা হয় আসলে সে আল্লাহ্‌ নয় বরং একজন সাধারণ মানুষ। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, আইন প্রণয়ন ও বৈধ-অবৈধ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যার ইবাদত অথবা আনুগত্য করা হয় সেও একজন জনগণ, একজন মানুষ, একজন সৃষ্টি, সে মহান আল্লাহ্‌ নয়। এটাই হল কুফর, শির্ক এবং পথভ্রষ্টতার মূল অস্তিত্ব এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয় সমূহ ও তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। এভাবেই দুর্বল এবং অজ্ঞ লোকেরা শাসন-কর্তৃত্ব ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র একক ইলাহিয়্যাতের সাথে শরীক করে।’ *(হুকুম আল ইসলাম ফী আদ্‌-দিমুক্রাতিয়্যাহ আত-তা’দ্দুদিয়্যাহ আল-হিযবিয়্যাহ, পৃ:২৮)*

সুতরাং সত্য হল এটাই যে, সকল সংসদ সদস্য যারা সবাই অধিকাংশ জনগণের ইচ্ছায় নির্বাচিত এবং যারা আইন প্রণয়নের জায়গায় বসে আছে তারা তাদের এই আল্লাহদ্রোহী কাজগুলো তখনি করতে পারে যখন জনগণ তাদেরকে ঐ অবস্থানে বসতে সাহায্য করে। এখন যদি আমরা বলি যে, আল্লাহ্‌র পাশাপাশি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ঐ সাংসদরা কুফর এবং শির্ক করছে তাহলে যারা তাদেরকে এই কাজের জন্য নির্বাচিত করছে তাদেরকে আমরা কি বলব? এমনকি তারা এটাও জানছে যে, এই প্রার্থীরাই মানব রচিত আইনের পুনর্গঠন করবে তাদের নির্বাচনের মাধ্যমে।

শাইখ আব্দুল কাদির ইবনে আব্দুল আজিজ বলেনঃ ‘তাদের নিজেদের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যারা ভোট দেয় তাদেরকে (সাংসদ), তারা অনুসরণ করছে কেননা ভোটাররা বস্তুতঃ তাদের পক্ষে শির্কের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করছে। কারণ এই প্রতিনিধিরাই আল্লাহ্‌র পাশাপাশি আইন-প্রণয়নের কাজে হাত দেয় এবং এভাবেই ভোটাররা সংসদ সদস্যদেরকে শির্কের বাস্তবায়নের অধিকার দেয় এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র পাশাপাশি আইন প্রণয়নকারী প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে। আল্লাহ্‌ তা’আলা বলেনঃ

“ফিরিশতাগণকে ও নবীগণকে রব হিসাবে গ্রহণ করতে সে তোমাদের নির্দেশ দিতে পারে না। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর কি সে তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবে?” *(সূরা আলি ‘ইমরান ৩:৮০)*

---

[২০] এমনকি “ভোটের পক্ষে ও বিপক্ষে” শীর্ষক বইয়ের লেখক ন্যূনতম এই সত্য স্বীকার করেছেন যে, একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগদান করা অবশ্যই অননুমোদনযোগ্য। তার বইয়ের প্রথম ধাপে তিনি বলেছেন যে, “বর্তমান আধুনিক সময়ের অবস্থা ইসলাম থেকে অনেক দূরে। প্রকৃত পক্ষে আইন প্রণয়নের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ রব্বুল 'আলামিনের নিকট যিনি পবিত্র, মহান এবং সর্বোচ্চ। তাই কেউ যদি এমন কোন শাসন ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করতে চায় প্রকৃত পক্ষে যার ভিত্তি মানব রচিত অথবা আল্লাহ্‌ তা’আলা প্রণীত শরীয়াহ্‌র সাথে সাংঘর্ষিক অথবা যা ইসলামিক শরীয়াহ্‌কে বাতিল বলে ঘোষণা করে, তাহলে এ ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলিম আলেমরা একমত যে সেই শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অননুমোদন যোগ্য।

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যদি কেউ ফিরিশতা ও নবীগণকে ‘রব’ হিসেবে গ্রহণ করে তবে সে কাফির। তাহলে যারা সংসদ সদস্যদেরকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছে তাদের অবস্থা কি? এইভাবে আল্লাহ্ তা’আলা আরও বলেনঃ

وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

“তুমি বল, হে কিতাবীগণ এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি, এবং আমাদের কেউ কাউকেও আল্লাহ্ ব্যতীত ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ না করি।” *(সূরা আলি ‘ইমরান ৩:৬৪)*

অতএব, মানুষকে আল্লাহ্র পাশাপাশি রব রূপে গ্রহণ করা হল কুফরী এবং বেঈমানী এবং এই কুফরীই হল সংসদ সদস্যদেরকে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে জনগণ এই কুফরী ও শির্কে লিপ্ত হচ্ছে। *(আল-জামি ফি তালাব আল-ইলম আশ-শারীফ, ১/১৫১-১৫২)*

আবার কেউ যদি নিজে সরাসরি কুফরীর সাথে জড়িত না থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুফরীর পক্ষপাতিত্ব করে তাহলে নিম্নোক্ত নীতিমালার মধ্যে পরিগণিত হবে যে, ‘কুফরীর সমর্থন দেওয়াও কুফরী’। কেননা যে ব্যক্তি জেনে শুনে মানুষকে কুফর অথবা শির্ক করতে সাহায্য অথবা সক্ষম করে ঐ একই রায় তার ক্ষেত্রেও যে রায় প্রযোজ্য ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে নিজে শির্ক অথবা কুফর করলো। রায়টা আসলে আমার নিজের নয় আমরা যদি নিচের আয়াতটি দেখি তাহলে পরিষ্কার হবে যে আল্লাহ্ তা’আলা স্বয়ং এই রায় দিয়েছেন।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

“কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহ্র আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং একে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসংঙ্গে লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সাথে বসবে না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। মুনাফিক ও কাফির সকলকেই আল্লাহ্ জাহান্নামে একত্রিত করবেন।” *(সূরা নিসা ৪:১৪০)*

এবং আশ-শাওকানী (রহঃ) বলেন, ‘তাঁর ভাষ্য- নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে ‘আপনি তাদের মতই হবেন’ -অন্য কথায়- আপনি যদি কাজটি করেন অথবা প্রতিরোধ না করেন তাহলে কুফরীর ক্ষেত্রে আপনি তাদের সমপর্যায়ের।’ *(ফাত্হ আল-ক্বাদির, ১ম খন্ড, পৃ:৫২৭)*

শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেনঃ “উক্ত আয়াতটির অর্থ একেবারে যেভাবে বলা হয়েছে ঠিক তাই। আয়াতটি দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র আয়াতগুলো শুনে বিশ্বাস না করে অথবা আয়াতগুলো নিয়ে মজা করে/ ঠাট্টা বিদ্রুপ করে এবং কেউ যদি জোর-জবরদস্তি ছাড়াই এ সকল লোকদের সাথে বসে যারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করেছে অথবা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে এবং তাদেরকে প্রতিরোধ না করে অথবা তাদেরকে ত্যাগ না করে যতক্ষন পর্যন্ত না তারা তাদের আলোচ্য বিষয় পরিবর্তন করছে তাহলে সেও তাদের মত একজন কাফির। এমন কি সে যদি তাদের কাজে অংশ গ্রহণ নাও করে কেননা তার নীরব সম্মতি প্রমাণ করে কুফরীর প্রতি তার সমর্থন। কুফরীর প্রতি মৌন সমর্থন থাকাও কুফরী।

এই আয়াত এবং এই ধরনের যে আয়াতগুলো আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কেউ যদি কোন পাপ কর্মে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে যে পাপ কাজটি করেছে সে তার মতই বিবেচিত হবে যদিও একথা বলে যে সে মনে মনে পাপ কাজটিকে ঘৃণা করে। তবুও এটা গ্রহণযোগ্য না। কেননা বিচার সাধারণত করা হয় বাহ্যিক প্রকাশভঙ্গির উপর ভিত্তি করে। কেননা অন্তরের আভ্যন্তরিণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা কেবল মাত্র আল্লাহ্র কাজ। তাই বাহ্যত যার মধ্যে কুফরী প্রতীয়মান হবে সেই কাফির বলে বিবেচিত হবে।” *(মাজমুআ’ত আত-তাওহীদ, পৃ:৪৮)*

অতএব, যে সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত থাকে কুফরী সংগঠিত হওয়ার স্থানে এবং ঐ স্থান ত্যাগ করে না অথবা ঐ স্থানে কোন প্রতিরোধের ব্যবস্থাও গ্রহণ করে না তার ক্ষেত্রে ঐ একই রায় যে রায় কুফরীকর্তার ক্ষেত্রে। যারা শির্ক ও কুফরকে সাহায্য করে অর্থাৎ সক্রিয় থেকে কাউকে নির্বাচিত করে যাতে তারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে কি বা বলা যায়। মনে রাখতে হবে যে, এই ভোট দান পদ্ধতি হচ্ছে প্রত্যেকটি সংসদ সদস্যকে শির্ক এবং কুফরী করতে দেয়ার একমাত্র উপায় কারণ ভোটার কর্তৃক নির্বাচনীয় সমর্থন ব্যতীত তারা ঐ বিশেষ স্থানে সমাসীন হতে পারে না।

আমরা যদি একবারের জন্যেও ভোটারদের কার্যকলাপ এবং যখন কোন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয় তার কার্যকলাপকে একত্রিত করি তাহলে তাদের উভয়ের দ্বারা কৃত কুফর বা শির্কের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। যারা আল্লাহ্র পাশাপাশি অন্য কাউকে 'রব' বানায় বৈধ ও অবৈধ করার ব্যাপারে, বিধান দাতা হিসেবে এবং যারা সূর্য ও চন্দ্রকে আল্লাহ্র পাশাপাশি জীবনী শক্তি ও খাদ্য/ রিযিক দানকারী হিসেবে রব বানায় তাদের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? আল্লাহ্র কসম! তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে একই রায় প্রযোজ্য।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পক্ষে যোগদান সংক্রান্ত সংশয়গুলোর ব্যাপারে ফয়সালা

যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যোগদান করাকে অনুমোদন দেয় সত্যিকার অর্থে তারা পথভ্রষ্টতার বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। এদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে যে, অনিবার্যভাবে শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ তারা পথভ্রষ্টতার চরম পর্যায়ে রয়েছে। আর কতক রয়েছে যারা ভুল ধারণা ও সন্দেহ বশতঃ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যোগদানকে বৈধ মনে করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের লোকদের উক্ত ভ্রান্ত ধারণাগুলো নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে খন্ডন করা হলঃ

১। মিশরের তৎকালীন রাজসভায় একজন মন্ত্রী হিসেবে ইফসুফ (আঃ) এর যোগদান সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ **"রাজা বলিল ইউসুফকে আমার কাছে লইয়া আইস; আমি তাহাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করিব। অতঃপর রাজা যখন তাঁহার সহিত কথা বলিল, তখন রাজা বলিল, আজ তুমি তো আমাদের নিকট মর্যাদাশীল বিশ্বাস ভাজন হইলে। ইউসুফ বলিল, 'আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম ও সুবিজ্ঞ রক্ষক।' এইভাবে ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে সেই দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারিত। আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি দয়া করি। আমি সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিফল নষ্ট করি না।"** *(সূরা ইউসুফ ১২:৫৪-৫৬)*

তাই যারা ইউসুফ (আঃ)-এর উদাহরণ দিতে গিয়ে এই আয়াতটি প্রদর্শন করে দলিল হিসাবে তারা বলতে চায় যেহেতু ইউসুফ (আঃ) একজন অমুসলিম রাজার রাজ্যে মন্ত্রী পরিষদে যোগ দিতে পারেন তাহলে কেন আমাদের পক্ষ হয়ে একজন প্রার্থী সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবে-এটা গ্রহণযোগ্য হবে না?

যারা এই আয়াতগুলোকে তাদের পক্ষে দলিল হিসাবে ব্যবহার করে তারা হয়তো ভুলে গেছে কারাগারে ইউসুফ (আঃ) তাঁর দুই সাথীকে কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

"বিধান দিবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। তিনি আদেশ দিয়েছেন- তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করার জন্য। ইহাই শ্বাশত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা সম্পর্কে অবগত নহে।" *(সূরা ইউসুফ ১২:৪০)*

তাহলে আমরা কিভাবে বলব যে, ইউসুফ (আঃ) ঐ রকম একটা সরকার ব্যবস্থাকে সাহায্য করেছিলেন অথবা তাদের সাথে আপোষ করেছিলেন যারা মানব রচিত আইন প্রণয়ন করেছিল যখন তিনিই অন্যদেরকে এই বিধান/ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আল্লাহ্ সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন এই বলে যেঃ "বিধান দেবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্রই।"

প্রথমতঃ যারা এই (১২:৫৪-৫৬) আয়াতগুলোকে উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করে, দলিলের অভাবে তাদের দাবীকে প্রমাণ করার জন্য যে, তৎকালীন সরকার ব্যবস্থায় প্রচলিত ইউসুফ (আঃ)-এর শরীআহ্ সম্মত নয় এবং এই উদাহরণের দ্বারা আর কিছুই নির্দেশ করার নেই। বরং এই আয়াতগুলো দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন রাজা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পনের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন।

ইবনে জারীর আত-তাবারী বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ "ইউসুফ (আঃ)-এর সময় যেই রাজা ছিলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন"। *(জামি আল-বাইয়ান আত-তাওয়ীল আই আল-কুরআন, ৯/২১৭)*

আল-বাঘাবী বলেনঃ "মুজাহিদ (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেছেনঃ ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে অতিবিনয়ের সাথে ইসলামের দিকে ডাকা থেকে ক্ষান্ত হননি যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজা এবং আরও অনেক লোক ইসলামে প্রবেশ করে।"

আরও বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আঃ) নিজে একজন শাসকও ছিলেন বটে কেননা মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্বের পাশাপাশি তাঁর উপর মিশরের শাসন ভারও ন্যস্ত হয়েছিল।

ইবনে জারীর আত-তাবারী, আস-সুদ্দী হতে বর্ণনা করেনঃ রাজা, ইউসুফ (আঃ)-কে মিশরের উপর নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি কর্তৃপক্ষেও একজন সদস্য ছিলেন এবং তিনি যে কোন কিছু ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতেন এবং ব্যবসা ও অন্যান্য যত বিষয় ছিল তা তদারকি করতেন। এর প্রমাণ সূরা ইউসুফ, ৫৬ আয়াতের শেষ অংশে পাওয়া যায়ঃ এই ভাবে আমি ইউসুফ (আঃ)-কে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; যে সেই দেশে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত।

"... সেই দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতেন...", এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনে জারীর আত-তাবারী, ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, 'মিশরের সকল কর্তৃত্ব ইউসুফের (আঃ) কাছে হস্তান্তর করা হয়ে ছিল এবং যে কোন বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চুড়ান্ত ।

আল-কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তাঁর বিছানার উপর বসলেন এবং রাজা তার পরিষদবর্গ এবং স্ত্রীগণসহ তাঁর সাথে পরিচয় পর্বের জন্য তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং মিশরের সকল কর্তৃত্ব তাঁর (আঃ) কাছে হস্তান্তর করা হয় ।" এ সম্পর্কে আল-কুরতুবী বলেনঃ "যখন রাজা, ইউসুফ (আঃ)-এর উপর দায়িত্ব সমর্পন করলেন তখন তিনি (আঃ) সাধারণ জনগণের উপর উদার প্রকৃতির মনোভাব পোষণ করলেন এবং তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দিকে ডেকেছিলেন যতক্ষন পর্যন্ত না তিনি তাদের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন । তাই পুরুষ-মহিলা উভয়ই তাকে ভালোবাসতো । এই একই ধরনের কথা পাওয়া যায় আঃ ওয়াহ্হাব, আস-সুদ্দী এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের বর্ণনায় ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি রাজার উক্তিতে-যখন রাজা, তার পরিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি দেখেছিলেন শাসন কর্তৃত্ব এবং ন্যায়বিচার প্রথা প্রচারের ক্ষেত্রে । রাজা বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমতা দান করলাম, সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি করতে পারো । এবং আমরা তোমার একনিষ্ঠ অনুসারী এবং আমি তোমার আনুগত্য করব এবং আমি তোমার কোন বিষয়ের সহযোগীর চেয়ে বেশী কিছু নই । *(আল-জামী'লি আহকাম আল-কুরআন, খন্ড ৯/২১৫)*

তাই এক্ষেত্রে যদি এইরকম কোন সম্ভাবনা থাকে যে, ঐ রাজা ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাহলে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে (১২:৫৪-৫৬) দলিল হিসাবে ব্যবহার করাটা প্রশ্নের সম্মুক্ষীন হবে এবং ভূল হবে । কেননা ইসলামের একটা নীতি হল, " যদি কোন সম্ভবনা/ সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে তাকে দলিল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না ।

আরও বলা যেতে পারে যে, অধিকাংশ উসুলের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বের শরীয়াহ আমাদের শরীআহ হিসেবে বিবেচিত যদি না তা আমাদের শরীআহর সাথে সাংঘর্ষিক হয় । তাই কেউ যদি কল্পনার বশীভূত হয়ে শুধুমাত্র তর্কের খাতিরে বলে যে, ইউসুফ (আঃ) তাঁর উপর প্রদত্ত শরীআহ মানেননি তাহলে তাকে বলতে হবে যে, ইউসুফ (আঃ) যদি এখন বেঁচে থাকতেন তাহলে তাকে মুহাম্মদ (সঃ) এর শরীআহ মানতে হতো ।

২ । দুই প্রকারের খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপের পক্ষ অবলম্বন করার নীতি

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সমর্থকরা ইসলামের এই নীতিকে দুইভাবে ব্যবহার করে থাকেঃ

- যে প্রার্থীর আদর্শ অপেক্ষাকৃত কম ইসলাম বিরোধী তাকে ভোট দেয়ার মানে হলো কম খারাপের পক্ষ নেয়া;
- অন্য দিকে, কাউকে যদি ভোট না দেয়া হয় তাহলে বেশী খারাপ প্রার্থীটি নির্বাচিত হতে পারে এই আশংকায় কম খারাপকে ভোট দেয়া;

আসলে ইসলামের বেশীরভাগ নীতি নিয়ে এভাবেই মানুষ মানুষকে বিভ্রান্ত করে । তারা সঠিক নীতিটি সুন্দরভাবে উল্লেখ করে কিন্তু এর প্রয়োগ করে ভুল অথবা এমন ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করতে চায় যেখানে ঐ নীতি খাঁটে না ।

বিশেষ করে এই নীতিটির ক্ষেত্রে তাদের ভুল হলো, তারা এর প্রয়োগ বোঝেনি । শুধুমাত্র সেখানেই এটি প্রয়োগ করা যাবে যেখানে, দুটি পথের একটি গ্রহণ না করে উপায় নেই । কিন্তু যদি এগুলো থেকে বেঁচে থাকার উপায় থাকে অর্থাৎ দুটি পথের একটি গ্রহণ করতে যদি বাধ্য করা না হয়- তাহলে সেখানে এই নীতি প্রযোজ্য নয় । অর্থাৎ কাউকে যদি দুটি হারামের একটি গ্রহণে বাধ্য করা হয় তা হলে সে কম গুনাহের কাজটি করতে পারে । কিন্তু এমন ক্ষেত্রে নয়- যেখানে কেউ বাধ্য করছে না সেই ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় । ভোটের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগকে এভাবে দেখা যায়ঃ কোন এক ব্যক্তি একজন মুসলিম ভাইকে মদ খাওয়ার দাওয়াত দিল । সেখানে একটি মদে থাকবে ৫০% এলকোহল এবং অন্য একটি মদে ২৫% এলকোহল । সুতরাং সে দাওয়াত গ্রহণ করে ২৫% এলকোহলের মদটি পান করল ।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আমাদের কেউ বাধ্য করছে না; তাই কম খারাপকে সমর্থনের নামে একটি শির্‌ক করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । আমরা ভোট না দিলে যে ক্ষতি হবে তার তুলনায় এই শির্‌ক (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আইন তৈরীর অধিকার দেয়া) অনেক অনেক বেশী ক্ষতিকর । এটা হবে ২৫% এলকোহল বাদ দিয়ে ৫০% এলকোহল গ্রহণ করার মতো ।

৩ । ক্ষতি অবজ্ঞা করে সুবিধা গ্রহণ করা

এই নীতি বা উসুলটিও পূর্বের নীতির মতোই । এই নীতির দোহাই দিয়ে যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে জায়েয করতে চায় তাদের ভাষ্য হলো, এমন একজন ইসলামপন্থী নেতাকে নির্বাচিত করলে, যার কর্মপন্থা মুসলিমদের জন্য অন্য নেতাদের থেকে

তুলনামূলক কম ক্ষতিকর এবং একটি ইসলাম বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করলে যতটা লাভ হবে তা এই হারামের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী।

প্রথমেই বলতে হয়, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হলো শির্ক। সুতরাং এর সুবিধা আলোচনা করে একে উৎসাহিত করা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্‌র তাওহীদকে উপেক্ষা ও অমান্য করে তার কাছ থেকে সুবিধা আদায় করাকে কি করে সমর্থন করা যায়। সুতরাং উপরোক্ত কথাগুলো বর্জনীয় এবং এর দ্বারা মুসলিমদের ভোট দানে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণরূপে ভুল। গণতন্ত্র- যা বর্তমানে বিদ্যমান, তাতে একমাত্র আক্বীদা ও শরীয়াতের বিভ্রান্তির দ্বারাই অংশগ্রহণ করা সম্ভব, এবং ফলাফল কখনোই প্রশংসা লাভ করতে পারে না ; আর এর থেকে যতই সুবিধা লাভ করা যাক না কেন- তা কখনোই অজুহাত হতে পারে না। আর এক্ষেত্রে এটা কিভাবে সম্ভব হয় যেখানে এটি শরীয়ত ও এর নীতির বিরুদ্ধে।

আর যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সত্যিকার অর্থেই কোন সুবিধা থেকে থাকে তাহলে- তার পরেও এটি হালাল হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

"তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুনঃ এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ, তবে মানুষের জন্য উপকারও আছে, কিন্তু এর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বেশী।" *(সূরা বাকারা ২:২১৯)*

সেই সাথে আল্লাহ্ (সুবঃ) আরো বলেছেনঃ

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ণায়ক শর এসব নোংরা অপবিত্র, শয়তানের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" *(সূরা মা'য়িদা ৫:৯০)*

ইবনে কাসির (রহঃ) প্রথমোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, "এসবের লাভগুলো সবই ইহলৌকিক। যেমন, এর ফলে শরীরের কিছু উপকার হয়, খাদ্য হজম হয়, মেধাশক্তি বৃদ্ধি পায়, একপ্রকারের আনন্দ লাভ হয়, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে এর ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা আছে। একইভাবে জুয়াখেলাতেও বিজয়ের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এগুলোর উপকারের তুলনায় ক্ষতি বা অপকারই বেশী। কেননা, এর দ্বারা জ্ঞান লোপ পাওয়ার সাথে সাথে দ্বীনও ধ্বংস হয়ে থাকে।" আর একারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ **"---কিন্তু এর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বেশী।"** *(সূরা বাকারা ২:২১৯)*

একইভাবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনেরও কিছু সুবিধা বা লাভ থাকতে পারে, কিন্তু এতে অংশ নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মানুষকে আইনদাতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় নিজ দ্বীনের জন্য যেকোন লাভের চাইতে অনেক অনেক গুন বেশী ক্ষতিকর। আর একথা আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, মদ খাওয়া বা জুয়া খেলার চাইতে অনেক বেশী বড় গুনাহ হলো শির্ক আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করা এবং এর পরিণতিও অনেক ভয়াবহ।

৪। আমলসমূহ সর্বোপরী নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল

"আমরা তো এটা মুসলিমদেরকে যুলুম নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য করছি; যাতে মুসলিমদের সুবিধা হয়"- এভাবেই অনেকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়ার পক্ষে অজুহাত দাঁড় করায়। তারা বলতে চান যেহেতু, একটি সৎ উদ্দেশ্যে, ভালো নিয়্যতে এ কাজটি করা হচ্ছে তাই এতে কোন সমস্যা নেই- এটি বরং প্রশংসনীয়।

আসলে এই মারাত্মক ভুলটি তারা শুধু এখানেই করছে তা নয়। এই হাদীসটির অপব্যবহার আরো অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে। এজন্য আমরা এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা তুলে ধরছি, ইন্‌শাআল্লাহ্।

প্রথম কথাটি হলো, উত্তম নিয়্যত থাকলেই গুনাহ উত্তম আমল বা সাওয়াবের কাজ হয়ে যায় না। আবু হামিদ আল গাজ্জালী (রহঃ) বলেনঃ "গুনাহ, এগুলোর প্রকৃতি কখনো নিয়্যতের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায় না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর হাদীস (প্রত্যেক আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল) থেকে অজ্ঞ বা জাহিল লোকেরা এভাবেই সাধারণ অর্থে ভুল বুঝ নেয়, তারা মনে করে যে, নিয়্যতের দ্বারা একটি গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের মনকে খুশী করার জন্য কারো গীবত করে, অথবা ঐ ব্যক্তি যে অন্যের টাকায় অভাবীদের আহার করায়, অথবা কেউ যদি হারামের পয়সায় স্কুল, মসজিদ বা সৈন্যদের ক্যাম্প তৈরী করে দেয় উত্তম নিয়্যতে, তখন তাদের গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়! এসবই জাহেলীয়াত বা মূর্খতা, এই সীমালংঘনের ও অপরাধের উপর এর নিয়্যতের কোন প্রভাব নেই। বরং ভালো উদ্দেশ্যে খারাপ কাজ করার এই নিয়্যত শরীয়তবিরোধী– যা আরেকটি অন্যায়। সুতরাং সে যদি সচেতন থাকে (ভুল পথের ব্যাপারে) তাহলে, যেন শরীয়াতের উপর অটল থাকে। কিন্তু সে যদি এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে তাহলে তার উপর অজ্ঞতার গুনাহ বর্তাবে, কারণ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। তাছাড়া, শরীয়াত যেখানে ভালো কাজের (নিয়্যতের বিশুদ্ধতা) ব্যাপারেই এমন (সতর্ক), সেখানে খারাপ কাজ কিভাবে ভালোতে পরিণত হয়? এটাতো অসম্ভব। সত্যিকার অর্থে, যে জিনিসগুলো অন্তরে এমন ধারণার জন্ম দেয় তা হচ্ছে অন্তরের গোপন খেয়াল খুশী বা কামনা-বাসনা-----।"

এরপর তিনি আরো বলেছেনঃ “এর দ্বারা যা বোঝানো হচ্ছে তা হলো কেউ যদি অজ্ঞতাবশতঃ ভালো নিয়্যতে খারাপ কাজ করে তাহলে তার কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না সে দ্বীনে নতুন হয় এবং ঐ ইলম অর্জনের সময় না পায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ **“অতএব তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জান।”** *(সূরা নাহ্ল ১৬:৪৩)*

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) আরও বলেছেনঃ “সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই বাণীঃ “প্রত্যেক আমলই তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল”– তিনটি জিনিসের (ইবাদত, মুবাহ ও গুনাহ) এর মধ্যে শুধুমাত্র আনুগত্য ও মুবাহ (অনুমতি প্রাপ্ত আমল)-এর মধ্যে সীমিত, গুনাহের জন্য নয়। এটা এই কারণে যে, আনুগত্য গুনাহ-তে পরিণত হয় (খারাপ) নিয়্যতের দ্বারা। বিপরীত দিকে, একটি খারাপ কাজকে কখনোই নিয়্যতের দ্বারা আনুগত্যে পরিণত করা যায় না। হ্যাঁ, নিয়্যতের একটি প্রভাব এ ক্ষেত্রে (গুনাহের ক্ষেত্রে) আছে; তা হলো খারাপ কাজের সাথে যদি (আরও) খারাপ নিয়্যত যুক্ত করা হয় এবং এটা তার বোঝা বৃদ্ধি করে আর পরিণতি হয় চুড়ান্ত খারাপ– যা আমরা 'কিতাবুত তাওবা'-তে উল্লেখ করেছি।” *(ইলাহইয়া উলুমুদ্দীন, ৪/৩৮৮-৩৯১)*

শেখ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ, অপর শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ এর ফাতওয়ার সমালোচনা করেছেন, যেখানে তিনি (বিন বাজ) সংসদ সদস্য হওয়া এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়াকে অনুমতি দিয়েছেন। শেখ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ বলেনঃ “আমি বলি এই ফাতওয়াটি ভুল। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) যে উদ্ধৃতি আমরা দিয়েছি সেই অনুযায়ী, গুনাহ কখনো নিয়্যতের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া কুফর হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহর একটি। আর পার্লামেন্টে অংশ নেয়া হলো কুফর, এটা নিয়্যতের কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটা এই কারণে যে, পার্লামেন্ট হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগের একটি মাধ্যম। সুতরাং এতে অংশ নেয়া বা ভোট দেয়ার রায় জানতে হলে গণতন্ত্র সম্পর্কিত রায়ও জানতে হবে, আর এই রায়ও নির্ভর করে এর বাস্তবতা জানার উপর।” *(আল-জামি ফি তালাব আল ইলম আশ শারীফ-১/১৪৭-১৪৮)*

সুতরাং উত্তম নিয়্যত দিয়ে একটি গুনাহকে অনুমোদন দেয়া যাবে না। আর মুসলিমদের যুল্ম থেকে রেহাই দেয়ার নামে কুফর বা শির্ক করাতো কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। যদি তাই হতো তাহলে আমরা বাইবেল আর মূর্তি বিক্রয় করে অভাবী মুসলিমদেরকে সাহায্য করতাম!

৫। ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা

গণতন্ত্রের পক্ষে যারা কথা বলেন তারা এই নীতিটিও ব্যবহার করে থাকেন। যে প্রার্থীর আদর্শ মুসলিমদের জন্য কম ক্ষতিকর বা কিছুটা উপকারী তাকে নির্বাচিত করার সাথে তারা এই নীতিটির তুলনা করেন। কারণ, এতে ভালো প্রার্থীর ভালো কাজে সহায়তা করে মন্দ প্রার্থীকে বাঁধা দেয়া হচ্ছে।

এক্ষেত্রে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণই হলো শির্ক, আর এটাকেই সর্বপ্রথম নিষেধ করতে হবে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার পাশে অন্যকে স্থাপন করে আইন রচনার জন্য- যা সুস্পষ্ট শির্ক। যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে পারে, সে খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে উপরোক্ত নীতিটি কতটা ভুলস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। তারা যেভাবে এই নীতিটি ব্যবহার করে, তা একেবারেই উল্টো, এই নীতির সঠিক ব্যবহার বরং তাদেরই বিরুদ্ধে যায়। [২১]

ভালো কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শর্ত হলো, এর পন্থাটি শরীয়ত সম্মত হতে হবে। অর্থাৎ, কোন চোরের চুরি বন্ধ করতে তাকে হত্যা করা যাবে না বা কাউকে সুদ দেয়া থেকে বিরত রাখতে তার টাকা ছিনতাই করা যাবে না অথবা কারো পরিবারকে তার অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে পরিবারের মানুষগুলো অপহরণ করা যাবে না। এই সামান্য বিষয়টি বোঝা মোটেই কঠিন কিছু নয় যদি সে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করার বিষয়টি বোঝে।

এক্ষেত্রে আরো একটি শর্ত হলো, ঐ মুনকার (খারাপ) নিষেধ করতে গিয়ে যেন আরো বড় মুনকার (ক্ষতি) না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করা। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেনঃ “এবং (ভালো কাজের)আদেশ ও (মন্দকাজের) নিষেধকারীরা যদি জানে যে এর প্রতিফলে ভালোর সাথে সাথে মিশ্রিত হয়ে কিছু মন্দও ঘটবে, তাহলে তাদের জন্য এটি করার অনুমতি নেই যতক্ষণ না তারা এর ফলাফলের (বিশুদ্ধতা) ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। যদি ভালো ফলাফলের প্রাধান্য থাকে, তবে তারা এটি চালিয়ে যাবে। আর যদি মন্দ ফলাফলের প্রাধান্য থাকে, তাহলে তাদের জন্য এটি করা নিষেধ, যদিও এর দ্বারা কিছুটা ভালো (ফলাফল) বিসর্জন দিতে হয়। এক্ষেত্রে এই ভালো কাজের আদেশ করা, যার পরিণতি খারাপ একটি খারাপ বা মুনকারে পরিণত হয় যা আল্লাহ্ ও রাসূলের (সঃ) অবাধ্যতা বৃদ্ধি করে।” *(আল আমর বিল মারুফি ওয়াল-নাহিয়ু 'আন আল-মুনকার, পৃঃ ২১)*

[২১] এক শ্রেণীর লেখকরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকে বৈধ বলেই ক্ষান্ত হয় না - গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য বলে মনে করে (নাউযুবিল্লাহ)। শুধু তাই নয়, যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং মানুষদের এটা থেকে বিরত থাকতে বলে তাঁদেরকে এইসব লেখক যালিম বলে আখ্যা দিয়ে থাকে।

ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) বলেনঃ "সুতরাং যদি কারো মন্দ কাজের নিষেধ করা আরো বড় মন্দের দিকে পরিচালিত করে যা আল্লাহ্ (সুবঃ) ও রাসূল (সঃ) বেশী অপছন্দ করেছেন (প্রথম মন্দের চেয়ে), তাহলে তা নিষেধ করা বৈধ নয়। যদিও আল্লাহ্ (সুবঃ) এটি (প্রথম মন্দ) অপছন্দ করেন এবং এটি যারা করে তাদের অপছন্দ করেন। *(ই'লাম আল মুওয়াক্কীন, খন্ড ৩, পৃঃ ৪)*

যারা মন্দ প্রার্থী আর ভালো প্রার্থীর কথা বলে নির্বাচনে অংশ নেয়াকে বৈধ করে; তারা এ মন্দ ঠেকাতে শির্ক বা কুফরীর মতো মূল্য দিতে বলে। দুটি জিনিসকে মেপে দেখুন তো, সমান হয় কিনা। এক্ষেত্রে যদি আমরা ইরাকের মুসলিমদের উপর অত্যাচার কমানোর কথাও চিন্তা করি, তাহলেও কি আমরা শির্ককে বিনিময় হিসাবে ধরতে পারি। আল্লাহ্ বলেছেনঃ **"ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।"** *(সূরা বাকারা ২:২১৭)*

এখানে, ফিৎনা বলতে আল্লাহ্ (সুবঃ) শির্ক ও কুফরীকে বুঝিয়েছেন, যা অধিকাংশ তাফসীরে পাওয়া যায়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেনঃ "যদিও হত্যা করার মাঝে পাপ ও অমঙ্গল রয়েছে তবে কাফিরদের ফিৎনার (কুফরী) মাঝে রয়েছে তার চেয়েও অধিক গুরুতর পাপ এবং অমঙ্গল।" *(আল ফাতওয়া-২৮/৩৫৫)*

শেখ আলী আল-খুদাইর তাঁর "লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্ - এই সাক্ষ্য দানে আহবান" বইটিতে শেখ সুলাইমান বিন সাহমান (রহঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ "আল-ফিৎনাহ হলো কুফর। সুতরাং সমস্ত বেদুঈন ও নগরবাসী যদি যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যায় তা অনেক কম গুরুতর ঐ জমীনে একটি তাগুতকে নির্বাচন করার চেয়ে যে এমন আইনে শাসন করে যা ইসলামের শরীয়াত বিরোধী।"

সুতরাং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের অজুহাতে শির্ক করা যাবে না, তাতে অত্যাচার যতই কমে যাবার সম্ভাবনা থাকুক, তাতে কিছুই যায় আসে না। এটা এই জন্যই যে মুসলিমরা অত্যাচারের কারণে যে ক্ষতির শিকার হচ্ছে, তার চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে শির্ক করার মাধ্যমে।

৬। *নিতান্ত প্রয়োজনে হারাম গ্রহণ করার অনুমতি*

যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ হারাম বলে মনে করেন, তারা অজুহাত দেন যে, এখন মুসলমানদের জন্য একটি জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে, সুতরাং এমতাবস্থায় হারাম কাজে অংশগ্রহণ করাকে ইসলাম সমর্থন করে। অর্থাৎ যে জিনিসটি হারাম ছিল তা এই প্রেক্ষাপটে বা পরিস্থিতিতে হালাল!

এই নীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিৎ যা তারা করেননি। কারণ, এ নীতিটি সর্বক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করার মতো নয়। বরং এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে এবং কিছু বাধ্যবাধকতা বা সীমা আছে যার কারণে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমতঃ অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে 'প্রয়োজন' বা 'জরুরী' বলা যায় না। সতরাং আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন আমরা সত্যিকার প্রয়োজন ছাড়া এর নীতির নমনীয়তাকে ব্যবহার না করি। মানুষের 'প্রয়োজন' বা জরুরী অবস্থা ৫ প্রকারেরঃ

- দ্বীনের জন্য আবশ্যকীয়
- জীবনের জন্য আবশ্যকীয়
- মানসিক সুস্থতার জন্য আবশ্যকীয়
- রক্ত (বংশ) বা সম্মান রক্ষার্তে আবশ্যকীয়
- সম্পদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়

এই সকল প্রয়োজনীয়তা সমান পর্যায়ের নয়। যেমন, কারো জ্বিনা করা বা কোন মাহরুম মহিলাকে নিকাহ (বিবাহ) করার অজুহাত কখনো এই হতে পারেনা যে, আমার যৌন আকাঙ্খা পূরণ করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সকল প্রয়োজনকেই এই নীতির আওতায় ফেলা যাবে না, এক্ষেত্রে একটি সীমারেখা আছে।

দ্বিতীয়তঃ শির্ক বা কুফরের ক্ষেত্রে এই নীতি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শির্ক এবং কুফর থেকে নিজেকে রক্ষা করাই সবচেয়ে আবশ্যকীয় ব্যাপার, মানুষের দ্বীন রক্ষা করাটাই তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। একটি প্রয়োজন রক্ষা করতে গিয়ে আরো বড় প্রয়োজন বিসর্জন দেয়া কখনোই অনুমোদনযোগ্য নয়। শুধুমাত্র ইকরাহ (চুড়ান্ত জোর জবরদস্তি)-এর ক্ষেত্রেই এটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আমরা শির্ক ও কুফরকে হালাল করার জন্য এমন একটি নীতির সাহায্য নেয়ার কথা কিভাবে ভাবতে পারি?

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেনঃ “নিশ্চয় যেসব বস্তু হারাম; এর মধ্যে যেসব বস্তু কোন অবস্থাতেই ইসলামের শরীয়াতে অনুমোদন দেয়া হয়নি এবং এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনাও রয়েছে, (সেগুলো) না আবশ্যকীয়তায় আর না এছাড়া অন্য কোন কারণে অনুমোদনযোগ্য, যেমন, শির্‌ক, অবৈধ যৌনাচার এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে জ্ঞান ছাড়া কথা বলা এবং স্পষ্ট সীমালংঘন। এই চারটি বিষয় হলো সেইগুলো যার সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেছেনঃ **“বলুনঃ আমার রব হারাম করেছেন যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অসংগত বিরোধীতা, আল্লাহ্‌র সাথে এমন কিছু শরীক করা যার কোন প্রমাণ তিনি নাযিল করেননি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না।”** *(সূরা আরাফ ৭:৩৩)*

এই বিষয়গুলো সকল শরীয়াতেই হারাম করা হয়েছে, আর এগুলোর ব্যাপারে সাবধান করতে আল্লাহ্ নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন এবং কোন অবস্থাতেই এগুলো হালাল ছিল না, কঠিন সময়েও নয়। আর এ কারণেই এই আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়।

শেখ আলী আল খুদাইর, শেখ হামাদ বিন আতিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ **“নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যার উপর জবাইয়ের সময় আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্য নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমান ও সীমালংঘনকারী না হয় তার কোন পাপ হবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।”** *(সূরা বাকারা ২:১৭৩)*

সুতরাং এখানে ‘অনন্যোপায়’ অবস্থায় থাকাকে শর্ত করা হয়েছে, যেন এগুলো কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অন্যায় বা সীমালংঘন থেকে না খায়। এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে (প্রয়োজন এবং জোর-জবরদস্তি) পার্থক্য অস্পষ্ট বা গোপন নয়।” তিনি (ইবনে আতিক) আরো বলেছেনঃ “এবং অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য মৃত বস্তু খাওয়ার অনুমতির মাঝে কি এমন কিছু আছে যা স্বেচ্ছায় দ্বীন ত্যাগ করাকে সমর্থন করে? এ ধরনের তুলনা কি এমন নয় যে, একজন ব্যক্তি তার বোন বা মাকে বিয়ে করল, সেই নীতির ভিত্তিতে যেখানে একজন স্বাধীন মানুষকে একটি দাসীকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে অথবা তার বিয়ে করার যোগ্যতা নেই (একজন স্বাধীন নারীকে)? এই বিভ্রান্তি ছড়ানো মানুষগুলো তাদের চেয়েও বেশী (বাড়াবাড়ি) করছে যারা তুলনা করে- **“বেচাকেনা তো সুদেরই মতো।”** *(সূরা বাকারা ২:২৭৫)*। *(হিদায়াত আত-তারিক, পৃঃ১৫১)*

শেখ আলী আল খুদাইর বলেছেনঃ “আমরা বলিঃ অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য মৃত জীব ভক্ষনের অনুমতির মাঝে কি এমন কিছু আছে যা, শির্‌কের সমাবেশে প্রবেশের অনুমতির দিকে ইঙ্গিত করে, যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ ও তাগুত সরকারের সাথে জোট করা হয় ‘দাওয়ার উপকারীতা’র নামে।” *(আল জামু ওয়াত তাজরিদ ফি শারহি কিতাব আত তাওহীদ, পৃ:১২১)*

৭। জোর জবরদস্তি বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে কুফরী ক্ষমার যোগ্য

এর আগের (৬ নং) পয়েন্টে আমরা এব্যাপারে প্রমাণ দিয়েছি যে প্রয়োজনে কুফর বা শির্‌ক করার কোন অনুমতি নেই। আমরা এখন যে নীতিটি আলোচনা করবো তা হচ্ছে নির্বাচনের পক্ষ অবলম্বনকারীদের শেষ অস্ত্র। তারা যেকোন উপায়ে বলতে চায় যে, এটি একটি ইকরাহ (জোরজবরদস্তি) সংক্রান্ত বিষয়। হ্যাঁ, আমরাও বলছি যে, যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই জোরজবরদস্তি নিপীড়নের স্বীকার হয়, তাহলে তার জন্য এটি ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু, আমরা যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এই ক্ষেত্রে ইকরাহর সংজ্ঞা ও শর্তাবলীর সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই। প্রথম কথা হলো, এই নীতিমালা সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয় যে স্বেচ্ছায় কোন কাজ করে। এক্ষেত্রে যে তাকে জোর করানো হয়েছে, সেই প্রমাণ থাকতে হবে।

'আলা আদ-দ্বীন আল বুখারীর সংজ্ঞা অনুযায়ী জবরদস্তি হলোঃ করো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কোন ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয় যা সে করতেও সক্ষম। তাই অন্য ব্যক্তি সন্ত্রস্ত হয় এবং জবরদস্তির বাস্তবায়নে তার সন্তুষ্টি দূরীভূত হয়।

ডঃ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল ওয়াহাবী বলেন, “এটা সেই প্রকারের যেখানে শুধুমাত্র ঐ নিপীড়িত ব্যক্তিকেই জোর করা হচ্ছে এবং তার আর কোন উপায় বা ক্ষমতা নেই।” *(নাওয়াকিদ আল ঈমান আল ইতিকাদিইয়্যাহ ওয়া যাওয়াবিত আত তাকফির ইনদাস সালাফ, ২/৭)*

সুতরাং, যারা এই যুক্তি দিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে বৈধ করে তারা কখনোই এই দাবী করতে পারে না যে তাদেরকে এই কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। কারণ, এখানে মুসলিমদেরকে বলা হয় ‘স্বতস্ফুর্তভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করুন’।

‘ইক্‌রাহ’-এর শর্তের ব্যাপারে ইবনে হায্‌র (রহঃ) বলেনঃ “ইকরাহ’র ৪টি শর্ত রয়েছেঃ

- যে জোর করছে তার ঐ হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা রয়েছে সেই সাথে যাকে জোর করা হচ্ছে সে এটি ঠেকাতে এমনকি এর থেকে পালাতেও অক্ষম।
- এ ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট ধারণা আছে যে, সে যদি অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে ঐ হুমকি তার ওপর পড়বে।

- তাকে যে হুমকি দেয়া হচ্ছে তা অতি নিকটে অর্থাৎ যদি বলা হয়, "তুমি যদি এটা না কর, তোমাকে আগামীকাল মারব", তাহলে তাকে নিপীড়িত বলা যাবে না। এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে, তাহলো যদি নিপীড়নকারী একটি সময় নির্ধারণ করে দেয় যা অতি অল্প এবং সাধারণত সে এই সময় পরিবর্তন করে না।

- যাকে জোর করা হয়েছে তার থেকে এমন কিছু প্রকাশ হবে না যা দ্বারা বোঝা যায় যে সে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করছে। *(ফাত্‌থ আল-বারি, খন্ড ১২, পৃঃ ৩১১)*

সুতরাং এই নীতিটি সঠিক যে, সত্যিকার অর্থেই যদি কাউকে বাধ্য করা হয় তবে তার নির্বাচনে অংশগ্রহণ ক্ষমা যোগ্য। তবে আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, তারা যেটাকে এখন ইকরাহ যা জোর-জবরদস্তি বলছেন তা আসলে ইকরাহ-র শর্তাবলী পূর্ণ করে না।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে রায়

যারা এই শির্‌কী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে তারা যে কুফরীতে লিপ্ত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিছু সন্দেহ-সংসয় ও ভুল ধারণার অজুহাতে তাদের এসব কাজ অনুমোদনযোগ্য নয়, যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তবে এটাও সমানভাবে নিশ্চিত যে অনেক মুসলমান ব্যাপারটির আসল রূপ পুরোপুরি অনুধাবন না করে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণে সকলের প্রতি আহবান জানায়। যদিও আমরা বলি না যে ভাল নিয়্যতে কোন কাজ করলেই তা শিরক ও কুফরী থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। আসলে সঠিক ব্যাপার হল শিরক ও কুফরী করার ব্যাপারে অজ্ঞতা তাদের ভাল নিয়্যতের কারণে তাদের কুফরীর বাইরে নিয়ে আসে না।

অতএব, ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কোন শির্‌ক বা কুফর করলেই সেটা মাফ হবে এমন কথা আমরা বলতে পারিনা। তবে যেহেতু অনেকেই এই বিশেষ (গণতন্ত্র) বিষয়ে অজ্ঞ আর তাছাড়া বিষয়টি আরও জটিল হয় যখন এটি জায়েজ করার লক্ষ্যে আলেমগণ ফিকহের সেই সব নীতির ভিত্তিতে নানান ফাতওয়া দেন, যেগুলো আমরা এই প্রবন্ধে ইতোমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং এরকম অবস্থায় যে কাউকে তৎক্ষণাৎ কাফির বলাটা বাড়াবাড়ি বা উগ্রতা। যতক্ষন না তার কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার তুলে ধরা হচ্ছে এবং এসকল বিভ্রান্তি অপসারণ করা হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত আমরা তাকে তাকফির করতে পারি না।

যারা তড়িঘড়ি করে সকল ভোটদানকারীকে তাকফির করে এবং এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাকদিসী বলেনঃ "আর একারণেই আইন প্রণয়নকারী প্রতিনিধিদের কর্মকান্ডের বাস্তবতা এবং এর মধ্যে যেসব কাজ কুফর এবং তাওহীদ ও ইসলাম বিনষ্টকারী সেগুলো ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করার আগে এমন কাউকে (ভোটার) তাকফির করার জন্য ব্যস্ত হওয়া জায়েয নয়। এরপরও যদি সে ভোট দান করে তবে সে কুফরী করল। সুতরাং ভোটারদের ক্ষেত্রে পার্থক্যসমুহ অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে, সবাই আইনপ্রণেতা তৈরীর উদ্দেশ্যে ভোট দেয় না তাদের (অজ্ঞতার কারণে) অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে তার কাছে সত্য প্রকাশ করার আগে তাকে তাকফির করা যাবেনা, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে, যে তার নিয়্যত জানেনা তার কাছে, মনে হবে যে, ঐ ব্যক্তি কুফরী কাজে লিপ্ত আছে। কারণ, গণতন্ত্রেও ক্ষেত্রে অনেক ভুল বোঝাবুঝি, অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে; আর তাছাড়া 'গণতন্ত্র', 'পার্লামেন্ট' গুলো সবই বিদেশী শব্দ, তাই অনেকেই বাস্ত বতা না বুঝে এর কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। এর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মত যে এমন কিছু কথা মুখ দিয়ে বলেছে যার অর্থ সে নিজেই জানে না।

সুতরাং যারা গণতন্ত্র ও এতে ভোটদানের দানের ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত জানে; তাদের একান্ত দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা এবং এ বিষয়ক বিভ্রান্তিসমুহ দুর করা।

হে পাঠক! কোন সন্দেহ নাই মুসলিমরা আজ ভয়াবহ অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। আজ আমাদেরই ভাই-বোনদের উপর সংঘটিত হয়ে চলছে পৃথিবীর নৃশংসতম নির্যাতন, গণহত্যা; যা দেখে চোখের পানি ঝড়ছে আর হৃদয়ে আগুন জ্বলছে। এই বর্তমান অবস্থা দেখেও যদি কারো অন্তর নাড়া না দেয় তাহলে সে যেন তার ঈমানের ব্যাপারে নিজেকে প্রশ্ন করে আর তার মৃত অন্তরকে পরীক্ষা করে দেখে।

একই সাথে, আমরা আমাদের ভাইবোনদের সাবধান করে দিতে চাই শয়তানের চক্রান্ত থেকে যে সর্বাত্মকভাবে আমাদের পথভ্রষ্ট করতে চায়। উত্তম আমলের নামে, ইসলামের প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে কৌশলে কাজে লাগিয়ে তারা আমাদের শির্‌কের মাঝে প্রবেশ করাতে সদাতৎপর। আর একথাও মনে রাখা দরকার যে, সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডই নিষিদ্ধ নয়। যদি এগুলো শির্‌ক বা কুফরের আওতায় না পড়ে এবং রাসূলের (সঃ) সুন্নত অনুযায়ী পালন করা হয় তাহলে কোন বাধা নেই। যেমন, আলোচনা সভা, সমাবেশ, প্রচারণা, ইত্যাদি কিছু রাজনৈতিক কর্মকান্ড যেগুলো শরীয়তের কোন নিষেধ নেই।

আমাদের এই প্রয়াসের মাঝে যদি সঠিক কিছু থাকে, তাহলে তা নিশ্চয় আল্লাহ্ (সুবঃ)-এর তরফ থেকে আর এর ভেতর যদি কোন ভুল বা সীমাবদ্ধতা থাকে তাহলে তা আমাদের এবং শয়তানের থেকে, আমরা তার থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ) এর উপর, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত ।

ইসলাম ও গণতন্ত্র - কিছু মৌলিক পার্থক্য

গণতন্ত্র	***ইসলাম***
১) গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি 'জনমত' ।	১) ইসলামের মূল ভিত্তি আল্লাহ্র অভিপ্রায় ।
২) গরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নাম 'গণতন্ত্র' ।	২) আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম ।
৩) সকল ক্ষমতার **উৎস জনগণ** ।	৩) সকল ক্ষমতার **উৎস আল্লাহ্** ।
৪) সার্বভৌমত্বের মালিক **জনগণ** ।	৪) সার্বভৌমত্বের মালিক **আল্লাহ্** ।
৫) মানব রচিত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি ।	৫) আল্লাহ্ প্রদত্ত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি ।
৬) মত প্রকাশে, ভোট দানে ও নির্বাচনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত ।	৬) মানুষ হিসেবে সকলেই সাধারণভাবে এসব অধিকার ভোগ করবে। কিন্তু যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গুণীজনেরা বিশেষভাবে মুল্যায়িত হবেন ।
৭) উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান বিবেচিত ।	৭) উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরষে প্রভেদ বিদ্যমান ।
৮) নারী ও সংখ্যালঘুরা সাধারণ সমাধিকার ভোগ করবে ।	৮) শক্তি ও মেধায় তারতম্যের কারণে নারী ও সংখ্যালঘুরা সংরক্ষণ নীতির অধীনে ভোগ করবে বিশেষ অধিকার ।
৯) পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক বিশেষ আদর্শ। নৈতিকতার কোন বালাই নেই গণতন্ত্রে। যেমন: জরায়ুর স্বাধীনতা বা সমকামিতা কোন মতামতকেই বর্জন করতে বাধ্য নয় গণতন্ত্র ।	৯) শাশ্বত আদর্শ ও নৈতিক মানসম্পন্ন পরমত সমাদৃত। অনৈতিক পরমত ইসলামে বর্জণীয় ।
১০) গরিষ্ঠের সমর্থন সকল বৈধতার মানদন্ড ।	১০) শাশ্বত বা প্রত্যাদিষ্ট বিধান গরিষ্টের সমর্থন ছাড়াই বৈধ ।
১১) জাগতিক উন্নয়নেই সকল চেতনা সীমিত এই অর্থে প্রগতি ।	১১) জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে চেতনা পরিব্যপ্ত, এই অর্থে প্রগতি ।
১২) জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি ।	১২) চরম জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি ।
১৩) মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার কার্য নিয়ন্ত্রিত ।	১৩) আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন দ্বারা বিচারকার্য নিয়ন্ত্রিত (যে আল্লাহ্ প্রদ্ত্ত ফায়সালা মোতাবেক বিচার করে না সেই কাফের ।)
১৪) সংবিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত ।	১৪) প্রত্যাদিষ্ট বিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত ।
১৫) জীবনের সর্বস্তরে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক ।	১৫) জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোই ইসলামী মূল্যবোধের পরিচায়ক ।
১৬) গণতান্ত্রিক বিশ্বাসে ধর্ম অবশ্যই রাজনীতি বিবর্জিত ।	১৬) ইসলামী বিশ্বাসে মানুষের প্রথম উপাধি খলীফা/ প্রতিনিধি, কাজেই ইসলাম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য ।
১৭) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারীদল ও বিরোধীদল নামে একাধিক দলের জন্ম দিয়ে একটি রাষ্ট্রের জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয় এবং জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করে ।	১৭) ইসলামী রাষ্ট্রের সকল মুসলিমের উপর ফরয দায়িত্ব হচ্ছে এই যে কোন অবস্থাতেই মুসলিম ঐক্য ব্যাহত করা যাবে না। মুসলিম ঐক্য ব্যাহত করা হারাম এবং শাস্তিদায়ক ।

১৮) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধীদল ও অপরাপর দল তাদের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য হরতাল, মিছিলি, রাজপথ অবরোধ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড যা একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় তার অনুমোদন দেয়।	১৮) ইসলামী রাষ্ট্রের সকল বৈধ দাবী ও অধিকার আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ আলোচনা এবং সবর ও ধৈর্য্যের নির্দেশ দান করে। কোন অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের উন্নয়ন বাধাপ্রদান ও ক্ষতিকর কর্মকান্ডের অনুমোদন দেয় না।

মানুষের তৈরীকৃত আইনের (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ------) সমর্থনের সাথে জড়িত থাকা হারাম, কুফর এবং শিরক

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) মানুষের অস্তিত্বের কারণটি পরিস্কারভাবে বর্ণনা করে বলেছেনঃ

"আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই, কেবল এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা আমার ইবাদত করিবে।" *(সূরা আয-যারিয়াত ৫১ঃ ৫৬)*

ইহা তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করবে যখন আমরা আমাদের সকল কার্যক্রম ও সমস্যাবলীয় সমাধানের জন্য শরীয়াহ আইনের কাছে দারস্থ হব এবং সেই আইনগুলো প্রয়োগ করব। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

"না, হে মুহাম্মদ, তোমার রবের নামের শপথ, ইহারা কিছুতেই ঈমানদার হইতে পারে না, যতক্ষণ না তাহারা তাহাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারপতি রূপে মানিয়া লইবে। অতঃপর তুমি যাহাই ফায়সালা করিবে সে সম্পর্কে তাহারা নিজেদের কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিবে না, বরং উহার সম্মুখে নিজদিগকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করিয়া দিবে।" *(সূরা আন নিসা ৪ঃ ৬৫)*

এবং আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাদেরকে প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর কাছে আত্মসর্মপিত অবস্থায় থাকার আদেশ করেছেন। **"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমনভাবে ভয় করা দরকার ঠিক তেমন ভাবে ভয় করো। আর তোমরা অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা।"** *(সূরা আলে ইমরান ৩ঃ ১০২)*

যখন আমরা বলি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তখন আমরা বলে থাকি যে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) ছাড়া ইবাদতের যোগ্য অন্য কোন উপাস্য নাই। ইহার অর্থ এই দাড়ায় যে, আত্মসমপর্নের জন্য আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) ছাড়া আর কোন শক্তি নাই। ইহা করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে কোন কিছুই আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) কোন গুণাবলীর সমকক্ষ বা যোগ্য নয়। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) তার নিজের নিরানববই (৯৯)টি নাম ও গুণাবলী আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন। যে কেউ আল্লাহর সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং শুধু একটিমাত্র নাম বা গুণাবলীর অধিকারী বলে দাবী করে তাহলে সে ব্যক্তি একটি 'তাগুত' পরিণত হবে। আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) পরিবর্তে যে কারোরই আনুগত্য বা ইবাদত করা হয় সে "তাগুত" সুতরাং আমাদের নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করার পূর্বে আমরা প্রথমেই 'তাগুত'কে সেইভাবে বাতিল বা অস্বীকার করব ঠিক যেভাবে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেছেনঃ

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নাই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গুমরাহী থেকে পৃথক হইয়া গেছে । এখন যে কেহ 'তাগুতকে' অস্বীকার করিয়া আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিল সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করিল, যাহা কখনই ছিঁড়িয়া যাইবার নহে এবং আল্লাহ (যাহার আশ্রয় সে গ্রহন করিয়াছে) সব কিছু শ্রবণ করেন ও সব কিছু জানেন।" *(সূরা আল-বাকারাহ ২ঃ ২৫৬)*

"আমি প্রত্যেক উম্মতে একজন রাসূল পাঠাইয়াছি। আর তাহার সাহায্যে সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছি যে, আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাগুতের বন্দেগী হইতে দূরে থাক। ইহার পর তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও আল্লাহ হেদায়াত দান করিয়াছেন, আর কাহারো উপর গোমরাহী চাপিয়া বসিয়াছে। অনন্তর যমীনের উপর একটু চলাফেরা করিয়া দেখিয়া লও যে, মিথ্যা আরোপকারীদের কি পরিণাম হইয়াছে।" *(সূরা নাহল ৩৬)*

"আল-হাকিম (AL-HAKIM) আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) একটি নাম ও গুণাবলী যার অর্থ "একমাত্র আইনদাতা (The only law giver)"। যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন আইন প্রণয়ন করল যা কোরআন ও সুন্নাহর বাইরে তাহলে সে ব্যক্তি একটি 'তাগুতে' পরিণত হবে কারণ আল্লাহই (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) একমাত্র আল-হাকিম যিনি বিধান রচনা করেন। আল্লাহই (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) একমাত্র আইনদাতা একথা প্রমাণের জন্য কোরআনে অনেক আয়াত বিদ্যমান।

"আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নাই। তিনি আদেশ দিয়াছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানেনা।" *(সূরা ইউসুফ ১২ঃ ৪০)*

“তুমি বল, তাহাদের অবস্থানের সঠিক মীয়াদ আল্লাহ তা’আলা অধিক ভালো জানেন। আসমান ও যমীনের সব গোপন অবস্থা তাঁহারই জানা আছে। তিনি কত সুন্দরভাবে দেখেন, কত সুন্দর নির্ভুলভাবে তিনি শুনেন! যমীন ও আসমানের সব সৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ক তিনি ছাড়া আর কেহ নাই। তিনি তাঁহার রাজ্যশাসনে কাহাকেও শরীক করেন না।” *(সূরা আল-কাহাফ ১৮ঃ ২৬)*

আল-কোরআনের এইসব আয়াতসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহই (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আইনদানের একমাত্র অধিকারী এবং আমাদের জন্য অবশ্যই তা পালনযোগ্য। আমরা মুসলমানরা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) ব্যতীত অন্য কারোর তৈরীকৃত আইনের আনুগত্য করতে পারিনা।

“তাহারা কি আল্লাহর এমন কিছু শরীক বানাইয়া লইয়াছে যাহারা ইহাদের জন্য ‘দ্বীন’ ধরনের কোন নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে যাহার কোন অনুমতি আল্লাহ দেন নাই? ফয়সালার সময় পূর্ব হইতেই যদি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া না হইত তাহা হইলে এতদিনে তাহাদের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করিয়া দেওয়া হইত। নিশ্চিতই এই যালেমদের জন্য পীড়াদায়ক আযাব রহিয়াছে।” *(সূরা আশ শুরা ৪২ঃ ২১)*

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ **“আর যে জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয় নাই তাহার গোশত খাইও না। তাহা খাওয়া ফাসেকী (পাপের) কাজ। শয়তানেরা নিজেদের সংগী-সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্নাবলীর উন্মেষ করে, যেন তাহারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করিতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি তাহাদের আনুগত্য স্বীকার কর তবে নিশ্চিতই তোমরা মুশরিক।”** *(সূরা আল-আনআম ৬ঃ ১২১)*

এইসব আয়াতসমূহে প্রমাণ করে যে, যদি আমরা আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) পাশে অন্য কাউকে আইনদাতা হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে আমরা আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) সাথে শরীক সাব্যস্ত করার মতো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের (শিরক) অপরাধী হবো। এখন যদি কোন ব্যক্তি একটি (কুফরী নিয়মে অর্থাৎ গণতন্ত্র) রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় প্রেরণের জন্য ভোট দান করে যারা কুফরী আইন প্রণয়ন করে তখন সে শুধু তাগুতকে চিহ্নিত করল না বরং নিজে কুফরী নিয়মে অংশগ্রহণ করল এবং সেই রাজনৈতিক দলকে তাগুতকে পরিণত হওয়ার জন্য এবং কুফর প্রণয়ন করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করল।

নিম্নের উল্লেখিত শরীয়তের এবং ঈমানের প্রধান বৈশিষ্টগুলো প্রমাণ করে যে মানুষের তৈরীকৃত বিধানে ভোটদান বা অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ বিপথগামীতা অর্থাৎ জাহান্নাম।

(১) “শাহাদাহ” এর প্রথম অংশঃ

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” অর্থাৎ আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) ছাড়া ইবাদতের বা আনুগত্যের যোগ্য কেউ নাই। ইহা তাওহীদুল উলুহিয়া যে কেউই আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) যাকে আনুগত্য বা মান্য করার হুকুম করেছেন তার আনুগত্য করে সত্যিকার অর্থে সে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) মান্য বা আনুগত্য করল।

(২) “শাহাদাহ” এর দ্বিতীয় অংশঃ

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ রিসালাত যার অর্থ মুহাম্মদ (সঃ) এর শরীয়াহই একমাত্র বৈধ শরীয়াহ যা মান্য করতে হবে এবং আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) হুকুম প্রণয়নের জন্যে তাঁরই দেখানো পথ অনুসরণ করতে হবে অন্য কোন পথে নয়।

(৩) “তাগুত” কে অস্বীকারঃ

ঈমান বিরোধী বিষয়সমূহের উপর অবিশ্বাস পোষণ ও বাতিলকরণ ব্যতীত ঈমানের দাবী করা অযৌক্তিকতা ও ভন্ডামী মাত্র।

“দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নাই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গুমরাহী থেকে পৃথক হইয়া গেছে। এখন যে কেহ ‘তাগুতকে’ অস্বীকার করিয়া আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিল সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করিল, যাহা কখনই ছিঁড়িয়া যাইবার নহে এবং আল্লাহ (যাহার আশ্রয় সে গ্রহন করিয়াছে) সব কিছু শ্রবণ করেন ও সব কিছু জানেন।” *(সূরা আল-বাকারাহ ২ঃ ২৫৬)*

“হে নবী, তুমি কি সেইসব লোকদের দেখ নাই যাহারা দাবী তো করে যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি সেই কিতাবের প্রতি যাহা তোমার প্রতি নাযিল হইয়াছে এবং যাহা তোমরা পূর্বে নাযিল হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারের ফায়সালা করাইবার জন্য তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাহাদিগকে তাগুতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও অমান্য করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, মূলত শয়তান তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়া সত্য-সঠিক পথ হইতে বহুদূরে লইয়া যাইতে চাহে।” *(সূরা আন নিসা ৪ঃ ৬০)*

(৪) মুসলমানদের উপর কাফিরদের শাসন কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধঃ

মুসলমানদের উপর কাফিরদের কর্তৃত্ব সর্বাস্থায় নিষিদ্ধ বা হারাম যদিও কাফিররা তাদের আইন প্রণয়নে ইসলামী নিয়ম কানুন ব্যবহার করে এবং বিশ্বাসী অর্থাৎ ঈমানদাররা কখনও তাদের কর্তৃত্ব মেনে নিবে না। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেন।

"এই মুনাফিকগণ তোমাদের ব্যাপারে এই অপেক্ষায় রহিয়াছে যে, শেষ পর্যন্ত পরিণতি কি দাঁড়ায়! খোদার তরফ হইতে তোমাদের জয় সূচিত হইলে তাহারা আসিয়া বলিবেঃ আমরাও কি তোমাদের সংগে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাফেরদের পাল্লা ভারী হইলে তাহাদিগকে বলিবেঃ আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে পারিতাম না? তাহা সত্ত্বেও আমরা তোমাদিগকে মুসলমানদের হইতে রক্ষা করিয়াছি। বস্তুতঃ আল্লাহই তোমাদের ও তাহাদের পারস্পরিক ব্যাপারের ফয়সালা কিয়ামতের দিন করিবেন। আর এই (ফায়সালায়) মুসলমানদের উপর কাফেরদের জয়লাভ করার কোন পথই আল্লাহ অবশিষ্ট রাখেন নাই।" *(সূরা নিসাঃ ১৪১)*

(৫) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিরকঃ

যে কেউই দাবী করে যে আমি বা আমরা আইন তৈরী করতে পারি তাহলে সে শিরক করল কারণ একমাত্র আল্লাহই (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আইন দান করেন। আমরা আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) গোলাম এবং গোলাম তাঁর মালিকের নির্দেশ ও ফয়সালা পালনের মাধ্যমে আনুগত্য করবে।

"আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নাই। তিনি আদেশ দিয়াছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করোনা। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানেনা।" *(সূরা ইউসুফ ১২ঃ ৪০)*

"হে ঈমানদার লোকগণ, আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রসূলের এবং সেইসব লোকেরও যাহারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয় তবে উহাকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরাইয়া দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হইয়া থাক। ইহাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়াও ইহাই উত্তম। *(সূরা নিসা ৪ঃ ৫৯)*

(৬) আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরকঃ

"প্রত্যেক মুসলিম নামাজে সূরা ফাতিহায় পড়ে ইয়্যা কানা বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস তায়িন। "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।" *(সূরাঃ আল ফাতিহা ১ঃ ৪)*

(৭) বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে কুফরীঃ

যারা কাফির যারা ইসলামকে অস্বীকার করছে, যারা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করছে এবং যারা মুসলমানদের অন্যায় ও অত্যাচার করছে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা তাদেরকে সাহায্য করা এবং তাদের সাথে তাদের মতো করে জোটবদ্ধ বা একত্রিত হওয়া সম্পূর্ণভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ যে কেউই ইহা করবে সে নিজে কাফিরে পরিণত হবে।

"হে ঈমানদার লোকগণ! ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহন করিও না, ইহারা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহন করে, তাহা হইলে সে তাহাদের মধ্যে গণ্য হইবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যালেমদিগকে নিজের হেদায়াত হইতে বঞ্চিত করেন।" *(সূরা আল-মায়িদা ৫ঃ ৫১)*

"যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।" *(সূরা আন নিসা ৪ঃ ১৩৯)*

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে?" *(সূরা আন-নিসা ১৪৪)*

(৮) আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে শিরকঃ

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আল হাকিম, আল হাকাম, আল আলিম, আল খাবির, আল ওয়াকিল, আল আদীল, আল বাদি, আল খাফি, আল মালিক, আন নাসির, আল ওয়াসি, সুতরাং যে কেউই মানুষের তৈরী করা আইনের অনুসারী হয় এবং নিজের জীবনের যাবতীয় কার্যক্রম তদানুযায়ী পরিচালিত করে যা সম্পূর্ণভাবে তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) একত্ববাদের বিরোধিতা এবং আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) অনেক নাম ও গুণাবলীসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন কওে এবং এই কার্যক্রমের দ্বারা যে কেউ শিরকের মতো ভর্ৎসনা অমার্জনীয় অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। সে যেন ধরে নেয় যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) উপরোক্ত গুণাবলীসমূহ বিদ্যমান এবং সে মনে করে মানুষ আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) হতে উৎকৃষ্ট আইন দিতে সক্ষম (নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক) এবং মনে করে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) দেওয়া শরীয়াহ বিধান সঠিক পথ নির্দেশনায়, আইন প্রণয়নে ও বিচার ফয়সালার জন্য পরিপূর্ণ না। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক)

"ইহাদের অধিকাংশই আল্লাহকে মানে; কিন্তু এমনভাবে যে, তাহার সহিত অন্যেরাও শরীক।" *(সূরা ইউসুফ ১২ঃ ১০৬)*

"এবং সেই সব মুনাফিক পুরুষ ও স্ত্রী এবং মুশরিক পুরুষ ও স্ত্রীগণকে শাস্তি দিবেন, যাহারা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। দোষ ও খারাবীর আবর্তনে তাহারা নিজেরাই পড়িয়া গিয়াছে। আল্লাহর গযব হইয়াছে তাহাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন। আর তাহাদের জন্য জাহান্নাম সু-সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, যাহা অত্যন্ত বেশী খারাব স্থান।" *(সূরা আল ফাতাহ ৪৭ঃ ৬)*

"আল্লাহ কেবল শেরকের গুনাহই মাফ করেন না; উহা ব্যতীত আর যত গুনাহ আছে তাহা যাহার জন্য ইচ্ছা মাফ করিয়া দেন। যে লোক আল্লাহর সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিল; সে তো বড় মিথ্যা রচনা করিল, এবং বড় কঠিন গুনাহের কাজ করিল।" *(সূরা আন নিসা ৪ঃ৪৮)*

(৯) রাসূল (সঃ) এর দেখানো পথের সম্পূর্ণ বিরোধিতাঃ

রাসূল (সঃ) মুসলমানদেরকে আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) একত্ববাদের ভিত্তিতে একত্রিত করেছিলেন এবং শিরকের বিরুদ্ধে মৌখিক ও দৈহিকভাবে জিহাদ করেছিলেন এবং সর্বক্ষণ শরীয়াহ আইনের দ্বারাই সমস্ত কিছু পরিচালনা করেছিলেন। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) অবতীর্ণ বিষয়ের বিরোধী ও অনুসরণকারী কাফেরদের কাছে কখনো তিনি ফয়সালার প্রার্থনা করেননি। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেনঃ

"কিন্তু যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধতা করার জন্য কৃতসংকল্প হইবে এবং ঈমানদার লোকের নিয়ম-নীতির বিপরীত নীতিতে চলিবে-এমতাবস্থায় যে, প্রকৃত সত্যপথ তাহার নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে-তাহাকে আমরা সেই দিকেই চালাইব যেদিকে সে নিজেই চলিতে শুরু করিয়াছে এবং তাহা জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব যাহা নিকৃষ্টতম স্থান।" *(সূরা আন-নিসা ৪ঃ ১১৫)*

"তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরেকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন।" *(সূরা শূরা আয়াত ১৩)*

ইবরাহীমের জীবনপন্থাকে ঘৃণা করিবে কে? বস্তুতঃ যে নিজেকে মুর্খতা ও নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত করিয়াছে, সে ব্যতীত আর কে এইরূপ দৃষ্টতা করিতে পারে? ইবরাহীম আর কেহ নহে তাহাকেই আমি পৃথিবীতে আমার কাজ সম্পন্ন করার জন্য বাছাই করিয়া লইয়াছিলাম এবং পরকালে সে সৎ লোকদের মধ্যেই গন্য হইবে। *(সূরা বাকারা ২ঃ ১৩০)*

(১০) কুফরকে উৎখাতের জন্যেই ইসলামের আগমণঃ

আল কোরআনের জিহাদের প্রতিটি আয়াত (একশতের উপরে) এবং অন্যান্য অনেক আয়াতসমূহ ও অসংখ্য হাদীসসমূহ একথা নিবিঘ্নে প্রমাণ করে কুফরকে সমর্থনের জন্যে নয় বরং কুফরকে সমূলে উৎখাতের জন্যই ইসলামের আগমন।

"হে ঈমানদার লোকেরা, এই কাফেরদের সাথে লড়াই কর, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা (শিরক ও কুফর) খতম হইয়া যায় এবং দ্বীন পুরাপুরিভাবে আল্লাহরই জন্য হইয়া যায়। পরে তাহারা যদি ফেতনা হইতে বিরত থাকে, তবে তাহাদের আমল আল্লাহই দেখিবেন।" *(সূরা আনফাল ৮ঃ ৩৯)*

(১১) কুফরের সাথে আপোষ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও হারামঃ

যখন মক্কার কোরাইশ মুশরিকরা তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) একত্ববাদের আহবানের প্রতি আপোষ করার জন্যে রাসূল (সঃ) এর নিকট প্রার্থনা করেছিল তখন রাসূল (সঃ) তাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তখন আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) সূরা আল কাফিরুন নাযেল করেছিলেন তাতে আপোষের বিপক্ষে পরিষ্কারভাবে উত্তর দেওয়া হয়েছিল।

"বলিয়া দাওঃ হে কাফেররা! আমি সেই রবের ইবাদত করি না যাহাদের ইবাদত তোমরা কর। আর না তোমরা তাঁহার ইবাদত কর, যাহার ইবাদত আমি করি। আমি তাহাদের ইবাদত করিতে প্রস্তুত নহি যাহাদের ইবাদত তোমরা করিয়াছ। আর না তোমরা তাঁহার ইবাদত করিতে প্রস্তুত যাহার ইবাদত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।" *(সূরা আল কাফিরুন ১০৯ঃ ১-৬)*

"এই আনুগত্য ইসলাম ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করিতে চাহে তাহার সেই পন্থা একেবারেই কবুল করা হইবে না এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হইবে।" *(সূরা আলে ইমরান ৩ঃ ৮৫)*

"কাজেই তুমি এই অমান্যকারীদের কোনরূপ চাপে পড়িয়া কিছু করিও না। এই লোকেরাতো চায় যে, তুমি কিছু গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলে তাহারাও কিছু গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে।" *(সূরা আল-কালাম ৬৮ঃ ৮-৯)*

(১২) ক্রমে ক্রমে বা আংশিক প্রণয়ন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধঃ

কিছু কিছু ব্যক্তি (শয়তান) ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন করে আইন প্রণয়নের ভিত্তি ভ্রান্ত মতবাদের উপর ভিত্তি করে কুফর নিয়মের মধ্যে নিজেদের অংশগ্রহণকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণের চেষ্টা করে (যা কিনা পুরোপুরি শিরক)। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাদের জীবনের প্রতিটি কার্যক্রমের আইনদানের একমাত্র অধিপতি বা মালিক, এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে না মেনে ক্রমে ক্রমে বা আংশিক মেনে নেওয়া একেবারেই অগ্রহণযোগ্য অর্থাৎ শিরক। আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আইন বা শরীয়াহ প্রণয়নের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরিবর্তে ইসলাম অস্বীকার বা বিরোধী ফয়সালা প্রার্থনা এবং ইসলাম বিরোধী আইন প্রণয়ন করা যাবে এ ধরনের যৌক্তিকতা সম্পূর্ণভাবে শিরক। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেনঃ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" *(সূরা আল-বাকারাহ ২ঃ ২০৮)*

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যাহারা এরূপ করে তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অজ্ঞাত নহেন।" *(সূরা আল-বাকারাহ ২ঃ ৮৫)*

(১৩) কুফর আইনের আনুগত্য সম্পূর্ণ শিরক ও নিষিদ্ধঃ

"এবং কাফের ও মুনাফেকের সম্মুখে আদৌ দমিয়া যাইও না, তাহাদের নিপীড়নকে মাত্রই পরোয়া করিও না। আল্লাহর উপর ভরসা কর, আল্লাহই যথেষ্ট যে, মানুষ সমস্ত ব্যাপার তাঁহারই উপর সোপর্দ করিয়া দিক।" *(সূরা আল-আহযাব ৩৩ঃ ৪৮)*

"সুতরাং হে মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহর আইন অনুযায়ী এই লোকদের যাবতীয় পারস্পরিক ব্যাপারের ফয়সালা কর, এবং তাহাদের নফসানী খাহেশাতের (খেয়াল খুশীর) অনুসরণ করিও না। সাবধান থাক, উহারা যেন তোমাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করিয়া আল্লাহর নাযিল করা হেদায়াত হইতে একবিন্দু পরিমাণ বিভ্রান্ত করিতে না পারে। আর ইহারা যদি বিভ্রান্ত হয়, তবে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ তাহাদের কোন কোন গুনাহের শাস্তি স্বরূপ তাহাদিগকে কঠিন বিপদে নিমজ্জিত করার সিদ্ধান্তই করিয়া ফেলিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাদের অনেক লোকই ফাসেক।" *(সূরা আল-মায়েদা ৫ঃ ৪৯)*

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি সেই সব লোকের ইশারা অনুযায়ী চলিতে শুরু কর, যাহারা কুফরীর পথ অবলম্বন করিয়াছে তবে তাহারা তোমাদিগকে বিপরীত দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হইবে।" *(সূরা আল-ইমরান ৩ঃ ১৪৯)*

(১৪) মারূফ ছাড়া অন্য কারোর আনুগত্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধঃ

ধরি যদি মানুষের তৈরীকৃত আইনসমূহের বাহ্যিকভাবে "শরীয়াহ" নিয়মকে স্বীকার করল কিন্তু তা সত্ত্বেও এর মধ্যে শিরক বিদ্যমান থাকে কারণ তাদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) কে খুশী করা এবং তাঁর আনুগত্যের জন্যে নয় বরং এসব কার্যক্রম সাজানোর মাধ্যমে মানুষকে বড় বড় ব্যবসায়ীদের, বড় বড় দলকে খুশীর জন্যে এবং নিজেরা বেতন ভোগ করার জন্যে। যা হোক এইসব আইনসমূহ ইসলামী বিশ্বাস ও আইনসমূহের সম্পূর্ণ বিরোধী। তারা ইসলামী বিশ্বাসের সাথে বিরোধীতা করে এ ঘোষণার মাধ্যমে যে, মানুষ নিজের জন্য নিজেই আইন তৈরী করবে ও নিজেরা নিজেদের মতো জীবন পরিচালনা করবে এবং শিক্ষা, রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থা সমস্ত কিছু ধর্ম থেকে আলাদা হবে। ইসলামী আইনকে পরিবর্তন করে তারা হালাল করেছে মদ, সুদ, অশ্লীল চিত্র ও সাহিত্য, গর্ভপাত, অবাধ যৌনাচার, ব্যভিচার, সমকামিতা মানুষের অশিষ্টতা বা অশ্লীলতা ইত্যাদি। নাউস বিন সামা আন থেকে উদ্ধৃত রাসূল (সঃ) বলেনঃ সৃষ্টিকর্তার *(আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)* অবাধ্যতার সৃষ্টির কোন আনুগত্য নাই। *(ফারহুস সুন্নাহ ১০/৪৪)* আহমদ আল হাকিম)। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেন "আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) অবাধ্যতার কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য আছে মারূফে। *(মুসলিম কিতাবুল ইসারাহ নং ৪৫৩৬), বুখারী (২য় খন্ড ৯ নং ২৬৯))*

সুতরাং নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো উপরে বর্ণিত হারাম এবং শিরকের অর্ন্তভূক্ত।

১) মানুষের তৈরী আইনে বা নিয়মে ভোট দান করা;

২) আইন প্রণয়নের জন্য ভোট প্রার্থী হওয়া;

৩) এমন কোন দলের সদস্য হওয়া যা গঠিত হয়েছে আইন তৈরী বা প্রণয়নের উদ্দেশ্য;

৪) মানুষ তৈরীকৃত আইনের প্রতি সমর্থন বা ভোট দানে লোকজনকে ডাকা বা উৎসাহিত করা;

যে কেউই এ সমস্ত কার্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন উনার অবশ্যই উচিৎ আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) কাছে ক্ষমা বা তওবা প্রার্থনা করা এবং যে সমস্ত লোকজনকে উনারা পূর্বে এ সমস্ত ভুল কার্যের দিকে আহবান জানিয়েছিলেন তাদের সবাইকে সত্য জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

যাদু, তাবিজ-কবজ এবং শুভ অশূভ সংকেত গ্রহন শির্ক

তৌহিদের প্রথম অধ্যায়ে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা এবং তার সঙ্গে মানুষের সকল সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বের স্রষ্ঠা ও সংরক্ষক এই উপলদ্ধিকে তৌহিদ আল-রুবুবিয়াহর (প্রতিপালকের এককত্ত্ব) বলা হয়েছিল। আল্লাহর হুকুমে বিশ্বের বস্তুর সৃষ্টি, সংরক্ষণ এবং পরিশেষে ধ্বংস হবে। আল্লাহই ভাল ভাগ্য ও মন্দ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। তথাপি সর্বকালের মানুষ প্রশ্ন করেছে ভাল সময় বা মন্দ সময় আসার আগেই কি কোনভাবে জানার উপায় আছে, কারণ যদি সময় আসার পূর্বেই জানার উপায় থাকত, তাহলে দূর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হত এবং সফলতা নিশ্চিত করা যেত। অতিপ্রাচীন কাল হতে এই গুপ্ত জ্ঞানের মধ্যে প্রবেশাধিকার রয়েছে বলে কিছু ব্যক্তি বিশেষ মিথ্যে দাবী করে আসছে এবং মানবকূলের অজ্ঞ জনগোষ্ঠী প্রচুর অর্থ খরচ করে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অংশ বিশেষ জানার জন্য তাদের চারদিকে ভিড় করছে। দূর্ঘটনা এড়ানোর কিছু কৌশল সাধারণ জ্ঞান হিসাবে পরিণত হয়েছে এবং সেই জন্য ভাল ভাগ্যের তাবিজ কবজ ও যাদুমন্ত্রের প্রাচুর্য প্রায় সব সমাজেই দেখা যায়। একজনের ভাগ্য জানার জন্য কিছু কল্পিত গোপন পদ্ধতিও সাধারণ জ্ঞানে পরিণত হযেছে এবং সে জন্য বিভিন্ন ধরনের শুভ অশূভ সংকেত এবং তাদের ব্যাখ্যা সকল সভ্যতায় পাওয়া যায়। অবশ্য এই জ্ঞনের কিছু গোপন অংশ ভাগ্য গণনা ও জাদু মন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের গুপ্ত বিদ্যা হিসাবে বংশ পরম্পরায় এই সব চর্চা সমাজে ব্যাপকভাবে সংঘটিত হবার কারণে এগুলির ব্যাপারে একটি স্বচ্ছ ইসলামী ধারণা প্রকাশ করা খুবই গুরুতদ্বপূর্ণ। সম্ভবত আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে ঐ সব চর্চা সম্পর্কে ইসলামি আদেশ নিষেধ পরিস্কার ভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে একজন মুসলিম অতি সহজেই বড় ধরণের শিরক এর গুনাহর মধ্যে পড়তে পারে যা এই সব চর্চায় মূলনীতি। যে সব বিষয়ে আল্লাহর অদ্বিতীয় গুনাবলির (সিফাত) বিরোধিতা করে এবং সৃষ্টির উপসনা (ইবাদত) উৎকর্ষ সাধন করে। কোরআনে এবং রাসূলের (সঃ) সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে প্রতিটি দাবী বিশ্লেষণ করা হবে এবং যারা আন্তরিকভাবে তৌহিদের বাস্তবতা খুজছেন তাদের জন্য প্রত্যেকটির উপর ইসলামী নীতি সম্পর্কে নির্দেশনাবলী উপস্থাপন করা হবে।

জাদুমন্ত্র

রাসূল (সঃ) এর সময় আরবদের মধ্যে শয়তান তাড়ানো এবং ভাল ভাগ্য আনার জন্য বালা, চুড়ি পুতির কণ্ঠহার, ঝিনুক ইত্যাদির কবজও পরার প্রথা ছিল। পৃথিবীর সকল অঞ্চলে বিভিন্ন আকৃতির তাবিজ ও মন্ত্রপূত কবচ এবং তাবিজের মত সৃষ্টিকৃত বস্তুর উপর শয়তান তাড়ানো এবং ভাল ভাগ্য আনার ক্ষমতা বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর রবুবিয়াহর (প্রতিপালত্ব) উপর বিশ্বাসের বিরোধিতা করেন। ইসলাম এইধরনের বিশ্বাস প্রদর্শনের বিরোধিতা করে যা আরব দেশে শেষ পয়গম্বরের সময় প্রচলিত ছিল। এই বিরোধিতা ভিত্তি এমনভাবে স্থাপিত যে পরবর্তী সময়ে আশানুরূপ বিশ্বাস ও প্রথা যখনই আবির্ভূত হবে তখনই তা বাতিল বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যাবে। এই ধরণের বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে বেশীরভাগ পৌত্তলিকসমাজে মূর্তিপূজার ভিত্তি প্রদান করে এবং জাদুমন্ত্র নিজেই মূতিপূজার একটি শাখার প্রতিনিধিত্ব করে। এই বিশ্বাস খ্রিস্টান ধর্মের ক্যাথোলিক শাখায় সহজেই দেখা যায় সেখানে পয়গম্বর যিশু কে দেবত্ব প্রদান করা হযেছে তার মা মেরী এবং সন্তানদের উপসনা করা হয় এবং সৌভাগ্যর জন্য তাদের কল্পিত ছবি, মূর্তি এবং পদক রাখা ও পরা হয়। রাসূল (সঃ) সময় যখন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করল তখনও তারা প্রায়ই জাদুমন্ত্রে বিশ্বাস করত, যা আরবী ভাষায় সমষ্টিগত তামাইম (তামমিহ একবচনে) বলে পরিচিত। ফলে রাসূল (সঃ) বহু হদীস রযেছে যেখানে এই ধরণের আচার শক্তভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নীচে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলঃ

ইমরান ইবনে হুসাইন কর্তৃক বর্ণিত আছে রাসূল (সঃ) একটি লোকের বাহুতে দস্তার বালা দেখে তাকে বললেন দুর্ভাগ্য তোমার উপর। এটা কি? লোকটি উত্তর দিল যে এটি আল ওয়াহিনাহ নামের একটি অসুখ হতে রক্ষা পাবার জন্য ।[২২] রাসূল (সঃ) তখন

২২. *শাব্দিক অর্থে দুর্বলতা। সম্ভবতঃ গেঁটে বাতকে উদ্দেশ্য করা।*

বললেন এটা ফেলে দাও, কারণ এটা শুধু তোমার অসুস্থতা বৃদ্ধি করবে এবং যদি তুমি এটা পরা অবস্থায় মারা যাও তুমি কখনও কৃতকার্য হবে না ।[২৩]

এই ভাবে অসুস্থতা এড়ানো যায অথবা সারানো যায় এই বিশ্বাসে অসুস্থ বা স্বাস্থবানদের তামা, দস্তা, চুড়ি, বালা এবং আংটি পড়া কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হারাম (নিষিদ্ধ) সামগ্রীর মাধ্যমে অসুস্থতার চিকিৎসা ইসলামে নিষেধ যে সম্বন্ধে রাসূল (সঃ) বলেছিলেন একজন আর একজনের অসুস্থতার চিকিৎসা কর কিন্তু নিষিদ্ধ সামগ্রী দিয়ে অসুস্থতা চিকিৎসা করিও না ।[২৪]

আবু ওয়াকীদ আল লেইথী ও বর্ণনা দিয়েছেন যে আল্লাহর রাসূল (সঃ) হুনাইনের[২৫] উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়ে ধাতু আনওয়াত[২৬] নামে একটি বৃত্ষ পার হয়ে গেলেন। মূর্তিপূজারীরা সৌভাগ্যের জন্য এই গাছের ডালে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। ইসলামে নব দীক্ষিত কিছু সাবাহা রাসূল (সঃ) অনুরূপ একটি বৃক্ষ মনোনীত করে দিতে বললেন রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন সুবহানালাহ (আল্লাহ প্রশংসিত হউক) এটা ঠিক সেই রকম হল যখন মূসার লোকেরা মূসা কে বলেছিল **"তাহাদিগের দেবতার ন্যায় আমাদিগের জন্যও এক দেবতা গড়িয়ে দাও।"** *(সূরা আল আরাফ ৭ঃ ১৩৮)* যার হাতে আমার আত্মা তার নামে শপথ তোমরা সবাই তোমাদের পূববর্তীদের রাস্তা অনুসরণ করবে। [২৭]

এই হাদিসে রাসূল (সঃ) সৌভাগ্যের প্রতীকস্বরূপ কোন বস্তুর বিশ্বাস ও ব্যবহারই শুধু বাতিল করেন নি তিনি ভবিষ্যৎবাণীও বরেছিলেন যে মুসলিমরা খৃস্টান ও ইহুদীদের অনুসরণ করবে। মুসলিমদের মধ্যে সাধারণভাবে বাহ্যত যিকির তাসবিহ, ক্যাথলিকদের জপমালার অনুসরণ করবে। মিলাদ (রাসূলের জন্ম দিবস উদযাপন) যিশু খৃস্টের জন্মোৎসব পালনের অনুকরণ এবং বহু মুসলিমদের মধ্যে পীর ও সাধক এবং তাদের মধ্যস্থতায় বিশ্বাস খ্রিস্টীয় ধর্মের প্রথা থেকে ভিন্ন নয়। ভবিষ্যৎবানী ইতোমধেই সত্যে পরিণত হয়েছে।

রাসূল (সঃ) যারা মন্ত্রপূত কবচ পরে তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপের বিষয়টি আরও গুরুত্ব সহকারে স্মরণ করিয়া দিয়েছিলেন। উকবা ইবনে আমির র্বণনা দিয়েছেন যে রাসূল (সঃ) একবার বলেছিলেন আল্লাহ তাদের উপর ব্যর্থতা এবং অশান্তি ঘটাক যারা নিজেরা মন্ত্রপূত কবচ পরে অথবা অন্যকে পরায়। *(আহম্মদ এবং আল হাকিম কর্তৃক সংগৃহীত)*

রাসূলের (সঃ) সাহাবাগণ জাদুমন্ত্র এবং মন্ত্রপূত কবচ সম্বন্ধে রাসূলের (সঃ) আদেশ কঠোরভাবে অনুসরণ করেছেন। ফলস্বরূপ বহু লিপিবদ্ধ ঘটনা পাওয়া যায যেখানে তারা সমাজে এবং তাদের পরিবারের মধ্যে এগুলির প্রচলন খোলাখুলিভাবে বিরোধিতা করেছেন। উরওয়াহ বর্ণনা দিয়েছেন যে যখন সাহাবী হুদায়ফা এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যান তখন তিনি লোকটির একটি বালা বাধা দেখতে পান। তিনি ওটা টেনে ভেঙ্গে ফেললেন। তার পর হুদায়ফা আয়াত আবৃতি করলেন **"তাহাদিগের অধিকাংশ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাহারা শিরক করে।"** *(সূরা ইউসুফ ১২ঃ১০৩)* অন্য আর এক সময় তিনি এক অসুস্থ লোকের বাহুতে স্পর্শ করে বাহুর চার দিকে একটি খিয়াত (দড়ি দিয়ে বাধা বালা) দেখতে পেলেন। যখন লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন ওটা কি লোকটি উত্তর দিল আমার জন্য বিশেষভাবে মন্ত্র পড়া একটি জিনিস হুদায়ফা লোকটার বাহু থেকে তা ছিড়ে ফেলে বললেন তুমি যদি ওটা বাহুতে থাকা অবস্থায মারা যেতে আমি তোমার জানাযা পড়তাম না।[২৮] আব্দুলাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী জয়নাব র্বণনা দেন যে একদিন যখন ইবনে মাসউদ তার গলায় একটা রশির হার জিজ্ঞাস করলেন এটা কি কখন কিনি উত্তর দিলেন এটা আমাকে সাহায্য করার জন্য মন্ত্র পড়া একটা রশি। তিনি তার গলা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন নিশ্চয় আব্দুলাহর পরিবারের শিরক এর প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহর রাসূল (সঃ) কে বলতে শুনিয়াছি নিশ্চয়ই মন্ত্র, তাবচি কবচ এবং জাদুমন্ত্র শিরক। জয়নাব উত্তর দিলেন আপনি এ কথা কেন বলছেন? আমার চোখ স্পন্দিত হত বলে অমুক ইহুদীর কাছে গেলে সে এর উপর একটা মন্তও পড়ল এবং এতে স্পন্ধন থেমে গেল। ইবনে মাসুদ উত্তর দিলেন নিশ্চয়ই এটা শুধু একটা শয়তানের হাতের খোঁচা কাজেই তুমি যখন তাকে মন্ত্র দিয়ে বশ করেছ তখন সে ছেড়ে গেছে। রাসূল (সঃ) যেমন পড়তেন এটা পড়াই তোমার জন্য যথেস্ট হতঃ

---

২৩. *আহমদ, ইবনে মাযা এবং ইবনে হিব্বান কর্তৃক সংগৃহীত।*

২৪. *আবু দাউদ (Sunan Abu Dawood, Englishtran, vol 3, p 1087, no, 3865) এবং আল বাইহাকী কর্তৃক সংগৃহীত।*

২৫. *হিজরীর পর দশম বৎসরে রাসূল (সঃ) এবং আরবীয় পৌত্তলিক উপজাতিদের মধ্যে সংঘটিত শেষ গুরুত্বর্পূণ যুদ্ধের স্থান।*

২৬. *শাব্দিক অর্থে "এমন বস্তু যার উপর কিছু ঝুলছে।"*

২৭. *আত তিরমীজি, আন নাসায়ী এবং আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত।*

২৮. *ওয়াকী কর্তৃক সংগৃহীত।*

অর্থঃ হে মানবকুলের প্রতিপালক দুর্ভোগ দূর কর এবং আমাকে সম্পুর্ণ নিরাময় করে দাও যেহেতু তুমি প্রকৃত উপশমকারী। তোমার চিকিৎসা ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা নাই যে চিকিৎসার পর অসুখ হয় না। [২৯৩০]

জাদুর উপর রায়

এই নিষেধাজ্ঞার পূর্বে উল্লেখিত আরব দেশীয় পদ্ধতির মন্ত্র পড়া তাবিজ কবচ এবং জাদু মন্ত্র রাসূল (সঃ) যার বিরোধিতা করেছিলেন তার মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়। যেখানেই কোন সামগ্রী একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় সেখানেই এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য। প্রযুক্তিগত উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধিলাভ সত্ত্বেও আজকের পশ্চাত্য সমাজে বিভিন্ন ধরণের জাদুমন্ত্র ব্যবহার বহু বিস্তৃত। বহু তাবিচ কবচ প্রত্যাহিত জীবনে এমন ভাবে গেথে গেছে যে খুব কম লোকই এ বিষয়ে চিন্তা করার জন্য একটু সময় ব্যয় করে। তথাপি যখন তবিচ কবচের উৎস জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় তখন এদের মূলে শির্ক তা খুব পরিস্কার হয়ে যায়। পশ্চিমা সমাজের দুটি জনপ্রিয় তাবিচ কবচের উদাহরণ নিম্নে উলেখ করা হলঃ

কোরআনীয় তাবিজ কবচ

ইবনে মাসুদ ইবনে আব্বাস এবং হুদায়ফাহ এর মত সাহাবীগণ সকলেই কোরআন পড়া তাবিজ কবচ পরার বিরোধী ছিলেন। তাবেয়ীনদের (রাসূলের (সঃ) সাহাবাদের ছাত্রগণ) মধ্যে কয়েকজন পন্ডিত ব্যক্তি এধরনের তাবিজের অনুমোদন দিয়েছেন কিন্তু বেশীরভাগ এর বিপক্ষে অথচ পূর্বোক্ত হাদিসের মূল পাঠ্যাংশে কোরআনীয় তাবিজ বা সাধারণ তাবিজের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। এবং রাসূল (সঃ) কোরআনের আয়াত নিজের শরীরে রেখেছেন বা অন্যকে রাখার অনুমতি দিয়েছেন বলে আমাদের কাছে কোন দলিল নেই। কোরআনীয় তাবিজ কবজ শরীরে রাখা এবং রাসূল (সঃ) কর্তৃক বর্ণিত শয়তান এড়ানো এবং বান ও যাদু ভেঙ্গে ফেলার পদ্ধতি পরস্পর বিরোধী। সুন্নহ হল শয়তান নিকটবর্তী হলে কোরআনের কতিপয় সূরা (*১১৩তম এবং ১১৪ তম সূরা ফালাক ও নাস)* এবং আয়াত *(যথাঃ আয়াতুল কুরসী ২ঃ ২৫৫)* পাঠ করা।[৩১] কোরআন হতে সৌভাগ্য লাভের একমাত্র নির্দেশিত উপায় হল কোরআন পড়া এবং বাস্তবায়ন করা। রাসূল (সঃ) বলেন যে কেউ আল্লাহর কিতাব হইতে একটি অক্ষর পড়বে সে একটি নেকী অর্জন করবে এবং প্রত্যেকটি নেকীর মূল্য তার দশ গুন হবে। আমি বলছি না আলিফ লাম মীম একটি অক্ষর বরং আলিফ একটি অক্ষর লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর।[৩২] তাবিজের মধ্যে কোরআন পুরে শরীরে রাখা একটি অসুস্থ লোককে একজন ডাক্তার কর্তৃক প্রেসক্রিপশন (ব্যবস্থাপত্র) দেওয়ার মত। প্রেসক্রিপশন পড়ে এবং এর থেকে ঔষুধ প্রাপ্তির পরিবর্তে সে এটাকে একটা বলের মত গোল করে একটি থলিতে ভর্তি করে এবং তার গলায় ঝুলায় এই বিশ্বাসে যে এটা তাকে সুস্থ রাখবে। যতক্ষন পর্যন্ত একজন কুরআনের আয়াত দ্বারা তাবিজ কবচ ধারন করে এই বিশ্বাসে যে এতে ভূতপ্রেত এড়ান যাবে এবং সৌভাগ্য আসবে ততক্ষন সে আল্লাহ যা ইতিমধ্যে পূর্ব নির্ধারিত করে রেখেছেন তা অস্বীকার করল। লকেটের মধ্যে ভরে পরার জন্য খালি চোখে পড়া যায় না এমন ক্ষুদ্রাকার কোরআন প্রকাশ শির্ককে আহবান করে। একই ভাবে, অতিক্ষুদ্র, কার্যত দুষ্পাঠ্য, ছাপার অক্ষর দিযে লেখা আয়তুল কুরসী গহনা হিসাবে পরাও শির্ক উৎসাহিত করে। যারা শুধু শোভা বর্ধনের জন্য এই ধরনের গহনা পরে তারা শির্ক করে না। কিন্তু বেশির ভাগই ক্ষতিকর প্রভাব হতে রক্ষা পাবার জন্য পরে এবং এই কারণে এই সব কাজ তৌহিদের ইসলামী মূলতত্ত্বের পরিপন্থী শির্ক বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

মুসলিমদের কোরআনকে সৌভাগ্যের জাদুমন্ত্র হিসাবে ব্যবহারকারীদেরকে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যেতে হবে। অমুসলিমরা যে ভাবে বিভিন্ন ধরনের তাবিজ কবচ এবং মন্ত্রপূত বালা ব্যবহার করে ঐভাবে গাড়িতে, চাবির চেইনে বালা কণ্ঠহারে এই সব ঝুলিয়ে রেখে তারা শির্ক এর দরজা খুলে দেয়। এতএব যে সব বিশ্বাসের কারণে তৌহিদের খাটি ধারণা হরণ হয়ে যায় সে ধরণের বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ করতে সচেতন প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে।

---

২৯. *আয়েশা এবং আনাস উভয় কর্তৃক এই দোয়া বর্ণিত এবং আল বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। Sahih Bukhari Arabic English vol 7 pp 427-8, no5, 638-9) and Sahih Muslim (Englishtrans) vol 3 p 1195, no 5434).*

৩০. *আবু দাউদ, আহমদ ইবনে মাযা এবং ইবনে হিব্বান কর্তৃক সংগৃহীত। (Sunan Abu Dawood, Englishtran, vol 3, p 1089, no, 3874).*

৩১. *আবু হুরায়রাহ কর্তৃক বর্নিত এবং আল বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al Bukhari, Arabic English, vol 6th p 491, no 530).*

৩২. *আহমদ এবং আল হাকিম কর্তৃক সংগৃহীত।*

শুভ অশুভ সংকেত

প্রাক ইসলামী আরব দেশের লোকেরা পাখি ও প্রাণীর চলাচলের গতিপথকে আশু সৌভাগ্যে অথবা দূর্ভাগ্যের সংকেত বলে মনে করত। এই ধরনের সংকেতের উপর ভিত্তি করে তারা তাদের জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করত। পাখি ও প্রাণীদের উপর গতিবিধির উপর শুভ অথবা অশুভ সংকেত নির্ণয়ের প্রথাকে আরবী ভাষায় তিয়ারা বলা হত, যা 'তারা' ক্রিয়াপদ হতে গৃহীত এবং যার অর্থ উড়াল দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ যদি কোন ব্যক্তির যাত্রা শুরুর সময় একটি পাখি তার উপর দিয়ে উড়ে বাম দিকে চলে যেত তাহলে সে এটাকে আশু দুর্ভাগ্যের সংকেত মনে করে ঘরে ফিরে যেত। ইসলাম এই প্রথাগুলি বাতিল করেছে কারণ এগুলি তৌহিদ আল্-আসমা ওয়াস-সিফাত এর ভিত ক্ষয় করে ফেলে। কারণ এই প্রথাগুলিঃ

১) ইবাদতের প্রক্রিয়া যাকে নির্ভরশীলতা (তাওয়াক্কুল) বলা হয় তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য দিকে পরিচালিত করে, এবং

২) ভাল ও মন্দ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়তি এড়ানোর ক্ষমতা মানুষের অথবা সৃষ্ট জিনিষের উপর অর্পন করে।

যে বুনিয়াদের উপর তিয়ারার নিষিদ্ধকরণ প্রতিষ্ঠিত তা হলো রাসুলের (সঃ) নাতি আল্-হুসেন বর্ণিত একটি হাদিস যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন, "যে কেউ তিয়ারা করে অথবা তার নিজের জন্য করেছে, তার নিজের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে অথবা কাউকে সম্মোহিত করেছে, সে আমাদের একজন নয়।[৩৩] এখানে "আমাদের" বলতে মুসলিম জনগোষ্ঠী বুঝানো হয়েছে। সুতরাং তিয়ারা এমন একটি কাজ যার উপর বিশ্বাস একজনকে ইসলামের বহির্ভূত করে দেয়। মু'য়াবিয়াহ ইবনে আল-হাকিম কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি হাদিসে রাসুল (সঃ) তিয়ারার ফলাফল বাতিল করে দিয়েছেন। মুয়াবিয়াহ রাসুলকে (সঃ) বললেন, "আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা পাখির শুভ-অশুভ সংকেত মেনে চলে।" রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন, "এটা তোমরা নিজেরাই তৈরী করেছ, সুতরাং এটা যেন তোমাদেরকে থামিয়ে না দেয়।"[৩৪] অর্থাৎ তুমি যা করতে চাও এটা যেন তোমাকে তা করতে বাধা না দেয়। কারণ এ সব সংকেত মানুষের কল্পনাপ্রসূত বানানো গল্প যার কোন বাস্তবতা নেই। এতদানুসারে, আল্লাহর রাসুল (সঃ) পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, মহিমাময় আল্লাহ পাখিদের উড়ার গতিপথকে কোন কিছুর সংকেত হিসাবে ঘোষণা দেননি। তাদের গতিবিধির কারণে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় এই প্রাক-ইসলামী ধারণার সঙ্গে কোন ঘটনার মিল পাওয়া গেলেও কোন সফলতা অথবা দুর্ঘটনা তাদের উড্ডয়নের গতিপথের কারণে হয় না।

সাহাবাগণ (রাসুল (সঃ) এর সহচরবৃন্দ) নিজেদের এবং ছাত্রদের মধ্যে যখনই কেউ পাখির সংকেতের উপর বিশ্বাস আরোপের বিষয়ে উলেখ করেছেন তখনই তা শক্তভাবে বাতিল করে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইকরিমাহ বললেন, "একদিন যখন আমরা কয়েকজন ইবনে আব্বাসের সঙ্গে বসেছিলাম তখন একটি পাখি আমাদের উপর দিয়ে উড়ে গেল এবং কর্কশ তীক্ষ্ণ শব্দ করল। দলের মধ্যে হতে একজন তখন চিৎকার করে বলে উঠল, "শুভ, শুভ"। ইবনে্ আব্বাস তাঁকে কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন এই বলে, যে, "এর মধ্যে কোন ভাল বা মন্দ নেই।"[৩৫] অনুরূপভাবে, তাবেয়ীগণ (সাহাবাদের ছাত্ররা) তাদের নিজস্ব ছাত্রগণ কর্তৃক প্রকাশিত শুভ-অশুভ সংকেত সম্পর্কিত সকল রকম বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তাউজ তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে যখন যাত্রাপথে ছিলেন, একটি কাক কর্কশ তীক্ষ্ণ শব্দ করে ওঠে এবং তার সহযাত্রী বলেন, "শুভ"। তাউজ উত্তর দিলেন, "ওতে শুভ কি আছে? তুমি আর আমার সঙ্গে যেয়ো না।"[৩৬]

সহীত আল্-বুখারী [৩৭] হাদিসে অবশ্য রাসূলের (সঃ) নাম করে একটি বর্ণনা দেয়া হয়েছে যার মানে পারতপক্ষে সন্দেহপূর্ণ; "তিনটি জিনিষের মধ্যে শুভ-অশুভ সংকেত আছেঃ মহিলাগণ, পিঠে চড়া যায় এমন প্রাণী এবং ঘরবাড়ি।"[৩৮] আয়েশা এই বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে যে, "যিনি আবুল কাশেমের [৩৯] উপর ফোরকান (কোরআন) নাজিল করেছেন তাঁর শপথ, যে ব্যক্তি এই বর্ণনা দিয়েছে সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেছেন যে অজ্ঞ লোকেরা বলত, "নিশ্চয়ই মহিলাগণ, ঘরবাড়ি

৩৩. *আত তিরমীজি কর্তৃক সংগৃহীত।*

৩৪. *Sahih Muslim (Englishtrans) vol 4 p 1209, no 5532).*

৩৫. *Tayseer al Azeez al Hameed পুস্তকের ৪২৮ নং হতে বর্নিত।*

৩৬. *সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংগৃহীত হাদিসসমূহ (পয়গম্বরের ঐতিহ্য সমূহ)।*

৩৭. *Tayseer al Azeez al Hameed পুস্তকের ৪২৮ নং হতে বর্নিত।*

৩৮. *(Sahih Al Bukhari, Arabic English, vol 7th pp 447-8, no 666).*

৩৯. *আবুল কাশেম রাসূল (সঃ) এর ডাক নাম ছিল। এখানে শপথ মানে আল্লাহর নামে।*

এবং বোঝা বহণকারী প্রাণীদের মধ্যে তিয়ারা (অশুভ সংকেত) রয়েছে।” তারপর তিনি (আয়েশা রাঃ) কোরআনের আয়াত আবৃতি করলেনঃ

“পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদিগের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংঘটিত করিবার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে।” *(সূরা আল্-হাদীদ ৫৭:২২)* [৪০]

হাদিসটি নির্ভরযোগ্য কিন্তু অন্য আর একটি বর্ণনা হতে এটার আরও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া যায়- যদি অশুভ সংকেত বলে কিছু থাকত, তাহলে সেগুলি ঘোড়া, মহিলা এবং বাস করার স্থানে থাকত।[৪১] সুতরাং রাসুল (সঃ) অশুভ সংকেতের অস্তিত্ব সমর্থন ও অনুমোদন করেননি। বাস্তবে যদি কিছু থাকত তাহলে যেসব ক্ষেত্রে এটা ঘটার সম্ভবনা বেশী থাকত, তিনি শুধু তারই উল্লেখ করতেন। ঐ সময় মানুষের জীবনে ঐ তিনটি বস্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিধায় ঐ তিনটি নামে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ দুর্ঘটনা ঘটার সম্পৃক্ততা বিশেষভাবে উলেখ করা হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে, তাদের মালিকানা গ্রহণ অথবা তাদের মধ্যে প্রবেশ করার সময় রাসুল (সঃ) বিশেষ ধরণের আশ্রয় গ্রহণের সালাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাসুল (সঃ) বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে হতে যদি কেউ একজন মহিলাকে বিবাহ কর অথবা একটি ভৃত্যের সেবা ক্রয় কর তা হলে তার চুর্ণকুন্তল (মাথার সামনের চুল) ধর, সর্ব মহিমান্বিত আল্লাহর নাম উল্লেখ কর, আশীর্বাদ প্রার্থনা কর, তারপর পড়ঃ

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আস-আলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা জাবালতাহা আল্লায়হি ওয়া আউযবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা জাবালতাহা আল্লায়হি।)

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছ থেকে তার সর্বোত্তম অংশ চাই যা তুমি তার স্বভাব ধর্মের অংশ হিসাবে তৈরী করেছ। আমি তোমার কাছে তার অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় চাই, যে অনিষ্ট তার স্বভাব ধর্মের অংশ হিসেবে দিয়েছ।

যদি সে একটি উট ক্রয় করে তাহলে তাকে উটের কুঁজের সর্বোচ্চ অংশ ধরে এবং অনুরূপভাবে বলতে বল।[৪২] এও বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন যে, যদি কেউ গৃহে প্রবেশ করে তবে তার পড়া উচিত-

আউযুবি কালিমাতিলাহে আত্-তা'ম্মা'তি মিন্ শাররি মা খালাক।

আমি আল্লাহর নিখুঁত বাণীর আশ্রয় চাহিতেছি, তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন উহার অনিষ্ট হইতে। [৪৩]

আরও একটি হাদীস আছে যেখানে আপাতঃদৃষ্টিতে শুভ-অশুভ সংকেতকে সমর্থন করা হয়েছে বলে মনে হয়ঃ আনাস ইবনে সা'ঈদ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, একদিন একটি মহিলা আল্লাহর রাসূলের (সঃ) কাছে আসল এবং বলল, “হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! একটি বাড়ি ছিল যাতে অনেক অধিবাসী ছিল এবং তাদের ধন সম্পদ অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা কি এটাকে পরিত্যাগ করতে পারি?” রাসুল (সঃ) উত্তর দিলেন, “পরিত্যাগ কর, কারণ এটার উপর আল্লাহর অভিশাপ কাছে। “রাসুল (সঃ) তাদের জানালেন যে, বাড়িটি ছেড়ে দেয়াটা কোন ধরনের তিয়ারা নয় কারণ দুর্ঘটনা এবং নিশ্চয়তার কারণে মানসিকভাবে তাদের কাছে বাড়িটি একটি বোঝা হয়ে গিয়েছিল। এটি একটি স্বভাবগত অনুভূতি যা আল্লাহ মানুষের মধ্যে দিয়েছেন। যখনই মানুষ কোন বস্তু থেকে দুর্ঘটনা অথবা দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন বস্তুটি বাস্তবে কোন দুর্ভাগ্য না ঘটালেও ঐ লোকটির বস্তুটি অপছন্দ করার প্রবণতা হয় এবং এর যতদুরে সরে যাওয়া সম্ভব ততদূরে সরে যেতে চায়। এটা আরও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই অনুরোধটি করা হয়েছিল তাদের উপর দুর্ঘটনা সংঘটিত হবার আগে নয়, পরে। দুর্ঘটনা সংঘটিত হবার কারণে কোন একটি স্থান অথবা লোকদের উপর আল্লাহর অভিশাপ পতিত হয়েছিল বলে উলেখ করা সঠিক হবে। অভিশাপ পতিত হবার অর্থ এই যে তারা যে সব অসৎ কাজ করেছিল তার জন্য তারা আল্লাহর কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল। অনুরূপভাবে, যা কিছু দ্বারা সৌভাগ্য এবং কৃতকার্যতা আনীত হয় মানুষের ঐ সব কিছুকে ভালবাসার এবং তাদের কাছাকাছি হবার প্রবণতা দেখা দেয়। এই অনুভূতি স্বয়ং তিয়ারা নয়, যদিও, যখন এটা অপাত্রে স্থাপন করা হয় তখন তিয়ারা এবং শির্ক ঘটাতে পারে। যখন কোন ব্যক্তি বিশেষ অন্যদের জন্য দুর্ঘটনার কারণ হয়েছিল এমন স্থান এবং বস্তু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে অথবা যখন অন্যরা যেগুলির মধ্যে

---

৪০. আহমদ, আল হাকিম ইবনে খুজাইমাহ কর্তৃক সংগৃহীত।

৪১. (Sahih Al Bukhari, Arabic English, p 435, no 649) Sahih Muslim (Englishtrans) vol 4 p 1208, no 5528 & 5529 and Sunan Abu Dawood, Englishtran, vol 3, p 1099, no, 3911).

৪২. আমর ইবনে শুয়াইব কর্তৃক বর্ণিত এবং আবু দাউদ এবং ইবনে মাযা কর্তক সংগৃহীত। (Sunan Abu Dawood, Englishtran, vol 2, p 579, no, 2155)

৪৩. খালাহ বিনতে হাকিম কর্তৃক বর্ণিত এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। Sahih Muslim (Englishtrans) vol 4 p 1421, no 6521)

সৌভাগ্য পেয়েছিল খুঁজে বের করার চেষ্টা করে তখন তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে (সে শিরকের দিকে ধাবিত হয়)। সে ঐ স্থান এবং বস্তুগুলিকে সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের প্রতীক হিসাবে নেয় এবং এমনকি এক পর্যায়ে সে সেখানে কিছু উপাসনার কাজও সমাধা করতে পারে।

আনাস বর্ণনা দেন যে রাসুল (সঃ) বলেছেন, "সংক্রমণ[৪৪] অথবা তিয়ারা বলে কিছু নেই, কিন্তু আমি ফা'আল পছন্দ করি।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে ফা'আল কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "একটি ভাল শুভ শব্দ।"[৪৫] বস্তুর মধ্যে অশুভ সংকেতের স্বীকৃতি আল্লাহর সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ এবং শির্ক সম্পর্কিত ধারণার উপস্থিতি প্রকাশ করে।

যদিও শুভ সংকেত বিশ্বাসের মধ্যে আল্লাহর দিকে ঝোঁকার প্রবণতা বিদ্যমান তবুও সৃষ্ট বস্তুর উপর স্বগীয় ক্ষমতা আরোপের কারণে শির্ক ঘটে। এই কারণে রাসুল (সঃ) ফা'ল, একটি শুভ সংকেত, পছন্দ করার কথা প্রকাশ করায় সাহাবাগণ বিস্মিত হয়েছিলেন। যাহোক, রাসুল (সঃ) তাদের জন্য ইসলামিভাবে গ্রহণীয় ফালের সীমিত রূপ নির্দেশ করেছেন। এটা হ'ল আশাবাদী শব্দের ব্যবহার। যে রকম, অসুস্থ হলে একজনকে "সা'লিম" (ভাল থাকা) অথবা কিছু হারিয়ে গেলে একজনকে "ওয়াজিদ" (যে খুঁজে বেড়ায়) নামে ডাকা। এইগুলি এবং অনুরূপ শব্দাবলী হতভাগ্যদের মধ্যে প্রত্যাশা এবং আশা পুনরুদ্ধার করে এবং শুভ অনুভূতি সৃষ্টি করে।[৪৬] বিশ্বাসীদের সকল সময় আশাবাদী হওয়া অপরিহার্য।

শুভ-অশুভ সংকেত সম্বন্ধে ইসলামের রায়

পূর্ববর্তী হাদিস হতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, তিয়ারা হচ্ছে শুভ-অশুভ সংকেতের উপর সাধারণ বিশ্বাস স্থাপন। পাখীর গতিবিধি হতে ভবিষ্যদ্বাণী করার নিয়ম রাসুলের (সঃ) সুন্নাহ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। প্রাচীনকালে আরব দেশের লোকেরা পাখী হতে সংকেত গ্রহণ করেছে এবং অন্যান্য জাতি অন্যত্র থেকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে নীতিনিয়ম একই। যখন এই সব সংকেতের উৎস চিহিত করা যায়, তখন প্রায়ই তাদের মধ্যে শির্ক-এর উপস্থিতি খুব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বর্তমান পশ্চিমা সমাজে প্রচলিত অগণিত শুভ-অশুভ সংকেতের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলঃ

কাঠে টোকা দেয়াঃ

যখন কেউ কিছুর জন্য কৃতজ্ঞ হয় এবং আশা করে যে তার ভাগ্য পরিবর্তন করা হবে না তখন সে বলে "কাঠে টোকা দাও" এবং টোকা দেবার উদ্দেশ্যে চারদিকে এক টুকরা কাঠের জন্য তাকায়। এই বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে অতীতে ইউরোপের লোকেরা মনে করত যে দেবতারা গাছের ভিতর বাস করে। বৃক্ষ-দেবতার কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের জন্য তারা গাছ স্পর্শ করত। তাদের ইচ্ছা পূরণ হলে দেবতাদের ধন্যবাদ জানাবার জন্য তারা পুনরায় গাছ স্পর্শ করত।

লবণ উল্টে পড়াঃ

লবণ উল্টে পড়লে অনেকে বিশ্বাস করে যে শীঘ্রই দুর্ঘটনা আসবে। সে কারণে এটাকে প্রতিহত করার জন্য সে বাম কাঁধের উপর দিয়ে লবণ ছুঁড়ে দেয়। এই সংকেতের উৎস হল লবণের জিনিস তাজা রাখার ক্ষমতা। এটা জাদুকরী শক্তির কারণে প্রাচীন কালের লোকেরা এই বিশ্বাস করত। এইভাবে, উল্টে পড়া লবন অশুভ ঘটনার জন্য সতর্ক সংকেত হয়ে যায়। যেহেতু অশুভ আত্মা একজনের বাম দিকে বাস করে বলে মনে করা হ'ত, উল্টে পড়া লবণ বাম কাঁধের উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়াটা অশুভ আত্মাকে তুষ্ট করার প্রতীক।

আয়না ভাঙ্গাঃ

অনেকে বিশ্বাস করে যে, আকস্মিকভাবে একটি আয়না ভেঙ্গে যাওয়া সাত বৎসরের জন্য দুর্ভাগ্য আগমণের লক্ষণ। প্রাচীনকালে লোকেরা মনে করত যে, পানির উপরে প্রতিবিম্ব তাদের আত্মার। সুতরাং তাদের প্রতিবিম্ব চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে গেলে (যেমন, পানিতে

---

৪৪. *আলবুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগ্রহীত এবং আবু হুরায়রাহ কর্তক বর্ণিত অন্য একটি বর্ণনায় রাসূল (সঃ) সংক্রমণের (ছোয়াচের) অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করেছেন। একজন বেদুইন জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) মরুভূমিতে স্বাস্থ্যবান এক পাল উটের ঘটনাটি কি? যখন তাদের মধ্যে একটি অসুস্থ উট আনা হয় এবং এর কারণে সকল উট অসুস্থ হয়ে পড়ে? রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন, তা হলে প্রথমটি কে সংক্রমিত করেছিল? Sahih Al Bukhari, Arabic English, vol 7 pp 436, no 651) abd Sahih Muslim (Englishtrans) vol 4 p 1208, no 5519, see also Abu Dawood, Englishtran, vol 3, p 1098, no, 3906).*

৪৫. *Tayseer al Azeez al Hameed pp 4345.*

৪৬. *আবু দাউদ আত তিরমীজি এবং ইবনে মাযা কর্তৃক সংগৃহীত। (Sunan Abu Dawood, Englishtran, vol 3, pp 1096-7, no, 3901).*

কেউ ঢিল ছুঁড়লে) তাদের আত্মাও প্রাণী। ডাইনীরা কালো বিড়ালের মগজের সঙ্গে ব্যাঙ, সাপ এবং পোকামাকড়ের শরীরের অংশ মিশিয়ে মোহিনী (যাদুর) চোলাই শরবত তৈরী করত বলে মনে করা হ'ত। চোলাই শরবত এড়িয়ে কোন বিড়াল সাত বৎসর বেঁচে থাকলে বিড়ালটি ডাইনী হয়ে যেত বলে মনে করা হত।

তের নম্বর সংখ্যাঃ

আমেরিকায় সংখ্যা ১৩ অমঙ্গলজনক বলে গণ্য করা হয়। এজন্য বহু অট্টালিকা ১৩ তম তলাকে ১৪ তম তলা বলা হয়। ১৩ তারিখের শুক্রবারকে বিশেষ করে অমঙ্গলজনক বলে মনে করা হয়। বহু লোক এই দিনে ভ্রমণ অথবা বিশেষ কোন দেখা সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলে। ঐ দিন তাদের ক্ষতিকর কিছু হলে তৎক্ষনাৎ ঐ দিনকে দায়ী করে। এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে কেউ মনে করলে সে ভুল করবে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭০ সালের এ্যাপোলো চন্দ্র অভিযান, যা প্রায় দুর্ঘটনার কাছাকাছি পৌঁছে ছিল, তার ফ্লাইট কমান্ডার ফিরে আসার পর ব্যাখ্যা দেন যে কিছু একটা যে ঘটাতে যাচ্ছে তা তার জানা উচিত ছিল। তাঁকে যখন কারণ জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি উত্তর দিলেন যে, ১৩ তারিখ শুক্রবার ১৩.০০ ঘটিকার (অর্থাৎ একটার সময়) উড্ডয়ন সংঘটিত হয় এবং ফ্লাইট নম্বর ছিল এ্যাপোলো ১৩।

এই বিশ্বাসের উৎপত্তি হচ্ছে বাইবেলে বর্ণিত যীশুর শেষ নৈশভোজের ঘটনা থেকে। যিশুখৃষ্টের শেষ নৈশভোজে ১৩ জন উপস্থিত ছিলেন। ১৩ জনের মধ্যে একজন হল জুডাস, যে লোক যিশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বলে মনে করা হয়। অন্ততঃপক্ষে দুইটি কারণে ১৩ তারিখ শুক্রবারকে বিশেষ করে অমঙ্গলজনক মনে করা হয়। প্রথম, শুক্রবার যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার কথা ছিল, এবং মধ্যযুগীয় বিশ্বাস হিসাবে শুক্রবার হ'ল ঐ দিন যে দিন ডাইনীরা তাদের সভায় মিলিত হতো। এইসব বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহর ভাল এবং মন্দ ঘটাবার ক্ষমতা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে ভাগাভাগি করা হয়। দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা এবং সৌভাগ্য প্রাপ্তির আশা, যা শুধুমাত্র আল্লাহর উপর আরোপ করা উচিত, তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুতে আরোপ করা হয়। ভবিষ্যৎ এবং অজানা বিষয়ের জ্ঞানও দাবী করা হয় অথচ এই বৈশিষ্ট্যমূলক গুণাবলী শুধু আল্লাহর। আল্লাহ তাঁর গুণাবলীর মধ্যে স্পষ্টভাবে নিজেকে "আলিম আল্-গাইব" (অজানা সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পন্ন) বলে উলেখ করেছেন। এমনকি আল্লাহ কোরআনে রাসুলের (সঃ) মাধ্যমে বলিয়েছেন যে, **অদৃশ্য গায়েব সম্বন্ধে জানলে তিনি সকল দুর্ঘটনা এড়িয়ে যেতে পারতেন**। (*সুরা আল-আরাফ ৭ঃ ১৮৮*)

সুতরাং তৌহিদের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ সংকেতে বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে শির্‌ক-এর শ্রেণীভুক্ত করা যায়। ইবনে মাসুদ কর্তৃক বর্ণিত আরও একটি হাদিস দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণ করা যায় যেখানে আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেছেন যে, "তিয়ারা শির্‌ক, তিয়ারা শিরা, তিয়ারা শির্‌ক।"[৪৭] আবদুলাহ ইবনে আমর ইবনে আল্-আসও বর্ণনা দিয়েছেন যে রাসুল (সঃ) বলেছেন, "যে কেউ তিয়ারার কারণে কিছু করা থেকে বিরত হল, সে শির্‌ক করল।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "এর প্রায়শ্চিত্ত কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "বলঃ আল্লাহুমা লা' খাইরা ইলা খাইরুক ওয়া লা তাইরা ইলা তাইরুক ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।" ইয়া আল্লাহ, তুমি প্রদত্ত মঙ্গল ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গল নাই এবং তুমি প্রদত্ত পাখী ব্যতীত পাখী নেই এবং তুমি বিনা অন্য কোন ইলাহ নাই।"[৪৮]

পূর্ববর্তী হাদিস হ'তে এটা স্পষ্ট দেখা যায় যে, তিয়ারা কোনভাবেই শুধু পাখীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সকল প্রকার শুভ-অশুভ সংকেত এর অন্তর্ভুক্ত। স্থান থেকে স্থানে, সময় থেকে সময়ে এই বিশ্বাস গুলির রূপ পরিবর্তিত হলেও এই সব শির্‌ক-এর ভিত্তি এক।

সুতরাং মুসলিমরা এই সকল বিশ্বাস হতে উদ্ভত সকল অনুভূতি সযত্নে এড়িয়ে যেতে নীতিগতভাবে বাধ্য। যদি তারা দেখে যে এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা অচেতন ভাবে কোন কাজ করছে, তাহলে তাদের আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত এবং পূর্বে বর্ণিত দু'আ (প্রার্থনা) পড়া উচিত। এ ব্যাপারে এত বাড়াবাড়ি করা তাৎপর্যহীন মনে হতে পারে। অবশ্য ইসলাম এই সব ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ এই ধরণের ছোট শির্‌ক এর বীজ হতেই বড় শির্‌ক জন্ম নেয়। প্রতিমা, মানুষ, নক্ষত্র ইত্যাদি পূজা একই সময়ে আসে নাই। এই ধরণের পৌত্তলিকতা বহু কাল ধরে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়েছে। যখন গুরুত্বপূর্ণ শির্‌ক এর শিকড় গজিয়ে ওঠে এবং বেড়ে উঠতে থাকে তখন মানুষের মধ্যে আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে। এইভাবে, শয়তানের বীজ শিকড় গজানোর এবং মুসলিমদের বিশ্বাসের ভিত্তি ধ্বংস করার আগেই উপড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করার লক্ষ্যে ইসলাম মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে পথ নির্দেশ প্রদান করে।

---

৪৭. *আবু দাউদ' আত্ তিরমিজী এবং ইবনে মা'যা কর্তৃক সংগৃহীত। (Sunan Abu Dawud, Englishtrans. vol.3, pp1096-7, no. 3901)*

৪৮. *আহমদ এবং তিরমিজী কর্তৃক সংগ্রহীত।*

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ
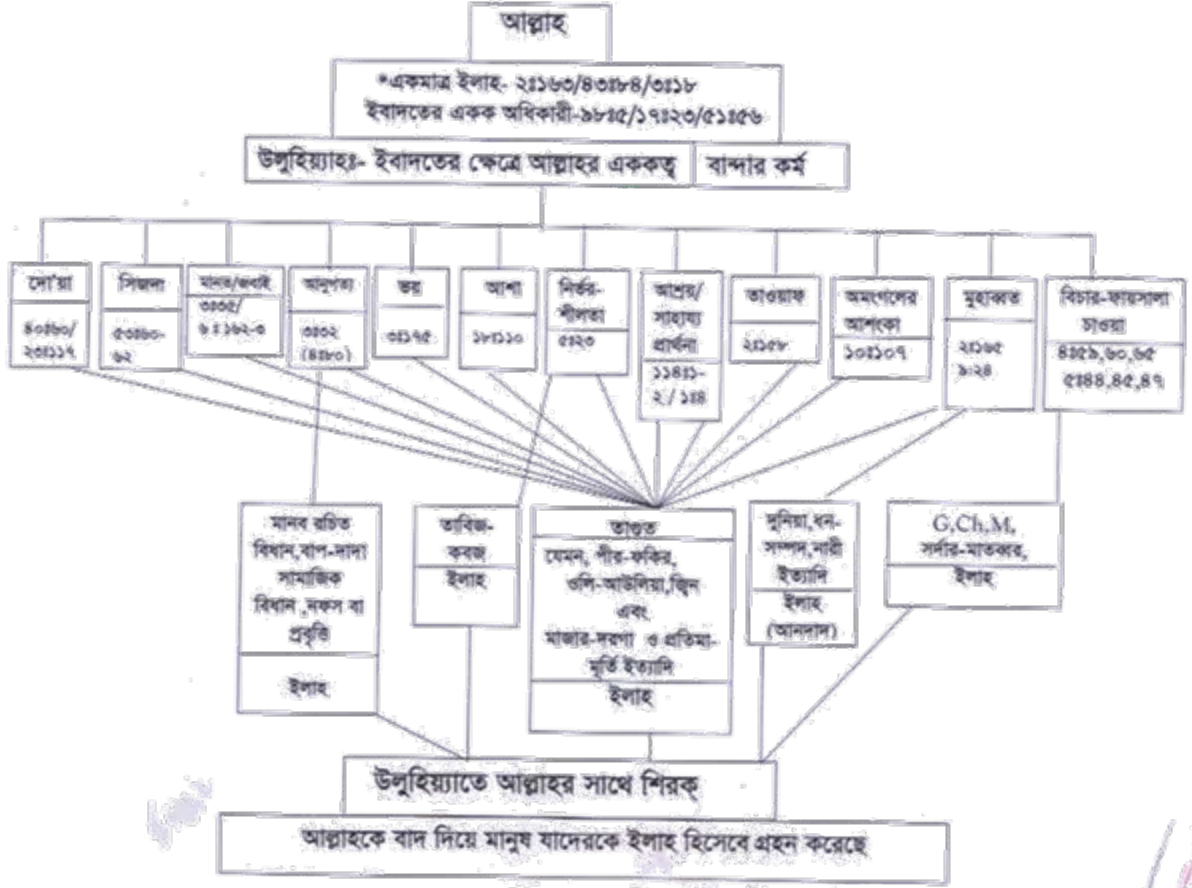
ডঃ ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মদ আল-বুরাইকান তার 'আল মাদখাল' নামক গ্রন্থে বলেন- ইলাহ শব্দ দু'টো অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. মা'বুদ। এটি সত্য ও অসত্য উভয় মা'বুদের উপর প্রযোজ্য।

২. মু'তা বা আনুগত্যের উপযুক্ত। এ শব্দটি সত্য মা'বুদকে যেমন বুঝায় তেমনি বাতিল মা'বুদকে বুঝায়। তবে পরবর্তীতে এর সমধিক ব্যবহার সত্য মা'বুদের ক্ষেত্রেই হয়েছে। তাই ইলাহের অর্থ দাড়াল এমন সত্বা, হৃদয়সমূহ যাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করে ভালবাসা, তা'যীম ও বড়ত্ববোধ সহকারে। তাই শরীয়ার দৃষ্টিকোন থেকে তাওহীদুল উলুহিয়্যার সংজ্ঞা হবে- " ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব সাব্যস্ত করা অথবা বান্দার কার্যাবলীতে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যেমন- সলাত, সিয়াম, যাকাত,হজ্জ, যবাহ, মান্নত, ভয়, আশা, ভালবাসা এসব কিছুই বান্দা করবে শুধু আল্লাহর ইবাদত, আনুগত্য এবং সন্তুষ্টি কামনায়। এর দ্বারা তাওহীদুল উলুহিয়্যার দূটো মূলনীতির উপস্থিতি অপরিহার্য বলে বুঝা যায়।

ক. সর্ব প্রকার ইবাদত গায়রুল্লাহকে বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহর জন্য নিবেদন করতে হবে।

খ. সর্ব প্রকার ইবাদত তাঁর আদেশ- নিষেধের সাথে সামঞ্জস্যশীর হতে হবে। এ দু'মূলনীতিকে ইখলাস ও মুতাবাআত বা বিশুদ্ধতা ও অনুসরণ বলা হয়। এ জন্যই এ তাওহীদ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত কর আর তাগুতকে বর্জন কর। (*সূরা আন নাহল* ১৬ঃ৩৬)।

এ তাওহীদ মূলতঃ বান্দার উপর আল্লাহর হক যা আর কারো জন্য সাব্যস্ত হতে পারে না। রাসুল (স) বলেনঃ

" বান্দাদের উপর আল্লাহর হক হচ্ছে এই যে, তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (বুখারী ও মুসলিম- ৪৪)

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ) তার " কায়েদাতুন জামেয়া ফি তাওহীদিল্লাহ ওয়া ইখলাছিল আমল ওয়াল ওয়াজহে লাহু" নামক পুস্তিকায় তাওহীদুল উলুহিয়্যার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক অনেক তথ্য এবং যুক্তির সমাহার ঘটিয়েছেন। আমরা সে গুলোর কিছুটা সংক্ষিপ্ত সার এখানে তুলে ধরছি।

১. * আল্লাহই মানুষের হৃদধেয়র মাকছুদ, হৃদয় শুধু আল্লাহকেই চায়।

  * এ মাকছুদ তথা আল্লাহকে পেতে তিনিই সাহায্যকারী।

  * গায়রুল্লাহ হৃদয়ের কাছে অনাকাংখিত।

  * এ অনাকাংখিত গায়রুল্লাহকে হৃদয় থেকে দূও করতে তিনিই সাহায্যকারী।

উপরোক্ত চারটি বিষয় শুধু আল্লাহর সাথে জড়িত। তাই তাঁরই ইবাদত করতে হবে। সাহায্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। আর এই হচ্ছে- "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়িন" এর মর্ম।

২. মানুষ আল্লাহর সৃজন ও রুবুবিয়্যাতের প্রতি যতটা মুখাপেক্ষী তার চেয়ে অনেক বেশী মুখাপেক্ষী তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যেও প্রতি। কেননা ইবাদতই হচ্ছে তার সৃষ্টি ও জীবনের লক্ষ্য। যা ব্যতীত তার জীবন নিস্ফল ও ব্যর্থ বরং ভয়াবহ শাস্তিযোগ্য।

৩. সৃষ্টির কাছে বান্দার কল্যান ও অকল্যানের, দান ও বঞ্চনার কোন কিছুই নেই। কেউ সন্তুষ্ট হলেই বান্দার উপকার করতে পারবে না যদি আল্লাহ তা মঞ্জুর না করেন, আবার ক্ষতিও করতে পারবে না যদি তিনি তা অনুমোদন না করেন। পক্ষান্তরে তিনি বান্দার কল্যান বা অকল্যান করতে চাইলে তা রুখবার মত কেউ নেই। সুতরাং অক্ষম গায়রুল্লাহর ইবাদত করে কি লাভ।

৪. আল্লাহর ইবাদতের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন, সৃষ্টির সাথে তার চেয়ে অধিক সম্পর্ক রাখা বান্দার জন্য ক্ষতিকর। যেমনিভাবে ক্ষতি কওে অতিরিক্ত খাদ্য পানীয়। তাই আল্লাহর দিকেই ধাবিত হওয়া উচিত। এবং সৃষ্টির সাথে ভালবাসা ও সম্পর্ক তাঁর দ্বীনের জন্য এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই হওয়া উচিত।

৫. অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমানিত হয়েছে যে, বান্দা আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপর ভরসা করলে কিংবা কারো আশা করলে নিরাশা আর ব্যর্থতাই তার পাওনা। তাই সকল আশা-ভরসা আল্লাহর উপরই করতে হবে। এতেই রয়েছে বান্দার কল্যান। এর ব্যতিক্রম করলে অকল্যান ও ধ্বংসই হবে তার প্রাপ্য।

৬. আল্লাহ নিজে অভাবমুক্ত, পরম উদার, বড়ই করুণাময়। কোন প্রয়োজন ছাড়াই তিনি বান্দার উপকার করেন। তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আর বান্দার প্রতি অন্য বান্দার ভালবাসাতো কোন না কোন স্বার্থেই হয়ে থাকে। রাজার সৈন্য বাহিনী, মুনীবের দাস-দাসী, শিল্পপতির শ্রমিক- কর্মচারী, নেতার গুনগ্রাহী সকলেই কোননা কোন স্বার্থেই তাদেরকে ভালবাসে। অবশ্য ভালবাসা আল্লাহর জন্য হলে সেটা ব্যতিক্রম। এছাড়া সকল ক্ষেত্রেই নিজ স্বার্থেই একে অপরকে ভালবাসে। যে ব্যক্তি একজনকে তার বীরত্ব,নেতৃত্ব সৌন্দর্য্য ইত্যাদিও কারণে ভালবাসল, সে তাকে এজন্যই ভালবাসল যে, তার এ সুন্দর গুনগুলো তাকে আনন্দ দিয়েছে। সে এগুলোকে উপভোগ করেছে। এটা কি কম স্বার্থের কথা। মোটামুটি বলা যায় প্রায় সকল সৃষ্টিই সু-সময়ের বন্ধু, বসন্তের কোকিল। স্বার্থ শেষ হলে ভালবাসা শেষ হয়ে যায়। তাই নিঃস্বার্থ আল্লাহই মানুষের প্রকৃতবন্ধু। তিনি বান্দার উপকারের জন্যই বান্দাকে কাছে নিতে চান। যাতে শুধু বান্দারই উপকার। এ সত্যটি বুঝলে তা আপনাকে মাখলুকের কাছে আশা করা থেকে বিরত রাখবে। তবে মানুষের স্বার্থপরতার কারণে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করাও ঠিক হবে না। বরং আল্লাহর জন্যই তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে।

৭. অধিকাংশ মানুষ আপনাকে দিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে চাইবে। যদিও তা আপনার জন্য ক্ষতিকর হয়। কারণ প্রয়োজনগ্রস্থ ব্যক্তি অন্ধ। সে প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না।

৮. আপনি কোন ভয়, ক্ষুধা ও রোগে আক্রান্ত হলে সৃষ্টিকুল আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া তা প্রতিহত করতে পারে না। আর তারা নিজের কোন স্বার্থ ছাড়া তা দূর করার ইচ্ছাও করবে না।

৯. সৃষ্টি যেহেতু আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া আপনার কোনই কল্যান অকল্যান করতে পারে না, তাই আপনার আশা-ভরসা আল্লাহর সাথেই সংযুক্ত করুন।

১০. আপনি নিজেই নিজের কল্যান- অকল্যান যথোচিতভাবে বুঝেন না। তাহলে কিভাবে অপর কোন সৃষ্টি আপনার কল্যান-অকল্যান বুঝবে। আল্লাহ সবই জানেন আর তিনি সক্ষমও বটে। তিনি আপনাকে তাঁর বিরাট অনুগ্রহ দান করতে সক্ষম।তাই একমাত্র তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্য কারা উচিত নয় কি?

ডঃ ইব্রাহীম ইবনু মোহাম্মদ আল বুরাইকান তার 'আল-মাদখাল' নামক গ্রন্থে বলেন- শিরক (ইবাদতের ক্ষেত্রে) তিন প্রকার।

১. আশ- শিরক্ আল আকবার বা বড় শিরক্। এর অর্থ হল- আল্লাহর কোন সমকক্ষ স্থিও করে আল্লাহর মত তার ইবাদত করা ও আনুগত্য করা।

২. আশ- শিরক্ আল আসগার বা ছোট শিরক্ । আর তা হচ্ছে আমলের কাঠামো ও মুখের কথায় গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমকক্ষ করা । অথবা কথায় ও কাজে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহর মনতুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা ।

৩. আশ্-শিরক্ আল খফী বা গোপন শিরক্ । আর তা হচ্ছে- হৃদয়ের এমন গোপন ইচ্ছা ও মুখের এমন অসতর্কমূলক কথা যাতে আল্লাহও গায়রুল্লাহর সমান হয়ে যায় । উপরোক্ত তিন প্রকার শিরক্ আবার অনেক প্রকাওে বিভক্ত । এবারে আমরা এ ব্যাপাওে বিস্তরিত আলোচনা করব ।

আশ- শিরক্ আল আকবার বা বড় শিরক্

১. দোয়ার ক্ষেত্রে শিরক্ তথা আল্লাহকে ডাকার মত গায়রুল্লাহকে ডাকা । সে ডাক কোন প্রাপ্তি বা মুক্তির জন্য হোক কিংবা শুধু ইবাদত বা বিনয় প্রকাশার্থে হোক । এ দোয়া তিনটি শর্তে শিরক্ হবে ।

ক) রূপক কোন অর্থ উদ্দেশ্য না করে বাস্তব অর্থে ডাকলে ।

খ) প্রার্থিত বিষয়টি আল্লাহ ছাড়া আর কারও অধিকারে না থাকলে ।

গ) প্রার্থনাকারী প্রার্থিত ব্যক্তির সামনে উপস্থিত না থাকলে অথবা মৃত হলে । যেমন-

* জীবিত পীর, খাজা, গাউস-কুতুবের কাছে সন্তান, রোগ নিরাময়, ব্যবসায় উন্নতি, বিপদ হতে পরিত্রান ও পরলৌকিক সুপারিশ ও মুক্তির প্রার্থনা করা ।

* কোন মৃত, কবরস্থ কিংবা অনুপস্থিত পীর দরবেশের নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা । যদিও সেটি এমন বস্তু হয় যেটা মানুষ দিতে পারে । এরূপ গায়েবানা দোয়া তো আল্লাহরই হক । যেমন- হে আবদুল কাদের! আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দান কর । আবার কেউ কেউ বলে- হে আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ! আল্লাহর ওয়াস্তে শাফায়াত করুন । এখানে আল্লাহর রাসুলকে আল্লাহর সাথে শিরক্ করা হল ।

২. নিয়্যত,ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে শিরক্ । অর্থাৎ নিজের আমল দ্বারা সংক্ষেপে ও সবিস্তারে গায়রুল্লাহকে উদ্দেশ্য করা । এ শিরক্ আক্বীদাহ বিশ্বাসের মাঝে বিরাজ করে । আল্লামা ইবুনুল কাইয়্যেম বলেন- এ শিরক্ হচ্ছে এমন এক সাগর যার কোন কুল কিনারা নেই । অনেক অল্প মানুষই এ থেকে পরিত্রান পেয়ে থাকে । যে ব্যক্তি নিজ আমলের দ্বারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নৈকট্য কামনা করবে, তার কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করবে অথবা শুধু পার্থিব কল্যানের উদ্দেশ্যেই আমল করবে সে ব্যক্তি ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যেও ক্ষেত্রে শিরকে লিপ্ত হবে । যেমন-

* মক্কার পরকাল অবিশ্বাসী মুশরিক সম্প্রদায়, যারা শুধু পার্থিব কল্যানের উদ্দেশ্যেই হজ্জ, উমরাহ, বায়তুল্লাহর খেদমত আঞ্জাম দিত ।

* সমাজতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, পুঁজিবাদী ও জড়বাদী নাস্তিক সম্প্রদায় এদের জীবনের মূল লক্ষ্যই হলো পার্থিব ভোগ বিলাস, যাদেও স্লোগান হলো- “খাও দাও ফুর্তি কর” । “দুনিয়া তোমারী হ্যায়- দুনিয়া কা মাজা লে লো ।” এরা সকলেই উপরোক্ত শিরকে লিপ্ত রয়েছে ।

অতএব আল্লাহকে বাদ দিয়ে শুধু ইহকালীন জীবনের লক্ষ্যেই কোন কাজ করলে তা শিরকে আকবার হয়ে যাবে । যার পরিনাম চিরকালীন জাহান্নাম । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন- **“যে পার্থিব জীবন এবং তার চাকচিক্য কামনা করবে, তবে পৃথিবীতে তাকে তার কর্মেও ফল পরিপূর্ন ভাবে দান করব এবং সেখানে তাদের কম দেয়া হবে না । তাদের জন্য পরকালে অগ্নি ব্যতীত কিছুই নেই । পৃথিবীতে তারা যা করবে সবই বিনষ্ট, ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং তারা যা আমল করবে তা সবই নিরর্থক হবে ।”** (*সূরা, হুদ ১১ঃ১৫-১৬*)

১. শিরক্ আত্ তা’আ । অর্থাৎ হুকুম বা বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা । অথচ বিধান প্রনয়ন বা হুকুম প্রদান করা আল্লাহর হক বা অধিকার সমূহের অন্তর্ভূক্ত । ইরশাদ হচ্ছে- إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ

   “হুকুম তো আল্লাহরই” (সূরা ইউসুফ ১২ঃ৪০) ।

* কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী মানব রচিত আইনের আনুগত্য উপরোক্ত প্রকারের শিরকে আকবারের অন্তভূক্ত । যে ব্যক্তি মানব রচিত আইনের কাছে বিচার চায় সে মুশরিক ও কাফের । যার কাছে বিচার চাওয়া হল সে তার রব ।

* সুফীবাদের শিরকযুক্ত তরীকাহ সমূহের অনুসরন করা । যে গুলোতে যিকিরের সময় মুরীদের ক্বলব পীরের ক্বলবের দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হওয়ার এবং ইবাদতের সময় পীরের কল্পনা করার বিধান রয়েছে । এবং কুরআন-সুন্নাহর দলীল প্রমান ব্যতীত পীরের সমস্ত কথাকে মেনে নেয়াকে অপরিহার্য করা হয়েছে । এসবগুলোই শিরকের অন্তর্ভূক্ত । অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা শিক্ষা দিয়েছেন-

আমি মুতাওয়াজ্জিহ করছি আমার চেহারাকে ঐ আল্লাহর প্রতি যিনি আসমান সমূহ ও জমীন সৃষ্টি করেছেন। (*সূরা আনআম ৬ঃ৭৯*)।

রাসুল (সঃ) বলেনঃ

"ইহসান হচ্ছে এই যে তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুম তাঁকে না দেখ তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন।" অথচ সুফীবাদে আল্লাহকে কল্পনা না কওে পীরকে কল্পনা করে ইবাদত করতে বলা হয় (নাউজুবিল্লাহ)।

২. শিরক্ আল মুহাব্বাহ। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে এমনভাবে ভালবাসা যে বান্দাহ গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর) সামনে বিনীত বিগলিত ও তার দাস হয়ে যায়, চাই সে ভালবাসা আল্লাহর ভালবাসার সমান হোক বা কম বেশী হোক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

অর্থাৎ **মানুষের মধ্যে এমন কতক সম্প্রদায় রয়েছে যারা আল্লাহর এমন সমকক্ষ সাব্যস্ত কওে যাদেরকে তারা আল্লাহর মত ভালবাসে**। (*সূরা বাকারাহ ২ঃ১৬৫*)

বস্তুত সৃস্টিও সকল কাজের মূল প্রেরণা আসে ভালবাসা থেকে আর না বাচক কাজের প্রেরণা আসে ঘৃনা বা বৈরীতা থেকে। আর এজন্য ভালবাসাই মূলতঃ তাওহীদ আল-উলুহিয়্যারর ইন্ডিকেটর বা নির্দেশক। এ জন্যই ইবিনুল কাইয়্যেম (রহঃ) উলুহী তাওহীদকে ভালবাসার তাওহীদ নাম দিয়েছেন। শিরক্ আল মুহাব্বার উদাহরন হল-

* মূর্তিপুজারী সম্প্রদায় কর্তৃক তাদেও মূর্তিসহ- লাত, মানাত, উজ্জা, ওয়াদ, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাসর, সুয়া, শিব, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, লক্ষী,গনেশ, দূর্গা ইত্যাদির ভালবাসা।

* কিছু নামধারী মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক গাউস,কুতুব, পীর ফকির, খাজা, দরগাহ- মাজার ইত্যাদিও প্রতি ভালবাসা।

* অপর কিছু সম্প্রদায় কর্তৃক আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির প্রতি অন্ধ ভালবাসা।

* তরুন-তরুনী সম্প্রদায় কর্তৃক গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকা, শিল্পীদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা। যেমন সালমান শাহের মত একজন নায়কের মৃত্যুতে বাংলাদেশের বারজন তরুনীর আত্মহত্যা এর প্রকৃস্ট প্রমান নয় কি ?

* পার্থিব জীবন, বিত্য-বৈভব, ভোগ-বিলাসের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা, যা আল্লাহ ও পরকালকে ভুলিয়ে দেয়। তাও এ শিরকের অন্তর্ভূক্ত। নবী (স) বলেন- "ধ্বংস হোক স্বর্ন মুদ্রার দাস, ধ্বংস হোক রৌপ্য মুদ্রার দাস।

৫. ভয়ের ক্ষেত্রে শিরক্। অর্থাৎ গায়রুল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদে আক্রান্ত হওয়ার এমন চুড়ান্ত ও পরিপূর্ন ভয় যা কেবল আল্লাহর জন্যই হওয়া বাঞ্চনীয়। কেননা এ ধরণের ভয় আল্লাহর প্রতি পোষন করা ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত। ইরশাদ হচ্ছে-

فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي

তোমরা তাদেরকে ভয় করো না , আমাকেই ভয় কর। (*সূরা বাকারাহ ২ঃ১৫০*)।

ভয় তিন প্রকার। যথা- ক) বিশ্বাসগত- গোপন ভয়। যেমন-মূর্তি,মাজার, দরগাহ, গাউস-কুতুব ইত্যাদিকে মনে মনে ভয় করা। এ ধরণের ভয় শিরকে আকবার।

খ) কাজের ক্ষেত্রে ভয়। মানুষকে ভয় করে কোন ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেয়া কিংবা কোন হারাম কাজ অনুষ্ঠিত করা। এ ধরণের ভয় ছোট শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

গ) স্বভাবজাত ভয়। যেমন- বাঘ, সিংহ, সাঁপ, সন্ত্রাসী, চোর-ডাকাত ইত্যাদিকে ভয় করা। মুসা (আঃ) লাঠিকে সাপ হতে দেখে দৌড়ে পালাতে শুরু করলেন এবং পিছন ফিরেও দেখলেন না। বুঝা গেল এ ধরণের ভয় শিরকের পর্যায়ে পড়ে না।

৬. তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে শিরক্। তাওয়াক্কুল এর অর্থ হচ্ছে, সকল বিষয়কে আল্লাহর নিকট সমর্পন করা, উদ্দেশ্য সাধনে তাঁরই উপরে নির্ভর করা। বাহ্যিক উপায় উপকরণ গ্রহন করে প্রতিদানের আশাটুকু তাঁর কাছেই করা। এ অর্থে তাওয়াক্কুল একটি পরিপূর্ন ইবাদত। তাই গায়রুল্লাহর উপর এ তাওয়াক্কুল পোষন করলে তা শিরকে আকবারে পরিণত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

"এবং আল্লাহর উপরই নির্ভর কর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।" (*সূরা মায়েদা ৫ঃ২৩*)।

তাওয়াক্কুল তিন প্রকার। যথা-

ক) শিরকী তাওয়াক্কুল। কল্যাণ ও অকল্যাণ বিষয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে আন্তরিকভাবে গায়রুল্লাহর উপর নির্ভর করা। এটিও আবার দু'প্রকার। যেমন-

১) যে বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত কারো ক্ষমতা নেই সে বিষয়ে গায়রুল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে নির্ভর করা। এটি শিরকে আকবার। যেমন- রোগ নিরাময়, জীবিকা দান, সন্তান দেয়া ও বিপদে পরিত্রান দেয়ার বিষয়ে গায়রুল্লাহর উপর নির্ভর ও বরসা করা।

২) যে উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন তা অর্জন বা দূরিকরণে জীবিত সক্ষম মানুষদের উপর নির্ভর করা। এটি শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। যেমন- চাকুরী লাভ, মামলায় জয় লাভ, পরীক্ষায় পাশ ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন আত্মীয় কর্মকর্তার উপর নির্ভরশীলতা।

খ) পার্থিব বিষয় পরিচালনায় পরনির্ভরশীলতা। যেমন- পার্থিব বা ইসলামী কোন কাজের সম্পাদনে কোন ব্যক্তিকে উকিল নিয়োগ করা। যেমন-বদলী হজ্জ, ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করা। এটি জায়েজ। এর মধ্যে কোন শিরক্ নেই।

গ) তাওহীদী তাওয়াক্কুল। যা প্রথমেই আমরা উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ সর্ববিষয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করা।

আশ- শিরক্ আল আসগার বা ছোট শিরক্

শিরকে আসগারকে নিন্মোক্ত প্রকার সমূহে সীমাবদ্ধ করা যায়।

১. কথাগত ছোট শিরক্। যা মুখের কথার দ্বারা সংগঠিত হয়ে থাকে। যেমন- গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর) নামে শপথ করা, আপনি চাইলে আর আল্লাহ চাইলে এ কাজটি হবে, আব্দুন্নবী, আব্দুর রাসুল, পীর বকশ, নবী বক্শ, আমি আল্লাহ এবং আপনার উপর ভরসা করছি, আমি আল্লাহ এবং আপনার হেফাজতে রয়েছি, আল্লাহ আর আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, এটি আল্লাহ এবং আপনার দান, আমি আল্লাহ আর আপনার উপর ভরসা করছি, কুকুরটি না হলে আজ ঘরে চোর ঢুকত, মাঝি বড় দক্ষ ছিল তাই আজ জীবন রক্ষা পেল, ড্রাইভারের দক্ষতায় বাসটি রক্ষা পেল, যেমন সার দিয়েছি তেমন ধান হয়েছে ইত্যাদি।

সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- "একদা এক ব্যক্তি নবী (স) কে বলল- আল্লাহ যা চেয়েছেন আর আপনি যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে), রাসুল (স) তাকে বললেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ করলে? বল! আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে।" (নাসাঈ, হাদীসটি বিশুদ্ধ)

২. কার্যগত ছোট শিরক্। অর্থাৎ এমন ছোট শিরক্ যা কর্মেও দ্বারা সংহঠিত হয়। যেমন-যাত্রাকালে ঘরের দুয়ারে ভিখারী দেখে তাকে কুলক্ষন মনে করা, কাক মাথার উপর উড়ে যাওয়াকে কোন অকল্যানের পূর্বাভাস মনে করা, হুতুম পেঁচার ডাককে কোন বিপদ বা মৃত্যুর দুঃসংবাদ মনে করা, ভাগ্য গননার উদ্দেশ্যে গনকের কাছে যাওয়, টিয়া পাখির দ্বারা চিঠি উঠিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা, চোর ধরার জন্য বাটি, লাঠি ও বাঁশ চালান দেয়া, হারানো বস্তুর বস্তুও সন্ধান লাভে মাটিতে রেখা অংকন, আয়না ও তৈল পড়াতে বিশ্বাস করা, চোর সনাক্ত করার জন্য রুটি পড়া খাওয়ানো, হারানো বস্তুর সন্ধান লাভের জন্য পীর-ফকির,দরবেশ, জ্বীন ও খনারের কাছে যাওয়া- এ ধরণের আরো অন্যান্য প্রচলিত কার্যাবলী শিরকের অন্তর্ভূক্ত। রাসুল (স) বলেন- " যে কুলক্ষন গ্রহন করল সে শিরক্ করল।" তিনি আরো বলেন- " যে গনেকের কাছে গিয়ে তার কথায় বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মদ (স) উপর যা অবতীর্ন হয়েছে তার সাথে কুফর করল।" (আহমাদ, মুসলিম)

৩. হৃদয়গত শিরক্। যেমন- লৌকিকতা, সুনাম ও যশ লাভের আশা, কোন আমল কওে তার দ্বারা শুধু দুনিয়া কামনা করা। যথাঃ-

*বুজুর্গী প্রকাশের উদ্দেশ্যে সক্ষম হওয়া সত্বেও দূর্বল ভঙ্গিমায় চলা, লম্বা তাসবীহ সারা দিন হাতে রাখা, তালিওয়ালা ও ছেড়া-ফাড়া পোশাক পরিধান করা।

* ক্রেতার কছে বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে প্রমান করার জন্যে দোকানে বসে উচ্চসওে সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ ইত্যাদি ঘন ঘন পাঠ করা। নবী (স) বলেন- "যে ব্যক্তি অপরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে সলাত পড়ল সে শিরক করল, যে ব্যক্তি অপরকে দেখাবার জন্য সিয়াম পালন করল সে শিরক করল, যে ব্যক্তি অপরকে দেখাবার জন্য সিয়াম পালন করল সে শিরক্ করল, আর আল্লাহ আয্যা ও জাল্লা বলেন- যে আমার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করেছে আমি তার জন্য সর্বোত্তম শরীক, কেননা তার আমলের স্বল্প বিস্তও সবটাই তার ঐ শরীকের জন্য যাকে সে শরীক করেছে। আমি তার থেকে অভাব মুক্ত। (আহমাদ)

আশ্-শিরক্ আল খফী বা গোপন শিরক্

ডঃ ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মদ আল-বুরাইকান তার 'আল মাদখাল' নামক গ্রন্থে বলেন- "গোপন শিরক হচ্ছে হৃদয়ের এমন ইচ্ছা বা মুখের এমন কথা যাতে আল্লাহর গায়রুল্লাহ সমান হয়ে যায়।" অথচ সে ইচ্ছা বা কথা এমন সংগোপনে বিরাজ কওে যে, তাকে সহজে শিরক্ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। এ শিরক্ কখনো শিরকে আকবার আবার কখনো শিরকে আসগার হয়ে

থাকে। গোপনীয়তার কারণে এ শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি সঠিকভাবে তা নির্ণয় করতে পারে না।তাই বড় শিরক্ হওয়া সত্ত্বেও তাকে ছোট শিরক মনে করে। আবার ছোট শিরক্ হওয় সত্ত্বেও তাকে বড় শিরক্ মনে করে।

বস্তুতপক্ষে এ প্রকারটি শিরকে আকবার ও শিরকে আসগারের মধ্যে দোদুল্যমান একটি প্রকার। যা গোপন দুর্বোধ্য, অতি সংগোপনে অতি সন্তপর্নে ইচ্ছা ও কথার মধ্যে মিশে থাকে।

এ প্রকারের শিরক্ সম্পর্কে রাসুল (সঃ) বলেছেন- " শিরক্ কঠিন কালো পাথরের উপর কালো পিপড়ার গুটি গুটি পায়ে চলার চেয়েও সুক্ষ্ম ও গোপন।" (আশ্ শিরকু ওয়া মাজাহিরুহু-৬৩)।

রাসুল (স) আরো বলেন- " মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কথা বলে যা তাকে নিয়ে সত্তর বছর পর্যন্ত জাহান্নামের তলদেশ দিকে পড়তে থাকবে। অথচ সে ধারনা ও করতে পারেনি যে, বাক্যটি এমন ভয়াবহ পর্যায়ে পৌছবে। (*বুখারী ও মুসলিম*)

হাদীসের মধ্যে গোপন শিরকের আরো একটি সাধারন উপমা পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি সলাতে দাড়িয়ে দেখল যে, এক ব্যক্তি তার দিকে তাকিয়ে আছে তখন সে সলাতটি সাজিয়ে গুছিয়ে পড়ল।

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস- তিনি বলেন- রাসুল (স) বের হলেন অতঃপর বললেন- " হে লোকসকল! তোমরা গোপন শিরক্ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর। তারা বললেন- হে আল্লাহর রাসুল! গোপন শিরক্ কি? তিনি বললেন- কোন ব্যক্তি সলাত আদায় করার জন্য দাড়াল, অতঃপর পরিশ্রম করে সলাতকে সুন্দর করে আদায় করে, কেননা সে দেখেছে মানুষ তার প্রতি লক্ষ্য করছে। এটাই হল গোপন শিরক্।

বর্তমানে প্রচলিত কতিপয় শিরক্

মিলাদে শিরক্[মুহাম্মদ (স) গায়েব জানেন বলে বিশ্বাস করা শিরক্]

একদল মানুষ নাবী (স) এর নামে মিলাদ নামক বিদ'আত অনুষ্ঠানে চেয়ার খালী রাখে এবং ধারণা রাখে যে, নাবী (স) এসে চেয়ারে বসেন। আবার তারা হঠাৎ করে মিলাদেও মাঝখানে দাড়িয়ে পড়ে এবং ধারণা কওে যে, নাবী (স) এর রুহ মোবারক মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে থাকে- তাই দাঁড়াতে হয়। একই দিনে একই সাথে হাজার স্থানে মিলাদ হয়ে থাকে, এরূপ ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন। (সূরা বাকারা ২ঃ১০৯)

আর রাসুল (স) তো মৃত্যুবরণ করেছেন, যাঁর মৃত্যুকে ওমর (রা) অতিরিক্ত ভালবাসার কারণে প্রথমে মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি খোলা তরবারী নিয়ে ঘোষনা করেছিলেন- যে বলবে মুহাম্মদ (স) মারা গেছেন তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। অতঃপর আবু ককর (রা) এসে রাসুল (স) এর মৃত্যুর স্বপক্ষে কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

মুহাম্মদ একজন রাসুল ছাড়া কিছু নয়, তাঁর পূর্বে বহু রাসুল গত হয়েছেন। যদি তিনি মারা যান কিংবা নিহত হন তবে কি তোমরা পশ্চাতবরণ করবে ? এবং কেউ পিছটান হলে কখনো সে আল্লাহর সামান্য ক্ষতি করতেও সক্ষম হবে না; আল্লাহ কৃতজ্ঞদের সত্বরই পুরষ্কার দিবেন। (*সূরা আলে ইমরান ৩ঃ১৪৪*) অতঃপর উমার (রা) এ আয়াত শ্রবন করে নিস্তেজ হয়ে যান এবং তার হাত থেকে তরবারী পড়ে যায়।

অতএব যারা নাবী (স) কে মিলাদে উপস্থিত হন বলে মনে করবে তারা উক্ত আয়াতকে অস্বীকার করল। রাসুল (স) কে আল্লাহর মত সকল স্থানে উপস্থিত হতে পারে বলে মনে করলে শিরক্ হবে। আর নাবী (স) তো জানেন না কোথায় কোথায় মিলাদ হচ্ছে। কেননা তিনি গায়েব জানেন না। মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে রাসুল (স) দ্বারা ঘোষনা করান-

قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

বলুন! আমি নিজের কল্যান-অকল্যান সাধনের মালিক নই। কিন্তু আল্লাহ যা চান। আমি যদি গায়েব জানতাম, তাহলে আমি অধিক কল্যান অর্জন করে নিতাম এবং অকল্যান আমাকে স্পর্শ করত না। (*সূরা আল-আ'রাফ ৭ঃ১৮৮*)

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

(হে নবী) বলুন! আসমান ও জমীনে আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েবের ব্যাপারে জানে না। (সূরা নামল ২৭ঃ৬৫)

অতএব গায়েবের ঈলম একমাত্র আল্লাহই জানেন। এ ঈলম নবী (স) এর সাথে সম্পৃক্ত করলে আল্লাহর সাথে শিরক্ হবে। এমনিভাবে কেউ যদি রাসুল (স) মিলাদে উপস্থিত হন এ আক্বীদাহ পোষন করে তবে আল্লাহর আয়াত অস্বীকারের দরুন কাফের হয়ে যাবে।

পীর-দরবেশ, ওলী-আউলিয়া এবং কবরে শায়িতদের নিকট দোয়া করা শিরক্

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না, যে তোমার উপকার করতে পারবে না ও অপকারও করতে পারবে না। যদি তুমি অন্যকে ডাক তাহলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। *(সূরা ইউনুস ১০ঃ১০৬)*

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ

অতএব আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকবেন না। ডাকলে আযাব প্রাপ্তদের অন্তরর্ভূক্ত হয়ে যাবেন। *(সূরা শুয়ারা ২৬ঃ২১৩)*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরও বলেন-

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুকে ডাকে যে কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? তারা তাদেও ডাকা সম্পর্কে খবরও রাখে না। যখন মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদেও শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদতের কথা অস্বীকার করবে। *(সূরা আহকাফ ৪৬ঃ ৫-৬)*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অন্যত্র বলেন-

আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটির মালিকও নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদেও ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমদের শিরকের কথা অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহর ন্যায় তোমাদেরকে কেউ অবহিত করতে পারবে না। ***(সূরা ফাতির১৩-১৪)***

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্নিত নবী (স) বলেনঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকে,আর এ অবস্থায় মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (বুখারী)

কবরবাসীরা জীবিতদের ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না, বধিরকেও আহ্বান শোনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (*সূরা নামল ২৭ঃ ৮০*)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অন্যত্র বলেন-

আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটির মালিকও নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদেও ডাকে সাড়া দেয় না। (*সূরা ফাতির১৩-১৪*)

যারা কথা শুনে না তারা কিভাবে অপরকে সাহায্য করবে? অপরকে সান্তনা দিবে, অপরের মাকসুদ পূর্ন করবে? বরং তারা নিজেরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত।

পীর-দরবেশ, ওলী- আউলিয়ার কথা অন্ধ অনুসরন করা শিরক্

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

তেমাদের রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ন হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অলী-আউলিয়াদেও অনুসরণ করো না। তোমরা অল্প সংখ্যকই তা স্মরণ রাখো। (*সূরা আল-আরাফ ৭:৩*)

অতএব নাজিলকৃত বিষয়কে বাদ দিয়ে পীর, অলীদের অনুসরণ করলে আল্লাহর সাথে শরীক্ করা হলো। আর যারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে এবং তারা ওদেরকে রব সাব্যস্ত করার মাধ্যমে মুমুরক হয়ে যাবে। আদী বিন হাতিম থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল (স) কে পড়তে শুনেনঃ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ "তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম এবং দরবেশদেরকে রব হিসেবে গ্রহন করেছে।" (আদী বললেন) আমি তাঁকে বললাম, আমরা তো তাদেও ইবাদত করতাম না। নাবী (স) বললেনঃ আল্লাহ যা হালাল করেছেন তারা কি তা হারাম করে না? অতঃপর তোমরা তা হারাম মেনে নাও। অপরদিকে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করে না? অতঃপর তোমরা তা মেনে নাও। অতঃপর আমি বললাম- হ্যাঁ। নাবী (স) বললেনঃ এটাই তাদের ইবাদত। অর্থাৎ এভাবেই তারা তাদেরকে রবরূপে গ্রহন করেছে। (*তিরমিজি, মুসনাদে আহমাদ*)

কবর-মাযার-দযগায় দান বা ভোগ দেয়া শিরক্

তরীক বিন শিহাব হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জান্নাতে গিয়েছে এবং একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! এটা কিভাবে? রাসুলুল্লাহ (স) বললেনঃ দু'ব্যক্তি এক গোত্রের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, আর তাদের একটি মূর্তি ছিল, সে মূর্তিকে কিছু না দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে পারত না। অতঃপর তারা (মাজারের খাদেমরা) দু'জনের একজনকে বলল ,কিছু দিয়ে যাও। সে বলল,আমার নিকট কিছুই নেই যা আমি পেশ করব। তারা তাকে বললঃ একটি মাছি হলেও দিয়ে যাও। অতঃপর সে একটি মাছি দান করল; আর তারা তার রাস্তা ছেড়ে দিল। অতঃপর সে জাহান্নামে প্রবেম করল। তারা মাযারের খাদেমকে বললঃ কিছু দিয়ে যাও। লোকটি বলল, আমি মহান আল্লাহ ব্যতীত কাউকে কিছু দান করি না। তারা লোকটিকে হত্যা করল। অতঃপর লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করল। (*মুসনাদে আহমাদ, কিতাবুত তাওহীদ ৫২ পৃঃ*)

তাবারুক হাসিলের জন্য গাছের নিকট ভোগ দেয়া শিরক্।

আবু ওয়াকেদ লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুল (স) এর সাথে হুনাইনে যাচ্ছিলাম আর আমরা তখনো নতুন মুসিলিম ছিলাম। মুশরিকদের জন্য একটি বড়ই গাছ ছিল তারা গাছটির নিকট অবস্থান করত এবং তাতে অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। তাকে যাতে আনওয়াত বলা হতো। আমরা একটি বরই গাছের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের জন্য যাতে আনওয়াত বানিয়ে দিন যেমনভাবে তাদের জন্য যাতে আনওয়াত রয়েছে।

অতঃপর রাসুল (স) বললেনঃ আল্লাহু আকবার ঐ সত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! এটা এমন একটি নীতি যা তোমরা বললে যেমন বলেছিল বানীসিরাঈলরা মুসা (আ) কে- "আমাদের জন্য আপনি মা'বুদ বানিয়ে দিন যেমন তাদের মা'বুদ রয়েছে। তিনি বললেনঃ তোমরা বড়ই নির্বোধ সম্প্রদায়। তোমরা এমন নীতির অনুকরণ করবে যে নীতির উপর তোমদেও পূর্ববর্তীরা ছিল। (*তিরমিজি ২য় খন্ড ৪১পৃঃ, আহমাদ, মুসনাদে আবদুর রাজ্জাক, ইবনু জারীর, ইবনু মুনযির, ইবনু আবি হাতিম, তাবারানী*)

আল্লাহ ব্যতীত বাপ-দাদা, মাতা, পীর-দরবেশ কিংবা অন্যকিছুর নামে কসম করা শিরক্

আবদুর রহমান বিন সামুরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা তাগুতের নামে ও বাপ-দাদার নামে কসম করো না। (*মুসলিম ২য় খন্ড ৪৬ পৃঃ*)

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা তোমাদেও বাপ-দাদার নামে,মা-নানীর নামে এবং প্রতিমার নামে কসম করো না এবং আল্লাহরনামে সত্য কসম ব্যতীত কসম করো না। (*আবু দাউদ ২য় খন্ড*)

আবদুল্লাহ বিন উমার (রা) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ আমি রাসুল (স) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নমে কসম করল সে শিরকই করল। (*তিরমিজি, আবু দাউদ ২য় খন্ড ৪৬৩ পৃঃ*)

নিজের মত বা প্রবৃত্তি বা মত অনুসরণ করা শিরক্

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى
مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

আর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তাহলে জানবেন তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ কওে,তার থেকে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (*সূরা কাসাস ২৮ঃ৫০*)

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন- যে তার স্বীয় প্রবৃত্তিকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করেছে? আর জ্ঞান বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন এবং তার কান ও অন্তওে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তার চোখের উপর পর্দা ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ গোমরাহ করার পর কে এরূপ ব্যক্তিকে হেদায়েত করবে? তোমরা কি গবেষনা করো না। (*সূরা জাসিয়াহ ৪৫ঃ ২৩*)

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহন করেছে, এরপরেও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? (*সূরা ফুরকান ২৫ঃ ৪৩*)

আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল (স) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল (স) বলেনঃ তোমাদের উপর একান্ত কর্তব্য হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং ইস্তেগফার পড়া। অতএব তোমরা এগুলো বেশী বেশী পড়ো। কেননা শয়তান বলে আমি মানুষকে গোনাহের মাধ্যমে ধ্বংস করি। আর তারা আমাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং ইস্তেগফার দ্বারা ধ্বংস করে। আমি যকন এ অবস্থা দেখলাম অর্থাৎ যখন আমার সকল চক্রান্তই বিফল, তখন তাদেরকে আমি প্রবৃত্তির তাবেদারী দ্বারা ধ্বংস করি। আর তারা তাদেরকে হেদায়েত প্রাপ্ত মনে করে। (*জামেউস সাগীর, ইবনু কাসীর ১ম খন্ড ১৪০ পৃঃ*)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল, প্রবৃত্তির অনুকরণ করায় প্রবৃত্তিকে ইলাহ বা উপাস্য বানানো হয়। সুতরাং যারা আল্লাহর দেয়া হেদায়েতকে বাদ দিয়ে নিজের মনমত চলে সে সুস্পষ্ট মুশরিক।

নাবী (সাঃ) কে নূরের তৈরী মনে করা শিরক্

এক শ্রেনীর মানুষ বলে, নাবী (স) কে তৈরী না করলে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না। আল্লাহ নাবী (স) কে তাঁর নিজের নূর দিয়ে তৈরী করেছেন, নাবী (স) নূরের তৈরী। আর নাবী (স) এর নূরে সমস্ত জগত তৈরী। সর্ব প্রথম আল্লাহ নাবী (স) কে তাঁর নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, এভাবে তারা আল্লাহর সাথে শিরক্ করে থাকে। অথচ সহীহ হাদীসে রয়েছে আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে লিখতে বলেন।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ (স) বললেনঃ আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম ও মাছ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর কলমকে বলেছেনঃ লিখ, কলম বলল কি লিখব? আল্লাহ বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে সব লিখ। (তাবারানী, ইবনু জারীর, ইবনু আসাকির, ইবনু আবি হাতিম, আহমাদ, তিরমিজি)

আর নাবী (স) কে আল্লাহ মাটির তৈরী আদমের থেকে স্বাভাবিক মানুষের যে নিয়ম আল্লাহ করেছেন সে পদ্ধতিতেই আবদুল্লাহর ওরসে মা আমিনার গর্ভে এ পৃথিবীতে আগমন ঘটিয়েছেন। আল্লাহর নূওে মুহাম্মদ (স) পয়দা হলে মাতৃগর্ভে অপবিত্র রক্তের সাথে ভুমিষ্ট হতেন না। তিনি মাটির তৈরী বলেই অন্যান্য মানুষের মত ভুমিষ্ট হয়েছেন। তবে চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তাঁকে রিসালাত দিয়েছেন। তাঁর নিকট আল্লাহর ওয়াহী আসত,কুরআন মাজীদ তাঁর প্রতি নাজল হয়েছিল। তারপরও তিনি একজন মানুষ ছিলেন এবং আল্লাহর একজন বান্দা ছিলেন। যার স্বীকৃতি আমরা সর্বদা দিয়ে থাকি- 'আবদুহু ওয়া রাসুলুহ' বলে অর্থাৎ তিনি আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল। মহান আল্লাহ বলেনঃ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ **বলুন! আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওয়াহী আসে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ।** (*সূরা কাহফ ১৮ঃ ১১০*)

আলোচ্য আয়াতে মুহাম্মদ (স) উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষনা করেছেনঃ আমি মানুষ, তোমাদের মতই একজন মানুষ। তবে পার্থক্য এই যে, আমার নিকট ওয়াহী আসে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আকরাম খাঁ লিখেছেনঃ "মানুষের মধ্যে এসেছেন মানুষ মোস্তফা, মাটির মানুষ মোস্তফা, মানুষের দুঃখ-দরদের সংগী মোস্তফা, সব মানুষের অভাব অনুভবে সমভাগী মোস্তফা। তিনি দেবতা নন,ফেরেশতা নন, অবতার নন-তিনি হচ্ছেন আমেনা মায়ের ইয়াতীম পুত্র মোস্তফা, আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র মোস্তফা, কোরেশের রাখাল বালক

মোস্তফা।" (*তাফসিরুল কুরআন, ৩য় খন্ড ৫৬৮পৃঃ*)

আল্লাহর রাসুল মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন তার কিছু প্রমান আমরা তুলে ধরছি।

প্রথম প্রমাণ

মুহাম্মদ (স) অন্যান্য মানুষের মতই আদম সন্তান ছিলেন। মানুষ যেমন পানাহার করে, তেমনি মুহাম্‌দ (স) ও পানাহার করতেন। অন্যান্য মানুষের যেমন সন্তানাদি ছিল, তেমনি রাসুদেরও সন্তানাদি ছিল,স্ত্রীও ছিল। মানুষের মত ভূল রাসুলেরও হত। তিনি বলেছেনঃ "আমি মানুষ, তোমাদের মত ভূলে যাই। ভূলে গেলে অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেবে।"

দ্বিতীয় প্রমাণ

অন্যান্য মানষের মত রাসুলেরও বংশ তালিকা ছিল। মুহাম্মদ (স) এর পিতার নাম আবদুল্লাহ, মাতার নাম আমেনা, দাদার নাম আবদুল মুত্তালিব। একথা সবকলেই জানেন। রাসুল যে মানুস নবী ছিলেন কোরাইশ বংশে জন্ম গ্রহন তার বিরাট প্রমান।

তৃতীয় প্রমাণ

মুহাম্দ (স) অন্যান্য মানষের মত পানাহার করতেন। রাসুল (স) পানাহার করতেন এজন্য কাফেররা বলত- 'মুহাম্মদ কেমন রাসুল যে পানাহার করে' এ কথাটি মক্কাবাসী পৌত্তলিকদের। এ প্রশ্নের উত্তর দানে আল্লাহ ওয়াহী পাঠালেন-

"আমরা যত রাসুল পাঠিয়েছি,তাঁরা সকলেই খাদ্য গ্রহন করত। আমরা তাদের এমন দেহ গঠন করিনি যে, তারা খাদ্য গ্রহন করবে না এবং চিরস্থায়ী বসবাস করবে।"

অর্থাৎ মানষের গঠন প্রণালী অনুযায়ী বিনা আহারে বাঁচতেও পারবেনা এবং মানুষ হিসেবে তাদেও কেউই চিরস্থায়ী বসবাস করতে পারবে না। যেহেতু সমস্ত নবী খাদ্য গ্রহন করতেন, সেহেতু মুহাম্মদ (স) ও একজন খাদ্য ভক্ষনকারী রাসুল ছিলেন। এটা তাঁর মানুষ হবার অন্যতম প্রমাণ।

চতুর্থ প্রমাণ

রাসুল অন্যান্য নবীদের মত মৃত্যু বরণ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে- إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

"নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারা সকলে মৃত্যু বরণ করবে।" (সূরা যুমার ৩৯ঃ৬)।

রাসুল (স) অতি মানব ছিলেন না যে তিনি মৃত্যু বরণ করবেন না। বরং তিনি ছিলেন মানুষ নবী, তাই তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল।

উল্লেখিত প্রমাণাদি দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, মুহাম্মদ (স) একজন মানুষ নবী ছিলেন। অন্যান্য মানুষের মতই তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছিল। অন্যান্য মানুষের মত তিনিও পানাহার করতেন এবং পরলোক গমন করেছেন। আর একথা কিভাবে গ্রহণ করা যায় যে, তিনি নূরের তৈরী, অথচ যাকে মানব জাতির হেদায়েতের জন্য, অনুসরণীয় একমাত্র আদর্শ হিসেবে আল্লাহ পাঠালেন মাটির মানুষদের কাছে। নূরের তৈরী সৃষ্টির প্রকৃতি,চাল-চলন তো হবে ভিন্ন, তাকে কিভাবে মানুষ পুরোপুরি আদর্শ হিসেবে গ্রহন কওে তার যথাযথ অনুসরণ করবে। যাদের বিবেক বুদ্ধি আছে, তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এব্যাপারে আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

মাজার ও দর্শনীয় বস্তু

মুসলমানদের দেশে আজ যে সমস্ত মাজার দেখা যায় যেমন সিরিয়া, ইরাক, মিসর, হিন্দুস্থান ও বাংলাদেশ। এ হচ্ছে ইসলামের শিক্ষার বিপরীত। কারণ নবী (সঃ) কবরের উপর ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।

"নবী (সঃ) কবরে রং, চুনকাম বা প্লাষ্টার করতে এবং তার উপর বসতে এবং তার উপর ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।" *(সহীহ মুসলিম)*

অন্য সহীহ হাদীস তিরমিযীতে আছেঃ তার উপর কোন কিছু লিখতে- তা কুরআনই হোক বা কবিতাই হোক।

১) এ সমস্ত মাজারগুলোর বেশির ভাগই ঠিক নয়। যেমন হোসেন (রাঃ) শহীদ হন ইরাকের কারবালাতে এবং তাঁকে মিসর নেয়া হয়নি, তাই মিসরে তার কবর মিথ্যা বানান। সবচেয়ে উত্তম প্রমাণ হল মুসলমানদেরকে মসজিদে দাফন করা হয় না। কারণ নবী (সঃ) বলেনঃ

"আল্লাহ্ (সুব) ইহুদীদের ধ্বংস করুন। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরস্থানগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছিল।" *(সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মিলিত হাদীস)*

এই হুকুমের মধ্যে হেকমত হল যাতে মসজিদগুলো শির্‌ক হতে মুক্ত থাকে। আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

“এবং নিশ্চয়ই মসজিদগুলো আল্লাহ্র জন্য, তাই সেখানে আল্লাহ্র সাথে অন্যকে ডেক না।” *(সূরা জ্বীন ৭২ঃ ১৮)*

মূলতঃ নবী (সঃ)-কে আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে দাফন করা হয়- মসজিদে দাফন করা হয়নি। যখন উমাইয়া মসজিদকে প্রশস্ত করেছিল তখন তাঁর কবরকেও এর মধ্যে প্রবেশ করায়। হোসেন (রাঃ)-এর কবর এখন মসজিদের মধ্যে। কিছু কিছু লোকেরা তাঁর চারপার্শ্বে তওয়াফ করে এবং তার কাছে তাদের ঐ প্রয়োজনীয় জিনিস চায় যা শুধু একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই চাওয়া যায়, যেমন রোগমুক্তি ও বিপদমুক্তি। আমাদের দ্বীন আমাদের হুকুম করে তা আল্লাহ্ হতে চাইতে এবং কাবা ছাড়া অন্যের চারপার্শ্বে তওয়াফ না করতে।

২) ইসলাম নিষেধ করে করবের উপর গম্বুজ ইত্যাদি বানাতে। বরং মসজিদে তা বানাতে বলে। যেমন দেখা যায় হোসেন (রাঃ)-এর কবরে, আব্দুল কাদের জিলানীর কবরে এবং অন্যান্য স্থানে যে সম্বন্ধে সরাসরি নিষেধ করা হয়েছে। আমার এক বন্ধু বলেছেনঃ আমি এক ব্যক্তিকে দেখি সে আব্দুল কাদের জিলানীর কবরের দিকে সালাত পড়ছে কেবলাকে ত্যাগ করে। তাকে উপদেশ দিলে সে তা অস্বীকার করে এবং তাকে উল্টো অপবাদ দেয়। হয়ত সে শুনেনি ঐ হাদীস - “কবরের উপরে বস না এবং তার দিকে সালাতও পড় না।” *(সহীহ মুসলিম)*

৩) বেশির ভাগ মাজার ও এই জাতীয় স্মৃতিসৌধগুলো ফাতেমীদের সময় তৈরী হয়েছে। ইব্নে কাসীর (রহ) তাদের সম্বন্ধে বলেনঃ কাফের, ফাসেক, পাপিষ্ঠ, ধর্মত্যাগী, জিনদিক, মুনাফিক, আল্লাহ্র (সুব) সিফাত অস্বীকারকারী এবং ইসলাম অস্বীকারকারী অগ্নি পূজকদের মত তারা ছিল কাফের। তাদের যামানায় তারা দেখে যে মুসল্লীরা মসজিদ পূর্ণ করে ফেলছে। তারা সালাতও পড়ত না এবং হজ্জও করত না। মুসলমানদের উপর হিংসা করত; ফলে তারা চিন্তা করল মানুষদেরকে মসজিদ হতে সরিয়ে দেয়ার। ফলে তারা মিথ্যা মাজার ও কুব্বা বানাতে শুরু করল। লোকদের ঐ ধারনা করাল ঐ সমস্তগুলোতে হোসেন (রাঃ) ও জয়নাব (রাঃ)-এর কবর। তাদের মধ্যে অনেক উৎসবের ব্যবস্থা করল যাতে মানুষ চোখ হতে নিজেদের ঢেকে রাখতে পারে। অন্য মুসলমানরা তাদের থেকে এই বেদ'য়াত নিয়েছে যা তাদেরকে শির্কের মধ্যে নিক্ষেপ করে। ফলে এতে প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করছে অথবা এ অবস্থায় মানুষের টাকা পয়সার দরকার অস্ত্রপাতি কেনার জন্য যাতে তাদের দ্বীন ও সম্মানকে বাঁচাতে পারে।

৪) কিছু কিছু মুসলমানরা তাদের টাকা পয়সা ব্যয় করছে কবরের উপর ঘর বানাতে, মাজার বানাতে, দেয়াল তুলতে, কবরের উপর নানা নিদর্শন তৈরি করতে যা মৃতদের কোন উপকার দিতে পারে না। যদি এই টাকা পয়সা গরীবদের পিছনে ব্যয় করত, তবে জীবিতরা ও মৃতরাও উপকৃত হত। অথচ এসব করা হচ্ছে এ কথা জেনে শুনে যে, ইসলাম নিষেধ করেছে কবরের উপর ঘর বানাতে। নবী (সঃ) সাহাবাদের বলেছেনঃ “কোন স্মৃতিসৌধ পেলে অবশ্যই তাকে ধ্বংস করবে, কোন উঁচু কবর পেলে তাকে ভেঙে দেবে এবং মাটির সমান করে দেবে।” *(সহীহ মুসলিম)*

ইসলাম কবরকে মাত্র এক বিঘত উঁচু করতে অনুমতি দেয়।

৫) ঐ সমস্ত নেয়ায-নজর যা মৃতদের জন্য পেশ করা হয় তা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। যা তাদের খাদেমরা হারামভাবে উপার্জন করে। যা তারা পাপের কার্যে এবং ভোগ লালসার ক্ষেত্রে ব্যয় করে। ফলে যে নজর দেয় এবং নেয় উভয়ই এই পাপে শরীক হবে। যদি এই টাকাগুলো গরীবদের দান করা হত তবে তাদেরও উপকার হত এবং দানকারীও যে নিয়তে দান করেছে তার ফল পেত।

ওয়াসীলাহ্ বা পীর ধরা

আত্তাওয়াস্সুল এর আভিধানিক অর্থ নৈকট্য লাভ করা। অসীলাহ্ হচ্ছে যার মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছা যায়। অর্থাৎ অসীলাহ হচ্ছে সেই উপায় ও মাধ্যম যা লক্ষ্যে পৌছিয়ে দেয়।

ইবনুল আছীর (রহঃ) প্রণীত নিহায়াত্ গ্রন্থে এসেছে আলঅসিল অর্থ আররাগিব অর্থাৎ আগ্রহী। আর অসীলাহ্ অর্থ নৈকট্য ও মাধ্যম বা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট বস্তু পর্যন্ত পৌছা বা নিকটবর্তী হওয়া যায়। অসীলাহর বহু বচন হচ্ছে অসায়েল। *(আন্নিয়াহায়াত ৫খন্ড ১৮৫ পৃষ্ঠা)*

কাসূম অভিধানে এসেছে,

অর্থাৎ, এমন আমল করা যার মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা যায়। ইহা তাওয়াস্সুলের অনুরূপ অর্থ। *(ক্বামূসুল মুহীত্ব ৪র্থ খন্ড ৬১২পৃঃ)*

কুরআনে অসীলাহ্র অর্থ

ইতিপূর্বে অসীলাহর যে আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করেছি। সালাফগণ (পূর্বসূরী বিদ্বান তথা সাহাবা ও তাবেঈগণ) কুরআনে উল্লেখিত অসীলাহ শব্দের অর্থ তাই করেছেন। যা সৎ কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা অর্থের বহির্ভূত নয়। কুরআন কারীমে দু'টি সূরার দু'টি আয়াতে অসীলাহ শব্দটির উল্লেখ এসেছে। সূরা দু'টি হচ্ছে মায়িদাহ্ ও ইসরা।

আয়াত দু'টি নিম্নরূপঃ

অর্থঃ **"হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁর নিকট অসীলাহ সন্ধান কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর। অবশ্যই মুক্তিপ্রাপ্ত হবে।"** *(সুরা মায়িদাহঃ ৩৫)*

অর্থঃ **"তারা (কতিপয় জনসমষ্টি) যাদেরকে আহ্বান করে তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট অসীলাহ সন্ধান করে। তাদেরকে অধিক নিকটবর্তী; আর তারা তার (আল্লাহ্‌র) রহমতের আশা করে ও তার আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের আযাব ভীতিযোগ্য।"** *(সুরা ইসরাঃ ৫৭)*

প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমামুল মুফাস্‌সিরীন হাফিয ইবনু জারীর (রহঃ) বলেছেনঃ

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি আরোপিত যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ মান্য করতঃ আনুগত্যের সাথে আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দাও।

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট নৈকট্য তালাশ কর তাকে সন্তুষ্টকারী আমলের মাধ্যমে। হাফিয ইবনু কাছীর ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, অসীলাহ অর্থ নৈকট্য। অনুরূপ অর্থ সংকলিত হয়েছে মুজাহিদ, হাসান, আব্দুল্লাহ বিন কাছীর, সুদ্দী, ইবনু যায়েদ ও অপরাপরগণ থেকে। কাতাদাহ থেকেও এরূপ সংকলিত হয়েছে। আল্লাহর নৈকট্য থেকেও এরূপ সংকলিত হয়েছে। আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে ও তাকে সন্তুষ্টিকারী আমলের মাধ্যমে। অতঃপর ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেনঃ এ সকল নেতৃস্থানীয় আলিমগণ আয়াতের তাফসীরে যা বলেছেন এতে (নির্ভরযোগ্য) তাফসীরকারদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। আর তা হচ্ছে এই যে, অসীলাহ হচ্ছে ঐ বিষয় যার মাধ্যমে অভিষ্ঠ লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পৌছা যায়। *(তাফসীর ইবনু কাছীর ৫খন্ড ৮৫ পৃষ্ঠা)*

দ্বিতীয় আয়াতঃ বিশিষ্ট সাহাবী ইবনু মাসউদ (রাঃ) আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্য সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে তার অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেছেন-

অর্থঃ "কিছু সংখ্যক মানুষ কিছু সংখ্যক জ্বিনের পূজা করত, অতঃপর পূজ্য জ্বিন সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু তারা (ঐ মানব সম্প্রদায়) নিজেদের ধর্মে (জ্বিন পূজায়) বহাল থাকে। *(বুখারী শরীফ)*

হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) বলেনঃ অর্থাৎ জ্বিনের পূজাকারী মানব সম্প্রদায় জ্বিন পূজায় বহাল থাকে, অথচ এ সকল জ্বিন তা পছন্দ করতো না, যেহেতু তারা ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র নিকট অসীলাহ কামনা করতে শুরু করেছে। *(ফাতহুল বারী ৮ম খন্ড ৩৯৭ পৃষ্ঠা)*

উক্ত আয়াতের এটাই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা। যেমনটি ইমাম বুখারী ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণনাপূর্বক তার ছহীহ্ বুখারী গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। অসীলাহ বলতে যে ঐ সকল বিষয় বস্তু উদ্দেশ্য যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়, এ ব্যাপারে আয়াতটি অত্যন্ত স্পষ্ট।

এজন্য আল্লাহ্ বলেন, অর্থাৎ তারা সন্ধান করে এমন সৎ আমল যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায়। দু'টি আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে সালাফদের (পূর্ববর্তী মুফাস্‌সিরদের) থেকে যা সংকলন করেছি এরই নির্দেশ করে আরবী ভাষা (অভিধান) ও সঠিক বোধশক্তি।

পক্ষান্তরে যারা এ আয়াত দু'টি থেকে নবীগণ ও নেক্কারগণের অবয়ব সত্ত্বা আল্লাহ্‌র নিকট তাদের অধিকার ও সম্মানের অসীলাহ গ্রহণ করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করে থাকে তাদের ব্যাখ্যা বাতিল এবং বাক্যকে নিজের স্থান থেকে বিকৃত করণ, শব্দকে তার প্রকাশ্য নির্দেশনা থেকে পরিবর্তন করণ ও দলীলকে এমন অর্থে ব্যবহার করার শামিল যার সম্ভাবনা রাখে না। তদুপরি এমন অর্থ কোন সালাফ তথা ছাহাবাহ্ তাবিঈ ও তাদের অনুসারীগণ বা গ্রহণযোগ্য কোন তাফসীরকারক বলেননি।

যখন প্রতিভাত হলো যে, অসীলাহ শব্দের অর্থঃ ঐ সকল সৎকর্ম যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। এবার এই সৎকর্মটির শরীয়ত সম্মত কিনা জ্ঞাত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কারণ আল্লাহ্ এ সকল আমল নির্বাচন করার দায়িত্ব আমাদের দিকে সোপর্দ করেননি, বা তাহা চিহ্নিত করার ভার আমাদের বিবেক ও রুচির উপর ছাড়া হয়নি। কেননা এমনটি হলে আমলে বৈপরিত্য ও বিভিন্নতা সৃষ্টি হতো। তাই আল্লাহ্ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমলের ক্ষেত্রে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে এবং তার নির্দেশনা ও শিক্ষার অনুসরণ করতে। কেননা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানেনা কোন্ বিষয় তাকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার মাধ্যমগুলো জানা। আর তা এভাবে সম্ভব; প্রতিটি মাস্‌আলার (বিষয়) আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল (সাঃ) যা প্রবর্তন ও বর্ণনা করেছেন তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, কোন আমল সৎ হওয়ার জন্য তাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে খাঁটি হতে হবে এবং আল্লাহর দেয়া নিয়ম অনুযায়ী হতে হবে। এ কথার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, তাওয়াস্‌সুল দু'ভাগে বিভক্ত শারঈ (শরীয়ত সম্মত) ও বিদঈ (বিদ'আতী বা শরীয়ত বিরোধী)

শরীয়ত সম্মত অসীলাহ

কুরআন সুন্নাহ রোমন্থন করে শরীয়ত সম্মত অসীলাকে তিন ভাগে সীমাবদ্ধ পাওয়া গেছে।

(ক) আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর অসীলাহ।

(খ) সৎ আমলের অসীলাহ।

(গ) সৎ ব্যক্তির দু'আর অসীলাহ।

প্রিয় পাঠক! আপনার সমীপে প্রকারগুলো দলীল সহ বিশদ বর্ণনা দেয়া হলোঃ-

প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর অসীলাহ ধারণ সম্পর্কেঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অসীলাহ গ্রহণ করার নিয়ম, যেমন মুসলিম ব্যক্তি তার দু'আয় বলবেঃ

অর্থঃ "হে আল্লাহ্‌ তুমি প্রজ্ঞাময় পরাক্রমশালী করুণাময়, কৃপানিধান, আল্লাহ্‌ তাই তারই অসীলায় সমগ্র বস্তুকে পরিব্যপ্তকারী তোমার রহমতের অসীলায় তোমার নিকট আমার জন্য রহমত ও ক্ষমা ভিক্ষা করছি। অথবা অনুরূপ আল্লাহ্‌র সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীর মাধ্যম ধরে দু'আ করবে।"

কিতাব ও সুন্নাহ্‌ এ প্রকার অসীলাহর প্রতি নির্দেশ দান করেছে। আল্লাহ্‌ বলেনঃ

অর্থঃ "**আর আল্লাহ্‌র অনেক সুন্দরতম নাম রয়েছে। অতএব সেগুলোর অসীলায় তাকে আহবান কর এবং পরিত্যাগ কর ওদেরকে যারা তার নাম সমূহের ভিতর বিকৃতি সাধন করে।** *(সূরা আ'রাফঃ ১৮০)*

সুন্নাহ হতে দলীলঃ নবী (সাঃ) এর বাণীঃ

অর্থঃ "হে আল্লাহ্‌ তোমার গায়েব জানা ও সৃষ্টির উপর নিরংকুশ ক্ষমতার অসীলায় আমাকে------।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌র নিকট সৎ আমলের দ্বারা অসীলাহ গ্রহণ করাঃ

ঐ সৎ আমল যার ভিতর কবুল হওয়ার নির্ধারিত শর্ত পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান।[৪৯] আর তা এরূপ যেন দু'আকারী বলবে-

অর্থঃ "হে আল্লাহ্‌! তোমার প্রতি আমার ঈমান, তোমার জন্য আমার ভালবাসা এবং তোমার রাসূলের অনুসরণ ও অনুকরণের অসীলায় আমাকে ক্ষমা করো।"

আরো এরূপ শরীয়ত সম্মত দু'আহর অসীলাহ গ্রহণ করা যায়। এ সকল অসীলাহ নির্দেশনায় কুরআন থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলার কিছু বাণী উদ্ধৃত হলোঃ

অর্থঃ "**হে আমাদের প্রতিপালক নিশ্চিতরূপে আমরা ঈমান এনেছি অতএব আমাদের গুনাহ্‌ সমূহ ক্ষমা করা এবং নরকের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।**" *(সূরা আলে ইমরানঃ ১৬)*

আরো আল্লাহ্‌র বাণীঃ

অর্থঃ "**হে আমাদের প্রতিপালক তুমি যা অবতীর্ণ করেছে আমরা তার উপর ঈমান এসেছি এবং তোমার রাসূলের অনুসরণ করেছি অতএব আমাদেরকে সাক্ষ্যপ্রদানকারীদের (মুহাম্মদী উম্মাতের সৎকর্মশীল বান্দাদের) দলে লিপিবদ্ধ কর।**" *(আলে ইমরানঃ ৫৩)*

আরো আল্লাহ্‌র বাণীঃ

---

৪৯. ইবাদত কবুল হওয়ার প্রধানতঃ দু'টি শর্তঃ

১) সকল আমল ও ইবাদত আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে খালিছ হতে হবে। যাবতীয় ইবাদত যথাঃ সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত দু'আ-প্রার্থনা, মান্নত-মানসা, শপথ, সাহায্য, যাজ্ঞা, পশু জবাই-কুরবানী ইত্যাদি একমাত্র ঐ আল্লাহ্‌র জন খালিস হতে হবে। আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো জন্যে বা অন্য কোন স্বার্থে সম্পাদন করা চলবে না, অন্যথায় ঐ আমল ও ইবাদত শির্কের মত পাপে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

২) ইখলাসের সাথে সাথে দ্বিতীয় শর্ত নবী (সাঃ)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমতঃ লক্ষ্য করতে হবে, আমল ও ইবাদত নবী (সাঃ) করেছেন বা করতে বলেছেন কিনা। দ্বিতীয়তঃ যদি করে থাকেন বা করতে বলে থাকেন তবে জানতে হবে কিভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন। এই শর্তটি যেই আমল ও ইবাদতে বিলুপ্ত থাকবে সেই আমল ও ইবাদত জঘন্যতম বিদ'আত রূপান্তরিত হবে। হাসানাহ্‌ নয়।

অর্থঃ **"হে আমাদের রব! আমরা শ্রবণ করেছি 'তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনো বলে' ঘোষণা প্রদানকারীর ঘোষণা অতঃপর আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের গুনাহ্‌সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের পাপরাশি মোচন কর এবং সৎ ব্যক্তিদের সাথে মৃত্যু দান কর।"** *(সূরা আলে ইমরানঃ ১৯৩)*

সুন্নাহ থেকে বুরাইদা (রাঃ)-এর হাদীস প্রনিধানযোগ্য,

অর্থঃ বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, নবী (সাঃ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট এই অসীলাই চাচ্ছি যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি তুমি সেই আল্লাহ যিনি ব্যতীত আর কেউ প্রকৃত উপাস্য নেই। তুমি একক, মুখাপেক্ষীহীন, যিনি কাউকে জন্ম দেননি, এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। এতদশ্রবণে নবী (সাঃ) বললেন, এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট তার এমন সুমহান নামের অসীলায় আবেদন করেছে যে, তার মাধ্যমে আবেদন করা হলে, প্রদান করেন এবং প্রার্থনা করা হলে, কবুল করেন *(হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)*

আরো এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে তিন ব্যক্তির ঘটনা সম্বলিত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) এর হাদীস। তারা এক গর্তে প্রবেশ করে আশ্রয় নিলে একটি পাথর উপর থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় তারা একে অপরকে বলল, তোমরা তোমাদের সৎ আমলসমূহের অসীলায় আল্লাহ আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ কর। অতঃপর তাদের একজন পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের দ্বারা অসীলাহ্ গ্রহণ করল। দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে অবাধ্যতায় কাজ থেকে বিরত হওয়ার অসীলাহ গ্রহণ করল। তাঁর চাচাতো বোনকে আয়ত্তে পাওয়ার পর যখন সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়ে দেয় তখন সে আল্লাহ্‌র ভয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। তৃতীয় ব্যক্তি তার আমানত দারিতা ও সততার অসীলাহ গ্রহণ করল। আর তা এভাবে, এক শ্রমিক তার পারিশ্রমিক ছেড়ে চলে গেলে সে তার পারিশ্রমিক সম্পদকে বিপুল সম্পদে পরিণত করে। পরবর্তীকালে সে এসে তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে যায় কিছুই ছেড়ে যায়নি। *(বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)*

এখানে ঘটনার সারাংশের উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি মুসলিম ব্যক্তির খুলুসিয়াত পূর্ণ আমলের অসীলাহ গ্রহণ শরীয়ত সম্মত হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্‌র নিকট সৎ ব্যক্তির দু'আর অসীলাহ গ্রহণ

যেমন মুসলিম ব্যক্তি চরম সংকটে পড়লে বা তার উপর কোন বিপদ আপতিত হলে এবং নিজেকে আল্লাহ্‌র হক আদায়ে ত্রুটি সম্পন্ন মনে করলে সে আল্লাহর নিকট মজবুত উপায় গ্রহণ করতে ভালবাসে। এজন্য এমন এক ব্যক্তির নিকট যেয়ে থাকে যাকে পরহেযগারী, পরিশুদ্ধি, মর্যাদা ও কুরআন-হাদীসের বিদ্যায় অধিক উপযুক্ত মনে করে তার নিকট বিপদমুক্তির ও দুশ্চিন্তা দূরীকরণের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করার আবেদন করে। এ ব্যাপারে সুন্নাহ ও সাহাবাগণের আচরণ নির্দেশ করে।

সুন্নাহ্ থেকে দলীলঃ আনাস (রাঃ) এর বণিত হাদীস "এক পল্লীবাসী নবী (সাঃ)-এর মিম্বরে খুৎবাহ দানকালে মসজিদে প্রবেশ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল আমাদের সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল, রাস্তা ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অতএব আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। নবী (সাঃ) দু'খানা হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন, এ পরিমাণ হাত উঠিয়েছিলেন যে, আমি তার বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখেছিলাম। (দু'আটি এই)

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান কর, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। লোকেরাও তাদের হাত উঠিয়ে দু'আ করলো।

আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, (দু'আর পূর্বে) আমরা আসমানে ব্যাপক অংশ জুড়ে মেঘের একটিও খন্ড দেখি নাই, আমাদের মাঝে ও সিলা'র মাঝে কোন ঘরবাড়ীও ছিলনা। দু'আর পর রাসূল (সাঃ) এর পিছন দিক থেকে মেঘ প্রকাশিত হলো ঢালের ন্যায়। আসমানের মাঝা-মাঝি স্থানে এসে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং বর্ষিত হলো। সেই যাতের কসম যার হাতে আমার জীবন নবী (সাঃ) হাত রাখেননি যে পর্যন্ত মেঘমালা পাহাড় সম আকারে বিস্তৃতি লাভ না করেছিল। অতঃপর মিম্বর থেকে অবতরণ করার পূর্বেই তার দাড়ির উপর দিয়ে বৃষ্টি গড়িয়ে পড়তে দেখেছি। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং আমরা সালাতান্তে বের হলাম পানিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ীতে পৌছলাম। দ্বিতীয় জুমু'আহ্ পর্যন্ত এ বৃষ্টি অব্যাহত থাকে। অতঃপর ঐ পল্লীবাসী লোকটি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। নবী (সাঃ) মৃদু হাসলেন এবং তার হাত দু'খানা উত্তোলন পূর্বক বললেন,

অর্থঃ "হে আল্লাহ্ আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ্ টিলার উপর, ছোট ছোট পাহাড়ের উপর, মাঠের ভিতর ও গাছপালা উৎপাদনস্থলগুলোতে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মেঘ সরে গেল এবং মদীনার পাশ্বস্ত ভূমিগুলিতে বর্ষিতে লাগল, মদীনায় আর একটুও বৃষ্টি বর্ষিত হলো না।

সাহাবাগণের আমল হতে প্রমাণ

এ মর্মের হাদীসটিও আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ লোকেরা যখন অনাবৃষ্টিতে ভুগতো তখন উমার (রাঃ) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এর মাধ্যমে বৃষ্টি চাইতেন। তিনি বলতেন,

অর্থঃ "হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অসীলা ধারণ করলে তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে থাকতে, আর এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার অসীলাহ ধারণ করছি। অতএব আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে তারা বৃষ্টি প্রাপ্ত হতো। *(বুখারী)*

উমার (রাঃ) এর বাণী আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অসীলাহ্ ধারণ করতাম এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার অসীলা ধারণ করছি, এর অর্থঃ আমরা আমাদের নবীর শরণাপন্ন হতাম এবং তার নিকট দু'আর আবেদন করতাম এবং তাঁর দু'আর অসীলায় আল্লাহ্র নৈকট্য কামনা করতাম। আর এমন যেহেতু তিনি উর্দ্ধতন বন্ধুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন (মৃত্যুবরণ করেছেন) সেহেতু আমাদের জন্য তার পক্ষে দু'আ সম্ভব নয় তাই আমাদের নবীর চাচার সম্মুখীন হচ্ছি এবং তার নিকট আমাদের জন্য দু'আর সম্ভব নয় তাই আমাদের জন্য দু'আর আবেদন করছি। এসব কথার অর্থ এটা নয় যে, তাঁরা তাদের দু'আয় এরূপ বলতেন, হে আল্লাহ্ তোমার নবীর সম্মানের অসীলায় আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর।

অতঃপর তার মৃত্যুর পর তারা বলতেন, হে আল্লাহ! আব্বাস (রাঃ)-এর মান মর্যাদার অসীলায় আমাদের বৃষ্টি দান কর। কারণ এ ধরনের দু'আ বিদআতী। কুরআন ও সুন্নাহতে এর কোন ভিত্তি নেই। এরূপ অসীলাহ পূর্বসূরী কোন বিদ্যান ধারণ করেননি।

অনুরূপভাবে মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁর যুগে ইয়াযীদ বিন আস্‌অদ (রহঃ)-এর অসীলাহতে অর্থাৎ তাঁর দু'আর অসীলাহতে বৃষ্টি চেয়েছিলেন। তিনি (ইয়াযীদ) সম্মানিত তাবেঈগনের একজন ছিলেন। যদি ব্যক্তিসত্তা, সম্মান ও মর্যাদার অসীলাহ ধারণ করা শরীয়ত সম্মত হতো তাহলে উমার ও মু'আবিয়াহ (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর অসীলাহতে পানি চাওয়া বাদ দিয়ে আব্বাস (রাঃ) ও ইয়াযীদ (রাঃ)-এর অসীলাহ ধারণ করার শরণাপন্ন হতেন না।

বিদআতী এবং শিরকী অসীলাহ

ইতিপূর্বে আমরা শরীয়ত সম্মত অসীলাহ, তার প্রকারভেদ, ও দলীল সম্পর্কে অবহিত হয়েছি, এবারে আমরা অন্যান্য অসীলাহ সম্পর্কে অবহিত হবো যেমন কোন ব্যক্তির অধিকারের অথবা কোন ব্যক্তির মর্যাদার অসীলাহ গ্রহণ বিদআতী অসীলাহ বৈ কিছু হতে পারেনা যার আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাহ্ থেকে কোন নির্দেশ নেই। এমনকি কোন সাহাবা ও তাবেঈগণ এরূপ করেছেন বলে জানাও যায়নি। এসবই (দৃষ্টান্ত ও অবস্থা) যথেষ্ট নবাবিস্কৃত অসীলাহ বাতিল প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে।

আর এ কারণেই অনেক গবেষক ইমাম ঐ ধরনের অসীলাহকে অস্বীকার করেছেন। এ বিসয়ে মতনৈক্যপোষণকারীর কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। কারণ তা দ্বীনের ভিতর নবাবিস্কৃত ও বিদআত থেকে নিষিদ্ধতা জ্ঞাপক সুন্নাহ ও কুরআনের স্পষ্ট দলীলসমূহের সাথে সংঘর্ষশীল।

অসীলাহ বিষয়ে কিছু সংশয় ও তার নিরসন

ব্যক্তিসত্ত্বা ও মর্যাদার অসীলাহ ধারণ বৈধ জ্ঞানকারীগণ কিছু দলীল প্রমাণের আশ্রয় নিয়ে থাকেন যার অবস্থা দ্বিবিধ। হয় দলীলগুলি সহীহ্ শুদ্ধ কিন্তু তারা এর অর্থ বিকৃত করে এবং এমন অর্থে ব্যবহার করে যার সম্ভাবনা রাখে না। কিংবা দলীলগুলো দুর্বল ও বানোয়াট যার প্রতি নির্ভর করা যায় না। এ দু'টি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোকপাত করবো।

প্রথম সংশয়ঃ

বিষয়টি হচ্ছে এমন সব দলীল যেগুলিকে এমন অর্থে ব্যবহার করা হয় যার সম্ভাবনা রাখেনা। ব্যক্তিসত্ত্বার অসীলাহ ধারণ বৈধ জ্ঞানকারীগণ ধারণা করে থাকেন যে ও দু'টি তাদের মতের সমর্থনে রয়েছে।

প্রথম হাদীসঃ হাদিসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। লোকেরা যখন অনাবৃষ্টির সম্মুখীন হতো তখন উমার (রাঃ) আববাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এর অসীলাহতে বৃষ্টি চাইতেন। তিনি বলতেন,

অর্থঃ "হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অসীলা ধারণ করলে তুমি আমাদের বৃষ্টি দিয়ে থাকতে, আর এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার অসীলাহ ধারণ করছি। অতএব আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে তারা বৃষ্টি প্রাপ্ত হতো। *(ইমাম বুখারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)*

তারা এই হাদীস থেকে বুঝে থাকেন যে, উমার (রাঃ) এর অসীলাহ ধারণ করার অর্থ আব্বাস (রাঃ) এর আল্লাহ্র নিকট সম্মান ও মর্যাদার দ্বারা অসীলাহ গ্রহণ করা। উমার (রাঃ) কর্তৃক আব্বাস (রাঃ) এর অসীলাহ ধারণ মানে দু'আয় শুধু তার নাম উল্লেখ করা এবং তাঁর বরাতে আল্লাহর নিকট বৃষ্টি তলব করা। সমগ্র সাহাবা এ আচরণকে সমর্থন করেছিলেন। অতএব দাবীর সপক্ষে এ হাদীসটি প্রমাণ বহন করছে। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা পাঁচভাবে অগ্রাহ্য।

(১) যদি ব্যক্তি সত্ত্বা ও সম্মানের অসীলাহ্ গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত হতো তাহলে উমার (রাঃ) সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ রাসূল (সাঃ)-এর অসীলাহ্ ধারণ করা থেকে বিমুখ হয়ে সম্মানের দিক থেকে তাঁর চেয়ে বহু নিম্নপর্যায়ের আব্বাস (রাঃ) এর অসীলাহ্ ধারণ করার জন্য শরণাপন্ন হতেন না। কিন্তু উমার (রাঃ) এমনটি এজন্য করেছেন কারণ, তিনি জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দু'আর অসীলাহ্ গ্রহণ করা শুধু তাঁর জীবদ্দশায় সম্ভব ছিল। জীবদ্দশায় থাকাকালে তিনি তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন ফলে আল্লাহ্ তার দু'আ কবুল করতেন, যেমনটি পল্লীবাসী লোকটির ঘটনা থেকে জানা গেছে।

(২) মানুষ চরম পর্যায়ের কোন প্রয়োজনের সম্মুখীন হলে স্বভাবতঃই সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বড় ধরনের একটি মাধ্যম তালাশ করে যা তাকে সেই উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম করতে পারে। সুতরাং কিভাবে উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর তার অসীলাহ্ শরীয়ত সম্মত হওয়া সত্ত্বেও পরিত্যাগ করতে পারেন। অথচ তারা ছিলেন খরা ও অনাবৃষ্টির কারণে বিপর্যস্ত অবস্থায়। যার জন্য সেই বছরটির নাম আমুর রমাদ (ছাই এর বছর) বলা হয়।

(৩) হাদীসের শব্দ নির্দেশ করে যে, উমার (রাঃ) কর্তৃক আব্বাস (রাঃ)-এর অসীলাহ্ ধরা একাধিকবার ঘটেছে। আর তা আনাস (রাঃ)-এর উক্তি দ্বারা যে, লোকেরা যখন খরার সম্মুখীন হতো তখন উমার (রাঃ) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব-এর অসীলায় বৃষ্টি চাইতেন। যদি এমনটি ঘটেও থাকে যে, লোকেরা যখন খরার সম্মুখীন হতো তখন উমার (রাঃ) আববাস বিন আব্দুল মুত্তালিব-এর অসীলায় বৃষ্টি চাইতেন। যদি এমনটি ঘটেও থাকে যে, উমর (রাঃ) উত্তম ছেড়ে অধমের শরণাপন্ন হয়েছেন যেমনটি বিরোধীগণের ধারণা। তাহলে একবার ঘটার কথা বারংবার ঘটার কথা নয়। কিন্তু দেখা যায় প্রতিবারই আব্বাসের শরণাপন্ন হয়েছেন। একটিবারও নবী (সাঃ)-এর শরণাপন্ন হননি।

(৪) নিশ্চয় বিরোধীগণ আমাদের সাথে এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে তথা উমার (রাঃ) এর বাণী "----" আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অসীলাহ্ ধরতাম। অনুরূপভাবে তাঁর বাণী "----" আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার অসীলাহ ধারণ করছি।" এতে একটি অব্যয় উহ্য রয়েছে। বিরোধীগণ বলেন, "আমাদের নবীর সম্মানের অসীলাহ্ এবং আমাদের নবীর চাচার সম্মানের অসীলাহ্ শব্দগুলি উহ্য মেনে থাকেন।

আর আমরা "----" আমাদের নবীর দু'আর অসীলাহ্ এবং "----" আমাদের নবীর চাচার দু'আর অসীলাহ্ শব্দগুলি উহ্য মানি। সংযোগশীল উহ্য অব্যয়টি নির্ধারণের জন্য সুন্নাহ ও ঘটনার ভঙ্গির দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। উমার (রাঃ) ও সাহাবাগণ যেহেতু নিজেদের বাড়ীতে বসে থেকে বলেননি "আমরা তোমার নিকট তোমার নবীর চাচার অসীলাহ্ ধারণ করছি" বরং তাঁরা আব্বাস (রাঃ)-কে নিয়ে সালাতের মাঝে বেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে যেয়ে দু'আ করার জন্য তার নিকট আবেদন করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অবস্থাটি ছিল দু'আর অবস্থা। যদি ব্যক্তিসত্ত্বা ও সম্মানের অসীলাহ্ ধরার অবস্থা হতো তাহলে তাদের জন্য ঘরে বসে রাসূল (সাঃ)-এর অসীলাহ্ ধারণ করা বেশী উপযুক্ত ছিল। কারণ উর্ধতন বন্ধুর (আল্লাহ্) সান্নিধ্যে গমণের ফলে তাঁর (রাসূলের) সম্মান ও মর্যাদা পরিবর্তন হয়নি। উমার (রাঃ) ও সাহাবাগণ জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছেন যা ইনতিকালের পূর্বের অবস্থার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন তখন তারা নবী (সাঃ)-এর নিকট আসতেন এবং তাঁর নিকট দু'আ তলব করতেন। কিন্তু মৃত্যুর পর বারযাখী[৫০] জীবনে অবস্থান করছেন, যে জীবনের প্রকৃতি ও ধরণ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। আর তা দুন্ইয়াবী জীবন ও তাঁর অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

(৫) এরূপ আমল ও আচরণ কতিপয় সাহাবা থেকেও প্রমাণিত। যেমন মু'আবিয়াহ কর্তৃক পরিশুদ্ধিতার প্রসিদ্ধ তাবিঈ ইয়াযীদ বিন আসওয়া (রহ) এর অসীলাহ্ গ্রহণ করা। অনুরূপভাবে যাহ্হাক ও ইয়াযীদ বিন আসওয়াদের সাথে আচরণ করেছিলেন। এসব আচরণ প্রমাণ করে যে, নবী (সাঃ) তিরোধানের পর সাহাবাগণ তাঁকে অসীলাহ্ হিসাবে ধারণ করেননি। বরং তারা দু'আ করতে সক্ষম জীবিত সৎ ব্যক্তিকে তালাশ করতেন এবং তাঁর নিকট আল্লাহর দরবারে দু'আ করার জন্য আবেদন করতেন। যদি

---

৫০. মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের দিন অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সময়কে মৃত ব্যক্তিদের ব্যয়যাখী জীবন বলা হয়। দুনইয়ার জীবন নিঃশেষিত হওয়ার পর থেকে বারযাখী জীবনের ধারা শুরু হয়। দুনিয়াতে সলক নবী, অলী, মুশরিক যেমন সমানভাবে দুনিয়া জীবন হারিয়ে মৃত্যুবরণ করে। তেমন সকল নবী এমনকি আমাদের নবী, অলী, মুশরিক, কাফির সবাই সমানভাবে মৃত্যুর পর আলামে বারযাখের জীবন লাভ করবে। যার কারণে মুমিন সম্প্রদায় সুখ ও নি'মাত প্রাপ্ত হয় এবং তা ভোগ করে আর কাফির, মুনাফিকরা শাস্তি ও অশান্তি ভোগ করে। তবে কুরআন হাদীসে শুধু নবীগণ ও শহীদহণের জীবিত থাকার কথা সরাসরি স্পষ্ট করে উল্লেখ হয়েছে শুধু তাদের সম্মান বুঝানোর জন্য। সাধারণ মু'মিন জীবিত থাকা বুঝানো হয়েছে অসরাসরিভাবে কবরে, জান্নাতের আবহাওয়া ও পরিবেশ লাভ করে শান্তি ও আনন্দ ভোগ করার সংবাদ দানের মাধ্যমে। কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের জীবিত থাকা বুঝানো হয়েছে কবরে কবরে জাহান্নামের আবহাওয়া ও পরিবেশ লাভ করে শাস্তি ও অশান্তি ভোগ করার সংবাদ দানের মাধ্যমে। এর পরও তাদের জীবিত থাকার সরাসরি ভাবে কুরআন হাদীসে স্বীকৃতি হয়নি আল্লাহর নিকট তাদের অসম্মানিত হওয়ার কারণে। কারণ কাফির মুশরিকরা যখন দুনিয়াতে জীবিত ছিল তখনই তাদেরকে আল্লাহ মৃত বলে উল্লেখ করেছেন। তাহলে মৃত্যুর পর কি করে তাদেরকে জীবিত করবেন? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- অর্থঃ "কি যে ব্যক্তি মৃত (কাফির) ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত (হিদায়াত দান করেছি) এবং তার জন্য নূর সৃষ্টি করেছি যার মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে বিচরণ করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে, বের হতে পারছে না।" (সূরা আনআম, আয়াত- ১২২)

ব্যক্তি সত্ত্বা ও মর্যাদা অসীলাহ গ্রহণ করা, শরীয়ত সম্মত হতো তবে সাহাবাগণ এ ধরনের অসীলাহ ধারণে সবার চেয়ে অগ্রগামী হতেন। কারণ তাঁরা ক্ষুদ্রবৃহৎ সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণে আগ্রহী ছিলেন। আর এমন কিছুর অস্তিত্ব যদি তদানিন্তনকালে থাকতো তাহলে অবশ্যই তারা তা আমাদের জন্য সংকলন করতেন।

অর্থঃ হাদীসটি আহমদ, তিরমিযী ও অপরাপরগণ উসমান বিন হানীফ থেকে বর্ণনা করেছেন, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী (সাঃ) এর নিকট এসে বলল, আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে সুস্থ করে দেন। নবী (সাঃ) বললেন, যদি তুমি চাও তবে তোমার জন্য দু'আ করবো এবং ইচ্ছা করলে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারো, আর এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর। অন্ধটি বলল, বরং আপনি তাঁর নিকট আমার জন্য দু'আ করুন। নবী (সাঃ) তাকে সুন্দরভাবে ওযু করতঃ দু'রাকাত নফল সালাত সম্পাদন করে এ দু'আটি পাঠ করতে বললেন, হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট চাই, এবং তোমার নবী তথা রহমতের নবীর অসীলাহতে তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি। হে মুহাম্মদ আমার প্রয়োজন মিটাতে আপনার অসীলাহ ধরে আল্লাহর শরণাপন্ন হলাম সুতরাং আমার প্রয়োজন মিটান হবে। হে আল্লাহ্ আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবূল কর এবং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবূল কর। অন্ধ লোকটি এরূপ করলে সুস্থ হয়ে যায়। *(হাদীসটি তিরমিযী, আহমদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।)*

ব্যক্তিসত্ত্বা ও নবী ওলীদের মান মর্যাদার অসীলাহ ধারণ বৈধ জ্ঞানকারীগণ এ হাদীসটিকে তাদের স্বপক্ষের দলীল হিসেবে মনে করে। যেহেতু অন্ধ ব্যক্তি এ ধরনের অসীলাহ ধারণ করে চক্ষু ফেরত পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের দলীল গ্রহণ ঠিক নয়। বরং এ ধরনের অসীলাহ শরীয়তসম্মত অসীলাহর প্রকারসমূহের তৃতীয় প্রকার। আর তা হচ্ছে সৎ ব্যক্তির দু'আর অসীলাহ। তা ছাড়া উক্ত হাদীসের মাধ্যমে তাদের দলীল গ্রহণ করা প্রসঙ্গ নিম্নরূপ ভাষায় পর্যালোচনা করা সম্ভব।

প্রথমতঃ অন্ধ ব্যক্তি তো নবী (সাঃ)-এর নিকট এসেছিল তার নিকট দু'আ তলবের জন্য। আর তার এই বাণী থেকে সুস্পষ্ট "আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট নবী (সাঃ)-এর দু'আর অসীলাহ গ্রহণ করেছিল। কারণ সে জানতো যে, আল্লাহর নিকট তাঁর দু'আ গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে অন্যের দু'আ অপেক্ষা অধিক আশ্বস্তপূর্ণ। কারণ যদি সে ব্যক্তির উদ্দেশ্য তার ব্যক্তিসত্ত্বা বা মান-মর্যাদার অসীলাহ গ্রহণ করা হতো তাহলে তার পক্ষে বাড়ীতে বসে বসে এ অসীলাহ ধারণ করা বেশী উত্তম হতো। কিন্তু সে ব্যক্তি সশরীরে নবীর নিকটে এসে তার নিকট দু'আ তলব করেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ নবী (সাঃ) তাকে উত্তম পন্থা গ্রহণের উপদেশ দানের পর তার জন্য দু'আ করার অ'দাহ দিয়েছিলেন। তাঁর বাণী-

অর্থঃ "যদি তুমি চাও তবে তোমার জন্য দু'আ করবো এবং ইচ্ছা করলে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারো। আর এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।"

তৃতীয়তঃ অন্ধ ব্যক্তির দু'আর ব্যাপারে পিড়াপীড়ি করা। সে বলেছিল, "বরং আপনি তার নিকট দু'আই করুন।" এ কথার দাবী এটাই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জন্য দু'আ করেছিলেন, কারণ তিনি অ'দাহ পূরণকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। অতএব, যেহেতু তার ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে দু'আর অ'দাহ করেছিলেন, কাজেই দু'আ অসীলাহ ধরাই সঙ্গতিপূর্ণ যেমন ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

চতুর্থতঃ নবী (সাঃ) তাকে এমন এক পন্থার প্রতি দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে সৎকর্ম ও দু'আর সমন্বয় সাধন করা। তাকে ওযু করে সালাত সম্পাদনোত্তর দু'আ করার।

পঞ্চমতঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে দু'আটি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাতে এ কথাও শিখিয়েছিলেন "----" এমন শব্দকে নবী (সাঃ)-এর ব্যক্তি সত্ত্বা বা তার মান মর্যাদার বা তার অধিকারের দোহাই-এ ব্যবহার করা অসম্ভব। কারণ বাক্যটির অর্থ "হে আল্লাহ্ আমার ব্যাপারে তুমি তার সুপারিশ কবুল কর। অর্থাৎ আমার চক্ষু ফেরত দেয়ার ব্যাপারে তার দু'আ কবুল কর। শাফায়াত (সুপারিশ) এর আভিধানিক অর্থ দু'আ বা প্রার্থনা।

ষষ্ঠতঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে দু'আটি অন্ধ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাতে এটা বলতেও শিখিয়েছিলেন, "তাঁর ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল কর।" অর্থাৎ আমার চক্ষু ফেরত দেয়ার ব্যাপারে তার দু'আ কবুল করার জন্য আমার সুপারিশ কবুল কর। উপরোক্ত বাক্য থেকে উল্লেখিত অর্থ ছাড়া আর কোন অর্থ হতে পারেনা।

এ কারণেই বিরোধী ভাইগণ এ বাক্যটি থেকে এড়িয়ে যেয়ে থাকেন। তাদের কিতাবে উল্লেখ করেন না। কেননা তারা জানেন যে, এটি তাদের গৃহীত মতকে ভেঙ্গে ফেলবে।

সপ্তমতঃ এ হাদীসটি উলামাগণ নবী (সাঃ)-এর মু'জিযাহ গৃহীত দু'আর এবং তার দু'আর বদৌলতে যে সকল অলৌকিক বিষয় ও রোগ নিরাময় হওয়া প্রকাশিত হয়েছে তার ভিতর গণ্য করেছেন। নবী (সাঃ) অন্ধ ব্যক্তিটির জন্য দু'আ করার ফলে আল্লাহ্ তার চক্ষু ফেরত দিয়েছিলেন। গ্রন্থ রচনাকারীগণ এ হাদীসটিকে নবুওত প্রমাণকারী প্রমাণাদির ভিতর উল্লেখ করেছেন। যেমন- বায়হাকী ও অপরাপরগণ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্ধ ব্যক্তিটি আরোগ্য লাভ করার অন্তর্নিহিত কারণ ও ভেদ হলো নবী (সাঃ)-এর দু'আ। একথার সমর্থন এভাবেও পাওয়া যায় যে, যদি নবীর দু'আ ব্যতিরেকে শুধু অন্ধ ব্যক্তিটির দু'আই আরোগ্যের ভেদ হতো তাহলে অন্ধদের যেকেউ আল্লাহর জন্য খাঁটি চিত্তে তার প্রতি ধাবমান অবস্থায় দু'আ করতো সেই আরোগ্যপ্রাপ্ত হতো, বরং কমপক্ষে তাদের একজন হলেও আরোগ্য প্রাপ্ত হতো। অথচ এমনটি ঘটার প্রমাণ নেই। সম্ভবত ভবিষ্যতেও এমনটি

ঘটবেনা। বিবাধীগণের অন্ধব্যক্তির হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণের বিষয়টি পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিভাত হলো যে, হাদীসে বর্ণিত অবস্থানটি আদ্যপান্ত দুআ ও সৎকর্মের অবস্থান। যা একজন দু'আ কারী কায়েম করে থাকে। তদুপরী বিষয়টি হচ্ছে নবুওত প্রমাণকারী দলীলাদীর একটি দলীল যেমনটি ইতিপূর্বে ব্যক্ত কর হয়েছে।

দ্বিতীয় সংশয়ঃ

বিরোধীগণ ব্যক্তি সত্ত্বার অসীলাহ গ্রহণ করার বৈধতার স্বপক্ষে বেশ কিছু দুর্বল (অশুদ্ধ) ও বানোয়াট বা জাল হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকেন। দলীল গুলির অগ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে তার দূর্বল ও জাল হওয়াই যথেষ্ট। অচিরেই আমরা সে সকল হাদীসের কিছু অংশ আলোচনা করবো সংক্ষিপ্তভাবে তার দুর্বল হওয়ার কারণ উল্লেখ পূর্বক।

(১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীদ- "হে আল্লাহ্ তোমার প্রতি প্রার্থনাকারীদের অধিকারের অসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি।" *(হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও ইবন মাজাহ)*

এ হাদীসটি অশুদ্ধ কারণ, এটি আত্বিয়াহ্ আউফী থেকে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আত্বিয়াহ দূর্বল এটা বলেছেন নববী তার আযকার গ্রন্থে। ইবনু তাইমিয়াহ তার "আল ক্বাইদাতুল জালীলাহ্" গ্রন্থে, যাহাবী তার মীযান বরং তিনি যুআ'ফা গ্রন্থে সকলের ঐক্যমতে দূর্বল বলেছেন।

হায়সামী মাজ্‌মাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থের একাধিক স্থলে তাকে দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

(২) "হাদীসটি হাকিম উদ্ধৃত করেছেন। উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন আদম (আঃ) ভুলে পতিত হলেন, তখন বললেন হে আল্লাহ্ আমি মুহাম্মদ (সাঃ) এর অধিকারের অসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যাতে আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ্ বললেন, হে আদম! কি করে তুমি মুহাম্মদকে চিনলে অথচ আমি এখনো তাকে সৃষ্টিই করিনি। আদম (আঃ) বললেন হে আমার প্রতিপালক আপনি যখন সহস্তে আমাকে সৃষ্টি করলেন এবং আমার ভিতর আপনার পক্ষ থেকে রূহ প্রদান করলেন তখন আমি মাথা উত্তোলন করে আরশের স্তম্ভগুলিতে লিখিত দেখলাম "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল। তাতে আমি বুঝেছিলাম যে, আপনার নামের সাথে যাকে সংযুক্ত করেছেন নিশ্চয় তিনি আপনার নিকট সৃষ্টির ভিতর সবচেয়ে প্রিয়তম। আল্লাহ্ বললেন, যাও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আর মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য না থাকলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না। হাদীসটি হাকিম তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি জাল বানোয়াট, যেমনটি যাহাবী হাকিমের দ্বিমত পোষণ করে পর্যালোচনায় বলেছেন "বরং বানোয়াট"। হাদীসটির বর্ণনা সূত্রে আব্দুর রহমান অতি হীন, এবং আব্দুল্লাহ বিন আসলাম আল-ফিহ্‌রীকে জানি না, সে কে? আরো রয়েছে এর সূত্রে আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন রশীদ। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার বলেছেন ইবনে হিব্বান তাকে হাদীস জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লাইছু ও মালিক এর বরাত দিয়ে হাদীস জাল করতেন। আরো রয়েছে ইবনু লাহীআহ যার হাদীস লিখাই হালাল নয়। *(পর্যালোচনাটি দেখুন লিসানুল মীযান- ৩/৩৬০)*

(৩) তাদের কথিত হাদীস; নবী (সাঃ) বলেছেন,

অর্থঃ "তোমরা আমার সম্মানের অসীলাহ ধারণ কর। কারণ আমার সম্মান আল্লাহ্‌র নিকট বিরাট বিষয়। এ হাদীসটি বানোয়াট, হাদীসের কোন গ্রন্থে এর কোন ভিত্তি নেই, এটা কবর পূজারী ও বিদআতীদের লিখিত বিভিন্ন পুস্তিকাদিতে পাওয়া যায়।[৫১] এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূল (সাঃ) এর মান-মর্যাদা সুমহান, বরং তিনি সমস্ত সৃষ্টি কুলের ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। যেমন তিনি নিজেও বলেছেন- অর্থঃ "আমি আদম সন্তানের সরদার এটা অহংকারবশত নয় (বরং প্রকৃত সত্য কথা) হাদীসটি তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।

এতদসত্ত্বেও তিনি আমাদের জন্য এ প্রকার অসীলাহ্ গ্রহণ করা বৈধ করেননি এটাই উল্লিখিত হাদীসকে বাতিল প্রমাণ করে। তারা তাদের ভ্রান্ত মতের সমর্থের আরো বেশ কিছু জাল হাদীছের অবতারণা করে থাকে, এ বিষয়ে আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি নিস্প্রয়োজন মনে করছি। ঐ সমস্ত হাদীসে সেই বিষয় আলোচিত হয়েছে। অতএব, স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ব্যক্তি সত্ত্বার অসীলাহ গ্রহণ করার ব্যাপারে একটিও নির্ভযোগ্য হাদীছ নেই।

---

৫১. *আরো পাওয়া যাবে জাল হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে। আর জাল হাদীসের গ্রন্থ অনেক। এ যাবৎ আমার অনুসন্ধানে প্রায় ৩০ খানা কিতাবের নাম পেয়েছি। যার চার পাঁচ খানা অমার গৃহে মওজুদ রয়েছে।- অনুবাদক*

তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়ার অর্থ তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করা

প্রথম প্রমাণঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে, আমরা সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে (তার প্রতিও ঈমান এনেছি) তারা বিবাদ পূর্ণ বিষয়কে (মীমাংসার জন্য) তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়; অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাকে (তাগুতকে) মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়।" *(আন নিসাঃ ৬০)*

আয়াতের প্রথম প্রামাণ্য দিকঃ "ইবাদত" ক্রিয়ার পর যদি মূর্তী অথবা প্রতিমা কিংবা তাগুতের উল্লেখ আসে, এরপর যদি তাগুতকে অস্বীকার করা এবং তা থেকে নিরাপদে থাকার নির্দেশ আসে, তাহলে উক্ত ক্রিয়াটি আল্লাহ তায়ালার জন্য খাঁটি এবং খালেস ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে এবং এই ইবাদতকে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করলে (ইবাদত কারী) শিরকে আকবর অর্থাৎ জঘণ্য শিরককে পতিত হবে।

শাইখ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ আল শাইখ তাঁর ((تيسير العزيز الحميد নামক গ্রন্থের ৪১৯ পৃষ্ঠায় বলেনঃ এ আয়াতটির মধ্যে কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়ার কাজটি পরিত্যাগ করা ফরজ এবং যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালার জন্য যাবে সে মুমিন তো নয়ই, এমনকি সে মুসলমানও নয়।

আয়াতের দ্বিতীয় প্রামাণ্য দিকঃ যে ব্যক্তি বিচার ফয়সালা তাগুতের কাছে প্রার্থনা করলো, সে তাগুতকে অস্বীকার করতে পারলোনা। আর যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করতে পারলোনা, সে মূলতঃ তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করলো। আল্লামা জামালউদ্দিন আল-কাসেমী তাঁর বিখ্যাত মাহাসিনুত্তাউইল ((محاسن التاويل নামক তাফসীর গ্রন্থে الم تر الى الذين يزعمون আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেনঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ

"তারা চায় বিচার ফয়সালা তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে, অথচ তাকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ হয়েছে।" তাগুতের নিকট বিচার ফয়সালা চাওয়াকে তাগুতের প্রতি ঈমান পোষন হিসেবে গন্য করা হয়েছে। আর এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তাগুতের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থই আল্লাহকে অস্বীকার করা, ঠিক যেমনটি তাগুতকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল- শাইখ فمن يكفر بالطاغوت আল্লাহর এ বাণী উল্লেখ করে বলেনঃ তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালার চাওয়ার অর্থই হচ্ছে তাগুতের প্রতি ঈমান আনা। *(ফাতহুল মাজিদ)*

আয়াতের তৃতীয় প্রামাণ্য দিকঃ

وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا

"শয়তান তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করে গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে চায়।" আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, শিরকে আকবার (বড় শিরক) হচ্ছে জঘণ্যতম গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতা এর প্রমাণ

وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে সে সুদূর গোমরাহীতে পতিত হয়।" *(আন্ নিসাঃ ১১৬)*

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ

"সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যে তার অপকার করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম পথ ভ্রষ্টতা।" *(হজ্জঃ১২)*

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দোয়া করলো, সে মারাত্মক গোমরাহীতে নিমজ্জিত হলো। কেননা, গাইরুল্লার কাছে দোয়া করা জঘণ্য শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত (বা বিধান) ছাড়া অন্য কোনো বিধানের মধ্যে বিচার ফয়সালা প্রার্থনা করলো, সে মারাত্মক গোমরাহীতে পতিত হলো। কেননা আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে বিচার ফয়সালা চাওয়া বড় বা মারাত্মক শিরকের অন্তর্ভূক্ত ।

দ্বিতীয় প্রমাণঃ

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

“বিধান দেয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর । তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করোনা। এটাই সঠিক দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।” *(সূরাঃ ইউসুফঃ ৪০)*

আয়াতের প্রামাণ্য দিকঃ আল্লাহ তায়ালা একটি ভূমিকা পেশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ إن الحكم إلا لـ অর্থাৎ বিধান দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। বিধান ও আইনের উপর আল্লাহর বিধানই সবচেয়ে শক্তিশালী। বিধান রচনা রুবুবিয়্যাতের অন্তর্ভূক্ত। কেননা বিধান রচনা ও বিধান জারি করা আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত কার্যাবলীর সাথে বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত তাই আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি ঈমানের অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে, উলুহিয়্যাত (ইবাদত) সংক্রান্ত তাওহীদ। সৃষ্টির অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকেই রিযিকের ব্যবস্থা করা, কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধন, এগুলো আল্লাহর কার্যবলীর অন্তর্ভূক্ত। তাই রিযিক চাওয়া, সাহায্য কামনার মতো ইবাদত গুলো তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। কেননা তিনিই কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনের একমাত্র মালিক। বান্দা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে বলে, তিনিই রিযিক দান করেন এবং বিপদ গ্রসতকে সাহায্য করেন। কিন্তু সে যদি একজন মুর্খ বেদুঈন অথবা জিলানীর (আঃ কাদের জিলানী) কাছে দোয়া করে, তার কাছে সাহায্য চায়, তাহলে তার ঈমান এবং সে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের যে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছে একমাত্র তিনিই রিযিক দান করেন, তিনি কল্যাণ অকল্যাণের মালিক; তার কোনো কাজেই আসবেনা। কারণ, দোয়া করা ও সাহায্য প্রার্থনার মতো ইবাদতকে সে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করার কারণে আল্লাহর উলুহিয়্যাতের ব্যাপারে সে মুশরিক হিসেবে গণ্য হয়েছে । এমনিভাবে যে ব্যক্তির ঈমান আছে এবং একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ এক এবং তিনিই বিধান দিবেন, তিনিই সকল বিধানের উৎস, তার এ ঈমানের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে, আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি ঈমান পোষন করা, অর্থাৎ আল্লাহ মহান বিচারক এ বিশ্বাস রাখা। তাই মানুষের ঈমানের দাবী হচ্ছে আল্লাহর শরীয়ত ও বিধানের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়া। তাই যখনই মানুষ আল্লাহর শরীয়ত ও বিধান বাদ দিয়ে বিচার ফয়সালা কামনা করে, তখনই সে (আল্লাহর) উলুহিয়্যাতের মধ্যে শিরক করে। এমতাবস্থায় তার ঈমান এবং আল্লাহই যে মহান বিচারক (আল্লাহর) রুবুবিয়্যাতের এ স্বীকৃতি তার কোন কাজে আসেনা, কেননা আল্লাহ তায়ালারও কর্ম আছে, বান্দার ও কর্ম আছে। আল্লাহর কর্ম হচ্ছে বিধান ও আইন রচনা করা, আর বান্দার কর্ম হচ্ছে যিনি আইন ও বিধান রচনা করেন তাঁর শরীয়ার (বিধানের) কাছে বিচার ফয়সালা প্রার্থনা করা। এমনি ভাবে আল্লাহর কর্ম হচ্ছে সৃষ্টির অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকেই তার রিযিকের ব্যবস্থা করা, আর বান্দার কর্ম হচ্ছে রিযিক দাতার কাছে রিযিকের জন্য দোয়া করা । অতএব আল্লাহ তায়ালাই রিযিক দান করেন এ বিশ্বাসের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে, তাঁরই কাছে রিযিক চেয়ে দোয়া নামক ইবাদত করা। এ দোয়া নামক ইবাদত গাইরুল্লাহর কাছে করলে তা শিরকে আকবার (বড় ধরনের শিরক) হিসেবে গণ্য হবে। আবার আল্লাহ তায়ালাই বিধান দাতা এ বিশ্বাসের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে, বিচার ফয়সালা চাওয়া নামক ইবাদতও তাঁরই উদ্দেশ্যে করা। এ ইবাদত যদি আল্লাহর আইন ও শরীয়তকে বাদ দিয়ে করা হয়, তাহলেও এটা হবে শিরককে আকবার বা বড় ধরনের শিরক। একজন মুওয়াহহিদ (আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী) মুসলমানের কাছে উপরোক্ত দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনো পাথর্ক্য নেই। এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত إن الحكم إلا لـ (বিধান দানের আধিকার একমাত্র আল্লাহর) আল্লাহ এ বাণীর মধ্যে নিহিত রয়েছে । এ আয়াতে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের সাথে أمر ان لا تعبدوا إلا إياه (একমাত্র তাঁরই ইবাদত তোমরা করো, এ নির্দেশ দিয়েছেন) এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহর উলূহিয়্যাতকে জুড়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতের অর্থেও কাছা-কাছি একটি আয়াতে বলেছেনঃ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ
أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

“আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা এমন বস্তুর ইবাদত করে, যা তাদের অপকারও করতে পারেনা উপকারও কারতে পারেনা। এবং তারা বলে; এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয় অবহিত করতে চাও, আসমান ও যমীনের মাঝে যে বিষয়ে তিনি অবহিত নন। তিনি মহান ও পুতঃপবিত্র সে সব বিষয় থেকে যাকে তোমরা শরীক করছো।” *(সূরা ইউনুস ১০ঃ১৮)*

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئًا

“তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করে যে তাদের জন্য ভূমন্ডল ও নভোমন্ডল থেকে সামান্য রোযী দেয়ারও অধিকার রাখেনা এবং শক্তিও রাখে না।” *(নাহলঃ৭৩)*

আল্লাহ তায়ালার কার্যবলীর মধ্যে রয়েছে রিযিক দান করা। অর্থাৎ একমাত্র তিনিই রিযিক দান করেন । তাই আল্লাহর জন্য এ ক্ষেত্রে যে ইবাদত নিবেদন করতে হবে তা হচ্ছে, রিযিক চেয়ে তাঁর কাছে দোয়া করা। আল্লাহ তায়ালার কার্যবলীর মধ্যে রয়েছে মঙ্গল-অমঙ্গল সাধন করা। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্য যে ইবাদত নিবেদন করতে হবে তা হচ্ছে, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া। আল্লাহ তায়ালার কার্যবলীর মধ্যে আরো একটি কাজ হচ্ছে, আইন বিধান দান করা। এ ক্ষেত্রে তাঁর জন্য যে ইবাদত নিবেদন করতে হবে তা হচ্ছে, তাঁর আইন ও বিধানের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া।

বর্তমান যমানায় অনেক মানুষের ওপরই এসব সত্যও ক্লান্তিকর বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। শাইখ আবদুর রহমান আস্ সা'দী কিতাবুত্তাওহীদের উপর লেখা তাঁর বই القول السديد এ الم تر الى الذين يزعمون এর ব্যাখা প্রসংগে বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাছুলকে বাদ দিয়ে বিচার ফয়সালা (অন্য কোনো বিধান বা ব্যক্তির কাছে) চায়, তাহলে সে ঐ প্রার্থীত ব্যক্তি বা মতাদর্শকে রব বানিয়ে নিয়েছে এবং তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চেয়েছে ।

তৃতীয় প্রমাণঃ

ছহীহাইন (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমের) হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সঃ) রাতের (নফল) নামাজে এ দোয়া পড়তেন

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤلك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفرلى ما قدمت و ماأخرت وما أسررت وما أعلنت انت إلهى لا إله إلا انت

“হে আল্লাহ সকল প্রশংসা তোমার, তুমি নুর (আলো) আকাশ ও যমীনের এবং আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুর সকল প্রশংসা তোমার, তুমি আকাশ, যমীন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর ধারক, সকল প্রশংসা তোমার, তুমি সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাথে সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, কিয়ামত সত্য, মুহাম্মদ (সঃ) সত্য । হে আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টির জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি (আত্মসমর্পন করেছি) তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার ওপর ভরসা করেছি, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি, তোমার জন্য বিবাদ করেছি, তোমার কাছে বিচার চেয়েছি, অতএব, আমি যা পেশ করতে পেরেছি আর যা পারি নি (ভালো মন্দ) তার সবই ক্ষমা করে দাও। ক্ষমা করো আমি যা গোপন রেখেছি আর যা প্রকাশ করেছি। তুমিই আমার ইলাহ, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।”

এ দোয়া উল্লেখ করে ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেনঃ আল্লাহর দিকে উসিলা করা হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ কীর্তনের মাধ্যমে আল্লাহরই জন্য উবুদিয়্যাত (ইবাদত) কে নিবেদন করার মাধ্যমে। ইবনূল কায়্যিম এ দোয়ার তিনটি বিষয়ের উল্লোখ করেছেন। আল্লাহর দিকে উসিলা করা, তাঁর প্রশংসা ও গুণ কীর্তনের দ্বারা, অতঃপর সমস্ত উবুদিয়্যাত (ইবাদত) কে আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদনের দ্বারা। আর সে উবুদিয়্যাত হচ্ছে তাওয়াক্কুল, (ভরসা করা) ইনাবত, (তাওবার মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করা) এবং বিচার ফয়সালা চাওয়া। এরপরই তাঁর কাছে মাগফিরাত কামনা করা হয়েছে। অতএব এখানে উদ্ধৃত দোয়া এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিচার-ফয়সালা চাওয়ার কর্মটি তাওয়াক্কুল এবং ইনাবতের (তাওবার মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করা) মতোই একটি ইবাদত ।

বিবদমান দুব্যক্তির বিচারক নিয়োগের বৈধতা এবং কোনো শহরে শরীয়তের বিচারক না পাওয়া গেলে করণীয় সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামতঃ

আল খাতাবী (রহঃ) তাঁর সুনানে আবী দাউদ নামক গ্রন্থে সফরের সময় আমীর নিয়োগ সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

إذا خرج ثلاثة فى سفر فليأمروا أحدهم - “তিনজন সফরে বের হলে তাদের একজনকে তারা যেনো আমীর ঠিক করে নেয়।”

রাসূল (সঃ) তাদেরকে আমীর ঠিক করে নেয়ার নির্দেশ এজন্য দিয়েছেন যে, তারা যেনো ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং মতামতের ক্ষেত্রে তারা যেনো বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। তারা যেনো মতানৈক্যের মধ্যে পতিত না হয়, আর পরস্পর কঠোরতা অবলম্বন না করে। এ হাদীসে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিবাদমান দুব্যক্তি যদি কোনো সমস্যার মীমংসার জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে বিচারক মেনে নেয় এবং সে যদি হক বিচার করে তাহলে তার রায় কার্যকর হবে। *(মাআলিমুস সুনান)*

আবু বকর বিন আল-মুনযির আন-নাইসাবুরী তাঁর “আল ইজমা, নামক কিতাবে বলেনঃ ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, (নিয়োগকৃত সরকারী) কাজী (বিচারক) ব্যতীত অন্য কাজী যদি কোনো ফয়সালা দেয়, আর তা যদি শরীয়ত সম্মত হয় তাহলে তা জায়েয (বৈধ) *(কিতাবুল ইজমা)*

আবু বকর বিন আল-মুনযির অন্য কাজী বলতে দারুল ইসলামের নিয়োগ প্রাপ্ত বা বিচারের কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত কাজী বা বিচারককে বুঝানো হয়েছে। এবং যদি শরীয়ত সম্মত হয় এ কথার দ্বারা ইসলামী শরীয়তকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম ইবনে কুদামা তাঁর 'আল মুগনী' নামক গ্রন্থে বলেনঃ যদি বিবদমান দু'ব্যক্তি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে বিচার নিয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি যদি দু'জনের মধ্যে বিচার যোগ্য বিষয়ে সন্তোষ জনকভাবে মীমাংসা করে দেয়, তাহলে তার বিচার করা জায়েয এবং তার রায় বিচার প্রার্থী দু'ব্যক্তির মধ্যে কার্যকর হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এ মতই ব্যক্ত করেছেন। ইমাম শাফী (রহঃ) এর এ ব্যাপারে দু'টি মতামত ব্যক্ত করেছেন। একটি হচ্ছে এই যে, এখানে বিচার প্রার্থী দু'জনের সন্তুষ্টি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির ফয়সালা দু'জনের জন্য অপরিহার্য নয়। কেননা ফয়সালা তখনই অপরিহার্য হবে যখন এর ব্যাপারে সে রাজী হবে। আর বিচার-ফয়সালা সম্পর্কে জানার পরই সন্তুষ্টি সম্ভব হয়। আর আমাদের কাছে আবু শুরাইহের বর্ণনাই গ্রহণ যোগ্য প্রমাণ। আর তা হচ্ছে রাসুল (সঃ) আবু শুরাইহকে লক্ষ্য করে বললেনঃ আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন ন্যায়ের আধার অতএব "আবুল হাকাম" উপনামে কেনো তোমাকে ডাকা হয়? (অর্থাৎ আবুল হাকাম উপনাম কেনো তুমি গ্রহণ করেছো) শুরাইহ বললোঃ আমার জাতি তাদের বিরোধপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসার জন্য আমার কাছে আসে। আমি তাদের মধ্যে এমনভাবে ফয়সালা করে দেই যে, বিবদমান উভয় পক্ষই তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। রাসুল (সঃ) তখন বললে এটা কতোই না ভাল কাজ। আচ্ছা, তোমার বড় ছেলের নাম কি? সে বললোঃ শুরাইহ রাসুল (সঃ) বললেন, অতএব তুমি আবু (শুরাইহ) শুরাইহের পিতা। *(নাসায়ী)*

হাদীসে বর্নিত আছে, রাসুল (সঃ) এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি বিবদমান দু'জনের মধ্যে বিচার করলো, এবং এতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হলো কিন্তু যদি বিচারক ইনসাফ না করে তবে সে হবে অভিশপ্ত। যদি বিচারকের বিচার উভয়ের জন্য অপরিহার্য না হতো তাহলে বিচারকের সাথে এ বদনাম সংযুক্ত হতো। হযরত ওমর (রাঃ) এবং উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হযরত যায়েদের কাছে বিচার প্রার্থী হয়ে ছিলেন। ইযরত ওমর (রাঃ) আরাবি (বেদুইনের) বিরুদ্ধে দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে শুরাইহের কাছে বিচার প্রার্থী হয়েছিলেন। হযরত ওসমান এবং তালহা (রাঃ) হযরত জবাইর বিন মাতআমের কাছে বিচার প্রার্থী হয়েছিলেন অথচ তারা কেউই কাজী বা বিচারক ছিলেন না।

বিচার ফায়সালার ব্যাপারে ভ্রান্ত সংশয় এবং এর নিরসন

প্রথম সংশয়ঃ এটা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ সংশয়। আর তা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির কথা, যে বলে যে, এ কাজটি তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া নয়। বরং এটা হচ্ছে যে অধিকার খুব শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে, তার জন্য যাওয়া এবং চাওয়া।

জবাবঃ আমরা বলতে চাই যে, মানুষ কখনো এমন কথা বলে, যা বিবেক সম্মত (বা যথার্থ) নয়। যদি এ কথা সমুদ্রের পানির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তা মিশ্রিত হয়ে যায়। এ ধরনের কথা রাসূল (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, যা তিরমিজি ও আবু দাউদেও এসেছে। এধরণের কথা মূলতঃ আল্লাহর দ্বীনের সাথে, এবং আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ জিনিসের সাথে বাহানা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটাতো সকল জ্ঞানী ব্যক্তিরই জানা যে, নামের পরিবর্তনের কারনে কোন জিনিসের হাকিকত বা আসল নষ্ট হয়ে যায়না। আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা বাতিন বলেনঃ যে ব্যক্তি যে কোনো ধরনের ইবাদত গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করলো সে মুলতঃ ঐ গাইরুল্লাহর ইবাদত করলো, তাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করলো এবং আল্লাহর সাথে তার খাস অধিকারের ক্ষেত্রে গাইরুল্লাহকে শরীক করলো, যদিও সে উলুহিয়্যাত, ইবাদত এবং শিরকের দিক থেকে তার কাজের নামকরণ থেকে দুরে ছিলো। জ্ঞান ও বিবেক সম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত আছেন যে, জিনিসের হাকিকত (আসলরূপ) নাম পরিবর্তনের দ্বারা পরিবর্তিত হয়না। (*মাজমুআতুত তাওহীদ আর রিসালাত আস সাবেয়াহ্*)

কোনো মুসলমানই এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারেনা যে, বিচার-ফায়সালা চাওয়ার অর্থ হচ্ছে বিবাদ মীমাংসা করার জন্য বিবাদপূর্ণ বিষয়টি যার কাছে মীমাংসিত হবে তার কাছে প্রত্যার্পন করা। এ বিষয়টি অন্তর দিয়ে সমাধা হয়না, এর জন্য শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগাতে হয় (অর্থাৎ এটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ, অন্তরের নয়)। অতএব যারা বলে যে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার বিষয়টিও যতক্ষণ পর্যন্ত তাগুতের নিকট বিচার-ফয়সালার জন্য যাওয়ার নিয়ত না করবে এবং তাগুতের বিধান আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম বলে বিশ্বাস না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার অপরাধে অপরাধী হবেনা, তাদের কথা আসলে ঐ ব্যক্তির মতোই যে বলেঃ সেজদা করার কাজটি ততক্ষণ পর্যন্ত শেরেকী সেজদা হিসেবে গণ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেজদাকারী ব্যক্তি সেজদা গ্রহনকারী ব্যাক্তিকে সেজদার অধিকারী বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস না করবে। ইমাম ইবনে কায়্যিম এ ধরনের কথার জবাব দিয়েছেন। একথাটা ঠিক ঐ ব্যক্তির মতোই যে ব্যক্তি এ দাবী করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতকারী ইবাদতকে ইবাদত হিসেবে বিশ্বাস না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। তিনি বলেনঃ পীরের উদ্দেশ্যে মুরীদের সেজদা শিরকের অন্তর্ভূক্ত। সেজদাকারী এবং সেজদা গ্রহণকারী উভয়ের পক্ষ থেকেই এটা শিরক। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তারা বলেঃ এটা আসলে সেজদা নয়, এটা হচ্ছে পীরের সামনে তারই সম্মান রক্ষার্থে এবং বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র মস্তক অবনত করা। তাদেরকে একথা বলা হচ্ছে যে, আপনারা যদিও এর নাম যা দেয়ার তাই দিয়েছেন। সেজদার হাকিকত বা মূলকথা হচ্ছে সেজদা গ্রহণকারীর সামনে মস্তক অবনত করা। (*আল মুদারেজ৩৭৪/১*)

অতঃপর আমরা বলতে চাই যে, রাসূল (সঃ) থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা কারো কাছে সমস্যা বা প্রশ্ন হয়ে দাড়াতে পারে, আর তা হচ্ছে রাসূল (সঃ) মাতআম বিন আদীর (যে একজন মুশরিক ছিলো) আশ্রয়ে গিয়েছিলেন। (অর্থাৎ নবী হয়ে কি ভাবে তিনি একজন মুশরিকের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন?) এর জবাবে আমরা বলবো। যদি একজন মানুষ বিচার-ফয়সালা চাওয়ার অর্থ কি তা বুঝতে পারে তাহলে এ ধরনের প্রশ্ন তার কাছে উদিত হতে পারতো না। ইতিপূর্বে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার যা অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে যার কাছে বিবাদের মীমাংসা হবে তার কাছে বিচার-ফায়সালার বিষয়টি প্রত্যার্পন করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

"তোমরা যদি কোনো বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়, তাহলে মীমাংসার জন্য বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) দিকে প্রত্যার্পন করো, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হও।" (*আন-নিসাঃ ৫৯*)

এটাই হচ্ছে বিচার ফয়সালা চাওয়ার স্বরূপ। এর উদাহরণ হচ্ছে দু'জন লোকের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সংঘটিত হওয়া এবং দু'জনের মধ্যে বিবাদপূর্ণ বিষয়টিকে ফায়সালা করে দেয়ার জন্য উভয়েই মীমাংসাকারীর কাছে যাওয়া। যদি এ বিচার প্রার্থনা তাগুতের কাছে হয়ে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে এটা কুফরী এবং বড় ধরণের শিরক। আর কোনো কাফেরের কাছে (আদর্শকে জলাঞ্জলী না দিয়ে নিরাপত্তার প্রয়োজনে) আশ্রয় চাওয়া হারাম, এর কোনো দলীল বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ ধরণের আশ্রয় হযরত আবু বকর (রাঃ) ইবনুদ্দাগনার কাছে চেয়েছিলেন এবং ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের মুশরিকদের জুলুম ও নির্যাতনের ভয়ে সাহাবায়ে কেরাম খৃষ্টান রাজা নাজ্জাসীর আশ্রয়ে গিয়েছিলেন।

আমাদের কাছে যারা হিলফুল ফুজুলের ঘটনাকে (যা জাহেলী যুগে ইবনুজুদআনের সংঘঠিত হয়েছিলো) তাগুতী বিচারালয়ের কাছে যাওয়া এবং তাগুতী বিধানের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার দলীল হিসেবে পেশ করার ক্ষেত্রে তাদের ভুলটা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিয়মান হচ্ছে। এ ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করার যুক্তিটি সম্পূর্নরূপে ভুল। কেননা হিলফুল ফুজুলের লোকজন (ধারক বাহকেরা) কাহান জুহাইনা এবং কাআববিন আশরাফের মতো তাগুত ছিলোনা। কাআব বিন আশরাফ ও তার সংগীরা তাগুতী বিধানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করতো। হিলফুল ফুজুলের লোকেরা ছিলো এমন মুশরিক যারা শুধুমাত্র মাজুলুম

ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য সমবেত হয়েছিলো। এটা একটি প্রশংসনীয় কাজ, এ ধরণের কাজের প্রতি ইসলাম মানুষকে উৎসাহিত করে।

আপনারা যারা এ ঘটনা থেকে প্রমাণ পেশ করতে চান, তাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই, আল্লাহর নবীর (সঃ) উপরোক্ত কথা কি কা'আব বিন আশরাফ ও কাহান জুহাইনার এবং অন্যান্য তাগুতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলতে চান? যাদের কাছে জাহেলী যুগের লোকেরা বিচার-ফয়সালা নিয়ে যেতো? আপনারা যদি বলেন, না, আমরা একথা বলতে চাইনা। তাহলে আমরা বলবোঃ কেন? এর উত্তরে আপনারা যদি বলেনঃ কারণ তারা ন্যায় বিচার করতোনা, মাজলুমের অধিকার ফিরিয়ে দিতো না, তদুপরি তারা ঘুষ গ্রহণ করতো। তখন আমরা বলবোঃ তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য এবং তাদের কাছে বিচার-ফয়সালা না চাওয়ার জন্য যখন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নির্দেশ দেয়ার সময় কি এ কথা বলেছিলেন যে তারা ন্যায় বিচার করেনা, এবং তারা ঘুষ গ্রহণ করে? নাকি কারণ হিসেবে এ কথা বলেছিলেন যে তারা হচ্ছে তাগুত, তাদেরকে অস্বীকার করা ছাড়া আর তাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া পরিত্যাগ করা ছাড়া কোন ব্যক্তির ইসলাম শুদ্ধ হবে না? এটি হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছেঃ আমরা তো ঐ সব ব্যাপারেই তাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাই, যে ব্যাপারে তারা ন্যায় বিচার করবে। জুলুমের ব্যাপার হলে আমরা বিচার চাইনা।

আমরা বলবোঃ এ পাথর্ক্যের কি প্রমাণ আপনাদের কাছে আছে? তাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাইতে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এবং এটাও বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাদের (তাগুতের) কাছে বিচার নিয়ে গেলো সে তাদেরকে (তাগুতকে) অস্বীকার করে না। এখানে আল্লাহ তায়ালা কোন ব্যক্তি ন্যায় সংক্রান্ত বিষয়ে তাগুতের কাছে বিচার চাইলো আর কোনো ব্যক্তি অন্যায়ের ব্যাপারে বিচার চাইলো, এর মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। যে ব্যক্তি হিলফুলফুজুলের ঘটনাকে দলীল হিসেবে পেশ করে, তার দলীল শুদ্ধ ও যথার্থ নয়। কেননা হিলফুলফুজুলের লোকজন তাগুত ছিলোনা। তারা তাগুতী বিধানে মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালাও করেনি। তারা ছিলো কতিপয় মুশরিক ব্যক্তি যারা শুধুমাত্র মাজলুমের সাহায্যার্থে সমবেত হয়েছিলো। এখানে আমাদেরকে অবশ্যই ঐ দু'ব্যক্তির মাঝে পাথর্ক্য করার মতো জ্ঞান থাকতে হবে, যে ব্যক্তি মর্যাদাবান ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছে যারা তাগুত নয় মাজলুমের অধিকার ফিরিয়ে দিতে সাহায্য চাওয়ার জন্য গিয়েছে, আর যে ব্যক্তি ঐ সব তাগুতী বিচারকদের কাছে-যারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং তাগুতী বিধান মোতাবেক মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করে, বিচার নিয়ে যায়। এর ফলে তাদের কাছে লোকেরা বিচার নিয়ে যায়, অতঃপর তাগুতী বিধানে তাদের বিবাদ মীমাংসা হয়। এ ধরনের কাজ কুফরী। একমাত্র জবরদস্তী মূলক অবস্থা ব্যতীত এ কাজ জায়েয নয়। আর জবরদস্তীর শিকার হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তির জীবন নিশ্চিত ভাবে হত্যা, জুলুম নির্যাতন জীবনের বিরাট ক্ষতির আশংকায় পতিত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ

"যে ব্যক্তির ওপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উম্মুক্ত করে দেয়।" *(নাহলঃ ১০৬)*

অতএব একজন মুসলমানকে এ ব্যাপারে শর্তক হতে হবে। তাড়াহুড়া করলে হবেনা, তাহলে বুঝের মধ্যে ত্রুটি থাকবে, ফলে তাকে অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলতে হবে, আর সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হতে হবে । তখন দুঃখ করলেও কোনো উপকার হবে না ।

দ্বিতীয় সংশয়ঃ ঐ সব লোকদের কথা যারা বলে যাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তারাতো তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যায়, এর কারণ হচ্ছে, তারা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলের (সঃ) ফয়সালায় সন্তুষ্ট ছিলো না, আর আমরা তো তাদের মতো নই। আমরা বিচার তাগুতের কাছে নিয়ে গেলেও আমরা তা চাইনা।

বিভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া যায়ঃ

১। আল্লাহ তায়ালা যখন বলেছেনঃ

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت **"তারা বিচার-ফয়সালার বিষয়কে তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়।"**

তখন আল্লাহ তায়ালা তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা প্রার্থনা কারীকে তাদের বলার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকে শর্ত করেননি। বরং যারা উপরোক্ত কথা বলে তারাই ইচ্ছাকে শর্ত বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যখন (তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায়) বলেছেন তখন দু'ব্যক্তি অর্থাৎ ইহুদী এবং মোনাফিকের অবস্থা বর্ণনা করছিলেন। তারা কা'ব বিন আশরাফ তথা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চেয়েছিলো কিন্তু ইহুদী কা'ব বিন আশরাফের কাছে যেতে অস্বীকার করেছিলো এ জন্য যে, সে জানতো, সে

কাব বিন আশরাফ ঘুষ খায়। অতঃপর তারা উভয়ই নবীর (সঃ) কাছে গিয়ে বিচার চাইলো। মূলকথা হলো, আল্লাহ তায়ালা যখন يريدون (তারা চায়) বলেছেন তখন এর দ্বারা তিনি ইহুদী ও মুনাফিকের চারিত্রিক অবস্থার কথা বলেছেন। এখানে ইচ্ছাকে কুফরীর জন্য শর্ত করা হয়নি। অবস্থাটা ঠিক কারো উদ্দেশ্যে যদি বলা হয়, লোকটি এমন এমন করেছে অথচ তার ইচ্ছা ছিলো এমন করার, অতএব ইচ্ছা করে কথাটা যদি এ ধরনের বাক্যে বলা হয় তার দ্বারা তখন অবস্থা বুঝানো হয়।

২। তারা বলেছে যে, তারা তাগুতের কাছে বিচারের জন্য যায়, কিন্তু এমন কাজ করতে তাদের ইচ্ছা নেই। তাদের এ কথা নিঃসন্দেহে অশূদ্ধ বা ঠিক নয়। কেননা, এমন কোনো মানুষ নেই যে, সে কোনো না কোন কাজ করবে অথচ কাজের ইচ্ছা করবেনা। এটা হতে পারেনা। কেননা ক্রিয়া কখনো ইচ্ছার সম্পৃক্ত ছাড়া সংঘটিত হয়না। তবে ইচ্ছার বিষয়টা ভিন্ন। কেননা ইচ্ছার সাথে কাজ বা ক্রিয়া কখনো সম্পৃক্ত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।সম্ভবতঃ তারা তাদের কথার দ্বারা এ কথা বুঝাতে চায় এবং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যায় বটে কিন্তু তারা এরকম হোক তা চায়না অর্থাৎ শিরকী এবং কুফরী তারা চায়না এবং তাদের উদ্দেশ্যও এটা নয়। তাদের কথা অনুযায়ী যদি এটাই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে অন্য কথা। এর জবাবে আল্লাহ চাহে তো সামনে ৬ নম্বরে বিবরণ আসছে।

৩। ইমাম আবুস সুউদ (রহঃ)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেনঃ এখানে তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাকেই খারাপ এবং বিস্ময়কর বলা হয়েছে, বিচারের ফয়সালাকে নয়; এ বিষয়ে শতর্ক করে দেয়ার জন্য যে ইচ্ছেটাই হচ্ছে, তা যে বিষয়ে ফয়সালা করা হবে তারই অংশ। তাই ইচ্ছাই না হওয়া উচিৎ। তাহলে তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তোমার কি ধারনা? (অর্থাৎ যে কাজের ইচ্ছা করাই অন্যায়, তার মূল কাজটা কত বড় অন্যায় তা ভেবে দেখতে বলা হয়েছে)

তাহলে প্রিয় পাঠক, তাঁর (ইমাম আবুস সুউদ এর) কথা ভেবে দেখুন । তিনি বলেছেনঃ তাহলে মূল বিষয় অর্থাৎ "তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া" এর ব্যাপারে তোমার কি ধারনা।

৪। উম্মতে মুসলিমা এ ব্যাপারে একমত যে ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে। যদি তা গাইরুল্লাহর জন্য হয়, তাহলে ইবাদতকারী এমন জঘণ্য মুশরিক (শিরককারী) হিসেবে গণ্য হবে যা তাকে মুসলিম উম্মাহ থেকে বের করে দিবে, চাই সে (শিরক করার) ইচ্ছা করুক বা নাই করুক, চাই এতে সে রাজী থাকুক বা নাই থাকুক। তবে যদি কেউ বাধ্য হয়ে উক্ত কাজ করে তাহলে তার ব্যাপার আলাদা।

৫। এ কথা 'অসপষ্টতা' (মুশাবাহাত) এর দৃষ্টি কোন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, আর সুস্পষ্টতার দৃষ্টি ভঙ্গি যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন পরিত্যাগ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وقد أمروا أن يكفروا به "অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে (তাগুতকে) অস্বীকার করার জন্য।"

আল্লামা শাইখ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ আল– শাইখ (রহঃ) বলেনঃ আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

وقد أمروا أن يكفرو به "অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অর্থাৎ তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য)।" তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া ঈমানের বিপরীত ও পরিপন্থী কাজ। তাই তাগুতকে অস্বীকার করা ব্যতীত ঈমান শুদ্ধ হবে না। এমনি ভাবে তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া বাদ দিতে হবে। যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করতে পারবেনা সে মুমিন আল্লাহর প্রতিও ঈমান আনতে পারবেনা। আমরা যখন মুহকাম (সুস্পষ্ট) আয়াতের মর্ম জানতে পারলাম তখন মুতাশাবিহকে (অস্পষ্ট থাকে) মুহাকামের দিকেই প্রত্যার্পন করবো। ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব কুফরীর صفات বা প্রকৃতি ও ধরণের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে তাগুতকে অস্বীকারের প্রকৃতি হচ্ছে যে গাইরুল্লাহর ইবাদত বাতিল এ বিশ্বাস থাকতে হবে। তা পরিত্যাগ করতে হবে, গাইরুল্লাহর ইবাদতকে ঘৃনা করতে হবে। গাইরুল্লাহর ইবাদতকারীদেরকে কাফের বলে গণ্য করতে হবে এবং তাদের বিরোধীতা করতে হবে। *(তাইসীরুল আজীজিল হামীদ ফি বায়ান তাওহীদ)*

মানুষ যদি গাইরুল্লাহর ইবাদত বাতিল বলে বিশ্বাস করলো, অথচ তা ত্যাগ করতে পারলো না, তাহলে সে তাগুতকে অস্বীকারকারী বলে গণ্য হবে না আর যদি গাইরুল্লাহর ইবাদতকে বাতিল বলে বিশ্বাস করলো এবং তা পরিত্যাগ করলো, কিন্তু সে গাইরুল্লাহর ইবাদতকে সে মুহাব্বত করে, এবং এর প্রতি তার কোনো ক্রোধ নেই, ক্ষোভ নেই, তাহলেও সে তাগুতকে অস্বীকার করতে পারলোনা।

৬। ইচ্ছা দ্বারা আপনারা যদি নিয়ত বুঝিয়ে থাকেন, আর কাজ বাদ দিয়ে কথা বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে এটা তো তাদের মতোই হলো, যারা কবর পূজা করে, কবর প্রদক্ষিণ করে (তাওয়াফ করে) অথচ মূখে বলেঃ হা, আমরা কবরের চারদিকে তাওয়াফ

(প্রদক্ষিন) করি এবং আমরা তাদের জন্য এ কাজ (ইবাদত)করি, তবে আমরা শিরক কখনোই চাইনা। তাওহীদে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষই জানেন যে তাদের কথা সম্পূর্ন রূপে বাতিল।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ

মোদ্দাকথা হচ্ছে, যে ব্যক্তি এমন কথা বললো বা এমন করলো যা কুফরী, সে কাফের হওয়ার ইচ্ছা না করলেও সে উক্ত কথা ও কর্মের দ্বারা কুফরী করলো। কারণ কেউ উদ্দেশ্য করে বা ইচ্ছা করে কুফরী করেনা। অর্থাৎ কাফের হওয়ার নিয়তে কেউ কুফরী করে না ইল্লা মাশা আল্লাহ। *(আচ্ছারেমু আলমাছলুল ১৮৭-১৮৮পৃঃ)*

ইমাম তাবারী (রহঃ)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا
الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

"বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দিব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? তারাই সে লোক, যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে অথচ তারা মনে করে যে তারা সঠিক কাজই করছে।" *(কাহফঃ১০৩, ১০৪)*

এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেনঃ

যারা এ কথা দাবী করে যে, ওয়াহদানিয়্যাত (আল্লাহর একত্ববাদ) সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর কুফরীর উদ্দেশ্য ছাড়া কুফরী না করলে সেটা আল্লাহকে অস্বীকার করা হবেনা, তাদের এ দাবীও যে সমপূর্ণ ভুল অত্র আয়াতটি এর সবচেয়ে বড় দলীল। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঐসব লোকদের খবর দিয়েছেন এবং গুনাগুণ (খারাপ অর্থে) বর্ণনা করেছেন যাদের সকল পার্থিব চেষ্টা সাধনা গোমরাহীতে পর্যবসিত হয়েছে, অথচ তারা কাজ করার সময় মনে করতো যে তারা খুব ভাল কাজ করছে।

হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর গ্রন্থে বলেনঃ এখানে একথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছাড়াই দ্বীন থেকে বের হয়ে যায় এবং ইসলামের ওপর অন্য কোনো দ্বীনকে প্রাধন্য দেয়া কিংবা বাছাই করা ছাড়াই ইসলাম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।

তিনি আরো বলেনঃ এ কথার দিকে যাদের ঝোঁক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তাদের মধ্যে ইমাম তাবারীও রয়েছেন। তিনি তাঁর তাহজীর গ্রন্থে এতদসংক্রান্ত হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করার পর বলেনঃ এ বক্তব্যে ঐ ব্যক্তির কথাকে খন্ডন করা হয়েছে যে বলে, আহলে কেবলার (কাবা ঘরের দিকে ফিরে যারা নামাজ পড়ে) কাউকে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া, যাবতীয় অবস্থা প্রাপ্তির পরও তাকে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার রায় দেয়া যাবেনা, যদি না সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা সজ্ঞানে পোষণ করে। তারা হক কথা বলে, তারা কুরআন পড়ে, অথচ তারা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন, ইসলামের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কে নেই।

ইবনে কুদামা তাঁর আল-কাফীতে বলেনঃ মুরতাদ বিষয়টি অধিকন্তু হয়ে থাকে এমন সন্দেহ ও সংশয়ের কারণে, যা মুরতাদের কাছে প্রতিভাত হয়। *(আল কাফি ইবনে কুদামা)*

চতুর্থতঃ যে ব্যক্তি এমন কাজ করলো, সে কি মুমিন মুসলিম? তাকে কি কাফের বলা যাবে? এ কাজ দ্বারা তার আমল কি বরবাদ হয়ে যাবে, নাকি বরবাদ হবে না, যদি প্রথম বিষয়টি তোমার কাছে জটিল মনে হয়, তাহলে কবরে প্রশ্নকারী দু'ফেরেস্তার প্রশ্নের প্রতি এবং এর প্রতিউত্তরে তার (মৃত ব্যক্তির) কথা হায়! হায়!! আমি কিছুই জানি না, লোকেরা দুনিয়াতে যা বলতো আমি তাদের মতোই বলতাম "এর প্রতি তুমি দৃষ্টি দাও। আর যদি দ্বিতীয় বিষয়টি তুমি গ্রহণ করো (অর্থাৎ শিরকী ও কুফরী কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিকে যদি কাফের বলো, তার আমল বাতিল বলে মনে করো) তাহলে তোমার এ সিদ্ধান্তে অটল থাকা উচিৎ। আর যদি তৃতীয় মত হিসেবে তুমি এ কথা বলো যে, এ উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য রকম উদ্দেশ্য। তাহলে তোমাকে দু' উদ্দেশ্যের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা কুরআন অথবা সুন্নাহ অথবা ইজমা (সর্বসম্মত রায়) ইত্যাদি দলীলের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। চতুর্থ মত হিসেবে যদি তুমি বলতে চাও যে, সে যাই করুক না কেনো ইসলাম তাকে কুফরী থেকে হেফাজত করেছে তাহলে ভাল করে মুরতাদের হুকুম সংক্রান্ত বিষয় পড়াশুনা করে নিও *(মাজমুআতুল ফাতওয়া ওয়াররাসায়েলে ওয়াল আজওইবা লিল ইমাম আবদুল ওহাব পৃঃ ৮৮)*

তিনি আরো বলেনঃ আর রিসালা অছছুন্নিয়াতে শাইখ বলেছেনঃ যখন খাওয়ারেজদের (ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া একটি গোমরাহ দল) সম্পর্কে এবং তাদের ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে এবং রাসুল (সঃ) এর পক্ষ

থেকে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ সম্পর্কে বলা হলো, তখন তিনি বলেনঃ রাসুল (সঃ) এবং তাঁর খলীফাগণের যমানায় যদি ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন লোক থাকে যে, মর্যাদাকর ইবাদত সত্ত্বেও ইসলামের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে' যার ফলে রাসুল (সঃ) তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন; তাহলে এটা তো অবশ্যই জানা গেলো যে, বর্তমান যমানায় ইসলাম ও সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত থেকেও ইসলাম থেকে কেউ বের হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। *(তারিখে নজদ ৩৬৭পৃঃ)*

ইমাম সানআনী (রহঃ) তাঁর তাতহীরুল "ই'তিকাদ আন আদরানিশ শিরক ওয়াল ইলহাদ"নামক পুস্তিকায় বলেনঃ তুমি যদি বলো, তারা মূর্খ, তাদের কর্মে তারা মুশরিক। আমি বলবো, সমস্ত ফিকাহর কিতাবে ফকীহগণ মুরতাদ হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়ে একথা বলেছেন যে, যে ব্যক্তি কুফরী কথা বলবে, কথা তার উদ্দেশ্য না হলেও সে কাফের বলে গণ্য হবে। একথা এটারই প্রমাণ পেশ করে যে, তারা ইসলামের হাকীকত (আসল কথা) এবং তাওহীদের মর্মকথা সম্পর্কে জানে না। এতদসত্ত্বেও তারা মৌলিক দিক থেকে কাফের। *(মাজমুআতুল ফাতওয়া ওয়াররাসায়েলে ওয়াল আজওইবা পৃঃ ৮৮)*

নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফের বলার বিষয়ে ভুল পথ অবলম্বন করেছেন। এর ফলে তারা মনে করেন, যে ব্যক্তি বড় বা জঘণ্য শিরকের কাজ কওে, ব্যাখ্যা সাপেক্ষে তাদেরকে কাফের বলা যাবে না এবং তারা ইসলাম থেকেও খারিজ হবে না। তারা কতিপয় বিষয়কে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন যেমন খলীফা মামুনের ঘটনা। ব্যাখ্যা সাপেক্ষে তিনি খালকে কুরআনের পক্ষ অবলম্বন করেন। অর্থ্যাৎ কুরআনকে খলীফা মামুন আল্লাহর সৃষ্টি বলে স্বীকার করতেন অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম ওলামায়ে কেরাম কুরআনকে আল্লাহর মাখলুক বা সৃষ্টি বলে স্বীকার করেন না। এমতাবস্থায় ইমাম, আহমাদ বিন হাম্বল তাকে কাফের বলে আখ্যা দেননি। নিঃসন্দেহে এটা একটা জঘণ্য রকমের ভূল। কেননা শিরক এবং কুফরে জলী, (অর্থাৎ সুস্পষ্ট বড় ধরনের প্রকাশ্য কুফরীর মধ্যে) যেমন ইবাদতের মধ্যে শিরক করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সঃ) নিয়ে উপহাস করা ইত্যাদি এবং কুফরে খফী বা গোপনীয় কুফরী, অপ্রকাশ্য কুফরী যেমন কুফরী খফী সংক্রান্ত কথা বা প্রবন্ধ ইত্যাদির মধ্যে পাথর্ক্য রয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা কতিপয় সিফাতের বা গুণ বাচক নামের ব্যাখ্যাও এর অন্তর্ভুক্ত যা কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে গুপ্ত বা অস্পষ্ট রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার কালাম বা কথা সংক্রান্ত সিফাত বা গুণ। এ বর্ণনার প্রতি যাদের ঝোঁক বা সমর্থন রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব। এটা লক্ষ্য করা যায় শাইখ হুসাইন বিন গানামের নজদের ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থে সংরক্ষিত কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) যে মত গ্রহণ করেছেন তা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে ইবাদতের মধ্যে শিরক এবং অপ্রকাশ্য কুফরী সংক্রান্ত কথার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা বাতীন এবং শাইখ ইসহাক বিন আবদুর রহমান বিন হাসান আল-শাইখ হুকমু তাকফীবিল মুআইয্যান নামক পুস্তিকায় - এর বিষদ বর্ণনা দিয়েছেন। এ ছাড়া বড় বড় ওলামায়ে কেরাম ও এর বর্ণনা দিয়েছেন।

তৃতীয় সন্দেহ ও সংশয়ঃ ঐ ব্যক্তির কথাই হচ্ছে তৃতীয় সংশয় যে বলে, বিচার ফয়সালা (তাগুতের কাছে) চাওয়া শিরক হলেও তা শিরকে আসগার (ছোট শিরক) বড় শিরক বা শিরকে আকবরের পর্যায়ে তা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নীত হবে না যতক্ষণ না এটাকে মনে করা এবং আক্বীদার বিষয় সাথে সংযুক্ত হয়। যেমন গাইরুল্লাহর নামে কসম করা।

আর গোপন বা বাতেনী ইবাদত যা আক্বীদা বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত যেমন ভয়, আশা, ভালবাসা ভক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইবাদতকারীর প্রতি কুফরী আরোপ করার জন্য তার ইবাদতকে মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে বা কথার মাধ্যমে তার আক্বীদা বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করা জরুরী। কেননা, এ জাতীয় ইবাদত অন্তরে লুপ্ত। অতএব কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে কুফরী কর্ম পাওয়া গেলে তার প্রতি কুফরী আরোপ করার জন্য তার আক্বীদা বিশ্বাস প্রকাশ করা জরুরী বলে মনে কওে, সে মূলতঃ একটি বাতিল যুক্তি প্রদর্শন করেছে। এটা হয়েছে তাওহীদের অর্থ এবং ইবাদতের অর্থ সম্পর্কে তার অজ্ঞতার কারণে। এর ফলে বিচার চাওয়ার বিষয়কে যা ইবাদত হিসেবে গণ্য গাইরুল্লাহর নামে কসম করার সাথে একীভূত করেছে, যা ইবাদত নয় বরং শিরকী শব্দ হিসেবে গণ্য।

কেউ হয়তো বলতে পারে, তাহলে আল্লাহর নামে কসম করাকে ওলামায়ে কেরাম কেন ইবাদত হিসেবে আখ্যায়িত করেন? এর জবাবে আমরা বলবো, কেননা আল্লাহর নামে কসম করার সাথে আল্লাহকে তাজীম ও সম্মান করার মতো ইবাদতের বিষয় এর সাথে সংযুক্ত আছে। আল্লাহর নামে কসমকারী ব্যক্তি কসম করার সময় সে একথা জানে যে, আল্লাহ হচ্ছেন মহান। তাঁর নামে কসমের হকদার একমাত্র তিনিই। তাই তাঁর নামে সে কসম করে। এখন এ কসম করার আমলটি ইবাদত হিসেবে গণ্য। কেননা এর সাথে তা'জীম (আল্লাহর সম্মান) সংযুক্ত হয়েছে। এ জন্যই ওলামায়ে কেরাম বলেনঃ যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে কসম করলো সে ছোট শিরকের মধ্যে পতিত হলো। এ কসম তাকে মুসলিম মিল্লাত থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত বের করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে একথা বিশ্বাস না করে যে, যার নামে কসম করা হলো সে কসমের হকদার। তাকে কাফের বলার জন্য যার নামে কসম করা হলো, তার প্রতি সম্মান জাহির বা প্রকাশ করার শর্তারোপ করেছেন ওলামায়ে কেরাম। এর অর্থ্য হচ্ছে, গাইরুল্লাহর নামে তা'জীম বা সম্মান করার সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত নিবেদন করলো। এ ইবাদত গোপনীয় এবং অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। যদি কোনো ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে কসম করে এবং যার নামে কসম করা হলো তার উদ্দেশ্যে তা'জীম বা সম্মান দেখায় তাহলে সে ব্যক্তি উলুহিয়্যাতের দিক থেকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে, তাই সে মুশরিক। তাহলে তাঁর মুশরিক হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে ইবাদতকে প্রকাশ করেছে। তাই আমরা তাকে একথা জিজ্ঞেস করবো না যে তুমি কি এটা বিশ্বাস করো, না কি বিশ্বাস কর না। তাই তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া, সেজদা এবং তাওয়াফের মতোই প্রকাশ্য ইবাদত। এ ইবাদতকে যে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্য নিবেদন করে সে কাফের। এটা ইবাদতে কালবিয়া খাফিয়া (অর্থাৎ অন্তরের গোপনীয় ইবাদত নয়) যা মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

দুই: এ কথা তো সবারই জানা যে, গাইরুল্লাহর নামে কসম করার বিষয়টি প্রাক ইসলামী যুগে নিষিদ্ধ ছিলোনা। এর পর গাইরুল্লাহর নামে কসম খাওয়ার বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যর মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল (সঃ) পরবর্তিতে গাইরুল্লাহর নামে কসম করা নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করা নিষিদ্ধ করেছেন (বুখারী)। অতএব যে বিষয়টি প্রাক ইসলামী যুগে আদৌ নিষিদ্ধ ছিলোনা সেটাকে কি ভাবে বা কোন যুক্তিতে এমন বিষয়ের ওপর কেয়াস করা হয়, যা ছাড়া বান্দার ইসলামই ছহীহ শুদ্ধ হয়না। আর তা হচ্ছে সকল তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) বিধান ব্যতীত সকল বিধান অস্বীকার করা। আর সেটা করতে হবে তাগুতের কাছে বিচার না চাওয়ার মাধ্যমে।

অতঃপর আমরা আরো বলতে চাই যে, এ বাতিল 'কিয়াস' যে বিষয়টিকে অপরিহার্য করে তোলে তা হচ্ছে, যে আয়াতে তাগুতের কাছে বিচার চাওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে সে আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে তাদের জন্য গণক, আহলে কিতাব এবং তাদের তাগুতদের কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যাওয়া জায়েয ছিলো। কেননা তাদের দাবী অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা চাওয়ার বিষয়টি কসম করার মতোই একটি কাজ (অর্থাৎ উভয় কাজই একই মানের তাই গাইরুল্লাহর নামে কসম করলে যেমন কাফের হয়না তেমনি তাগুতের কাছে বিচার চাইলে ও কাফের হবেনা) ।

৪র্থ সংশয়ঃ ঐ বক্তির কথা, যে বলে, যে আইনের কাছে বিচার চাওয়া হবে তা যদি আল্লাহর আইনের বিরোধী হয় তাহলে ঐ আইনের কাছে বিচারফয়সালা নিয়ে যাওয়া জায়েয নেই। আর যদি ঐ আইন আল্লাহর আইনের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ হয় যেমন সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্য ইনসাফপূর্ণ আইন, তাহলে ঐ আইনের কাছে বিচার চাওয়া জায়েয আছে। নিঃসন্দেহে এ কথাটিও দুটি দৃষ্টি কোন থেকে বাতিল

প্রথমতঃ আমরা আইন বা বিধানের দিকে দৃষ্টিপাত করবোনা। আমরা দেখবোনা, আইনটি কি ন্যায় সঙ্গত, নাকি জুলুমপূর্ণ বরং আমরা দেখবো কর্ম এবং প্রত্যার্পনের বিষয়টি। মূল ঘটনা হচ্ছে ন্যায় বিচারটি প্রার্থনা করা হচ্ছে তাগুতের মাধ্যমে। তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

يردون أن يتحاكموا إلى الطاغوت - "তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায়"

এর দ্বারা ক'াব বিন আশরাফ (ইহুদী) কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে । তার কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া এবং বিবাদ মীমংসা করাকে কুফরী বলা হয়েছে। কুফরীর কারণ হিসেবে এখানে একথা বলা হয়নি যে, সে ন্যায় বিচার করেনা, সে ঘুষ গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়তঃ আমরা বান্দার ব্যাপারে এটা দেখবোনা যে, তার প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে, নাকি অন্যায় করা হবে। বরং আমরা দেখবো মা'বূদ অর্থাৎ আল্লাহর তায়ালার ব্যাপার, অর্থাৎ তাগুতকে অস্বীকার করার মাধ্যমে, তাগুতের কাছে বিচার না নিয়ে তাকে অস্বীকার করার মাধ্যমে এবং তাগুত থেকে মানুষকে শতর্ক করে দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ । আপনারা যেহেতু তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার মধ্যে প্রথম, সেহেতু আপনারা লোকদেরকে তাগুত থেকে কিভাবে শর্তক থাকতে বলবেন।

৫ম সংশয়ঃ ঐ ব্যক্তির কথা যে বলে, শরীয়ত সম্মত এমন ব্যবস্থা নেই, যে আমার অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারে তাই আমি বাধ্য হয়েই এমন কাজ করছি

জবাবঃ এ কথারও দুটি জবাব ।

প্রথম বিষয় হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি উপরোক্ত কথা বলে, আমরা তাকে আল্লাহ তায়ালার এ বাণীর মাধ্যমে শর্তক করতে চাইঃ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"এটা এজন্য যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ কাফেরদেরকে হেদায়াত করেননা ।" *(নাহলঃ ১০৭)*

শাইখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) তার 'কাশফুল শুবহাত' নামক পুস্তিকায় এ আয়াত প্রসংগে বলেনঃ এখানে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ কুফরী ও শাস্তির কারণ বিশ্বাস কিংবা অজ্ঞতা, কিংবা ধর্মের প্রতি আক্রোশ অথবা কুফরীর প্রতি মুহাব্বত ছিলোনা । বরং কারণ ছিলো দুনিয়ার স্বার্থ । দ্বীনের ওপর দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল ।

তাই আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি যে মুসলমানের ঈমান আছে তার জন্য দুনিয়ার কোনো স্বার্থকে দ্বীনের কোনো স্বার্থের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া জায়েয নেই । চাই সে স্বার্থ কোনো পদবী অথবা নেতৃত্ব চাওয়ার মাধ্যমেই হোক, অথবা দুনিয়া ও সম্পদ নষ্ট না হওয়ার বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যমে হোক । কেননা দ্বীন হেফাজতের বিষয়টি সম্পদ হেফাজতের ওপর অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে । রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

تعش عبد الدينار والدرهم و عبد الخميصة إن أعطى رضى وإن لم يعط سخط (رواه البخارى)

"দিনার, দিরহাম এবং পেট পূজারী ধ্বংস হোক, যদি তাকে কিছু দেয়া হয় তাহলে খুশী, আর কিছু না দিতে পারলে ক্রোধান্বিত হয় ।" *(বুখারী)*

আল্লাহ তায়ালা সূরায়ে আত-তাওবাহ্‌তে ইরশাদ করেনঃ

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

লক্ষ্য করুন আল্লাহ তায়ালা কিভাবে ঐ সব পার্থিব উপকরণের নিন্দা করেছেন, যে গুলোর সাথে তারা সম্পৃক্ত হয়ে জিহাদকে পরিত্যাগ করেছে । এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, আয়াতে উল্লেখিত (পার্থিব) আটটি জিনিসের (ভালবাসার) কারণে যে ব্যক্তি তাওহীদ পরিত্যাগ করে সে কি বেশী অন্যায় করলো, না কি একই কারণে যে ব্যক্তি জিহাদ পরিত্যাগ করলো সে বেশী অন্যায় করলো? এ আটটি বিষয় কি আল্লাহ তায়ালা যখন জিহাদ পরিত্যাগ করার ওযর (অযুহাত) হিসেবে গ্রহণ করেননি, তখন কিভাবে এ বিষয়গুলোকে তাওহীদ পরিত্যাগ করার ওযর হিসেবে গ্রহণ করবেন? কুফরী কথা উচ্চারণ করার জন্য একমাত্র জবরদস্তি ছাড়া অন্য কোনো ওযর আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেননি । আর জবরদস্তির বিষয়টি হচ্ছে এমন কর্ম সম্পাদন করা, যা বাধ্য হয়ে হযরত আম্মার বিন ইয়াসীর (রাঃ) করেছেন । (অর্থাৎ অত্যাধিক অমানুষিক নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য নিজের অন্তরকে ঠিক রেখে শুধু মৌখিক ভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করা) শুধু জীবন বাঁচানোর জন্য এর অনুমতি দেয়া হয়েছে তবে এমতাবস্থায় আজিমত অর্থাৎ জীবনের বিনিময়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করার বিষয়টিকে অতি উত্তম কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে । হাদীসে এ ব্যাপারে বক্তব্য এসেছে । শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল-শাইখ (রহঃ) হেজাজের আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ বিন আহমাদ আল-হিফজী বলেনঃ হে বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, আপনারা শতর্ক হোন, শতর্কতা অবলম্বন করুণ । হে উদাসীন ব্যক্তিরা আপনাদের জন্য রয়েছে তাওবা আপনারা তাওবার পথ অবলম্বন করুন । কেননা দ্বীনের মূল বিষয়েই ফেতনা (পরীক্ষা) হয়েছে প্রাসংগিক বিষয়ের ফেতনা হয়নি, দুনিয়াবী বিষয়ও ফেতনা হয়নি । তাই অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে পরিবার পরিজন, স্ত্রী, সম্পদ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাড়ী-ঘর সবকিছুই থাকবে শুধু দ্বীন রক্ষার স্বার্থে । এ গুলো উৎসর্গিত হবে দ্বীনের জন্য । এগুলোর হেফাজতের জন্য কখনো দ্বীন উৎসর্গিত হবেনা ।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"আপনি বলে দিন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা তোমরা উপার্জন করিয়াছ, সে ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা তোমরা করো, এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো, তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং তাঁর রাস্তায় জেহাদ করা থেকে অধিকতর প্রিয় হয়, তবে আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেফাজত করেন না।" *(আত তাওবাহ ২৪)*

প্রজ্ঞা সম্পন্ন মস্তিস্কে ভেবে দেখুন, দেখবেন যে, আল্লাহ তায়ালা' আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এবং জিহাদের মুহাব্বত উল্লেখিত আটটি বিষয়ের মুহাব্বতের চেয়ে অধিক হওয়া ওয়াজিব বা আপরিহার্য করেছেন । ইহা ছাড়া এগুলোর যে কোনো একটি কিংবা একাধিক এবং এ ছাড়া যা এর চেয়ে বেশী মুহাব্বতের হকদার তার চেয়েও বেশী মুহাব্বত হতে হবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য। তাই তোমার কাছে দ্বীন হতে হবে সবচেয়ে মূল্যবান এবং মর্যদা সম্পন্ন। তোমার কাছে তাওবা হবে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোত্তম বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে এ কথা যারা বলে তাদেরকে আমরা আল্লাহর এ বাণীর মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

"হে আদম সন্তান, তুমি আমার ইবাদতে আত্ম নিয়োগ করো, আমি তোমার বক্ষকে মুখাপেক্ষীহীনতা দিয়ে ভরে দিবো এবং তোমার দারিদ্র বিমোচন করে দিবো। যদি তুমি তা না করো, তাহলে তোমার হাতকে কাজে ব্যস্ত রাখবো, অথচ তোমার দারিদ্র বিমোচন করবোনা।" *(আহমাদ)*

আর সে যে বলেছে যে, সে এ কাজ (তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া) বাধ্য হয়ে করেছে এ কথা ও দু'দিক থেকে বাতিল।

একঃ লোকটি দু'টি বিষয়কে মিশ্রিত করে ফেলেছে। সে অনন্যোপায় হওয়া আর জোর জবরদস্তীর শিকার হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে সক্ষম হয়নি। সে মানুষের জন্য ওযর বা অজুহাত তালাশ করেছে যখন কুফরী করার জন্য সে অনন্যোপায় হয়েছে। নিঃসন্দেহে তার এ যুক্তি বাতিল, কেননা অনন্যোপায় মা'সিয়াত বা গুণাহের কাজের মাধ্যমে, কিন্তু কুফরীটা এ যুক্তিতে জায়েয হবে না যে, সে অনন্যোপায় অবশ্যই কুফরী কাজের জন্য তাকে হত্যা, নির্যাতন ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হবে। আর অনন্যোপায় হওয়ার অর্থ হচ্ছে, কোনো মানুষ দুটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বিপর্যয় সৃষ্টির বিষয়ের অবসানের জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট অন্যায় কাজটি সম্পাদন করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমা লংঘনকারী না হয়, তার জন্য কোনো পাপ নেই নিশ্চয় আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।" *(আল-বাকারাহঃ ১৭৩)*

জবর দস্তির অর্থ হচ্ছে, এমন শাস্তি ও কষ্ট প্রদান যা জীবনকে ধবংষ করে দেয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কুফরী কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন। তাই যদি আমরা অনন্যোপায় এবং জবর দস্তি মূলক নিয়মটি একত্রিত করে দেখি, তাহলে দেখতে পাবো যে, একটির মধ্যে বিশেষ অবস্থা আর একটির মধ্যে সাধারণ অবস্থার একটি ব্যাপার নিহিত আছে। অর্থাৎ এক অবস্থায় কুফরী কথা বলার সুযোগ আছে আরেক অবস্থায় এ সুযোগ নেই।

শাইখ হামাদ বিন আতীক (রহঃ) বলেনঃ যদি বলা হয়, যে অবস্থায় কুফরী কথা বলা যায় এমন জরবদস্তির পরিচয় কি? এর জবাবে আমরা বলতে চাই, যে কারণে এতদসংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয়েছে সেটিই জবরদস্তির সবচেয়ে সম্পষ্ট ব্যাখ্যা। ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ তায়ালা হযরত আম্মার (রাঃ) এর ব্যাপারে বলেছেনঃ

مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ

"যার ওপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে, সে ব্যতীত যে কেউ ঈমান গ্রহণ করার পর আল্লাহকে অস্বীকার করে।" *(নাহলঃ১০৬)*
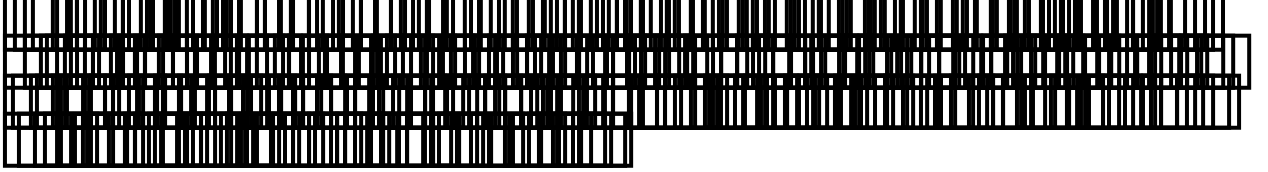
দুইঃ যে ব্যক্তি বলে যে, আমি বাধ্য হয়েই কুফরী করি, তার একথা বাতিল হওয়ার দ্বিতীয় দিক তার কাছে উপস্থাপন করার মাধ্যমেই বলে দিতে চাই। যদি এমন কোনো শক্তি বা কর্তৃপক্ষ থাকে যার পূজা করা হয়। সে শক্তি যদি কোনো মানুষের ওপর চড়াও হয়ে তার সম্পদ কেড়ে নেয়, সম্পদ ফেরত দিতে যদি অস্বীকার করে, যদি বলে যতক্ষণ পর্যন্ত এ কবরকে কিছু উপহার না দিবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত এ কবরকে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার সম্পদ ফেরত দেয়া হবে না। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এমতাবস্থায় প্রতিমার উদ্দেশ্যে কোরবানী করা অথবা প্রতিমার চার পাশে তাওয়াফ করা অথবা মূর্তিকে সেজদা করা কি তার সম্পদ ফিরিয়ে আনার জন্য অনন্যোপায়ের অজুহাতে জায়েয হবে? তার এ কাজটি কি তার ওপর যে শেরেকী ফতোয়া অর্পিত হবে এর গ্লানি থেকে তাকে বাঁচাতে পারবে? এ প্রশ্নের জবাব আমরা তার কাছে চাই।

তিনঃ যদি ধরা হয়, যে সম্পদ ধ্বংস হওয়ার বিষয়টি জবরদস্তিরই অন্তর্ভূক্ত। এটা নিঃসন্দেহই বলতে পারি যে, যখন আমরা কুরআন ও সুন্নাহর উদ্ধৃতিগুলি একত্র করি, তখন এটা সুস্পষ্ট ভাবেই আমরা বুঝাতে পারবো যে, জবরদস্তি করে কুফরী কথা বললে কার ওজর গ্রহণ করা হবে আর কার ওজর গ্রহণ করা হবেনা প্রথম উদ্ধৃতাংশে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এই আয়াতটি ঐ সব মুসলমানদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যারা (মুসলমান হয়ে ও ঈমানী দুর্বলতার কারণে হিজরত না করে কাফেরদের সাথে মক্কাতেই ছিলো) বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলো তাদের কতিপয় লোক বদর যুদ্ধে মারা গিয়েছিলো, বাকীরা মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলো। রাসূল (সঃ) তাদের সাথে কাফেরদের প্রতি তিনি যে আচরণ করেছেন, সেই আচরণই করেছেন। অর্থাৎ কাফেরদের মতো তাদের কাছ থেকেও মুক্তিপন হিসেবে অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে বন্দী দশা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ বুখারীতে মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আবুল আসওয়াদের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান) বলেনঃ শামবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মদিনা বাসীদেরকে নিয়ে একটি সেনাদল গঠন করা হয়। এতে আমার নামও তালিকাভূক্ত করা হয়। আমি তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম ইকরামার কাছে গিয়ে সব কিছু বললাম। তিনি আমাকে সেনা দলে যোগদান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। তার পর বললেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমাকে বলেছেনঃ মুসলমানদের কিছু লোক মুশরিকদের সাথে থেকে রাসূল (সঃ) এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের দল ভারী করেছিলো। যুদ্ধের ময়দানে নিক্ষিপ্ত তীর এসে তাদের কারো শরীরে বিদ্ধ হলে সে মারা যেতো অথবা আহত হয়ে পরে মারা যেতো। তারপর আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেছেন।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا

"যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, ফেরেস্তারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলেঃ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম, ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলোনা যে, দেশ ত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ স্থান।" *(আন নিসাঃ ৯৭)*

ইবনে আবি হাতেম এবং ইবনে জারীর হযরত ছুদ্দী থেকে এর তাফসী প্রসংঙ্গে বর্ণনা করেন যে, তিনি ছুদ্দী (রহঃ) বলেছেনঃ যখন হযরত আব্বাস, আকীল এবং নওফেল বন্দী হয়ে রাসূল (সঃ) এর কাছে নীত হলেন, তখন রাসূল (সঃ) আব্বাসের উদ্দেশ্যে বললেনঃ তুমি তোমার এবং তোমার ভ্রাতুস্পুত্রের পক্ষ থেকে ফেদিয়া মুক্তি পনের (অর্থ দাও)। তখন আব্বাস বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আপনার কেবলার দিকে ফিরে নামাজ পড়িনা? এবং আপনি যার স্বাক্ষ্য প্রদান করেন আমরা কি তাঁরই সাক্ষ্য দেইনা? তিনি বললেনঃ হে আব্বাস নিশ্চয়ই তোমরা পরস্পর ঝগড়া করো, তাই ঝগড়া করছো। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করলেন

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً - **"আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিলোনা?"**

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ বুখারীতে আল- জিহাদ অধ্যায়ে মুশরিকদের মুক্তিপন সংক্রান্ত বিষয়ে হযরত আনাস (রাঃ) এর হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি (হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূল (সঃ) এর কাছে যখন বাহরাইনের মাল আনা হলো, তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) নবী (সঃ) এর কাছে এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে কিছু মাল (সম্পদ) দিন। কেননা আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং অকীলের পক্ষ থেকে মুক্তি পনের অর্থ দিয়েছি। রাসূল (সাঃ) বললেন, লও, তখন রাসূল (সাঃ) তাঁর কাপড়ে কিছু মাল দিলেন।

কুরআন ও সুন্নাহর এসব উদ্ধতির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে, যে ব্যক্তি কুফরী কথার ব্যাপারে তাকে জবরদস্তি করা হবে বলে পূর্বেই জানতে পারে বা ধারনা করতে পারে এবং যদি মহা পরীক্ষা বা বিপদে পতিত হওয়ার পূর্বে তার শহর ও এলাকা থেকে হিজরত করা কিংবা পালিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি থাকে অথচ সে (পলিয়ে গেলোনা বা হিজরত করলোনা তাহলে তার ওপর জবরদস্তি মূলক আচরণ কে তার কুফরী কথা বা কাজের ওযর হিসেবে গ্রহণ (যোগ্য) হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির ওপর কাফেররা চড়াও হয়েছে অথচ উক্ত অবস্থা থেকে নিস্কৃতি লাভের কোনো শক্তি তাদের নেই। যার ফলে কাফেররা তাদেরকে কুফরী করতে বাধ্য করেছে, তাদের ওযর বা অজুহাত গ্রহণ যোগ্য। এ ব্যাপারে খুবই শতর্ক হওয়া উচিৎ এবং জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে

বিচার করা উচিৎ। আল্লামা শাইখ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ বিন শাইখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) তার লিখিত حكم موالاة اهل الاشراك নাম পুস্তিকায় বলেনঃ

৬ষ্ঠ দলীল হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا

"যারা নিজেদেও আত্মার প্রতি জুলুম করে, এই অবস্থায় ফেরেস্তারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেস্তারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলোনা যে, দেশ ত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ স্থান।" *(আন নিসাঃ ৯৭)*

অর্থাৎ তোমরা কোন দলে ছিলে? তোমরা কি মুসলমানদের দলে ছিলে? নাকি মুশরিকদের দলে ছিলে? তারা তখন ওযর বা অজুহাত পেশ করেছিলো যে, তারা দুর্বল হওয়ার কারণে তারা মুসলমানদের দলে থাকতে পারেনি। ফেরেস্তারা কিন্তু তাদের এ ওজর গ্রহণ করেনি বরং তাদের কে লক্ষ্য করে বললোঃ

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا

"তোমাদের হিজরত করার জন্য কি আল্লাহর যমীন প্রশস্ত ছিলোনা? এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম। এটা খুব খারাপ স্থান।"

কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ করবে না যে, যারা মুসলমানদের দল থেকে চলে গিয়ে মুশরিকদের সাথে মিশে গিয়েছেলো তারা তাদেরই (মুশরিকদেরই) দল ও জামায়াতের অন্তর্ভূক্ত হিসেবে গণ্য হয়েছিলো। অথচ এখানে আয়াত নাযিল হয়েছে এ সব লোকদের ব্যাপারে যারা ছিলো মক্কাবাসী, তারা ঈমান এনেছিলো তবে তারা হিজরত থেকে বিরত ছিলো। যখন মুশরিকরা বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলো তখন তাদের সাথে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তাদেরকে (মক্কার মুসলমানদেরকে) জবরদস্তি করেছিলো। অগত্যা তারা ভয়ে ভয়ে তাদের সাথে বের হয়েছিলো। অবশেষে তারা বদর যুদ্ধে মুসলমানদেরই হাতে নিহত হয়। যখন (নবীর সংগী) মুসলমানরা তাদের (নিহত মুসলমান) কথা জানতে পারলো, তখন তারা আফসোস করলো আর বলতে লাগলো, আমরা আমাদের ভাইদেরকেই হত্যা করলাম। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। তাহলে ঐ সব লোকদের অবস্থা বা হুকুম কি হতে পারে যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ছিলো, অতঃপর ইসলামের রজ্জুকে আপন স্কন্ধ থেকে খুলে ফেলেছে, মুশরিকদের দ্বীনের প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করেছে, তাদের অনুগত্য করেছে, তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে, তাওহীদে বিশ্বাসী লোকদেরকে আপমানিত করেছে, তাওহীদে বিশ্বাসী লোকদের পথ পরিহার করেছে, তাদেরকে দোষারোপ করেছে, তাদেরকে গালি-গালাজ করেছে, বদনাম করেছে, তাদেরকে উপহাস করেছে, বদনাম করেছে, তাদেরকে উপহাস করেছে, তাওহীদের ওপর অবিচল থাকাকে মন্দ হিসেবে চিহ্নিত করেছে, জিহাদের ক্ষেত্রে তাদের ধৈর্যকে অপমানিত করেছে। জবরদস্তির ফলে নয় বরং ইচ্ছাকৃত ভাবে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে, তারা ঐ সব লোকদের চেয়ে কাফের হওয়ার বেশী যোগ্য বা হকদার যারা হিজরত পরিত্যাগ করেছে সামান্য পর্থিব স্বার্থের কারণে। কাফেরদের কারণে বাধ্যহয়ে মুশরিক সৈন্যদের সাথে ভয়ে, ভয়ে বের হয়েছিলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে। যদি কেউ বলেঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জবরদস্তিতে মক্কা থেকে বের হয়ে যারা বদর যুদ্ধে মারা গিয়েছিলো, কাফের কর্তৃক তাদের ওপর জবরদস্তি কি ওজর হিসেবে গ্রহণ যোগ্য হবে না? তখন উত্তর হবে না, গ্রহণ যোগ্য হবেনা। কেননা প্রাথমিক পর্যায়ে যখন তারা কাফেরদের সাথে অবস্থান করছিলো তখন তাদের কোনো ওজর বা অযুহাত ছিলোনা। তাই পরবর্তীতে জবরদস্তির কারণে ওজর গ্রহণ যোগ্য হবে, না, তার মূল কারণ হচ্ছে হিজরত পরিত্যাগ করে কাফেরদের সাথে তাদের থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। *(মাজমুআতুত তাওহিদ ৩০৫/১)*

কাজী আইয়ায (রহঃ) আল-মাদারেক এর ২/৭১৯ পৃষ্টায় বলেনঃ আবু মুহাম্মদ বিন আল-কারবানীকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যাকে বনু ওবায়েদ। (নামক একটি গোত্র) তাদের আহবানে সাড়া দেয়া অথবা মৃত্যু বেছে নেয়ার ব্যাপারে জবরদস্তি করা হয়েছিলো। তিনি জবাবে বললেনঃ মৃত্যুকেই বেছে নিবে, তবু অন্যায় আহবানকে ওযর হিসেবে গ্রহণ করা যাবেনা। তবে প্রথম থেকেই যদি সে (অন্যায় আহবানকারী লোকদের) শহরে প্রবেশ করে থাকে এবং তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে থাকে এবং ঈমানের জন্য ভয়ের কোনো কারণ না থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। পরবর্তীতে ঈমানের ওপর হুমকি প্রকাশ পেলে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। কিন্তু কাফের মুশরিকদের সাথে সব কিছু জেনে-শুনে অবস্থান করতে থাকলে ভীতি বা জবর দস্তির কোনো অযুহাত গ্রহণ যোগ্য হবেনা। কেননা যে অবস্থান অধিবাসীদের কাছে শরীয়ত বাতিলের দাবী করে, সে অবস্থানে থাকা (শরীয়ত বাতিলের আহবানে সাড়া দেয়া কিছুতেই জায়েয নয়। এ থেকে ওলামায়ে কেরাম সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন, ওযর মুসলমানদের জন্য তাদের শত্রুদের মাঝে এমন অবস্থায় বসবাস করা অনুচিৎ, যে আবস্থায় তাদের শত্রুরা তাদেরকে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দেয়।

চারঃ ইতিপূর্বে পেশকৃত প্রশ্ন ও উদাহরণের এখানে প্রশ্ন করতে চাই, যদি অসংখ্য মুসলমান এমন কোনো শহরে বাস করে, সেখানে কুফরী শাসন চলে। এক সময় মুসলমানদের ওপর যদি কাফেররা চড়াও হয়, আর তাদের সম্পত্তি হরণ করে নেয়, আর নগরের প্রশাসন একথা বলেঃ তোমাদের ধন- সম্পদ আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরত দিবনা যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহকে গালি দাও, অথবা তোমাদের রাসূলকে (সঃ) গালি দাও, অথবা তোমাদের দ্বীন ইসলামকে গালি দাও, অথবা গাইরুল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তোমরা পশু জবাই করো ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর তারা (মুসলমানরা) তাদের ডাকে সাড়া দিলো এবং কাফেদের সাথে তারা বেশ কিছু বছর অতিবহিত করলো? তারপর তারা কুফরী শক্তির বিচারালয়ে ততদিন পর্যন্ত নিজেদের সম্পদ ফিরে পাওয়ার জন্য গেলোনা, যতদিন না তারা আল্লাহকে গালি দিলো। এটাকে জবরদস্তি গণ্য করে তাদের ওজর হিসেবে গণ্য করা যাবে? নিঃসন্দেহে এর জবাব হবে 'না, । অতএব আমরা বলতে চাই, সে জাতির সকলেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে আল্লাহকে ইচ্ছা মতো গালমন্দ করে এবং যে কুফরী কাজ ইসলামের গন্ডি থেকে মানুষকে বের করে দেয়, এমন কাজ করে তার মধ্যে আর যে জাতির সবাই তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা নিয়ে যায় আর এমন কাজ করে, যা ইসলামের গন্ডি থেকে কোনো ব্যক্তি বের করে দেয় তার মধ্যে কি পার্থক্য আছে?

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত

এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ঐ সমস্ত নাম ও গুনাবলীর (আসমা ও সিফাত) প্রতি ঈমান আনয়ন করা যেগুলো আল্লাহ নিজেই নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রাসুল তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কোনো নাম ও গুণকে আকৃতি বিশিষ্ট বলা যাবেনা, নিরর্থক বা অকার্যকর বলা যাবে না, পরিবর্তন করা যাবে না, (সৃষ্টির) সমতুল্য বলা যাবে না।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সুন্দর নাম ও গুণবাচক একত্ববাদ হল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার গুণাবলী সম্বন্ধে ঐ সমস্ত কথা যা পবিত্র কুরআনে আছে এবং সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়, তার উপর ঈমান আনা। সাথে সাথে যে সমস্ত গুণাবলীতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা নিজেকে ভূষিত করেছেন অথবা তাঁর নবী (সঃ) বিভূষিত করেছেন সত্যিকার অর্থে- কোন অপব্যাখ্যা ছাড়াই, কোন নির্দিষ্ট আকার ব্যতীতই অথবা না বুঝে ছেড়ে দেয়া ছাড়াই তার উপর ঈমান আনা। যেমনঃ- এসতোয়া এর অর্থ হল বসা, নুজুল, অবতীর্ণ হওয়া, সেই রকম হাত, উপস্থিত হওয়া এবং অন্যান্য গুণাবলী সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে। এর তাফসীর যা সাহাবীদের থেকে বর্ণিত আছে তা বিশ্বাস করা। যেমন "ইসতোয়া" সম্বন্ধে সহীহ বুখারীতে তাবেয়ীনদের রেওয়াত আছে তা হল উর্ধ্বে উঠা ও আরোহণ করা, তবে তা তাঁর হাইছিয়াত অনুযায়ী হবে।

"তাঁর মত কেউ নেই- কিন্তু তিনি শুনেন এবং দেখেন।" *(সূরা শুরা ৪২ঃ ১১)*

এর অর্থঃ আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই। এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া সমস্ত উপাস্যকে অস্বীকার করা- শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র (সুব) ক্ষেত্রে তা স্বীকার করা।

১. **تاويل** তা'বিলঃ পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত ও সহীহ হাদীসের বিপরীত কোন আচরণ করাই হচ্ছে তা'বিল। যেমন এসতোয়া (উর্ধ্বে আরোহণ, বসা) ইত্যাদি অর্থ ইসতাওলা বা শক্তি প্রয়োগে দখল করা বুঝায়।

২. **تعطيل** তা'তীলঃ তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র (সুব) কোন সিফাতকে (গুণ) অস্বীকার করা। যেমনঃ আল্লাহ্ (সুব) আসমানের উপর আছেন। কিন্তু আমাদের অনেকের নিকট এ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে আল্লাহ্ (সুব) সর্বত্র বিরাজমান।

৩. **تكيف** তাকইফঃ তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র (সুব) কোন গুণকে কোন নির্দিষ্ট আকারে চিন্তা করা। যেমনঃ- আল্লাহ্ (সুব) যে আরশের উপর আছে তা তার অন্য কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা না করা। তিনি কিভাবে আরশের উপর আছে তা কেউ জানে না।

৪. **تمثيل** তামছিলঃ তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র (সুব) কোন গুণকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা না করা। যেমনঃ- আল্লাহ্ (সুব) প্রতি রাত্রে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাঁর অবতীর্ণ হওয়া ও আমাদের কোন জায়গায় অবতীর্ণ হওয়া এক নয়। আর অবতীর্ণ হওয়ার হাদীস মুসলিম শরীফে বর্নিত হয়েছে সহীহ সনদে। অনেকে মিথ্যা বলেন যে, শাইখুল ইসলাম ইব্‌নে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর কিতাবে এ ধরনের তামছীল বা তুলনা করেছেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তার কিতাব পড়লে দেখা যাবে তিনি তুলনা বা উপমা এভাবে দেন নাই।

৫. **تفويض** তাফবীদঃ সলফে সালেহীনদের মত আল্লাহ্‌র (সুব) আকৃতির ব্যাপারে কোন কথা আসলে তা তারা বলতেন আমরা আকৃতি জানি না কিন্তু যে সমস্ত অঙ্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে তা বুঝি। যেমন ইসতোয়া অর্থ উর্ধ্বে আরোহণ কিন্তু কিভাবে উর্ধ্বে আরোহণ করেছেন তা আমরা জানি না।

৬. কিন্তু অন্য দল যারা আল্লাহ্‌র (সুব) এই সমস্ত সিফতের স্বীকার করে তারা অর্থ এবং অবস্থান উভয়কেই অস্বীকার করে। তা ঐ সমস্ত সলফে সালেহীনদের কথার উল্টো যেমন উম্মু সালামাহ (রাঃ) ইমাম রবীয়া (রহঃ) যিনি ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উস্ত

াদ ছিলেন এবং ইমাম মালিক (রহঃ)। কারণ, তারা সকলেই বলেছেন, ইসতোয়া অর্থাৎ বসা বা উর্ধারোহণ এর অর্থ সবাই বুঝে, কিন্তু কিভাবে, তা কেউ জানে না। এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব, আর এর কৈফিয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বিদা'আত।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত এর ক্ষেত্রে প্রচলিত বিভ্রান্তিকর এবং শির্কী আক্বীদা

অপার এবং অসীম আল্লাহ

মানুষ যাতে আল্লাহকে অধিকতর উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় সেজন্য সর্বশক্তিমান এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহ আসমানী কিতাবসমূহ এবং তাঁর পয়গম্বরদের মাধ্যমে নিজের বর্ণনা দিয়েছেন। জ্ঞানে এবং প্রসরতায় মানুষের বিচারশক্তি সীমিত বিধায় তাদের পক্ষে অসীম কিছু বুঝা অসম্ভব। মানবজাতি যাতে আল্লাহর গুণাবলির সঙ্গে সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলি তালগোল পাকিয়ে না ফেলে সেজন্য দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ তাঁর গুণাবলির কিয়দংশ মানুষের কাছে প্রকাশ করার দায়িত্ব তাঁর নিজের উপর নিয়েছেন। আল্লাহর গুণাবলির সঙ্গে সৃষ্টির গুণাবলি মিশিয়ে ফেলে মানুষ পরিশেষে সৃষ্ট বস্তুর উপর দেবত্ব আরোপ করে। সৃষ্টির উপর এই ধরণের দেবত্ব আরোপই সকল প্রকার পৌত্তলিকতার সারাংশ এবং ভিত্তি। সকল পৌত্তলিক ধর্ম এবং ধর্ম বিশ্বাসে মানুষ সৃষ্টিজাত প্রাণী অথবা বস্তুর উপর মিথ্যাভাবে স্বর্গীয় গুনাবলী আরোপ করে এবং ফলশ্রুতিতে সেগুলি আল্লাহ ছাড়া অথবা আল্লাহসহ উপাসনার বস্তুতে পরিণত হয়।

আল্লাহর অগণিত গুণাবলির মধ্যে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ গুণটি হল একমাত্র তিনিই সকল ইবাদতের যোগ্য। গ্রীকদর্শন প্রভাবিত মুতাজিলাহ মতাদর্শ অনুসারীদের আবির্ভাবের কারণে মুসলিমরা এই গুণটি সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এখনও বহু মুসলিম বিভ্রান্তিতেই আছে।[৫২] এই চরম গুরুত্বপূর্ণ গুণটি হল আল-উলু যার ইংরেজী অর্থ মহামান্য অথবা যা সমস্ত সীমার উর্দ্ধে। আল্লাহকে বর্ণনা করার জন্য যখন এটা ব্যবহার করা হয় তখন এই গুনটি হচ্ছে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির উর্দ্ধে এবং সৃষ্টিসীমা বহির্ভূত। তিনি সৃষ্টির দ্বারা পরিবেষ্টিত নয় কিংবা সৃষ্টির কোন অংশ কোনভাবেই তার উর্দ্ধে নয়। তিনি সৃষ্টি জগতের অংশ নন কিংবা সৃষ্টি জগৎ তাঁর অংশ নয়। প্রকৃপক্ষে তাঁর সত্তা তার সৃষ্টি হতে সম্পুর্ণভাবে স্বতন্ত্র এবং পৃথক। তিনি স্রষ্টা। বিশ্ব এবং এর মধ্যস্থিত সকল বস্তু তাঁর সৃষ্টির অংশ। তবে সৃষ্টির প্রকারভেদ সত্ত্বেও তাঁর গুণাবলী অপরিবর্তিত। তিনি সমস্ত কিছু দেখেন, শুনেন এবং জানেন এবং তিনি হলেন সৃষ্ট জগতে সমস্ত কিছু ঘটার মুখ্য হেতু। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘটে না। ফলশ্রুতিতে, এ কথা বলা যেতে পারে যে আল্লাহর সাথে তাঁর সৃষ্টির সম্পর্ক সম্বন্ধে ইসলাম দ্বৈত মতবাদ পোষন করে। এই দ্বৈতবাদিতা এই অর্থে যে, আল্লাহ আল্লাহই এবং সৃষ্টি সৃষ্টিই। দুটি আলাদা সত্ত্বা, স্রষ্টা অসীম এবং সৃষ্টি সসীম। একটি অপরটি নয় অথবা তারা উভয়ে এক নয়। একই সঙ্গে ইসলামি মতবাদ আপোষহীনভাবে এককত্বের দর্শন এই অর্থে যে আল্লাহ সম্পুর্ণভাবে স্বতন্ত্র এবং মাতাপিতা, সন্তানসন্ততি অথবা অংশীদার বিহীন। তিনি তাঁর ঐশী শক্তিতে অনন্য এবং কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি মহাবিশ্বের সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস এবং সব কিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে, সৃষ্টির সাথে সম্পর্কে তিনি দৃঢ়ভাবে একক, কারণ সমস্ত বিশ্বের সকল বস্তু আল্লাহ একাই সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত সৃষ্ট প্রাণী এবং সত্ত্বা একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং এই কারণে "প্রকৃতি" সৃষ্টির উপাদানসমূহ একই প্রাথমিক পদার্থসমূহ হতে নির্মিত।

তাৎপর্য

উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহর অপারতা ও অসীমতার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ইসলাম আবির্ভুত হবার পূর্বে এই মহৎ গুণের নিহিতার্থ হতে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদুর চলে গিয়েছিল। খৃষ্টানরা দাবি করে যে, আল্লাহ পৃথিবীতে রক্ত মাংসের মানুষের আকারে পয়গম্বর ঈশা (যিশু) হিসাবে আবির্ভুত হন যাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। এদের আগের ইহুদিরা দাবি করেছিল যে আল্লাহ মানুষের রূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং একটি মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় পয়গম্বর ইয়াকুব (জেকব) এর কাছে হেরে যান।[৫৩] পারস্যবাসীরা তাদের রাজাদের আল্লাহর সকল গুণাবলীতে ভূষিত দেবতা বলে গণ্য করত এবং তাদের পুজা করত। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে ব্রক্ষ্মার ব্যক্তিরূপের প্রকাশ বলে পুজা করে। [৫৪] প্রকৃতপক্ষে, এই বিশ্বাস হিন্দুদেরকে এমন এক অবিশ্বাস্য পর্যায়ে নিয়ে গেছে যেখানে শিব দেবতা, যাকে পুরুষের উত্তোলিত লিঙ্গ হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং আদর করে যাকে লিঙ্গম বলা হয়, তাকে পূজা করার জন্য তারা তাদের পবিত্র শহর বানারসে তীর্থযাত্রা করে।[৫৫]

---

৫২. *নাসরউদ্দীন আল্-আলবানী, মুখতাসার আল উলু (Beirut: al-Islamee, 1st ed. 1981) চ.২৩.*

৫৩. *Genesis 33: 24-30.*

৫৪. *John R. Hinnells, Dictionary of Religious , (England: Penguin Books, 1984) pp 67-8.*

৫৫. *Coller`s Encyclopedia, vol.12, p.130. See Santha Rama article ``Banaras: Indias City of Light, National Geographic , February, 1986, p. 235 শিব একজন দ্বৈত স্বভাবের দেবতা যে ধ্বংস করে কিন্তু সৃষ্টিও করে। সাধারনতঃ পাথর থেকে আকৃতিতে আনা লিঙ্গম উত্তেজিত পুরুষের লিঙ্গেও প্রতীক হিসাবে ঈশ্বরের পূনঃবিকশিত করার ক্ষমতাকে প্রকাশ করে। বিরাট বিরাট লিঙ্গ মন্দিরগুলির সাধারন বৈশিষ্ট্য।একটি বৃত্তকার ভিত যাকে যোনী (মাহিলা অঙ্গ) বলা হয় এবং শক্তি নামে দেবতার অর্ধেক মহিলা অংশ এবং স্বর্গীয় শক্তের উৎস হিসাবে প্রকাশ করা হয়; তার উপর বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে লিঙ্গ বসানো হয়।*

ব্রহ্মার সর্বত্র বিরাজমান- এই হিন্দু মতবাদ পরবর্তীতে খৃষ্টীয় বিশ্বাসের একটি অংশ হয়ে যায় এবং রাসুলের (সাঃ) বহু প্রজন্ম পর অবশেষে মুসলিমদের মধ্যেও এই বিশ্বাস ঢুকে পড়ে। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের স্বর্ণ যুগে যখন ভারতবর্ষ, পারস্য এবং গ্রীক দেশের দর্শন শাস্ত্রের পুস্তকগুলি অনুবাদ করা হয়; আল্লাহ সকল স্থানে এবং সব কিছুর মধ্যে বিরাজমান এই মতবাদ তখন দার্শনিক পরিমন্ডলে উপস্থাপন করা হয়। সুফীয়া (মরমীরা) তখন এই মতবাদের অনুসরণ শুরু করে। অবশেষে, মুতাজিলাহর (যুক্তিবাদী) অনুসারীদের মধ্যে (যারা একটি দর্শনভিত্তিক গোষ্ঠি নামে পরিচিত এবং যাদের মধ্যে অনেকে আব্বাসীয় খলিফা, মামুনের (৮১৩-৮৩২) প্রশাসনের সময় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) এই মতবাদ আলোড়ন সৃষ্টি করে। খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায়, মুতাজিলাহারা তাদের বিকৃত দর্শন ও মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করতে শুরু করল। সারা সাম্রাজ্যে আদালত বসানো হয় এবং মুতাজিলাহ দর্শনের বিরোধিতা করার কারণে বহু বিদ্বান ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড, জেল ও নিপীড়ন করা হয়।

এই অবস্থায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলই প্রথম (৭৭৮-৮৫৫) নিজ অবস্থানে দৃঢ় থেকে প্রথম দিকের মুসলিম আলেম এবং সাহাবাদের পক্ষাবলম্বন করেন এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। খলিফা আলমুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৮৬১) এর রাজত্বকালে মুতাজিলাহভুক্ত দার্শনিকদের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ থেকে অপসারণ করা হয় এবং তাদের দর্শন সরকারীভাবে বাতিল বলে গণ্য করা হয়। যদিও তাদের বেশীর ভাগ মতবাদ সময়ের সাথে সাথে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তবুও আল্লাহ যে সর্বত্র বিরাজমান (সর্বব্যাপী) তা আশারীয় মতবাদ অনুসারীদের মধ্যে আজও পর্যন্ত বিদ্যমান।[৫৬] যে সকল পন্ডিতগণ মুতাযিলাহ দর্শন পরিত্যাগ করেন এবং মুতাজিলাহ তত্ত্বের মাত্রাধিক দার্শনিক ভিত্তি খন্ডন করার প্রচেষ্টা করেন তাঁরাই আশারীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সর্বব্যাপিতা মতবাদে বিপদ

স্বর্গীয় সর্বব্যাপিতা (স্রষ্টা সর্বত্র বিরাজমান এই বিশ্বাস) নামক ভ্রান্ত গুণাবলীর ভিত্তিতে কেউ কেউ দাবী করে যে, স্রষ্টা প্রাণী, গাছপালা অথবা খনিজ পদার্থের চেয়ে মানুষের মধ্যে বেশী বিদ্যমান ছিল। ঐ তত্ত্ব হতে কেউ কেউ দাবী করেছিল যে অন্যান্য মানুষের তুলনায় স্রষ্টা, হুলুল (মানুষের মধ্যে বসবাসকারী আল্লাহ) অথবা ইত্তিহাদ (মানুষের আত্মারা সঙ্গে আল্লাহ আত্মার সম্পুর্ণ এককত্বতা) এর কারণে তাদের নিজেদের মধ্যে বেশী বিরাজমান। নবম শতাব্দীর মুসলিমগণের মধ্যে আল্-হাল্লাজ (৮৫৮-৯৯২) নামে একজন উন্মাদ সাধক এবং তথাকথিক ওলি খোলাখুলিভাবে ঘোষণা দেয় যে, সে এবং আল্লাহ এক।[৫৭] দশম শতাব্দীর শিয়া সম্প্রদায় হতে দলত্যাগী নুশারাইতগণ দাবী করেছিল যে, রাসুলের (সাঃ) জামাতা আলী ইবনে আবু তালিব এর মাধ্যমে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।[৫৮] একাদশ শতাব্দীতে দ্রুজ নামে অপর এক দলত্যাগী শিয়া সম্প্রদায় দাবি করেছিল যে, ফাতেমীয় শিয়া খলিফা আল-হাকিম বিন আমরিল্লাহ (৯৯৬-১০২১) মানুষের মধ্যে স্রষ্টার শেষ দেহধারণ।[৫৯] ইবনে আরাবী (১১৬৫-১২৪০) নামে দ্বাদশ শতাব্দীর এক তথাকথিত সুফী ওলি বিশ্বাস করত যে, স্রষ্টা মানুষের ভিতরে বিরাজমান। কাজেই তার কবিতার মাধ্যমে তার অনুসারীদের নিজেদেরকে প্রার্থনা করার এবং নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে প্রার্থনা করা করায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।[৬০] এই একই মতবাদের সারমর্ম অনুযায়ী আমেরিকায় এলাইজা মুহাম্মদ (মৃ-১৯৭৫) দাবী করে যে

সাধারন অর্থে, লিঙ্গ হল হিন্দু বিশ্বে সম্পুর্ণতার প্রতীক..... । একটি সাধারন হিন্দু অনুষ্ঠানে, একজন পুরোহিত একটি লিঙ্গকে পুষ্প দ্বারা শোভিত করে, ঘি মাখায় এবং পুষ্প ও পানি দ্বারা ধৌত করে।

৫৬. *আবুল-হাসান আলী আল্-আশ'আরী (৮৭৩-৯৩৫খৃঃ) নামে বসরায় জন্মগ্রহনকারী একজন ধর্মতত্ব বিশেষজ্ঞ ছিলেন যিনি চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মুতাযিলা ধর্ম বিশেষজ্ঞ আল্-যুবা'ই এর ছাত্র ছিলেন।তার নাম অনুসারে আশারীয় ধর্মতত্বেও নামকরন করা হয়।আবুল হাসান হাদিস অধ্যয়ন করার পর মুতাজিলাহ মতবাদ এবং ইসলামী ধ্যান-ধারনার (ঝঢ়রৎরঃ ড়ভ ওংষধস) মধ্যে বিদ্যমান অসংগতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নতুন মধ্যযুগীয় দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে আশারীয় মতবাদ হিসাবে বিস্তার লাভ করে।তার সবচেয়ে বিখ্যাত কীর্তি হল আল্-ইবা'নাহ উসুল আদ্- দিয়ানাহ এবং মাকা'লাত আল্-ইসলা'মী'য়ীন (al-Ibaanah `an Usool ad-Diyaanah,translated by W.C. Klem, New aven, 1940 and Maqaalaat al-Islaameeyeen Cairo: Maktabahn-Nahdah al-Misreeyah, 2nd ed. 1969) আল-আশ'আরী তাঁর জীবনের শেষের দিকে সম্পূর্ণভাবে মধ্যযুগীয় দর্শন পরিত্যাগ করেন এবং এককভাবে হাদিসের উপর নির্ভর করেন। তবে অন্যান্য ধর্ম তাত্ত্বিকগণ বিশেষ কওে শা'ফী মতবাদের বিশেষ কিছু ধর্ম বিশেষজ্ঞ তার আগেকার মতবাদ গ্রহণ করে আশারীয় মতবাদ তাদের নিজেদের মত করে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে। (Shorter Encyclopedia of Islam, pp. 46-47 and pp. 210-215)*

৫৭. *A.J. Arberry, Muslim Saints and Mystics, London : Routledge and Kagan Paul, 1976, pp 266-271.*

৫৮. *Shorter Encyclopedia of Islam, pp. 454-455.*

৫৯. *একই পুস্তকের পৃষ্ঠা ৯৪-৫।*

৬০. *ইবনে আরাবী আল্লাহকে এমনভাবে বর্ণনা দিয়েছিল, "মহিমা হোক তাঁর, যিনি সকল বস্তুকে প্রকাশিত করার সময় তাদের সত্ত্বা হয়েছেন। See Ibn Arabee, al-Futoohaat al-Makkeeyah, vol.2, p.604, quoted in Haadhihee Heya as-Soofeeyah by Abdur Rahman al-Wakeel, Makkah: Daar al-Kutub al-Ilmeeyah, 3rd ed. 1979, p. 35).*

প্রত্যেক কৃষ্ণকায় মানুষের মধ্যেই আল্লাহ আছে এবং তার পরামর্শদাতা ফারদ মুহাম্মদ নিজেই সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ।[৬১] মানুষের নিজেকে স্রষ্টা বলে দাবী করা এবং তা মেনে নেবার সবচেয়ে সাম্প্রতিক উদাহরণ হল ১৯৭৯ সনে গায়নায় রেভারেন্ড জিম জোনস তাঁর ৯০০ জন অনুসারীসহ নিজস্ব জীবন বিসর্জন করা। প্রকৃতপক্ষে, জিম জোনস অন্য আর একজন আমেরিকান যে নিজের নাম ফাদার ডিভাইন রেখেছিল, তার কাছ থেকে নিরপরাধ লোকদের কাজে লাগিয়ে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের দর্শন এবং মনস্তাত্বিক কৌশল শিখেছিল। ফাদার ডিভাইন এর সত্যিকার নাম ছিল জর্জ বেকার। ১৯২০ সালের পূর্বের মন্দা কালে জর্জ বেকার গরীবদের জন্য রেস্টুরেন্ট খুলেছিল। তাদের পেট জয় করার পর, সে তাদের উপর দাবী প্রক্ষেপ করেছিল যে সে মুর্তিমান ঈশ্বর। সময় কালে সে বিবাহ করে এবং তার কানাডীয় স্ত্রীর নাম রাখে মাদার ডিভাইন। ত্রিশ দশকের মাঝামাঝির মধ্যে তার অনুসারীদের সংখ্যা নিযুত ছাড়িয়ে যায় এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে এমনকি ইউরোপেও তা অনুসারীদের দেখা যায়। [৬২]

এই ভাবে ঈশ্বরত্বের এই সব দাবি কোন নির্দিষ্ট অথবা ধর্মীয় গোষ্টীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা যেখানে উর্বর জমি পেয়েছে সেখানেই সহজে শিকড় গজিয়েছে। মানুষরূপী ঈশ্বর মতবাদ গ্রহণ করার জন্য করোর মনে যদি ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতায় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তৈরি হয়ে থাকে তাহলে যারা দেবত্ব দাবি করে তারা সহজেই এদের অনুসারী হিসাবে পেয়ে যায়।

এই উপসংহারে উপণীত হওয়া যায় যে আল্লাহ সবত্র বিরাজমান। এই বিশ্বাস অতিশয় বিপজ্জনক; মূখ্যতা এই করণে যে, এই বিশ্বাস আল্লাহর সৃষ্টিকে উপসনা করার মত সবচেয়ে বড় পাপকে উৎসাহিত করে, নিরাপত্তাবিধান করে এবং যুক্তিসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করে। এটা তৌহিদ আল আসমা ওয়াস সিফাত অন্তর্গত শিরকেরও একটি রূপ কারণ এটা স্রষ্টার জন্য এমন এক গুন দাবি করে যা তার নয়। কোরআন অথবা রাসূলের (সঃ) জবাণীতে আল্লাহর এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে কোরআন এবং সুন্নাহ এর বিপরীত নিশ্চিত করে।

স্পষ্ট প্রমানাদি

যেহেতু আল্লাহর দৃষ্টিতে সব চেয়ে বড় গুনাহ হল তাকে ছাড়া অথবা তার পাশাপাশিষ অন্যকে উপাসনা করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য সকলই তাঁর সৃষ্টি, সেহেতু ইসলামের সকল দর্শণ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সৃষ্টিকে উপাসনা করার বিরোধীতা করে। বিশ্বাসের মৌলিক দর্শন স্রষ্টাএবং তার সৃষ্টি হতে পৃথক এবং তার সৃষ্টির উর্ধে এই বিষয়টি মুসলিম আলেমগণ প্রতিষ্ঠা কুরআন এবং সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে যে অসংখ্য প্রমাণাদি রয়েছে তা ব্যবহার করেন। এই ধরনের সাতটি প্রমাণ নিন্মরূপঃ

১। সহজাত প্রবৃত্তি থেকে প্রমাণঃ

ইসলামি দৃষ্টি কোণ হতে মানুষ কিছু স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে এবং সে কেবলমাত্র তার পরিবেশ সৃষ্টি নয়। এই বিষয়টির ভিত্তি কোরআনের এবং সেই অংশ যেখানে আল্লাহ বর্ণনা দিয়েছেন যে যখন তিনি আদম সৃষ্টি করেন তখন তিনি আদম হতে তার সকল বংশধরদের বের করেন এবং তার এককত্বের স্বাক্ষীকরেন। এই মতবাদটি আরও জোরদার হয় রাসূলের (সঃ) বিবৃতিতে যে, প্রতিটি সদ্যজাত শিশু আল্লাহকে প্রার্থণা করার প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে একজন ইহুদী, একজন জাদুকর অথবা এজন খৃস্টান হিসাবে তৈরি করে। [৬৩] আল্লাহকে প্রার্থণা করার এই সহজাত প্রতিক্রিয়া আল্লাহ সবত্র বিরাজমান এই বিশ্বাসের যুক্তি হিসেবে কেউ ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু যদি আল্লাহ সব জায়গায় এবং সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান থেকে তাহলে এটা ইঙ্গিত করে যে ঈশ্বরের নির্যাস নোংরা বস্তু এবং নোংরা স্থানেও দেখা যাবে। বেশীর ভাগ তারা এমন কোন বিবৃতি গ্রহণ করতে অপারগ যা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা মানুষের বিষ্ঠা অথবা অন্য কোন বস্তু মধ্যে মহামান্যের জন্য যথাযথ নয় এমন স্থানে বিদ্যমান। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপণিত হয় যে '' আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান'' এই দাববি সঠিক হবার সম্ভাবনা খুব কম। যারা '' স্রষ্টা সর্বত্র বিরাজমান'' এই বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক নয়, তারা তর্ক করতে পারে যে সহজাত প্রবৃত্তির জন্য নয়, ছেলেবেলার শিক্ষাদীক্ষা এবং সামাজিক অবস্থানের ফলশ্রুতিতে মানুষের এই মতবাদের প্রতি বিকর্ষণ। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েরা আল্লাহ যে সর্বত্র বিরাজমান সে সম্বন্ধে পূর্বেই শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দ্বিধা অথবা গভীর চিন্তা ছাড়াই তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে।

২। প্রার্থণা থেকে প্রমাণঃ

ইসলামের নিয়ম অনুযাযী সালাতের স্থান সমূহকে মূর্তি অথবা চিত্র দ্বারা আল্লাহ বা তার সৃষ্টি কে প্রকাশিত করা হতে সর্ম্পূণ মুক্ত রাখতে হবে। এই ভিত্তি সালাতের বিভিন্ন ভঙ্গি (আনত হওয়া, অবনত হওয়া ইত্যাদি) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর

---

৬১. *Elijah, Muhammad, Our Sovior Has Arrived, (Chicago: Muhammadistemple of Islam, no. 2, 1974) pp 26, 56, 57, 39, 39-46)*

৬২. *E.U. Essien-Udom, Black Ntioalism, (Chicago: University of Chicago Press, 1962)*

৬৩. *আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এবং আল্-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.8, p.369-90, no.597 and Sahih Muslim, Englishtrans, vol.4, pp.1399, no. 6429)*

প্রতি উদ্দেশ্য করা নিষিদ্ধ। স্রষ্টা যদি সকল স্থান, বস্তু এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে বিরাজমান হত তাহলে অখ্যাত সূফী "ওলি" ইবনে আরবীর দাবী অনুযায়ী একজন অপরকে উদ্দেশ্য করে অথবা এমনকি স্বয়ং তাদের নিজেদের কে উদ্দেশ্য করে তাদের ইবাদত পরিচালনা করা সর্ম্পূণভাবে গ্রহনীয় হত। একন মূর্তিপূজারীকে অথবা গাছ এবং প্রাণী পূজারীকে যৌক্তিকভাবে বুঝান সম্ভব হবে না যে তার পূজার পদ্ধতি ভূল এবং অদৃশ্য স্রষ্টা যিনি একা এবং অংশীদার বিহীন শুধু তারই প্রার্থণা করা উচিত। মূর্তিপূজারী স্রেফ উত্তর দেবে যে, সে বস্তু কে পূজা করছে না, সে এই বস্তুর মধ্যে নিহিত স্রষ্টার অংশ অথবা মানুষ বা প্রাণীর রূপ আকারে প্রকাশিত স্রষ টা পূজা করছে। তথাপি হাজার যুক্তি সত্ত্বেও যে কেউ এই ধরনের কাজ করে ইসলাম তাকে কাফির (অবিশ্বাসী) শ্রেণীভূক্ত করে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের ব্যক্তিবিশেষ স্রষ্টার সৃষ্টির সমম্মুখে সিজদায় যায়। মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্টি বস্তুর উপসানা থেকে সরিয়ে নিয়ে একমাত্র স্রষ্টাকে উপাসনার দিকে ফিরিযে আনার জন্য ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল। সুতরাং উপাসানা সম্বন্ধে ইসলাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, আল্লাহকে সৃষ্টি করা বস্তুর মধ্যে পাওয়া যাবে না; তিনি তাদের থেকে সর্ম্পণ আলাদা। এই অবস্থান আরও মজবুত হয় এই কারণে যে স্রষ্টা অথবা প্রাণীজগতের জীবন্ত কিছুকে চিত্র দ্বারা প্রকাশ করাকে ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছ।

৩। মিরাজ থেকে প্রমাণঃ

মদীনায় হিজরত করার দুই বৎসর পূর্বে রাসূল (সঃ) মক্কা হতে জেরুজালেমে অলৌকিক রাত্রি ভ্রমণ (ইসরা) করেন এবং সেখান হতে তিনি (সঃ) মিরাজ [৬৪] চড়ে সাত আসমানের সৃষ্টির সর্বোচ্চ সীমায় গমণ করেন। তিনি যাতে সরাসরি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে পারেন এ জন্য তাকে এই অলৌকিক ভ্রমন করান হয়েছিল। সেখানে সপ্তম আসমানের উর্দ্ধে, দিনে পাচবার সালাত (আনুষ্ঠানিত প্রার্থণা) বাধ্যতামূলক করা হয়, আল্লাহ সরাসরি রাসূলের (সঃ) সঙ্গে কথা বলেন এবং সূরা আর বাকারার (কোরআনের দ্বিতীয় সূরা) শেষ আয়াত গুলি অবতীর্ণ। [৬৫]

যদি আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান হতেন তাহলে রাসূলকে (সঃ) কোথাও যেতে হত না। তিনি নিজের বাড়ীতে সরাসরি আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে পারতেন। সুতরাং অলৌকিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে ঊর্দ্ধে স্বর্গারোহণে একটি প্রচ্ছন্ন উঙ্গিত রয়েছে যেঙ আল্লাহ তরি সৃষ্টির ঊর্ধে কোন অংশ নয়।

৪। কোরআন থেকে প্রমাণঃ

আল্লাহ তার সৃষ্টির ঊর্ধে কোরআনে বর্ণিত এরূপ প্রচুর আয়াত আছে। এই গুলি কেতারআনের প্রায় প্রতি সূরাতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাওয়া যায়। যে সব আয়াতে কোন জিনিষের স্রষ্টা পর্যন্ত ঊর্ধে গমণ অথবা তার নিকট হতে অবতরণের উল্লেখ রয়েছে ঐগুলি পরোক্ষ ইঙ্গিতের মধ্যে পড়ে। যথা সূরা আল ইখলাছে আল্লাহ নিজেকে আস সামাদ [৬৬] বলে নাম দিয়েছেন, যার অর্থ বস্তু যার নিকট ঊর্ধ্বগামী হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরণের উল্লেখ আক্ষরিক, যেমন ফেরেশতাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেনঃ

"ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্দ্ধগামী হয় এমন একদিনে যাহা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান। *(সূরা আল মা আরিজ ৭০ঃ ৪)*

এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক যেমন সালাত এবং যিকির সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেনঃ

তাহারই দিকে পবিত্র বাণী সমূহ আরোহন করে। *(সূরা ফাতির ৩৫ঃ ১০)*

এমনকি নিন্মোক্ত সূরায়

ফিরআউন বলিল, ' হে হামান আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাহাতে আমি পাই আসমানে আরোহনের অবলম্বন, যেন দেখিতে পাই মূসার ইলাহকে,তবে আমি তো উহাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি....... । *(সূরা ম'মুনি ৪০ঃ৩৬-৭)*

আল্লাহর নিকট হতে আরোহন সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সূরায় উদাহরণ পাওযা যাবেঃ

"বল তোমার প্রতিপালকের হইতে রুহুল কুদস জিবরাইল সত্যসহ কোরআন অবর্তীণ করিয়াছি, যাহারা মুমিন তাহাদিগকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পনকারী জন্য।

---

৬৪. মি'রাজ (আক্ষরিক অর্থে সিড়ি অথবা মই) প্রকৃতপক্ষে একটি বাহন যা রাসুল (সঃ) কে আকাশের মধ্য দিয়ে উর্দ্ধে নিয়ে গিয়েছিল।তবে স্বর্গারোহনকে সাধারনত এই নাম বলা হয়। (Lanes, Arabic-English Lexicon, vol. 2, pp 1966-7 দেখুন।

৬৫. রাসুল (সঃ) এর এই ঘটনার বিবরণের জন্য পড়ুন। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.9, pp.449-50, no.608 and Sahih Muslim, Englishtrans, vol.1, pp.103-4, no.313)

৬৬. সূরা আল্-ইখলাছ ১১২ঃ২।

আল্লাহর নাম গুলিতে এবং তার প্রদত্ত স্পষ্ট বাণীতে প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ নিজেকে আল আলী এবং আল আল্লা বালে নাম দিয়েছেন যার উভয়ের অর্থ সুউচ্চ, যার উপরে আর কিছু নেই। উদাহরণ স্বরূপ আল আলী আল আধহীম [৬৭] "রাব্বিকাল আ'লা"। [৬৮] তিনি নিজেকে তার দাসগণের উর্দ্ধে বলেও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

"তিনি আপন বান্দাদিগের উপর পরাক্রমশালী।" *(সূরা আল আন আম ৬ঃ ১৮ এবং ৬১)*

এবং তিনি তার ইবাদতকারীদেরও যেমন র্বণনা দেনঃ

"উহারা ভয় করে, উহাদিগের উপর পরাক্রমশালী রবকে।" *(সূরা আন নাহাল ১৬ঃ ৫০)*

সুতরাং যারা গভীরভাবে চিন্তা করে, কোরআন নিজেই তাদের স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তার সৃষ্টির অনেক উর্ধে এবং কোন ভাবেই এর ভিতরে অথবা এ রদ্বারা পরিবেষ্টিত নয়। [৬৯]

৫। হাদিস থেকে প্রমাণঃ

রাসূলে (সঃ) বিবরণের মধ্যে প্রচুর প্রামাণ রয়েছে যেগুলি পরিস্কার ভাবে প্রতিষ্ঠা করে যে আল্লাহ পৃথিবী অথবা তার সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান নয়। কোরআনের আয়াতগুলির মত হাদিসে কিছু পরোক্ষ এবং কিছু প্রত্যক্ষ উল্লেখ রযেছে। পরোক্ষ হাদিস ঐ গুলি যে গুলিফেরেশতাদের আল্লাহ পর্যন্ত উর্দ্ধগমনের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন আবু হুরায়রাহর হাদিসে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, " (একদল) ফেরেশতারা রাত্রে এবং (অন্য আর একদল) দিনে দিনে তোমার সঙ্গে থাকে এবং আসর (সন্ধা) ও ফরজ (প্রত্যুষ) সালাতের সময় উভয় দল দল মিলিত হয়। তারপর যে সব ফেরেশতারা সারা রাত তোমার কাছে ছিল তারো উর্দ্ধে গমন (আসমানে) করে এবং আল্লাহ তাদের কে জিজ্ঞাসা করেন (তোমাদের সম্বন্ধে) যদিও তিনি তোমাদের সম্বন্ধে সবই জানেন......।" [৭০]

পরোক্ষ উল্লেখের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ঐ গুলি যে গুলি প্রকাশ করে যে আল্লাহ তার সিংহাসনের উর্দ্ধে রয়েছেন এবং যে সিংহাসন সকল সৃষ্টির উপরে। এই ধরণের একটি উদাহরণ আবু হুরায়রাহর বর্ণনায় পাওয়া যায় যেখানে রাসূল (সঃ) বলেছেন, "যখন আল্লাহ সৃষ্টি সমাপ্ত করলেন, তিনি তার কাছে তার সিংহাসনের উর্দ্ধে রক্ষিত একটি পুস্তক (যা তিনি রেখেছিলেন) লিখেছিলেন, নিশ্চয়ই আমার করুনা আমার ক্ষোভ হতে অগ্রগামী হবে।" [৭১]

প্রত্যক্ষ উল্লেখের একটি উদাহরণ হল রাসূল (সঃ) স্ত্রী জয়নাব বিনতে যাহশ যিনি রাসূলের (সঃ) অন্য স্ত্রীগণের নিকট গর্ব করতেন। যে, যখন আল্লাহ সপ্তম আসমান এর উর্দ্ধে হতে তাকে বিবাহ দিলেন তখন তার পরিবার তাকে রাসূলের (সঃ) কাছে সম্প্রদান করলেন। [৭২]

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় দুয়ায় (প্রার্থণা) যাদ্বারা রাসূল (সঃ) অসুস্থদের তাদের নিজেদের জন্য প্রার্থণা করতে শিখিয়েছিলেনঃ

"রাব্বানা আল্লাহ আল্লাজি ফিস সামায়ী তাকাদাসাসমুকা...।"

(আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আসমানের উপরে, আপনার নাম পবিত্র হউক.....) [৭৩]

নিম্নোক্ত হাদিসটি বোথ হয় পক্যক্ষ উল্লেখের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ন প্রকাশিতঃ

মু'আবিয়াহ ইবনে আল হাকাম বলেন, "আমার একটি চাকরানী ওহোদ পাহাড় এলাকার আল জাওয়ারীয়াহ নামে একটি জায়গায় ভেড়া চরাত। একদিন আমি এসে দেখলাম যে একটি নেকড়ে বাঘ তার ভেড়ার পাল থেকে একটি ভেড়া তুলে নিযে গেছে। যেহেতু আদমের অন্যান্য বংশধরদের মত আমার মধ্যে দুঃখ জনক কাজ করার প্রবণতা ছিল, আমি তার মুখে সজোরে থাপ্পর মারলাম। আমি ঘটনাটি রাসূলে (সঃ) কাছে বর্ণনা দিলাম, তিনি এটাকে আমার পক্ষ হতে গুরুতর কাজ সংঘটিত হয়েছে বলে

---

৬৭. *সূরা আল্-বাকারা ২ঃ২২৫।*

৬৮. *সূরা আল্-আ'লা ৮৭ঃ১।*

৬৯. *al-Aqeedah attahaaweeyah পৃষ্ঠা ২৮৫-৬ দেখুন।*

৭০. *আল্-বুখারী, মুসলিম এবং আন্-নাসায়ী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.3, p.386-7, no.525 and Sahih Muslim, Englishtrans, vol.1, pp.306-7 no. 1320).*

৭১. *আল্-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.9, pp.382-3, no.518 and Sahih Muslim, Englishtrans, vol.4, p.1437, no. 6628)*

৭২. *আনাস কর্তৃক বর্ণিত এবং আল্-বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.9, p.382, no.517)*

৭৩. *আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত। Sunan Abu Dawud, Englishtrans, vol.3, p.109, no.3883).*

গণ্য করলেন। আমি বললাম '' হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমি কি তাকে মুক্তি দিয়ে দিতে পারি না? [৭৪] তিনি উত্তর দিলেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। সুতরাং আমি তাকে নিয়ে এলাম। তিনি (সঃ) তখন তাকে জিজ্ঞাস করলেন, আল্লাহ কোথায়? এবং সে উত্তর দিল, আসমানের উপরে। তারপর তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে? সে উত্তর দিল, আপনি আল্লাহর রাসূল। সুতরাং তিনি বললেন তাকে মুক্তি দাও, কারণ নিশ্চয়ই সে একজন সত্যিকার বিশ্বাসী। [৭৫]

অন্যের বিশ্বাস পরীক্ষা করার সময় তাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য যৌক্তিক প্রশ্ন হবে '' তুমি কি আল্লাহকে বিশ্বাস কর।" রাসূল (সঃ) ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেননি কারণ ঐ সময় বেশির ভাগ লোকই আল্লাহয় বিশ্বাস করত, যেমন বারংবার কোরআন উল্লেখ করেঃ

"যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাস কর, কে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র সূর্য কে নিয়ন্ত্রিত করেছেন? উহারা অবশ্যই বলিবে আল্লাহ।" *(সূরা আর কাবুত ২৯ঃ৬১)*

যেহেতু ঐ সময়কার পৌত্তলিক মক্কাবাসীরা বিশ্বাস করতে যে, আল্লাহ যে কোন ভাবেই হোক তাদের মূর্তিদের মধ্যে বিদ্যমান এবং তার ফলে সৃষ্টির কিছু অংশের মধ্যে বিদ্যমান, রাসূল (সঃ) বের করতে চেয়েছিলেন যে অন্যান্য মক্কাবাসীদের মত ঐ মেয়েটির বিশ্বাস বিভ্রান্ত এবং পৌত্তলিক ভাবধারার ছিল নাকি স্বর্গীয় শিক্ষানুযাযী পরিস্কার একককত্বে দশর্ণের মধ্যে ছিল। এই কারণে রাসূল (সঃ) এমন ভাবে প্রশ্নটি করলেন যার ফলে নির্ধারণ করা যায় যে মেয়েটি কি জানে যে, আল্লাহ আল্লাহ তার সৃষ্টির অংশ নয়, নাকি সে বিশ্বাস করে যে সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টার উপাসনা করা যায়। খাঁটি মুসলিমদের ধরে নিতে হবে যে, আল্লাহ আসমানের উপরে মেযেটির এই উত্তর আল্লাহ কোথায় এই প্রশ্নের একমাত্র বৈধ উত্তর। কারণ এরই ভিত্তিতে রাসূল (সঃ) রায় দিয়েছেন যে মেয়েটি সত্যিকার মুসলিম। যদি আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান হত যা নিয়ে এখনও মুসলিম তর্ক করে, তাহলে রাসূল (সঃ) আসমানের উপরে এই উত্তরের ভুল সংশোধন করতেন। রাসূলে (সঃ) এর সামনে যখন যা কিছু বলা হত তা তিনি প্রত্যাখ্যান না করলে ইসলামি আইন হিসাবে অনুমোদিত সুন্নাহ (তাকরীরিয়াহ) বলে গণ্য হত এবং তা বৈধ হত। যা হোক রাসূল (সঃ) মেয়েটির বক্তব্য শুধু গ্রহণই করেন নি, বরং তিনি তাকে একজন সতিকার বিশ্বাসী হিসাবে গণ্য করার একটি ভিত্তি হিসাবেও ব্যবহার করেছিলেন।

৬। যুক্তিসম্মত প্রমাণঃ

যুক্তিসম্মতভাবে বলতে গেলে, এটা সুস্পষ্ট যে যখন দুইটি জিনিস বিদ্যমান তাকে, তাদের মধ্য একটি নিশ্চয়ই অপরটির একটি অংশএবং এর গুনাবলির উপর নির্ভরশীল হয় অথবা অন্যটি থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করে। এতদানুসারে স্রষ্টা যখন বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন কখন হয় তিনি তার নিজের ভিতর তা সৃষ্টি করেছিলেন অথবা তার নিজের বাইরে সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথম সম্ভাবনা গ্রহনযোগ্য নয় কারণ তখন এটার অর্থ এই হত যে আল্লাহ অসীম সত্তার ভিতর অসম্পূর্ণ এবং দূর্বল সসীম গুনাবলী বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই তার নিজের বাইরে তার থেকে স্বতন্ত্র অথচ তার উপর নির্ভরশীল একটি সত্ত্বার হিসাবে বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। নিজের থেকে বাইরে বিশ্ব সৃষ্টি করে মনে হয় তিনি তার থেকে উপরে অথবা নীচের দিকে প্রার্থণা করা কোথাও নিশ্চিত করে না এবং সৃষ্টির নীচে হওয়াকে স্রষ্টার মহত্ব মহিমা এবং সার্বভৌমত্বের বিরোধীতা করা হয়, সেহেতু স্রষ্টা নিশ্চয়ই তদার সৃষ্টির উর্দ্ধে এবঙ এর থকে স্বতন্ত্র। স্রষ্টা পৃথিবীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, এর থেকে পৃথকও নয় অথবা তার অস্তিত্ব পৃথিবীর মধ্যে এবং এর বাইরেও নয়। [৭৬] এই ধরণের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য শুধু অযৌক্তিকই নয় এগুলি প্রকৃত পক্ষে স্রষ্টার অস্তি ত্বকে অস্বীকার করে। [৭৭] এই ধরনের দাবি স্রষ্টাকে মানুষের চিন্তার পরবাস্তববাদী রাজ্যে নিযে যায় সেখানে বিপরীত বস্তু সহ অবস্থানে থাকতে পারে এবং অসম্ভব বিদ্যামান থাকবে (যেমন একের ভিতর মধ্যে তিন স্রষ্টা)।

৭। পূর্বেকার আলেমদের ঐক্যমতঃ

স্রষ্টার সীমাবর্হিভূত অস্তিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পূর্বেকার ইসলামি আলেমগণের এত অসংখ্য বক্তব্য আছে যে তা তুলে ধরা এই সংক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার বাইরে। পঞ্চদশ শতকের হাদিস পন্ডিত আয যাহাবী আল্লাহর অপার এবং অসীম অস্তিত্বে নিশ্চিত করে

---

৭৪. *আল বুখারী, মুসলিম এবং আবু দাউদ, কর্তৃক প্রেরিত একটি হাদীস সংগ্রহ করেন যেখানে আবু হুরায়রা বর্ণনা দিয়েছেন যে আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, "যখন তুমি আঘাত কর (অন্যকে), মুখমন্ডল এড়িয়ে কর।" (দেখুন Sahih Muslim, Englishtrans, vol.4, p.13789, no. 6321-6 Ges Sunan Abu Dawud, Englishtrans, vol.3, p.1256, no.4478).এটা উল্লেখ আছে যে তিনি বলেছেন, "একজন দাসকে থাপ্পড় মারা অথবা প্রহার করার খেসারত হিসাবে তাকে আজাদ করে দাও।" (Sahih Muslim, Englishtrans, vol.3, p.882-3, no. 4078)*

৭৫. *মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, Englishtrans, vol.1, p.271-2, no.1094)*

৭৬. *See Haashiyah al-Beejooree alaa al-Jawharah, p.58.*

৭৭. *Al-Aqeedah attahaaweeyah, pp. 290-1. See also Ahmad ibn Hanbals ar-Radd Alaa al-Jahmeeyah.*

অতীতের দুই শতরেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ আলেমদের বক্তব্য আল উলু রিল আলী আল আধহীম নামে একটি পুস্তকে গ্রন্থিত করেছিলেন।[৭৮]

এই ধরনের বক্তব্যের একটি উত্তম উদাহরণ মূতী আল বালকীর বর্ণনায় পাওযা যায় সেখানে তিনি আবু হানিফার কাছে জানতে চান সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে যে জানে না তার প্রতিপালক আসমানে না জমিনের উপর বিদ্যমান। আবু হানিফা উত্তর দিলেন, "সে অবশ্বাস করেছে, কারণ আল্লাহ বলেছেন "দয়াময় আরশে সামসীন" *(সূরা তাহা ২০ঃ৫)* এবং তার সিংহাসন সপ্তম আসমানের উর্দ্ধে। অতপরঃ তিনি (আলবালাখী) বললেন, যদি সে বলে যে তিনি (আল্লাহ) সিংহাসনের উপরে কিন্তু সে জানে না যে সিংহাসন আসমানের না জমিনের উপরে, তাহলে কি হবে? তিনি (আবু হানিফা) উত্তর দিলেন, সে অবিশ্বাস করেছে এবং তিনি আসমানের ঊর্ধে বিদ্যমান এ কথা সে অস্বীকার করেছে এবং তিনি আসমানের ঊর্ধে এ কথা যে স্বীকার করবে সে অবিশ্বাসী।[৭৯] যদিও আবু হানিফার আইন শিক্ষার বহু অনুসারীগণ আজকাল দাবি করে যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, পূর্বের অনুসারীগণ এই দাবির সঙ্গে একমত ছিলেন না। ঐ সময়ের এবং তৎকালীন সময়ের বহু পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে যে বিশর আল মারীছী[৮০] যখন আল্লাহ সিংহাসনের ঊর্ধে এ কথা অস্বীকার করেছিল তখন আবু হানিফার প্রধান ছত্র আবু ইউসুফ তাকে অনুতপ্ত হতে বলেছিলেন।[৮১]

সুতরাং, ইসলাম এবং এর প্রধান তত্ত্ব তৌহিদ অনুসারে নিরাপদে বলা যায় যেঃ

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি হতে সর্ম্পূণ আল্লাদা।

কোন প্রকারেরই সৃষ্টি তাঁকে বেষ্টিত করে নেই অথবা তাঁর ঊর্ধে বিদ্যমান নেই।

আল্লাহ সকল বস্তুর ঊর্ধে।

ইসলামের মূল সূত্র হিসাবে আল্লাহ সম্বন্ধে এটাই হল সঠিক মতবাদ। এটা খুব সহজ এবং দৃঢ়। এতে এমন কোন স্থান নেই যার ফলে সৃষ্টিকে উপাসানা করার মত ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করার সম্ভাবনা থাকে।

এই মতবাদ অবশ্য অস্বীকার করে না যে, আল্লাহর গুনাবলি তাঁর সৃষ্টির সর্বাংশে চালু রয়েছে। কিছুই তাঁর দৃষ্টি, জ্ঞান এবং শক্তি এড়িয়ে যেতে পারে না। ঘরের আরামদায়ক পরিবেশে বসে পৃথিবীর অপর প্রান্তে ঘটনা অবলোকন করাকে যখন প্রযুক্তির প্রধান অগ্রগতি মনে করা হয়, সেখানে এটা মোটেও অসম্ভব নয় যে বিশ্বের মধ্যে বিদ্যমান না থেকেও আল্লাহ যেখানে যা কিছু ঘটে তা সবই দেখতে, শুনতে এবং জানতে পান। ইবনে আব্বাস বলেছেন '' তোমাদের হাতে সরিষার দানা যেমন, আল্লাহর হাতে সপ্ত আসমান, সপ্ত পৃথিবী, তাদের অভ্যন্তরস্থ এবং মধ্যস্থ সকল বস্তু তেমন।[৮২] রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্য টেলিভিশন চালানোকে যেখানে প্রযুক্তির বিরাট অগ্রগতি গণ্য করা হয় সেখানে সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম কণার নিয়ন্ত্রন আল্লাহর উপস্থিতি ব্যতিরেকেই অবিঘ্নিতভাবে ঘটা কোন ব্যপার নয়। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান, এই দর্শণ তৌহিদ আল আসমা ওয়াস সিফাত বিরোধী শিরক। কারণ এখানে আল্লাহর উপর মানুষের দুর্বলতা আরোপ করা হয়েছে। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা দেখা, শুনা, জানা এবং প্রভাব ফেলতে হলে মানুষকেই এই পৃথিবীতে উপস্থিত থাকতে হয়।

অপরপক্ষে, আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতার কোন সীমা নেই। মানুষের চিন্তাভাবনা আল্লাহর নিকটা একেবারেই অনাবৃত এবং এমনকি তার হৃদয়ের আবেগপূর্ণ কার্যাদিও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীল। এই জ্ঞানালোকের দ্বারা কতিপয় আয়াত যেগুলি আল্লাহর নিকটবর্তীতার ইঙ্গিত করে তা বুঝার চেষ্টা করতে হবে। উদাহরন স্বরূপ, আল্লাহ বলেছেন,

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।" *(সুরা কা'ফ ৫০ঃ১৬)*

তিনি আরও বলেছেন,

"হে মু'মিনগণ, রাসুল যখন তোমাদিগকে এমন কিছুর দিকে আহবান করে যাহা তোমাদিগকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসুলের আহবানে সাড়া দিবে এবং জানিয়ে রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তাহার অন্তরের অন্তরালে থাকেন এবং তাহারই নিকট তোমাদিগকে একত্র করা হইবে।" *(সুরা আল-আন্‌ফাল ৮ঃ২৪)*

---

৭৮. *Mukhtasar al-Uloo, p.5.*

৭৯. *আবু ইসমা'য়ীল আল্-আছা'বী কর্তৃক তাঁর al-Faarooq পুস্তকে বর্ণিত এবং al-Aqeedah attahaaweeyah পুস্তকে ২৮৮নং পৃষ্ঠা হতে উদ্ধৃত।*

৮০. *বাগদাদের বিশর (মৃত্যু ৮৩৩ খৃঃ)মানবিক আইনের বিজ্ঞান ও দর্শন এবং নীতিশাস্ত্রেও একজন মুযিলীয় পন্ডিত ছিলেন।.দেখুন al-Alaam, Beirut: Daar al-ilm lil-Malaayeen, 7th ed, 1984, vol.2, p. 55 by Khairudden az-Zfriklee)*

৮১. *আব্দুর রহমান ইবনে হাতিম এবং অন্যান্যদেও কর্তৃক বর্ণিত। al-Aqeedah attahaaweeyah পুস্তকের ২৮৮ পৃঃ দেখুন।*

৮২. *al-Aqeedah attahaaweeyah p.281.*

এই আয়াতগুলো দ্বারা এই মনে করা উচিত হবে না যে, আল্লাহ মানুষের ঘাড়ের মোটা শিরা থেকেও কাছে রয়েছে অথবা মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরের থেকে এর অবস্থার পরিবর্তন করছে। এগুলোর অর্থ এই যে আল্লাহর নজরে কিছুই এড়ায় না, এমনকি মানুষের অন্তরের চিন্তাভাবনা ও তার হৃদয়ের ভাবাবেগও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তনের ক্ষমতার বাইরে নেই। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

"তাহারা কি জানে না যে, যাহা তাহারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষনা করে নিশ্চতভাবে আল্লাহ তাহা জানেন।" *(সুরা আল-বাকারা ২:৭৭)*

('স্মরণ কর) তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে।" *(সুরা আলে-ইমরান ৩:১০৩)*

এবং রাসুল (সাঃ) প্রায়শঃই এই মর্মে প্রার্থনা করতেন,

"ইয়া মুকাল্লিব আল-কুলুব" (হে হৃদয় পরিবর্তনকারী) "ছাব্বিত ক্বালবী আল্লা দীনিক" (তোমার ধর্মে আমার অন্তর স্থির করে দাও)[৮৩]

অনুরূপভাবে, আয়াতগুলি,

"তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; উহারা এতদপেক্ষা কম হউক বা বেশী হউক, উহারা যেখানেই থাকুন না কেন আল্লাহ উহাদিগের সঙ্গে আছেন।" *(সুরা আল-মুজাদালা ৫৮:৭)*

বুঝতে হবে তাদের পটভূমি অনুসারে। একই আয়াতের পুর্ববর্তী অংশ পড়ে,

"তুমি কি অনুধাবন কর না, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ তাহা জানেন।"

এবং আয়াতের উপসংহার থেকে,

"উহারা যাহা করে, তিনি উহাদিগকে কিয়ামতের দিন তাহা জানাইয়া দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।"

এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ এখানে তাঁর সর্ব ব্যাপীতা নয় বরং তাঁর জ্ঞান সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। কারণ তিনি তাঁর সৃষ্টির উর্দ্ধে এবং নাগালের বাইরে।[৮৪]

অনেকে দাবী করে রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যেটা আসলে অনির্ভরযোগ্য হাদীস, "আসমান এবং পৃথিবী আল্লাহকে ধারণ করতে পারে না কিন্তু সত্যিকার মুমিনের অন্তর তাঁকে ধারণ করতে পারে।" কিন্তু, কোন যুক্তিবাদী ব্যক্তির পক্ষেই আল্লাহ যে ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান এই অনুমান করার কোন উপায় নেই। যদি একজন বিশ্বাসীর অন্তর আল্লাহকে ধারণ করে এবং সেই বিশ্বাসী যদি আসমান এবং জমিনের মধ্যে অবস্থান করে তাহলে আল্লাহ আসমান এবং জমিনের অন্তর্ভুক্ত। কারণ যদি ক, খ-এর ভিতরে থাকে এবং খ, গ-এ ভিতরে থাকে তাহরে ক অবশ্যই গ-এর ভিতরে আছে।

সুতরাং কোরআন ও রাসুলের (সাঃ) সুন্নাহ ভিত্তিক চিরায়ত ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে মহাবিশ্ব এবং এর অন্তর্গত সকল কিছুর উর্দ্ধে আল্লাহ এমনভাবে বিদ্যমান আছেন যা তাঁর মহিমার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এর অভ্যন্তরস্থ বস্তুদির উর্দ্ধে এবং তিনি কোন ভাবেই তাঁর সৃষ্টির মধ্য অথবা তাঁর নিজের মধ্যে ধারণকৃত নয়। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির সমস্ত কণিকার মধ্যে কোন বাধা ছাড়াই তাঁর অসীম জ্ঞান, ক্ষমাশীলতা এবং নিয়ন্ত্রণ কার্য সম্পাদন করে।[৮৫]

ভাগ্য গণনা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, মানবজাতির মধ্যে অনেকে আছে যারা অদৃশ্য এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবী করে। তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন- গণক, ভবিষ্যৎ-বক্তা, পূর্ব-পরিজ্ঞেয়ক, দৈবজ্ঞ, যাদুকর, পূর্বাভাষদাতা, দৈববাণী প্রকাশক, জ্যোতিষী, হস্তরেখা বিশারদ ইত্যাদি। গণকরা বিভিন্ন পদ্ধতি এবং মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্যাদি বের করে আনার দাবী করে, যার মধ্যে রয়েছেঃ চায়ের পাতা পড়া, রেখা অংকন, সংখ্যা লেখা, হস্তরেখা-পড়া, রাশিচক্র পরীক্ষা করা, স্ফটিক বলের প্রতি দৃষ্টিপাত, হাড়গোড় ছড়ি ছোড়া (লাঠি চালনা) ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে ভাগ্য গণনার বিভিন্ন কৌশল আলোচিত হবে।

---

৮৩. *আত্ তিরমিজী কর্তৃক সংগৃহীত এবং মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আল্-আলবানী কর্তৃক প্রমানকৃত। (Sahih at-Tirmidhee, Riadh: Arab Burea of Education forthe Gulf Stats, 1st ed. 198, vol.3, p.2792)*

৮৪. *Ahmad ibn al-Husain al-Bayhaqee, Kitab al-Asman was-Sifat, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmeeyah, 1st ed. 1984, pp. 541-2.*

৮৫. *Umar al-Ashqar, al-Aqeedah fee Allah, Kuwait: Maktabah al-Falaah 2nd ed, 1997, p. 171.*

গুপ্ত বিদ্যা পেশাজীবিগণ যারা অদৃশ্য প্রকাশ করতে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম বলে দাবী করে তাদের প্রধানতঃ দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারেঃ

(১) যাদের সত্যিার কোন জ্ঞান বা গুপ্ত বিষয় জানা নেই। কিন্তু সাধারণত ঘটনাবলি যা প্রায় বেশীর ভাগ লোকেরই ঘটে তাই তাদের খরিদ্দারদের বলে। তারা প্রায়ই অনেকগুলি অর্থহীন আচারানুষ্ঠান করে খরিদ্দারদের ধোঁকা দেয় এবং তারপর তারা পরিকল্পিতভাবে সাধারণ অনুমানগুলিই বলে। তাদের কিছু কিছু অনুমান, সাধারণতার কারণে, সচরাচর সত্য হয়ে যায়। বেশীর ভাগ লোকের গুটিকয়েক ভবিষ্যদ্বাণী যা সত্য হয় সেগুলি স্মরণ রাখার প্রবণতা দেখা যায় এবং যেগুলি সত্য হয় না তার বেশীরভাগই তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। এইসব ভবিষ্যদ্বাণীর বেশীরভাগই মানুষের অবচেতন মনে হারিয়ে যায় এবং শুধুমাত্র কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সেগুলো মনে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর আমেরিকাতে প্রতি বৎসরের শুরুর দিকে প্রসিদ্ধ ভবিষ্যৎ বক্তাদের বিভিন্ন ধরণের ভবিষ্যৎদ্বাণী করা একটি সাধারণ আচার হয়ে গিয়েছে। ১৯৮০ সনের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর উপর এক জরিপে দেখা গেছে যে ঐ সবের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভুল ভবিষ্যৎ বক্তার মাত্র ২৪ শতাংশ ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হয়েছিল।

(২) দ্বিতীয় দলভুক্ত তারা যাদের জিনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। এই দলটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর সঙ্গে সাধারণতঃ শির্‌ক এর মত গুরুতর গুনাহ জড়িত। যারা এই কাজে জড়িত তাদের তথ্যাদি অতি নির্ভুল হয় এবং এইভাবে মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের মধ্যে একইভাবে সত্যিকার ফিত্‌না (প্রলোভন) সৃষ্টি হয়।

জিনের জগৎ

কিছু লোক জিন এর বাস্তবতা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে। জিনের সম্বন্ধে কোরআনে একটি সম্পূর্ণ সূরা, সুরা আল্‌-জিন (৭২ *নং সূরা*) অবতীর্ণ হয়েছে। ক্রিয়াপদ জান্না, ইয়াজুন্নুঃ যে গুলির অর্থ অন্তরালে রাখা, আত্মগোপন করা অথবা ছদ্মবেশে পরানো ইত্যাদি হ'তে প্রাপ্ত জিন শব্দের আক্ষরিক অর্থের উপর নির্ভর করে তারা দাবি করে যে জিন হচ্ছে আসলে "চতুর বিদেশী"। অন্যেরা এমনও দাবী করে যে, যাদের মগজে কোন মন নেই এবং স্বভাবে অগ্নি প্রকৃতির তারাই জিন। প্রকৃতপক্ষে জিন আল্লাহর অপর একটি সৃষ্টি যারা এই পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে সহ-অবস্থান করে। আল্লাহ মানবজাতি সৃষ্টির পূর্বে জিন সৃষ্টি করেন এবং তিনি মানুষ সৃষ্টির উপাদান হতে ভিন্নতর উপদানের সমষ্টি দিয়ে জিন সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ বলেনঃ

"আমি তো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে। এবং ইহার পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি জিন অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ হইতে।" *(সূরা আল্‌-হিজর ১৫ঃ ২৬, ২৭)।*

তাদের জিন নামকরণ করা হয়েছে কারণ তারা মানব জাতির চোখের অন্তরালে রয়েছে। ইব্‌লিশ (শয়তান) জিন জগতের, যদিও আল্লাহ যখন আদমকে সিজ্‌দা করার হুকুম দিয়েছিলেন তখন সে ফেরেশতাদের মধ্যে অবস্থান করছিল। যখন সে সিজ্‌দাহ করতে অসম্মত হল এবং তাকে তার অবাধ্যতার কারণ জিজ্ঞেস করা হল। যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

"সে বলিল আমি উহা হইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি (আল্লাহ) আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কর্দম হইতে।" *(সুলা ছোয়াদ ৩৮ঃ৭৬)*

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা দেন যে রাসূল (সঃ) বলেছেন, "ফেরেশতাদের আলো হতে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং জিনদের ধুম্রবিহীন অগ্নি হতে।"[৮৬] আল্লাহ আরও বলেনঃ

"এবং স্মরণ কর, আমি যখন ফেরেশতাগণকে বলিয়াছিলাম আদমের প্রতি সিজ্‌দা কর, তখন সকলেই সিজ্‌দা করিল ইবলীস ব্যতীত, সে জিনদিগের একজন।" *(সূরা আল্‌-কাহ্‌ফ ১৮ঃ৫০)*

সুতরাং তাকে প্রত্যাখ্যাত ফেরেশতা অথবা ফেরেশতাদের একজন মনে করা ভুল হবে।

জিনদের অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণতঃ তাদেরকে তিন শ্রেণীর ভাগ করা যেতে পারে। রাসুল (সঃ) বলেন,

"তিন রকম জিন আছেঃ এক রকম যারা সারাক্ষণ আকাশে উড়ে, অন্য আর এক রকম যারা সাপ এবং কুকুর হিসাবে বিদ্যমান এবং পৃথিবীর উপর বসবাসকারী আর এক রকম যারা একস্থানে বাস করে অথবা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়।" [৮৭]

বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে জিনদের আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ মুসলিম (বিশ্বাসীগণ) এবং কাফির (অবিশ্বাসীগণ)। আল্লাহ সূরা আল-জিন এ বিশ্বাসী জিনদের সম্বন্ধে বলেনঃ

---

৮৬. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত (Sahih MusliM, enlgishtrans, vol. 4 p.1540 , no. 7134)

৮৭. আত্‌ তাবারী এবং আল্‌-হাকিম কর্তৃক সংগ্রীহিত।

"বল, আমার প্রতি প্রেরিত হইয়াছে যে, জিনদিগের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, আমারাতো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবন করিয়াছি। যাহা সঠিক পথ -নির্দেশ করে; ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনও আমাদিগের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করিব না এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদিগের প্রতিপালকের মর্যাদা, তিনি গ্রহণ করেন নাই কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান। এবং যে আমাদিগের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহর সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করিত।" *(সুরা আল্-জিন ৭২ঃ১-৪)*

"আমাদিগের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালংঘনকারী; যাহারা আত্মসমর্পণ করে তাহারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বাছিয়ে লয়। অপরপক্ষে, সীমালংঘনকারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।" *(সুরা আল্-জিন ৭২ঃ১৪-১৫)*

জিনদের মধ্যে অবিশ্বাসীদের বিভিন্ন নামে উলেখ করা হয়ঃ ইফরিত্, শয়তান, ক্বারিন, অপদেবতা, অশুভ আত্মা, আত্মা, ভুতপ্রেত ইত্যাদি। তারা বিভিন্নভাবে মানুষকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করে। যারাই তাদের কথা শুনে এবং তাদের জন্য কাজ করে তাদেরকেই মানব শয়তান বলে উলেখ করা হয়। আল্লাহ বলেছেনঃ

"এইরূপে মানব ও জিনের মধ্যে শয়তানদিগকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছি।" *(সুরা-আল্-আন্'আম ৬ঃ১১২)*

প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে স্বতন্ত্র একজন করে জিন রয়েছে যাকে ক্বারিন (সঙ্গী) বলা হয়। এটা মানুষের এই জীবনের পরীক্ষার অংশ বিশেষ। জিনটি তাকে সর্বদা অবমাননাকর কামনা-বাসনায় উৎসাহিত করে এবং সার্বক্ষণিকভাবে তাকে ন্যায়-নিষ্ঠা হতে অন্য দিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে। রাসুল (সঃ) এই সম্পর্ককে এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, "তোমাদের প্রত্যেককে জিনদের মধ্য হতে একজন সঙ্গী দেয়া হয়েছে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "এমনকি আপনাকেও ইয়া আল্লাহর রাসুল (সঃ)? তিনি বলেনঃ এখন সে আমাকে শুধু ভাল করতে বলে।"[৮৮]

"সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে-জিন, মানুষ ও বিহংগকুলকে এবং উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যূহে।" *(সুরা আন-নামল ২৭ঃ১৭)*

কিন্তু অন্য কাউকে এই ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই। অন্য কাউকে জিন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়নি এবং কেউ পারেও না। রাসুল (সঃ) বলেছেন, "যথার্থই গত রাতে জিনদের মধ্যে হতে একজন ইফরিত"[৮৯] আমার সালাত ভেঙ্গে দেবার জন্য থু থু নিক্ষেপ করেছিল। যাহোক আল্লাহ তাকে পরাভূত করতে আমাকে সাহায্য করেন এবং যাতে তোমরা সকালে তাকে দেখতে পারো সে জন্য তাকে আমি মসজিদের একটি স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলাম। অতঃপর আমার ভ্রাতা সোলাইমানের দোয়া মনে পড়লঃ **"হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যাহার অধিকারী আমি ছাড়া কেহ না হয়।"** *(সুরা সাদ ৩৮ঃ৩৫)*[৯০]

মানুষ জিনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম নয় কারণ এই বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা শুধু পয়গম্বর সোলায়মানকে দেয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, আছর অথবা ঘটনাক্রম ছাড়া জিনদের সাথে যোগাযোগ হওয়া বেশীর ভাগ সময়ই নিষিদ্ধ বা ধর্মদ্রোহী কাজের মাধ্যমেই হয়।[৯১] এভাবে তলব করে আনা দুষ্ট জিন তাদের সঙ্গীদের গুনাহ করতে এবং স্রষ্টাকে অবিশ্বাস করতে সাহায্য করতে পারে। তাদের লক্ষ্য হল স্রষ্টা ছাড়া অথবা স্রষ্টার পাশাপাশি অন্যকে উপাসনা করার মত গুরুতর গুনাহ করতে যত বেশী জনকে পারা যায় তত জনকে আকৃষ্ট করে। একবার গণকদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং চুক্তি হয়ে গেলে, জিন ভবিষ্যতের সামান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জানাতে পারে। রাসুল (সাঃ) বর্ণনা দিয়েছেন জিনরা কিভাবে ভবিষ্যত সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করে। তিনি বর্ণনা দেন যে, জিনরা প্রথম আসমানের উপর অংশ পর্যন্ত ভ্রমণ করত এবং ভবিষ্যতের উপর কিছু তথ্যাদি যা ফিরিশতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত তা শুনতে সক্ষম হত। তারপর তারা পৃথিবীতে ফিরে এসে তাদের পরিচিত মানুষের কাছে ঐ তথ্যগুলি পরিবেশন করত।[৯২] মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এই ধরণের বহু ঘটনা সংঘটিত হত। এবং গণকরা তাদের তথ্য প্রদানে নির্ভূল ছিল। তারা রাজকীয় আদালতে আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এমনকি পৃথিবীর কিছু অঞ্চলে তাদের পুজাও করা হত।

---

৮৮. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih MusliM, enlgishtrans, vol. 4 p.1540 , no. 7134)

৮৯. একটি বলিষ্ঠ অথবা খারাপ জিন (E.W.Lsne, Arabic-English Lexicon, Cambridge, England: Islamictexus Society, 1984, vol.2, p.2089)

৯০. আল্-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.1, p.268.no.75 and Sahih Muslim, Englishtrans, vol.1, p.273, no, 1104)

৯১. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস্ এর Ibntaymeeyah`s Essay onthe Jinn, রিয়াদ তৌহিদ প্রকাশনী, ১৯৮৯, পৃ.২১।

৯২. আল্-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, Englishtrans, vol.4, p.1210, no, 5538)

রাসুল (সাঃ) কর্তৃক ধর্ম প্রচার শুরু করার পর হতে অবস্থার পরিবর্তন হয়। আল্লাহ ফিরিশতাদের দিয়ে আসমানের নীচের এলাকা সতর্কতার সঙ্গে পাহাড়া দেবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর হতে বেশীরভাগ জিনদের উল্কা এবং ধাবমান নক্ষত্ররাজি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হত। আল্লাহ এই বিস্ময়কর ঘটনা কোরআনের ভাষায় বর্ণনা করেছেনঃ

"এবং আমরা চাহিয়াছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কা পিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ ; আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে সংবাদ শুনিবার জন্য বসিতাম কিন্ত এখন কেহ সংবাদ শুনিতে চাহিলে সে তাহার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কা পিন্ডের সম্মুখীন হয়।" *(সুরা আল-জ্বিন ৭২ঃ৮-৯)*

আল্লাহ আরও বলেনঃ

"প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি উহাকে রক্ষা করিয়া থাকি; আর কেহ চুরি করিয়া সংবাদ শুনিতে চাহিলে উহার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।" *(সূরা আল হিজর ১৫ঃ১৭-১৮)*

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "যখন রাসুল (সাঃ) এবং তাঁর একদল সাহাবা উকাধ বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন শয়তানদের ঐশী খবরাখবর শোনায় বাধা প্রদান করা হল। উল্কাপিন্ড তাদের উপর ছেড়ে দেয়া হল। ফলে তারা তাদের লোকদের কাছে ফিরে এল। যখন তাদের লোকরা জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছিল, তারা তাদের জানালো। কেউ কেউ পরামর্শ দিল যে নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে, কাজেই তারা কারণ খুজে বের করার জন্য পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের কয়েকজন রাসুল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণের সালাত রত অবস্থা দেখতে পেল এবং তারা তাদের কোরআন পড়া শুনলো। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে নিশ্চয় এটাই তাদের শোনায় বাধা প্রদান করেছিল। যখন তারা তাদের লোকদের মধ্যে ফিরে গেল তখন তারা বলল, **"আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করিয়াছি। যাহা সঠিক পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনও আমাদিগের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করিব না।"** *(সুরা আল জিন ৭২ঃ১-২)*[৯৩]
এইভাবে রাসূল (সাঃ) কর্তৃক ধর্ম প্রচারের পূর্বে জিনরা যেভাবে সহজে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করত তা আর আর পারেনি। ঐ কারণে তারা এখন তাদের খবরাখবরের সঙ্গে অনেক মিথ্যা মিশ্রিত করে। রাসুল (সাঃ) বলেন, "জাদুকর অথবা গনকের মুখে না পৌছান পর্যন্ত তারা (জিনরা) খবরাখবর নীচে ফেরত পাঠাতে থাকবে। কখনও কখনও তারা খবর চালান করার আগেই একটি উল্কা পিন্ড তাদের আঘাত প্রাপ্ত করার পূর্বে পাঠাতে পারলে এর সঙ্গে তারা একশটা মিথ্যা যোগ করবে। [৯৪]
আয়েশা বর্ণনা দেন যে তিনি আল্লাহর রাসূলের (সঃ) কাছে গণকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞসা করলে তিনি উত্তর দেন যে ওরা কিছু না।

আয়শা (রাঃ) তখন উল্লেখ করলেন যে গণকরা কখনও কখনও যা বলে সত্য হয়। রাসুল (সঃ) বলেন ''ওতে সত্যতার কিছু অংশ যা জিনরা চুরি করে এবং তার বন্ধুর কাছে বলে কিন্তু সে এর সাথে একশটি মিথ্যা যোগ করে।"[৯৫]

একদিন উমর ইবেন আল খাত্তাব যখন বসে ছিলেন তখন একটি সুদর্শণ লোক তার পাশ দিয়ে চলে গেলে তিনি বললেন, আমার যদি ভূল না হয় লোকটি এখনও প্রাক ইসলামি ধর্ম অনুসরণ করছে অথবা বোধ হয় সে তাদের একজন গণক। তিনি লোকটি কে তার সামনে আনতে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তার অনুমান সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলেন। লোকটি উত্তর দিল, আমি আজকের মত আর কোন দিন দেখিনি যেদিন মুসলিম এই ধরণের অভিযোগের সম্মূখীন হয়েছে। উমর (রাঃ) বললেন, অবশ্যই আমাকে তোমার অবহিত করা উচিত। লোকটি তখন বলল, অজ্ঞতার যুগে আমি তাদের গণক ছিলাম। ঐ কথা শুনে উমর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মহিলা জিন তোমাকে সব চেয়ে বিস্ময়কর কি বলেছে। লোকটি তখন বলল, একদিন আমি যখন বাজারে ছিলাম, সে (মহিলা জিন) উদ্বিগ্ন হয়ে আমার কাছে এসেছিল এবং বলেছিল মর্যাদাহানি হবার পর তুমি কি জিনদের হতাশাগ্রস্থ অবস্থায় দেখনি? তুমি কি দেখনি তাদেরকে (জিনদেরকে) মাদী উট ও তাতে আরোহণকারীদের অনুসরণ করতে? [৯৬] উমর বাধাদান পূর্বক বললেন, এটা সত্য।[৯৭] জিনরা তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী মানুষকে আপতঃ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবহিত করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ একজন গণকের কাছে আসে সে আসার আগে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তা গণকের জিন আগত লোকটির ক্বারিনের (প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে নিয়োজিত জিন) কাছ থেকে জিন জেনে নেয়। সুতরাং গণক

---

৯৩. *আল্-বুখারী, মুসলিম, আত্ তিরমিজী এবং আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.6, pp.415-6.no.443 and Sahih Muslim, Englishtrans, vol.1, pp.243-44, no, 908)*

৯৪. *আল্-বুখারী, মুসলিম এবং আত্ তিরমিজী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.8, p.150 , no.232)*

৯৫. *আল্-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.1, p.439.no.657 and Sahih Muslim, Englishtrans, vol.4, p.1209, no, 5535)*

৯৬. *জিনদের ফেরেশতাদের উপর আড়ি পাতায় বাধা করার পর , কেন বাধা প্রদান করা হল এটা জানার জন্য তাদেও আরববাসীদের অনুসরন করতে হয়েছিল।*

৯৭. *আল্-বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত।(Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.5, p.131-2. no.206)*

লোকটিকে বলতে সক্ষম হয় যে সে এটা করবে অথবা অমুক অমুক জায়গায় যাবে। এই প্রক্রিয়ায় একজন সতিকার গণক অপরিচিত লোকের অতীত পরির্পূণ ভাবে জানতে সক্ষম হয়। সে একজন অচেনা ব্যক্তির পিতামার নাম, কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছিল এবং তার ছেলে বেলার আচারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বলেতে সক্ষম হয়। অতীত সম্বন্ধে পরিপূর্ণ বর্ণনা দেবার ক্ষমতা জিন এর সঙ্গে মুহুর্তের মধ্যে বহু দুরত্ব অতিক্রম করতে এবং গোপন বিষয় হারানো জিনিস, অদেখা ঘটনা বলি সম্বন্ধে বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করতেও সক্ষম।

কোরআনে বর্ণিত পয়গম্বর সুলায়মান এবং সিবার রাণী বিলকিসের গল্পে মধ্যে এই ক্ষমতার সত্যতা পাওয়া যায়। যখন রাণী বিলকিসের গল্পে এলেন, তিনি একটি জিনকে রাণীর দেশ থেকে তার সিংহাসন নিয়ে আসতে বললেন। **"এক শক্তিশালী জিন বলল, আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বে আমি উহা আনিয়া দিব এবং এই ব্যাপাারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান বিশ্বস্ত**। *(সূরা আন নামল, ২৭ঃ৩৯)*

ভাগ্য গণনা সম্বন্ধে ইসলামের রায়

প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে অপবিত্র বিশ্বাস জাড়িত থাকার কারণে ইসলাম ভাগ্য গণনার প্রতি কঠোর দৃষ্টি ভঙ্গি গ্রহণ করেছে। যারা ভাগ্য গণনায় লিপ্ত তাদের এই নিষিদ্ধ প্রথা পরিত্যাগ করার উপদেশ প্রদান ব্যতীত তাদের সঙ্গে যে কোন ধরনের সম্পৃক্ততার ইসলাম বিরোধীতা করে।

গণক বা জ্যেতিষীর কাছে যাওয়া

যে কোন প্রকারের গণক দর্শন সম্বন্ধে রাসূল (সঃ) পরিস্কারভাবে নীতি নিদ্ধারণ করে দিয়েছেন। হাফসা (রাসূলে স্ত্রী) হতে সাফিয়া বর্ণনা দেন যে রাসূল (সঃ) বলেছেন, "যদি কেউ গণকের কাছে যায় এবং তাকে কিছূ জিজ্ঞাসা করে তাহলে ৪০ দিন রাত পর্যন্ত তার নামাজ (সালাত) গ্রহীত হবে না।"[৯৮] এই হাদিসের বর্ণিত শাস্তি শুধু মাত্র গণকের কাছে যাবার এবং তাকে কৌতুহল বশতঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার করণেই। মুয়াবিয়াহ ইবনে আল হাকাম আস সালামীর দ্বারা এই নিষিদ্ধকরণ আরও সমর্থিত হয়েছে। তিনি বলেছেন হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার কাছে যায়। রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন "তাদের কাছে যাবে না।"[৯৯]

শুধু মাত্র গণকের কাছে যাওয়ার জন্য এ ধরণের কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে কারণ এটা ভবিষ্যদ্বানী বিশ্বাস করার প্রথম পদক্ষেপ। এর বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দিহান অবস্থায় কেউ যদি সেখানে যায় এবং গণকের কোন ভবিষ্যৎদ্বানী সত্য হয় তাহলে সে নিশ্চতভাবে গণকের ভক্ত এবং ভবিষ্যৎদ্বানীর অতি উৎসাহী বিশ্বাসী ব্যক্তি হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি গণকের শরণাপন্ন হওয়ার সত্ত্বেও চলিশ দিন সময়কালের বাধ্যতামূলক সালাত (নামাজ) আদায় করতে নীতিগত ভাবে বাধ্য। যদিও ওই সালাতের সে কোন পুরস্কার পাবে না। যদি সে সব সালাত ত্যাগ করে তাহলে সে আরো একটি গুরুতর গুনাহ করল। সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী আইনবিদদের মতে এটা চুরি করে অর্জনকৃত বিষয় সম্পত্তির উপরে অথবা ভিতরের সালাত পড়া সম্বন্ধে প্রদত্ত ইসলামী রায়ের অনুরূপ। তারা ধারণা পোষণ করেন যে বাধ্যতামূলক সালাত আদায় করলে স্বাভাবিত অবস্থায় তা দুই ধরণের ফলাফল দেয়ঃ

ব্যক্তি বিশেষের জন্য ঐ সালাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা দূর হয়ে যায়।

এটা তার জন্য পুরস্কার অর্জন করে।

যদি চুরি করে অর্জনকৃত বিষয় সম্পত্তির উপরে অথবা ভিতরে সালাত আদায় করা হয় তাহলে সালাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা দূর হবে, কিন্তু এটা পুরস্কার বিহীন হবে। [১০০] ফলে রাসূল (সঃ) ফরজ নামাজ দুবার আদায় করা নিষিদ্ধ করেছেন।

গণকের উপর বিশ্বাস

গণক অদৃশ্য এবং ভবিষ্যতের খবর জানে এই বিশ্বাস নিয়ে যে কেউ গণকের কাছে যায় সে কুফর (অবিশ্বাস) করে। আবু হুরায়রা এবং আল হাসান উভয়ে বর্ণনা দিয়েছেন যে রাসূল (সঃ) বলেছেন "যে গণকের নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে সে মুহাম্মদের উপর (সঃ) উপর যা নাজিল হয়েছিল তা অবিশ্বাস করল। ১০১ এই ধরণের বিস্বাস আল্লাহ অদৃশ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে সৃষ্টির উপর আরোপ করে। ফলে এটি তৌহিদ আল আসমা ওয়াস সিফাতকে ধ্বংস করে এবং তৌহিদের এই ক্ষেত্রে একধরণের শিরক এর নমুনা। গণকদের লেখা জিনিস (বই ইত্যাদি) পড়া এবং তাদের কথা রেডিওতে

---

৯৮. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, Englishtrans, vol.4, p.1211, no, 5540)

৯৯. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, Englishtrans, vol. 4, p.1209, no, 5532)

১০০. আন্‌-নাওয়ায়ী কর্তৃক লিখিতঃ ayseer al-Azeez al-Hamid, পৃষ্ঠা ৪০৭ হতে উদ্বৃত।

১০১..আহামাদ, বায়হাকী এবং আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত। (Sunan Abu Dawud, Englishtrans, vol.3, p.1095, n.3895)

শোনা অথবা টেলিভিশনে দেখথা সাদৃশ্যতার (কিয়াস) কারণে কুফরীর মধ্যে পড়ে। বিংশ শতাব্দীতেএ মাধ্যম গুলি ব্যবহার গবেষকদের ভবিষৎবাণী প্রচারের সব চেয়ে সহজ পন্থা। আল্লাহ স্পষ্ট ভাবে কোরআনে উলেখ করেছেন। যে তিনি ছাড়া অন্য কেউ অদৃশ্য সম্বরন্ধ জানে না, এমনকি রাসূলও (সঃ) না।

আল্লাহ বলেনঃ **অদৃশ্যের কুঞ্জি তহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না।**

তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রাসূল (সঃ) কে বলেন, **বল আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজস্ব ভালমন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নাই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভূর কল্যাণই লাব করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্মপর্শ করিত না।***(সূরা আল-আ'রাফঃ ১৮৮)*

এবং তিনি আরও বলেনঃ **বল আল্লাহ ব্যতীত আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রানে না।**

সুতরাং পৃথিবীর চারিদিকে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, গণক এবং অনুরূপ ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতি মুসলিমদের মধ্যে নিষিদ্ধ। হস্ত রেখা গণনা, আই চিং ভাগ্য বিস্কুট চা পাতা, এমন কি রাশি চক্র ও বাই রিদম প্রোগ্রাম যারা বিশ্বাস করে তারা দাবী করে যে গুলি তাদের ভবিষ্যৎ বিসয়ক সংবাদ প্রদান করতে সক্ষম। যদিও আল্লাহ স্পষ্ট ভাবে এবং জোরের সঙ্গে বলেছেন যে একমাত্র তিনিই অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাতঃ

"নিশ্চই কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রহিয়াছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষন করেন এবং তিন জানেন যাহা জরায়ুতে আছে। কেহ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করবে এবং কেহ জানে না কোন স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অভিহিত।" *(সূরা লোকমান ৩১ঃ৩৪)*

সুতরাং পুস্তক, পত্রিকা, সংবাদপত্র এমনকি ব্যক্তিবিশেষ যে গুলি কোন না কেন ভাবে দাবী করে যে তাদের ভবিষ্যৎ অথবা অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান আছে তাদের সঙ্গে আচার ব্যবহার এবং যোগাযোগে মুসলিমদের অবশ্যই অতি সতর্কতা অবলম্বণ করা উচিত। যেমন একজন মুসলিম আবওহাওয়া বিদ কর্তৃক আগামীকালে বৃষ্টি, তুষারপাত অথবা আবহাওয়ার অন্য কোন অবস্থা প্রচার করার সময় ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন) শব্দ সমষ্টি যোগ করা উচিত। এই ভাবে যখন কোন মহিলা ডাক্তার তার রোগীকে জানায় যে সে নয় মাসের মধ্যে অমুক দিনে একটি সন্তান প্রসব করবে তখন ডাক্তারের ইনশা আল্লাহ শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করার বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত। যেহেতু এই ধরনের বক্তব্য পরিসংখ্যান ভিত্তিক অনুমান মাত্র।

রাশিচক্র সম্বন্ধে ইসলামের রায়

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা শুধু হারামই নয় একজন জ্যোতিষবিদের কাছে যাওয়া এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী শোনা, জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বই কেনা অথাব একজনের কোষ্ঠী যাচাই নিষেধ। যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানত ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা এই বিদ্যা চর্চা করে তাদের জ্যোতিষী বা গণক বলে গণ্য করা হয়। ফলস্বরূপ, যে তার রাশিচক্র খোঁজে সে রাসূল (সা) প্রদত্ত বিবৃতির রায়ের অধীনে পড়েঃ"যে গণকের কাছে যায় এবং কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে তার চল্লিশ দিন ও রাত্রির নামাজ গ্রহণযোগ্য হবে না।"[১০২]

এমনকি জ্যোতিষের বক্তব্যের সত্যতায় সন্দিহান হওয়া সত্ত্বেও একজনের শুধু তার কাছে যাওয়া এবং প্রশ্ন করার শাস্তি এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যদি কেউ জ্যোতিষ-সংক্রান্ত তথ্যাদির সত্য মিথ্যায় সন্দিহান হয়, তবে সে আল্লাহর পাশাপাশি অন্যরাও হয়তো অদৃশ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানে বলে সন্দেহ পোষণ করে। এটা এক ধরনের শিরক। কারণ আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেনঃ

"অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত কেহ জানে না।" *(সূরা আন-আনআমঃ ৫৯)*

"বল আল্লাহ ব্যতীত আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।" *(সুরা আন-নাম্লঃ ৬৫)*

যতই জ্যোতিষ বলুক অথবা যা কিছুই জ্যোতিষশাস্ত্রের বইয়ে থাকুক, কেউ তার রাশিচক্রে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করলে সে সরাসরি কুফরি (অবিশ্বাস) করে। কারণ রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে একজন ভবিষ্যতদ্রষ্টা গণকের নিকট গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, মুহাম্মদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছিল সে তা অবিশ্বাস করল।[১০৩]"

পূর্বে বর্ণিত হাদিসের মত এই হাদিসে শাব্দিকভাবে গণকের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হলেও জ্যোতিষবিদদের জন্যেও সমভাবে প্রযোজ্য। উভয়ই ভবিষ্যতের জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করে। জ্যোতিষবিদদের দাবি সাধারণ গণকদের তৌহিদের বিরোধিতা

১০২. *হাফসা কর্তৃক বর্নিত এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, Englishtrans, vol. 4, p.1211, no, 5540)*

১০৩. *আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্নিত এবং আহামাদ ও আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত।। (Sunan Abu Dawud, Englishtrans, vol.3, p.1095, n.3895)*

করার মত। সে দাবি করে যে মানুষের ব্যক্তিত্ব নক্ষত্র দ্বারা নিরূপিত এবং তাদের ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড এবং তাদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী নক্ষত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সাধারণ গণক দাবি করে যে একটি কাপের তলায় চায়ের পাতায় গঠন অথবা হাতের তালুর রেখা একই বিষয় বলে্। উভয় ক্ষেত্রে তারা সৃষ্ট বস্তর বাস্তব বিন্যাসের মধ্যে অদৃশ্যের জ্ঞানের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দাবি করে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস এবং রাশিচক্র পরীক্ষা করা পরিস্কারভাবে ইসলামের শিক্ষা এবং বিশ্বাসের বিপক্ষে। সেটাই সত্যিকারের শূন্য ও নিঃস্ব আত্মা যা খাঁটি ঈমানের (বিশ্বাসের) স্বাদ গ্রহণ করেনি এবং এই সব পথ খুঁজে বেড়ায়। অপরিহার্যভাবে, এই সব রাস্তা পূর্বনির্ধারিত নিয়ত হতে মুক্তি পাবার একটি নিষ্ফল প্রচেষ্টার প্রতীক। অজ্ঞ লোকেরা মনে করে যে তারা যদি জানে আগামী কাল তাদের ভাগ্যে কি রয়েছে, তারা আজ থেকে তার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। ঐভাবে তারা অমঙ্গল এড়াতে সক্ষম হতে পারে এবং মঙ্গল নিশ্চিত করতে পারে। তথাপি, আল্লাহ কর্তৃক আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে বলা হয়েছেঃ

"বল, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি তো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সর্তককারী ও সুসংবাদবাহী।" *(সুরা আল-আ'রাফঃ ১৮৮)*

সুতরাং, সত্যিকার মুসলমানগণ এই সব ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে থাকতে নৈতিকভাবে বাধ্য। একইভাবে আংটি, গলার হার ইত্যাদির উপর যদি রাশিচক্রের চিহ্ন থাকে তবে তা পরা উচিত নয়, এমনকি কেউ তাতে বিশ্বাস না করলেও। এটি একটি বানোয়াট পদ্ধতির অংশ যা কুফর বিস্তার করে এবং একে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা উচিত। কোন বিশ্বাসী মুসলমানের রাশিচক্র কি তা জিজ্ঞাসা করা অথবা তার প্রতীক অনমান করার চেষ্ট করাও উচিত নয়। কোন পুরুষ অথবা মহিলা কর্তৃক খবরের কাগজের রাশিচক্রের কলাম পড়া অথবা পড়তে শোনাও অনুচিত। যে মুসলমান তার কার্যক্রম নির্ধারণ করতে জ্যোতিষতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় পূর্বাভাস ব্যবহার করে, তার উচিত আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থণা (তওবা) করা এবং ইসলামের উপর বিশ্বাস নবায়ণ করা।

ইসলামের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক

বৈধতার মূলনীতি

"ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো একটি নিষিদ্ধতা শুধুমাত্র যদি শরীয়াহ এর ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করে। এবং সাধারণ অভ্যাসগত আচরনের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো বৈধতা শুধুমাত্র যখন শরীয়াহ এর ব্যাপারে নিষিদ্ধতা জারি করে।" *(মিনহাজুল-ক্বাসেদীন মুখতাছার ফি উসূলিল ফিক্বহ, পৃষ্ঠা-২৭, শায়খ আব্দুর রহমান আস সা'দী)*

উপরের মূলনীতিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি যেটা ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়। এভাবে 'আদাত' (দৈনন্দিন অভ্যাসগত কর্ম) সম্পর্কিত বিষয় যেমন খাওয়া-দাওয়া, পান করা এবং পোশাক পরিধান, এই সম্পর্কিত সব বিষয়াদি বৈধ, শুধুমাত্র যদি এর বৈধতার ব্যাপারে কোন সম্পর্ক ও বিশ্বস্ত সীমাবদ্ধকর বা নিষিদ্ধতার দলীল থাকে। কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিপরীত। এখানে কোন আমলই ইবাদত হিসাবে করতে পারে না, শুধুমাত্র যদি এর ব্যাপারে শরীয়াহর কোন স্পষ্ট ও বিশ্বস্ত দলীল থাকে যা এটাকে বৈধ করে। তাই 'আদাত' এর মূলনীতি হচ্ছে 'ইবাহা' (অর্থাৎ বৈধতা), যেখানে ইবাদতের মূলনীতি হচ্ছে তাহরীম (অর্থাৎ নিষিদ্ধতা)।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেনঃ

"মানুষের কথা এবং কাজ দুই প্রকারঃ ইবাদত (আল্লাহ ও তার রাসূল এর আদেশ সম্পর্কিত বিষয়াদি) যেটার দ্বারা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত এবং 'আদাত' (অভ্যাসগত বা রীতিগত কার্যাদি) যেগুলো দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন 'শারীয়াহ' (অহী দ্বারা নির্দেশিত ইসলামী বিধান সমূহ)-র মূলনীতি থেকে আমরা জানি যে, ইবাদত হচ্ছে ঐ গুলো যেগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত বা তাঁর দ্বারা অনুমোদিত; শারীয়াহ-র মাধ্যম ব্যতীত এখানে কোন কিছুই সত্য বলে সম্পর্কিত হতে পারে না। কিন্তু দুনিয়াবী কাজকর্মের যতদূর পর্যন্ত মানুষ সম্পর্কিত সেগুলো দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের জন্য। এই ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে কর্মের স্বাধীনতা; এখানে কোন কিছুই সীমাবদ্ধ হতে পারেনা শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যেটা সীমাবদ্ধ করেছেন। এর কারণ আদেশ এবং নিষেধ উভয়ই আল্লাহর হাতে। যখন ইবাদতের বিষয় আসবে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিষয়ে নির্দেশ থাকতে হবে। এভাবে যখন কোন কিছু প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ প্রয়োজন, তখন কিভাবে আমরা আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কিছুকে স্বীমাবদ্ধ বলতে পারি? এইজন্য আহমাদ বিন হাম্বল (মৃত্যু ২৪১হিজরি) এবং অন্যান্য ফিক্বাহবিদরা যারা হাদীসের উপর ভিত্তি করে তাদের রায় প্রদান করেছেন তারা বলেনঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে 'তাওক্বিফ' (সীমাবদ্ধতা), তাই বলা যায় এই ক্ষেত্রে আল্লাহ যে বিধান প্রনয়ন করেন তা ব্যতীত কোন কিছুই বিধান হিসাবে প্রনীত হতে পারে না। অন্যথায় এই আয়াতের দায়ভার গ্রহনের ঝুকি আছেঃ

"এদের কি এমন কতকগুলো ইলাহ আছে, যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের। যার অনুমতি আল্লাহ এদের দেননি? কিয়ামতের ঘোষণা না থাকলে এদের তো ফয়সালা হয়েই যেতো। নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি আছে।" *(সূরা আশ-শুরা ৪২ঃ ২১)*

যাই হোক, জীবনধারনের প্রনালী সম্পর্কিত অভ্যাসের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে স্বাধীনতা, কারণ এই ক্ষেত্রে কোন কিছুকেই সীমাবদ্ধ করা যায় না শুধুমাত্র তা ব্যতীত যা আল্লাহ নিষেধ করেন। অন্যথায় তার এই কথা প্রযোজ্যঃ

"তুমি বল- তোমরা লক্ষ্য কর যে, আল্লাহ তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন, তোমরা তা হতে কিছু বৈধ ও কিছু অবৈধ করে নিয়েছ, তুমি বল- আল্লাহ কি তোমাদের জন্য এ অনুমতি দিয়েছেন, অথবা তোমারাই আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ?" *(সূরা ইউসুফ ১২ঃ ৫৯)*

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি যার উপর আমরা বলতে পারি যে, ক্রয় করা, বিক্রয় করা, লিজ দেওয়া, উপহার দেওয়া নির্ভরশীল এবং এরূপ আরো বিষয় যেগুলো মানুষের কার্যাবলীর জন্য প্রয়োজনীয় যেমন খাওয়া-দাওয়া, পান করা এবং কাপড় পরিধান করা; এভাবে যদি শারীয়াহ দৈনন্দিন জীবনের কর্মের ব্যাপারে কিছু বলে তাহলে এটা ভাল আচরণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য। অনুরূপভাবে এটা নিষেধ করেছে যা কিছু পাপের দিকে পরিচালিত করে, অবশ্যই করণীয় করেছে যা অপরিহার্য ঐটা অগ্রাহ্য করেছে যা মাত্রাতিরিক্ত এবং এটাই অনুমোদন করেছে যা উপকারী, বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলী প্রসারের জন্য যথাযথ বিবেচনার সাথে এগুলো সব করা হয়েছে। যেহেতু এটাই হচ্ছে শরীয়ার অবস্থান সেহেতু মানুষ ক্রয় করতে, বিক্রি করতে এবং লিজ দেয়ার ব্যাপারে স্বাধীন কিছু খেতে এবং পান করতে যা তারা পছন্দ করে- যতক্ষন পর্যন্ত না এটা হারাম হয়। এমন কি এই জিনিষগুলোর কিছু অনুমোদিত নাও হতে পারে, তথাপি তারা এই ব্যাপারে স্বাধীন, যেহেতু শারীয়াহ সীমা পেরিয়ে এগুলোকে হারাম ঘোষণা করে নি, এভাবে (বৈধতার)।

ইসলাম

ইসলাম একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, কারো কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া, আত্মসমর্পণ করা। পরিভাষায় ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসা দ্বীনের নাম। যা আমাদের রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ইসলাম অর্থ শান্তি এ কথা কোন নির্ভরযোগ্য অভিধানে নেই। سلام (সালাম) অর্থ শান্তি। অনেক মুসলমান অজ্ঞতার ভিত্তিতে ইসলাম মানে শান্তি বলে। অনেকে আবার ইসলামের 'জিহাদ' ও বাতিলের সাথে ইসলামের অনিবার্য দ্বন্ধ ও সংঘাতকে এড়ানোর জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামের অর্থ শান্তি করে থাকে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ আর তার মুসলিম নামধারী চামচারা ইসলাম মানে শুধুই শান্তি বলতে ভালবাসে। অথচ 'হানসভে'র নামে একজন খ্রীষ্টান তার বিখ্যাত আরবী-ইংরেজী অভিধানে ইসলামের অর্থ করেছেঃ Submission,tothe will of God. আল্লাহর ইচ্ছার কাছে (জীবনের সকল বিষয়ে) বশ্যতা স্বীকার করা ও সমর্পণ করা। (A Dictionary of Modern written Arabic) তবে এ কথা ঠিক যে ইসলাম মানলে অবশ্যই শান্তি আসবে। দুনিয়াতে সুখ ও শান্তি লাভ করা যাবে। আর আখেরাতেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতের চিরস্থায়ী শান্তি ভোগ করা যাবে।

যদি কোন চিকিৎসক এসে কোন দৃষ্টিহীনকে বলে "আমি তোমার দুই চোখ ভাল করে দিব, বিনিময়ে তুমি আমার দাস হয়ে থাকবে। তাহলে যে কোন অন্ধ সাথে সাথেই রাযী হয়ে যাবে। কারণ দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার চেয়ে বড় নিয়ামত আর কি হতে পারে! অথচ আল্লাহ আমাদের কত অসংখ্য নিয়ামত না চাইতেই বিরামহীনভাবে দান করে চলেছেন। এই নিয়ামত সম্পর্কে আমাদের আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর উম্মত করে সৃষ্টি করেছেন এবং ইসলামের ন্যায় এত বড় একটা নিয়ামত দান করেছেন বলে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহ্র শোকর আদায় করে থাকে। এমন কি, স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাও ইসলামকে মানুষের প্রতি এতসব নেয়ামতের মাঝে সবচেয়ে বড় ও উৎকৃষ্ট নিয়ামত বলে ঘোষণা করেছেন। বলেছেনঃ

"আজ আমি তোমাদেরকে আনুগত্যের বিধান (জীবন বিধান) পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।" *(আল-মায়েদাঃ ৩)*

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের প্রতি এই যে, অনুগ্রহ করেছেন, এর হক আদায় করা তাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। কারণ যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের হক আদায় করে না, সে বড়ই অকৃতজ্ঞ। আর সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার এ বিরাট অনুগ্রহের কথা ভুলে যাওয়া।

ইসলামের মূল উৎস দু'টিঃ কুরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাত। রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। তোমরা যতক্ষণ এগুলোকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহ্র কিতাব, আরেকটি হলো আমার সুন্নাহ্।" *(বুখারী)*

ইসলাম ও মুসলিম

ইসলাম অর্থ আদেশ পালন করে চলা। আর দ্বীন হলো সেই আদেশ যা শুধুমাত্র আল্লাহ্র পক্ষ থেকে করা হয়। আল্লাহ্র সম্মুখে নিজের আযাদী ও স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করার নাম ইসলাম। যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত কাজ-কারবারকে আল্লাহ্র হাতে সঁপে দেয়, সেই ব্যক্তি মুসলমান। আর যে ব্যক্তি নিজের সব ব্যাপার নিজের ইচ্ছামত সম্পন্ন করে কিংবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোও হাতে তা সোপর্দ করে সে মুসলমান নয়। আল্লাহ্র হাতে সঁপে দেয়ার তাৎপর্য এই যে, তিনি তাঁর কিতাব এবং তাঁর নবীর মারফত যে হেদায়াত ও সৎপথের বিধান পাঠিয়েছেন, মানুষ তাকে পুরোপুরি কবুল করবে এবং তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করতে পারবে না। জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে এবং কাজে শুধু পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নিয়ম অনুসরণ করে চলবে। যে ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যাপারেই কেবল আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের হাদীসের কাছে পথের সন্ধান জানতে চায়– জিজ্ঞেস করে যে, আমার কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়, আর সেখান হতে যে নিয়মই পাওয়া যাক না কেন বিনা আপত্তিতে তা মেনে নেয়, তার বিপরীত যা তা সবই সে অস্বীকার করে–শুধু সেই ব্যক্তি মুসলমান। এর বিপরীত যে ব্যক্তি নিজের মন যা বলে তাই করে, কিংবা দুনিয়ায় যা কিছু হচ্ছে সে-ও তাই করে, নিজের কোন ব্যাপারেই সে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধান জেনে সে বলে ওঠে যে, আমার বুদ্ধি তা গ্রহণ করতে চায় না, তাই আমি তা মানি না, অথবা বাপ-দাদার কাল হতে তার উল্টা নিয়ম চলে আসছে কাজেই তার অনুসরণ করব না; কিংবা দুনিয়ার নিয়ম তার বিপরীত, তাই আমি সেই নিয়ম অনুসরারেই চলবো–তবে সেই ব্যক্তি কিছুতেই মুসলমান নয়। যদি সে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তবে সে মিথ্যাবাদী সন্দেহ নেই।

বর্তমান যুগে ইসলাম যেভাবে অনুশীলন করা হয়

বর্তমানে ইসলাম কয়েকটি অনুষ্ঠানের রূপ নিয়েছে। মানুষ কিছু ইবাদাতের সমষ্টির নাম দিয়েছে ইসলাম। জীবনের অন্যান্য বিষয়ের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বর্তমান সময়ে মানুষের কর্মজীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে-

১. ইবাদতের বিশেষ বিশেষ সময়ে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা।

২. অতপর জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে গাইরুল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবে, অর্থাৎ শির্‌ক, কুফরী, হারাম, হালাল ইত্যাদির তোয়াক্কা করবে না।

অথচ, সাহাবারা তাদের গোটা সত্তাকে আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের চিন্তা, চেতনা এবং কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র এক আল্লাহ্‌র অনুগত্য হয়ে গিয়েছিল।

"সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল, এই যে ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী রাসূলগণের উপর; আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্যধারণকারী, তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।" *(সূরা বাকারাহঃ ১৭৭)*

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, মুমিন হওয়ার আকাংখা করা এবং মুমিনের মত অবয়ব বানিয়ে নিলেই ঈমান সৃষ্টি হয় না, বরং ঈমান সেই সুদৃঢ় আকীদা যা হৃদয়ের মাঝে পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং যাবতীয় কাজ তার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে।

ইসলামের দাবিঃ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এরশাদ করেনঃ

"ওহে যারা ঈমান এনেছো পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর।" *(বাকারাঃ ২০৮)*

ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশের অর্থ হচ্ছে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মানতে হবে। আমাদের জীবনের সকলের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান অনুসরণ করতে হবে। ইসলামের কিছু বিধান মানা আর কিছু বর্জন করা চলবে না। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবেই মানতে হবে। ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মানার ব্যাপারে একজন মুসলমানের মূল বক্তব্য হবেঃ

"নিশ্চয় আমার নামায, আমার ইবাদতসমূহ এবং আমার জীবন ও আমার মৃত্যু ঐ আল্লাহ্‌র জন্য যিনি বিশ্বজাহানের রব। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। এভাবেই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আত্মসমর্পণকারী ও আনুগত্যশীল।" *(আন-আমঃ ১৬২-১৬৩)*

একজন সত্যিকার মুসলমান সেই যার সকল ইবাদত ও তার জীবনের সকল কাজকর্ম হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। এক মুহূর্তের জন্যও সে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বহির্ভূত হবেনা। সে কখনো আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না। আমৃত্যু সে শির্‌কমুক্ত থাকবে। আর তার মৃত্যুও হবে ইসলামের উপর। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এরশাদ করেছেনঃ

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্‌কে যেমনভাবে ভয় করা দরকার ঠিক তেমন ভাবে ভয় করো। আর তোমরা অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" *(আলে ইমরানঃ ১০২)*

মুসলিম ও কাফেরের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য

প্রত্যেক মুসলমান নিশ্চয়ই একথা জানে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসলমানকে পছন্দ করেন এবং কাফেরকে অপছন্দ করেন। মুসলমানের গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে কাফেরের অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। মুসলমান জান্নাতে যাবে এবং কাফের জাহান্নামে। কিন্তু মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে এতখানি পার্থক্য কেন হলো, সেই সম্বন্ধে একটু গভীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক।

কাফের ব্যক্তিরা যেমন হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তান, মুসলমানরাও তেমনি তাঁর সন্তান। মুসলমানদের মত তাদেরও হাত-পা, চোখ-কান সবই আছে। তাদের জন্ম এবং মৃত্যু মুসলমানদের মতই হয়। যে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাহলে মুসলমান কেন জান্নাতে যাবে আর তারা কেন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে? একথাটি বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখা আবশ্যক। মুসলমানদের এক একজনের নাম রাখা হয়েছে আবদুল্লাহ, আবদুল হামিদ বা তদনুরূপ অন্য কোন নাম, অতএব তারা মুসলমান। আর কিছু লোকের নাম রাখা হয়েছে দীলিপ, জগদীশ, জন প্রভৃতি, কাজেই তারা কাফের; কিংবা মুসলমানগণ খাত্‌না করায়, আর তারা তা করায় না। মুসলমান গরুর গোশত খায়, তারা তা খায় না– শুধু এটুকু কথার জন্যই মানুষে মানুষে এতবড় পার্থক্য হতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালাই যখন সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সকলকেই তিনি লালন-

পালন করেন তিনি এতবড় অন্যায় কখনও করতে পারেন না। কাজেই তিনি এ রকম সামান্য বিষয়ের কারণে তাঁর সৃষ্ট এক শ্রেণীর মানুষকে অকারণে দোযখে নিক্ষেপ করবেন তা কিছুতেই হতে পারে না।

বস্তুত উভয়ের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কেবলমাত্র কুফরি ও ইসলামের। ইসলামের অর্থ-আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা এবং কুফরীর অর্থ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, অমান্য করা ও আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্য হওয়া। মুসলমান ও কাফের উভয়ই মানুষ, উভয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্ট জীব, তাঁরই আজ্ঞাবহ দাস। কিন্তু তাদের একজন অন্যজন অপেক্ষা এজন্য শ্রেষ্ঠ যে, একজন নিজের প্রকৃত মনিবকে চিনতে পারে, তার সাথে কাউকে শরীক করে না, তাঁর আদেশ পালন করে এবং তাঁর অবাধ্য হওয়ার দুঃখময় পরিণামকে ভয় করে। কিন্তু অন্যজন নিজ মনিবকে চিনে না এবং তাঁর আদেশ পালন করে না, এজন্যই সে অধঃপাতে চলে যায়। এ কারণেই মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালা সন্তুষ্ট এবং কাফেরের প্রতি অসন্তুষ্ট, মুসলমানকে জান্নাতে দেয়ার ওয়াদা করেছেন এবং কাফেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ভয় দেখিয়েছেন।

"যেসব লোক ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, নিঃসন্দেহে তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।" *(সূরা বাইয়্যেনাঃ ৭-৮)*

মুসলমানকে কাফের হতে পৃথক করা যায় মাত্র দু'টি জিনিসের ভিত্তিতেঃ প্রথম, ইল্‌ম বা জ্ঞান; দ্বিতীয়, আমল বা কাজ। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানকে প্রথমেই জানতে হবে যে, তার প্রকৃত মালিক কে? কি তাঁর আদেশ ও নিষেধ? কিসে তিনি সন্তুষ্ট হন আর কিসে তিনি অসন্তুষ্ট হন এসব বিস্তৃতভাবে জেনে নেয়ার পর মালিকের মর্জিমত চলবে, তার মন যদি মালিকের ইচ্ছার বিপরীত কোন বস্তুর কামনা করে তবে সে নিজের মনের কথা না শুনে মালিকের কথা শুনবে। কোন কাজ যদি নিজের কাছে ভাল মনে হয়, কিন্তু মালিক সেই কাজটিকে ভাল না বলেন, তবে তাকে মন্দই মনে করবে। আবার কোন কাজ যদি নিজের মনে খুব মন্দ বলে ধারণা হয়, কিন্তু মালিক তাকে ভাল মনে করেন এবং কোন কাজ যদি নিজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে হয় অথচ মালিক যদি তা করার হুকুম দেন, তবে তার জান ও মালের যতই ক্ষতি হোক না কেন, তা সে অবশ্যই করবে। আবার কোন কাজকে যদি নিজের জন্য লাভজনক মনে করে, আর মালিক তা করতে নিষেধ করেন তবে তাতে দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পত্তি লাভ করতে পারলেও তা সে কখনই করবে না। ঠিক এ ইলম ও এরূপ আমলের জন্যই মুসলমান আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রিয় বান্দাহ। তার ওপর আল্লাহ্ তাআলার রহমত বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে সম্মান দান করবেন। উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে কাফের কিছুই জানে না এবং জ্ঞান না থাকার দরুনই তার কার্যকলাপ ও তদ্রুনরূপ হয় না। এ জন্য সে, আল্লাহ্ তাআলা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ এবং তাঁর অবাধ্য বান্দাহ। ফলত সে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হবে।

যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, অথচ কাফেরদের মতই জাহেল বা অজ্ঞ এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার অবাধ্য, এমতাবস্থায় কেবল নাম, পোশাক ও খানা-পিনার পার্থক্যের কারণে সে কাফের অপেক্ষা কোনভাবেই শ্রেষ্ঠ হতে পারে না, আর কোন কারণেই সে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের হকদার হতে পারে না। এরশাদ হচ্ছেঃ

"ইহাদিগকে জিজ্ঞাস কর, যে জানে ও যে জানে না ইহারা উভয় কি কখনো সমান হতে পারে? বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই তো নসীহত কবুল করিয়া থাকে।" *(যুমারঃ ৯)*

"প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলম সম্পন্ন লোকেরাই তাঁহাকে ভয় করে।" *(ফাতিরঃ ২৮)*

ইল্‌ম (জ্ঞান) হচ্ছে বান্দার প্রতি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যে বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে ইলম বা জ্ঞান দান করেন। এটা সেই জ্ঞান যা ওহী হিসাবে মহান আল্লাহ্ নাযিল করেছিলেন রাসূল (সাঃ) এর প্রতি কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞান এবং এর থেকে উদ্ভুত শাখা প্রশাখাসমূহ। ওহীর এই জ্ঞান এতই মর্যাদাপূর্ণ যে একে ইলম শরীফ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।

"আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাত নাযিল করেছেন এবং তোমাকে এমন জ্ঞান জানিয়ে দিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না। বস্তুতঃ তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিরাট।" *(আন নিসাঃ ১১৩)*

এটাই হচ্ছে সেই জ্ঞান যাহা মৃত হৃদয়কে জীবন্ত ও আলোকিত করে এবং বিপন্ন মানবতাকে অন্ধকারের গভীর থেকে আলোতে নিয়ে আসে।

"যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল, পরে আমরা তাহাকে জীবন দান করিলাম এবং তাহাকে সেই রৌশনী দান করলাম যাহার আলোক-ধারায় সে লোকদের মধ্যে জীবন-যাপন করে, সে কি সেই ব্যক্তির মত হইতে পারে, যে ব্যক্তি অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহা হইতে কোনক্রমেই বাহির হয়না? কাফেরদের জন্য এই রকমই তাহাদের আমলকে চাকচিক্যময় বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।" *(সূরা আন'আমঃ ১২২)*

যাদেরকে কুরআনে বলা হয়েছে সবচেয়ে ভাল এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী তারা হচ্ছে সেইসব লোক যারা ইল্‌ম অর্জন করে, সে অনুযায়ী আমল করে ও অন্যদের কাছে তা পৌছিয়ে দেয় (আহলুল ইলম)। কিন্তু দলীল রয়েছে যে, যারা ইলম অনুযায়ী আমল করে না তারা আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত।

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা কেন সেই কথা বল যাহা কার্যতঃ কর না? আল্লাহ্‌র নিকট ইহা অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার যে, তোমরা বলিবে এমন কথা যাহা কর না" *(আস-সাফঃ ২-৩)*

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর 'মাজমুআ আল-ফাতওয়াতে' বলেন যে যারা ইল্‌ম অর্জন করে তাঁরা হচ্ছেন আম্বিয়া কেরামের উত্তরাধিকারী ও রাসূল (সাঃ) এর খলিফা। তাঁরা সেই মাটির মত যেখানে পানি জমা হয় ও সবুজ ঘাস জন্মে।

আল্লাহ ঈমানদারগণকে সেই জ্ঞান দান করেন যা তারা জানত না, এরশাদ হচ্ছে

"যেমন (এই দিক দিয়া তোমরা কল্যাণ লাভ করিয়াছ যে,) আমি তোমাদের প্রতি স্বয়ং তোমাদেরই মধ্য হইতে একজন রসূল পাঠাইয়াছি, যে তোমাদিগকে আমার আয়াত পড়িয়া শুনায়; তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করিয়া তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয় এবং যেসব কথা তোমাদের অজ্ঞাত, তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দেয়।" *(বাকারাহঃ -১৫১)*

আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সাঃ) কে শিক্ষা দিয়েছেন যেন তিনি ইলম বৃদ্ধির জন্য (আল্লাহর) কাছে প্রার্থনা করেনঃ "আর দোয়া কর, **হে পরোয়ারদিগার! আমাকে আরও অধিক ইলম দান কর।"** *(তা-হাঃ ১১৪)*

জ্ঞানের মধ্যে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের জ্ঞানই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ তাওহীদের জন্যই আল্লাহ তার বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয। এরশাদ হচ্ছেঃ

"হে নবী জেনে রাখো- আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)। ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ত্রুটির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।" *(মুহাম্মদঃ ১৯)*

বিষয়টা খুবই সহজ বুঝার জন্য। একজন ডাক্তারের ঘরে জন্মেছে বলেই উনার ছেলে যেমন ডাক্তার নয় অর্থাৎ ডাক্তারের ছেলে বলে রুগি দেখে অষুধ দিতে পারে না কিংবা দিলেও কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না। তাকে অবশ্যই ডাক্তার হবার জন্য যে ইলম আবশ্যক তা কষ্ট করে হলেও হাসিল করতে হবে। এবং প্র্যাকটিস করতে হবে রুগি দেখার জন্য। ঠিক তেমনি মুসলিমের ঘরে জন্মেছে বলেই মুসলিম নয়। ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান হাসিল করতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করলেই মুসলিম হওয়া যাবে। ইসলাম কোন জাতি, বংশ বা সম্প্রদায়ের নাম নয়। কাজেই বাপ হতে পুত্র এবং পুত্র হতে পৌত্র আপনা-আপনিই তা লাভ করতে পারে না। হিন্দুদের মাঝে ব্রাহ্মণের পুত্র মুর্খ এবং চরিত্রহীন হলেও কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের পুত্র বলেই সে ব্রাহ্মণের মর্যাদা পেয়ে থাকে এবং উচ্চ বংশ বলে পরিগণিত হয়। আর চামারের পুত্র জ্ঞানী ও গুণী হয়েও নীচ ও হীন থেকে যায়। কারণ সে চামারের মত নীচ জাতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। এখানে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেনঃ "তোমাদের মধ্যে যে লোক আল্লাহ্ তা'য়ালাকে বেশী ভয় করে এবং সকলের অধিক তাঁর আদেশ পালন করে চলে সে-ই তাঁর কাছে অধিক সম্মানিত।" হযরত ইবরাহীম (আঃ) একজন মূর্তিপূজারীর ঘরে জন্ম লাভ করেছিলেন; কিন্তু তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালাকে চিনতে পেরে তাঁর আদেশ পালন করলেন; এজন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে এবং তার বংশধরের মাঝে যারা মুসলিম তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত জগতের রিসালাত, নবুয়ত ও খেলাফত অর্থাৎ নেতা বা ইমাম (খলীফা) করে দিয়েছেন।

"স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তাহার রব বিশেষ কয়েকটি ব্যাপারে যাচাই করিলেন এবং সেই সব কয়টি ব্যাপারেই সে উত্তীর্ণ হইল, তখন তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতা করিতে চাহি।" ইবরাহীম বলিল-"আমার সন্তানদের প্রতিও কি এই ওয়াদা? তিনি উত্তরে বলিলেন,-"আমার এই প্রতিশ্রুতি যালেমদের (ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশে যারা মুসলিম নহে শিরককারী) সম্পর্কে নহে।" *(আল বাকারাঃ ১২৪)*

"আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদিগকে সমগ্র দুনিয়াবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দান করিয়া (ও নিজের নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য) মনোনীত করিয়াছিলেন।" *(সূরা আলে-ইমরানঃ ৩৩)*

"তাহা হইলে ইহারা অন্যান্য লোকদের প্রতি (মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের) কি শুধু এইজন্য হিংসা পোষণ করে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করিয়াছেন? যদি তাহাই হয় তবে তাহারা যেন জানিয়া রাখে যে, আমরা তো ইবরাহিমের সন্তানদিগকে কিতাব ও বুদ্ধি-বিজ্ঞান দান করিয়াছি এবং বিরাট রাজ্য দিয়াছি।" *(সূরা নিসাঃ ৫৪)*

এখানে একটা বিষয় বুঝতে হবে যে, আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাদের মালিক। তিনি যদি তাঁর অনুগত দাসদের ইবাদতে খুশী হয়ে কাউকে মর্যাদার আসনে বসান তাহলে অন্যান্য দাসদের এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। যেমনি ইব্রাহিম (আঃ) এর (আল্লাহর জন্য) কুরবানীতে সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা যখন সমস্ত দুনিয়ার নেতৃত্ব দিতে চাইলেন (তার আগে থেকেই তিনি নবী ও রাসূল ছিলেন) তখন ইব্রাহিম (আঃ) উনার বংশধরদের মাঝেও যেন নেতৃত্ব দেয়া হয় তার

জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার বান্দা ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া কবুল করলেন। কিন্তু পরিষ্কার শর্ত দিয়ে দিলেন যে- এ নেতৃত্ব শুধুমাত্র তার বংশধরদের মাঝে যারা মুসলিম হবে তাদের জন্য অর্থাৎ তার বংশধরদের মাঝে কোন কাফের, মুশরিক এ নেতৃত্বের দাবীদার হতে পারবে না। পরবর্তীতে তাঁর দুই ছেলে ইস্হাক (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) এবং তার বংশধরের মাঝে নবুয়ত, রেসালাত ও খেলাফতের দায়িত্ব অর্পন করলেন। এর ফলশ্রুতিতে ইব্রাহিম (আঃ) এর এক ছেলে ইসহাক (আঃ) এবং তার ছেলে ইয়াকুব (আঃ) নবী ছিলেন এবং ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরদের নামই বনী ইসরাইল এবং তাদের মাঝেই মুহাম্মদ (সাঃ) আসার আগ পর্যন্ত সমস্ত নবী, রাসুল এবং নেতৃত্ব (খেলাফত) এসেছে। রাসূল (সাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসঃ

"ইসরাইলের বংশধরদের কাছে অব্যাহতভাবে নবী পাঠানো হয়েছিল। বনি ইসরাইলের বংশধরগণের মাঝে নবীগণ শাসন ব্যবস্থা (TASOOSUHUM) প্রতিষ্ঠিত রাখতেন। একজন নবী ইন্তেকাল করলে আরেকজন নবীকে উনার খলিফা (প্রতিনিধি) হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। আমার পরে আর কোন নবী পাঠানো হবে না, তবে তোমাদের আমার পরে বহু খলিফাহ আসবেন। সাহাবীরা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ সময় আপনি আমাদিগকে কি করার নির্দেশ দেবেন, তিনি জবাব দিলেন, প্রথমজনকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি (বাইয়াহ) দেবে এবং এর পরের সর্ব প্রথমকে। তাদেরকে তাদের অধিকার দেবে, কেননা আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন তারা (খলিফা) তাদের লোকদের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পূরণ করেছে কি না।" *(আল-বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত)*

আবার ইব্রাহিম (আঃ) এর ছেলে ইসমাঈল (আঃ) নবী ছিলেন এবং তার বংশই কুরাইশ এবং এ কুরাইশ বংশেই শেষ নবী রাসূল (সাঃ) এসেছিলেন। ইব্রাহিম (আঃ) এর মুসলিম বংশধরদের প্রতি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নেতৃত্বের ওয়াদা মোতাবেক কুরাইশ বংশকে কিয়ামত পর্যন্ত খলিফার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যাহা রাসূল (সাঃ) কর্তৃক নির্লিখিত সিহাহ সিত্তাহ হাদীস গ্রন্থসমূহের সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলূল্লাহ (সঃ) বলেছেন, এ 'আমর' অর্থাৎ খেলাফত কুরাইশদের মধ্যে সর্বদা বিরাজমান থাকবে। এমনকি তাদের মধ্য থেকে দু'জন লোক অবশিষ্ট থাকলেও। *(সহীহ আল-বুখারীঃ হাদীস নং- ৬৬৪১)*

হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র একজন নবী ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছিল; কিন্তু সে আল্লাহ্ তাআলাকে চিনতে পারল না বলে তাঁর অবাধ্য হয়ে গেল। এজন্য তার বংশমর্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হলো না। উপরন্তু যে শাস্তি দেয়া হলো, সমস্ত দুনিয়া তা হতে শিক্ষা লাভ করতে পারে। এরশাদ হচ্ছেঃ

"এবং নূহ তাঁর রবকে বললেন, পরওয়ারদিগার! আমার পুত্র অবশ্যই আমার পরিবারভুক্ত, আর আপনার ওয়াদা সত্য এবং আপনি মহাজ্ঞানী। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ বলেন, নূহ, সে তোমার পরিবার ভুক্ত নয়, কারণ তার কার্যকলাপ সৎলোকদের মত নয় আর তুমি যে বিষয়ের তাৎপর্য অবগত নও সে বিষয়ে আমার নিকট কোন আবেদন করো না।" *(হূদঃ ৪৫-৪৭)*

নূহ (আঃ) ও হযরত লূত (আঃ)-এর বিবিদের কাহিনীও কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু'জন মহান নবীর বিবিগণ ভিন্ন আকীদা পোষণ করতেন এবং শিরককে লিপ্ত ছিলেন। সেজন্য উভয় পয়গাম্বরই তাঁদের বিবিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এরশাদ হচ্ছেঃ

"কাফিরদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা নূহ ও লূতের বিবিগণের উদাহরণ পেশ করেছেন। এ দু'জন নারী আমার দু' নেক বান্দার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা খেয়ানত করেছিল। তাই তাদের স্বামীগণও তাদেরকে আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারেনি। উভয় নারীকে আদেশ দেয়া হয়, যাও অন্যান্যদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর।" *(আত তাহরীমঃ ১০)*

মিসরের অত্যাচারী ও আল্লাহ্দ্রোহী বাদশা ফিরাউনের বিবির কাহিনীও ঈমানদারদের নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

"ঈমানদারদের নসিহত করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা ফিরাউনের স্ত্রীর বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি দোয়া করেছিলেন, পরওয়ারদিগার! বেহেশতে তোমার নিকটে আমার জন্যে একখানা ঘর তৈরী কর, আমাকে ফিরাউন ও তার সকল অপকর্মের পরিণাম থেকে মুক্তি দাও এবং যালেমদের অনিষ্টকারিতা থেকেও আমাকে নিরাপদ রাখ।" *(আত তাহরীমঃ ১১)*

যাদের ইলম ও আমল নেই, তাদের নাম আবদুল্লাহই হোক, আর আবদুল হামিদ হোক, দীলিপ কুমারই হোক, আর জগদীশই হোক, আল্লাহ্ তাআলার কাছে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই- এরা কেউই আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ পাবার অধিকার পেতে পারে না।

মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে ইলম ও আমল, জ্ঞান ও কাজ ছাড়া আর কোন প্রভেদ নেই। কাফের পবিত্র কুরআন পড়ে না এবং তাতে কি লিখিত আছে তা সে জানে না। কিন্তু মুসলমানের অবস্থা যদি এ রকমই হয় তাহলে সে নিজেকে মুসলমান বলবে কোন অধিকারে? কাফের আল্লাহ্র মর্জি মত চলে না, চলে নিজ ইচ্ছামত; মুসলমানও যদি সেরূপ স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীন নিজের খামখেয়ালীর বশবর্তী হয়, সেরূপই আল্লাহ্ প্রতি উদাসীন ও বেপরোয়া হয় তবে তার নিজেকে 'মুসলিম' অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ

পালনকারী বলার কি অধিকার আছে? কাফের হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করে না যে কাজে সে লাভ ও আনন্দ দেখতে পায় তা আল্লাহ্ তাআলার কাছে হালাল হোক কি হারাম হোক নিঃসংকোচে সে তাই করে যায়। মুসলমানও যদি এ নীতি গ্রহন করে তবে তার ও কাফের ব্যক্তির পার্থক্য রইল কোথায়? মোটকথা, কাফেরের ন্যায় মুসলমানও যদি ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ হয় এবং কাফের ও মুসলমানের কাজ-কর্ম যদি একই রকম হয় তাহলে দুনিয়ায় কাফেরের পরিবর্তে কেবল মুসলমানরাই সম্মান লাভ করবে কেন? কাফেরের ন্যায় মুসলমানরাও পরকালে শাস্তি ভোগ করবে না কিসের প্রতি রাসূল পাঠিয়েছেন, তিনি মুসলিম হওয়ার উপায় ও নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর নবী দুনিয়ায় এসে কি শিক্ষা দিয়েছেন, তা জানার জন্য তারা কখনও যত্নবান হয়েছি কি? আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে ইজ্জত লাভ করার পথের সন্ধান বলে দিয়েছেন, কিন্তু তারা সেই পথে চলছে কি? যেসব কাজ মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে, আল্লাহ্ তাআলা তা এক এক করে বলে দিয়েছেন, কিন্তু মুসলমান কি সেসব কাজ ত্যাগ করেছে? এ প্রশ্নগুলোর কি উত্তর হতে পারে?

কাফের অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্য বান্দা যাদেরকে মনে করি, তারা আমাদের ওপর সকল ক্ষেত্রে বিজয়ী কেন? আমাদের ও কাফেরদের মাঝে বর্তমানে শুধু নামেই পার্থক্য রয়ে গিয়েছে। কেননা আমরা জানি যে, কুরআন আল্লাহ্ তাআলার কিতাব, অথচ আমরা কি এর সাথে কাফেরের ন্যায়ই ব্যবহার করছি না ? আমরা জানি, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রকৃত শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী, অথচ তাঁর অনুসরণ করা আমরা কাফেরদের মতই ত্যাগ করেছি। আমরা জানি যে, কুরআন হল মুসলিম তথা মানব জাতির একমাত্র সংবিধান। কিন্তু আমরা মানুষের দ্বারা লিখিত সংবিধান দ্বারা সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা করছি। আমরা জানি রাসূল (সাঃ) আনীত শরীয়ত মুতাবেক বিচার ফায়সালা করতে হবে। মানুষের তৈরি করা আইনের (তাগুতের আইন) কাছে বিচার-ফায়সালা চাওয়া আল্লাহর সাথে শিরক হওয়া সত্ত্বেও কুফর কোর্টে বিচার ফায়সালার জন্য যাচ্ছি। মুসলিমদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার হুকুম দলাদলি না করে সর্বাবস্থায় (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র থাকুক বা না থাকুক) মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেককে একজন খলিফার বা আমীরুল মু'মিনীনের নেতৃত্বে একত্রিত থাকা। অথচ আমরা জাতীয়তাবাদ, দেশ, ভাষা, বর্ণে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মাঝে দলাদলি করে শত শত ভাগে বিভক্ত রয়েছি। মিথ্যাবাদীর প্রতি আল্লাহ্ তাআলা লানত করেছেন এবং ঘুষখোরদের ও ঘুষদাতা উভয় নিশ্চিতরূপে দোযখে যাবে বলে ঘোষণা করেছেন, সুদখোর ও সুদদাতাকে জগন্য পাপী বলে অভিহিত করেছেন। চোগলখুরী ও গীবতকারীকে আপন ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন, অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতার জন্য কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু এ সমস্ত কথা জানার পরও আমরা কাফেরদের মতই বেপরোয়াভাবে এসব কাজ করে যাচ্ছি। মনে হয়, যেন আমাদের মধ্যে আল্লাহ্র ভয় বিন্দু মাত্র নেই। এ জন্য কাফেরদের তুলনায় আমরা কিছুটা মুসলমান হয়ে থাকলেও আমাদের জীবনে তার কোন প্রতিফলন আমরা পাচ্ছি না। বরং কেবল শাস্তিই পাচ্ছি নানাভাবে এবং নানাদিক দিয়ে। আমাদের ওপর কাফেরদের জয়লাভ এবং সর্বত্র আমাদের পরাজয় ও অপরাধের শাস্তি।

আল্লাহর কালাম মানুষের কাছে এ জন্য আসেনি যে, এটা পেয়েও সে দুর্ভাগ্য ও দুঃখ-মুসিবতের মধ্যে পড়ে থাকবে। পবিত্র কুরআন তো সৌভাগ্য ও সার্থকতা লাভ করার একমাত্র উৎস; আল্লাহ্ তাআলা নিজেই বলে দিয়েছেনঃ

طه

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

"ত্ব-হা হে নবী! তোমার প্রতি কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে, এটা সত্ত্বেও তুমি হতভাগ্য হয়ে থাকবে।" *(সূরা ত্ব-হাঃ ১-২)*

কোন জাতির কাছে আল্লাহ্ কালাম বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তার লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হওয়া, পরের অধীন থাক, অপমানিত ও পদদলিত হওয়া এবং পরের দ্বারা জন্তু-জানোয়ারের মত বিতাড়িত ও নির্যাতিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এমন দুঃখপূর্ণ অবস্থা সেই জাতির ঠিক তখনই হতে পারে যখন তারা আল্লাহ্র কালামের ওপর যুলুম করতে শুরু করে। বনী ইসরাঈলের অবস্থা আপনাদের অজানা নয়। তাদের প্রতি তাওরাত ও ইনজিল নাযিল করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিলঃ

"তাওরাত, ইনজিল এবং অন্যান্য যেসব কিতাব তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল, তারা যদি তা অনুসরণ করে চলতো, তবে তাদের প্রতি আকাশ হতে রিযিক বর্ষিত হতো এবং যমীন হতে খাদ্যদ্রব্য ফুটে বের হতো।" *(মায়েদাঃ ৬৬)*

কিন্তু তারা আল্লাহ্ তাআলার এসব কালামের প্রতি যুলুম করেছিল তার ফলে- "লাঞ্ছনা এবং পরমুখাপেক্ষিতা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ্র গযবে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল, এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহ্র বাণীকে অমান্য করতে শুরু করেছিল, আর পয়গাম্বরগণকে অকারণে হত্যা করেছিল। তাছাড়া আরও কারণ এই যে, তারা আল্লাহ্র অবাধ্য হয়েছিল এবং তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তা তারা অতিক্রম করে গিয়েছিল।" *(সূরা বাকারাঃ ৬১)*

অতএব, যে জাতি আল্লাহ্র কিতাব ধারণ করে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ায় লাঞ্ছিত, পদদলিত এবং পরের অধীন ও পরের তুলনায় শক্তিহীন হয়, নিঃসন্দেহে মনে করবেন যে, তারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কালামের ওপর যুলুম করছে।। অতএব, আল্লাহ্র এ গযব

হতে রেহাই পাওয়ার এছাড়া আর কোন উপায় থাকতে পারে না যে তারা আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি যুলুম করা ত্যাগ করবে এবং ষোলআনা 'হক' আদায় করতে চেষ্টা করবে।

মুসলমান কাকে বলে এবং মুসলিম শব্দের অর্থ কি, একথা প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বপ্রথমেই জেনে নিতে হবে। কারণ মানুষ্যত্ব কাকে বলে এবং মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য কি, তা যদি মানুষের জানা না থাকে, তবে সে জানোয়ারের মত কাজ করতে শুরু করবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ একথা জানতে না পারে যে, মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে কেমন করে পার্থক্য করা যায়, তবে সে তো অমুসলমানের মত কাজ-কর্ম করতে শুরু করবে। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানকে এবং মুসলমানের প্রত্যেকটি সন্ত নকেই ভাল করে জেনে নিতে হবে যে, সে যে নিজেকে নিজে মুসলমান মনে করে এ মুসলমান হওয়ার অর্থ কি? মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে কি পরিবর্তন ও পার্থক্য হয়ে যায়? তার ওপর কি কর্তব্য ও দায়িত্ব এসে পড়ে? ইসলামের কোন সীমার মধ্যে থাকলে মানুষ মুসলমান থাকতে ঈঠরে এবং কোন সীমা অতিক্রম করলেই বা সে মুসলমান হতে খারিজ হয়ে যায়? এসব কথা না জানলে মুখ দিয়ে সে জন্য?

মুসলিম কাকে বলে

একথাটি ভাল করে বুঝার জন্য সর্ব প্রথম আপনাকে কুফর ও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করতে অস্বীকার করাকেই 'কুফর' বা কাফেরী বলা হয়; আর কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করে চলা এবং আল্লাহ্‌র দেয়া পবিত্র কুরআনের বিপরীত যে নিয়ম, যে আইন এবং যে আদেশই হোক না কেন তা অমান্য করাকেই বলা হয় ইসলাম। ইসলাম এবং 'কুফরের' এ পার্থক্য কুরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছেঃ

"আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে যারা ফায়সালা করে না তারাই কাফের।"*(সূরা মায়েদাঃ ৪৪)*

আদালত ও ফৌজদারীতে যেসব মোকদ্দমা উপস্থিত হয় কেবল শুধুমাত্র সেই সবের বিচার-ফায়সালা কুরআন-হাদীস অনুসারে করার কথা এখানে বলা হয়নি। বরং প্রত্যেকটি মানুষ তার জীবনের প্রত্যেকটি কাজের সময় যে ফায়সালা করে সেই ফায়সালার কথাই এখানে বলা হয়েছে।প্রত্যেকটি ব্যাপারেই আপনাদের সামনে এ প্রশ্ন ওঠে যে, এ কাজ করা উচিত কি উচিত নয়, অমুক কাজ এ নিয়মে করবো কি আর কোন নিয়মে করবো? এসময় আপনাদের কাছে সাধারণত দু' প্রকারের নিয়ম এসে উপস্থিত হয়। এক প্রকারের নিয়ম আপনাদেরকে দেখায় আল্লাহ্‌র কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাহ। আর এক প্রকারের নিয়ম উপস্থিত করে আপনদের নফস, বাপ-দাদা হতে চলে আসা নিয়ম-প্রথা অথবা মানব রচিত আইন। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ম বাদ দিয়ে অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, প্রকৃতপক্ষে সে কুফরির পথই অবলম্বন করে। যদি সে তার সমস্ত জীবন সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্ত করে নেয় এবং কোন কাজেই যদি আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ম অনুসরণ না করে তবে সে পুরোপুরিভাবে কাফের। যদি সে কতক কাজে আল্লাহ্‌র হেদায়াত মেনে চলে আর কতকগুলো নিজের নফসের হুকুম মত কিংবা বাপ-দাদার প্রথা মত অথবা মানুষের রচিত আইন অনুযায়ী করে তবে যতখানি আল্লাহ্‌র আইনের বিরুদ্ধাচারণ করবে, সে ঠিক ততখানি কুফরির মধ্যে লিপ্ত হবে। এ হিসেবে কেউ অর্ধেক কাফের কেউ চার ভাগের এক ভাগ কাফের। মোটকথা, আল্লাহ্‌র আইনের যতখানি বিরোধিতা করা হবে ততখানি কুফরী করা হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কুরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

"তোমরা কি আল্লাহ্‌র আনুগত্য ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করতে চাও? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাঁরই আনুগত্য করে যাচ্ছে। আর সকলেই তাঁর কাছে ফিরে যাবে।" *(আলে ইমরানঃ ৮৩)*

আল্লাহর ইবাদতের অর্থ কেবল এটাই নয় যে, দিন-রাত পাঁচবার তাঁর সামনে সিজদা করলেই ইবাদতের যাবতীয় দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়ে যাবে। বরং দিন-রাত সর্বক্ষণ একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার হুকুম পালন করে চলাকেই প্রকৃতপক্ষে ইবাদত বলে। যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তা হতে ফিরে থাকা এবং তিনি যা করতে আদেশ করেছেন তা পূর্ণরূপে পালন করাই হচ্ছে ইবাদত। কারণ হুকুম দেয়ার ক্ষমতা তো কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার, "আল্লাহর হুকুম ছাড়া মানুষ অন্য কারো হুকুম মানতে পারে না।" মানুষের ইবাদত-বন্দেগী তো কেবল তিনিই পেতে পারেন, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার অনুগ্রহে মানুষ বেঁচে আছে। আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই তাঁর হুকুম পালন করে চলছে। একটি পাথর অন্য পাথরের হুকুম মত কাজ করে না, একটি গাছ আর একটি গাছের আনুগত্য করে না, কোন পশু অন্য পশুর হুকুমদারী করে চলে না। কিন্তু মানুষ কি পশু, গাছ ও পাথর অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা তো শুধু আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে, আর মানুষ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য মানুষের নির্দেশ মত চলতে শুরু করবে? একথাই কুরআনের উপরে উল্লেখিত দুইটি আয়াতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। মুসলমানের সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছেঃ

"ঐ ব্যক্তির কথা হইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নিজে নেক আমল করে ও বলে যে, নিশ্চয় আমি মুসলমানদের মধ্য হইতে একজন"। *(হা-মিম সিজদাহঃ ৩৩)*

মুসলিমের বৈশিষ্ট্য

'মুসলিম' তাকেই বলে যে আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ মেনে চলে এবং তার আদেশ লংঘন করে না। আমাদের ৭০% অথবা ৯৫% মুসলিম হওয়ার কোন সুযোগ নেই। আমাকে ১০০% মুসলিম হতে হবে অর্থাৎ 'আল ইসলাম' কে ১০০% মেনে নিয়ে নিজেকে পেশ করতে হবে। তবে হ্যাঁ হুকুম পালনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমলের ক্ষেত্রে কমবেশী ভুলভ্রান্তি হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ শয়তান ও তার সঙ্গী সাথীরা আমাদের পিছনে লেগে আছে সর্বক্ষণ। এরশাদ হচ্ছেঃ

"হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে– যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিস্কৃত করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে নিজে এবং তাহার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না। যাহারা ঈমান আনে না, শয়তানকে আমি তাহদের অভিভাবক করিয়াছি।" *(সূরা আরাফ-২৭)*

সে (শয়তান) বলল **"আপনি আমাকে যেমন গোমরাহীতে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, আমিও এখন আপনার সত্য সরল পথে এই লোকদের জন্য ওৎ পাতিয়া থাকবো এর পর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।"** *(আল-আরাফঃ ১৬-১৭)*

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনে, সেই মহান আল্লাহর শপথ, যিনি শয়তানের ষড়যন্ত্রকে কুমন্ত্রনার পর্যায়েয় সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। *(আবু দাউদ)*

শয়তানের ফাঁদে পরে মুসলিমের দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবার মাধ্যমে ক্ষমারও ব্যবস্থা রেখেছেন।

"তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল। *(বনী ইসরাঈলঃ ২৫)*

"তিনিই তাঁহার বান্দাহগণের নিকট হইতে তওবা কবুল করেন এবং গুনাহ সমূহ ক্ষমা ও মার্জনা করেন। অথচ তোমাদের সব কাজ-কর্ম সম্পর্কে তিনি অবহিত।" *(আশ- শুরাঃ ২৫)*

কিন্তু একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হতে হবে 'ছামিনা-ওয়া আত্বানা" শুনলাম এবং মানলাম (HEAR & OBEY) অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর (সহীহ হাদীস) সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে। এরশাদ হচ্ছেঃ

"রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি (ছামিনা-ওয়া আত্বানা)। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" *(বাকারাহঃ ২৮৫)*

"যখন মুমিনদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা একথাই বলেঃ আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম মূলতঃ তারাই সফল কাম ।" *(আন নূরঃ ৫১)*

"যাহারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করে। ইহারাই সেই লোক যাহাদিগকে আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন। এবং উহারাই বোধ শক্তি সম্পন্ন।" *(আয যুমারঃ ১৮)*

সাহাবা (রাঃ) (রাসূল (সাঃ)-এর সাথীগণ) কিভাবে মুসলিম হয়েছিলেন

আপনারা হয়তো শুনেছেন যে, আরব দেশে মদ পান করার প্রথা খুব বেশী প্রচলিত ছিল। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই মদের জন্য একেবারে পাগল প্রায় ছিল। আসলে মদের প্রতি তাদের অন্তরে গভীর আকর্ষণ বর্তমান ছিল। এর প্রশংসা করে কত যে গযল-গীত তারা রচনা করেছিল, তার হিসেব নেই। মদের জন্য প্রাণ দিতেও তারা প্রস্তুত হতো। একথাও আপনারা জানেন যে, একবার মদের নেশা লাগলে তা দূর হওয়া বড়ই মুশকিল। মদখোর ব্যক্তিরা মদের জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু মদ ত্যাগ করতে পারে না। কোন মদখোর যদি মদ না পায় তবে তার অবস্থা কঠিন রোগীর অপেক্ষাও খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু যখন মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছিল তখন কি অবস্থা হয়েছিল তা কি আপনারা কখনও শুনেছেন? মদের জন্য পাগল জান দিতে প্রস্তুত সেই আরবরাই এ হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে নিজেদের হাতেই মদের বড় বড় পাত্র ভেংগে ফেলেছিল। মদীনার অলিতে-গলিতে বৃষ্টির পানির মত মদ বয়ে গিয়েছিল।

হযরত আবু বুরাইদা (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা আমরা একটা মদের আসরে বসাছিলাম, হঠাৎ আমি উঠে রওয়ানা হলাম এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। ইতিমধ্যে মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশ এসে গেছে। আমি আমার সংগীদের কাছে ফিরে এলাম এবং তাদের

সামনে মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত *(মায়েদাঃ ৯০,৯১)* 'ফাহাল আনতুম মুনতাহুন' পর্যন্ত পাঠ করে শুনালাম। তখন কতিপয় লোকের হাতে পানপাত্র ছিল, যা থেকে তারা কিছু পান করেছে এবং কিছু বাকী আছে। নির্দেশ শুনার সাথে সাথে সবাই পানপাত্র উপুর করে দিলেন এবং বারবার বলতে থাকলেন, 'ইনতাহাইনা রব্বানা' 'ইনতাহাইনা রবান্না'–"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিরত হলাম"- *(তাসীরে ইবনে কাসীর)*

"লোকদের ভয় দেখানোর জন্য কোন সংস্থা কায়েম করারও প্রয়োজন হল না, আর সরকারকেও মৃত্যুদণ্ড, কয়েদ অথবা মালক্রোক করতে হল না। বরং লোকেরা কুরআনের নির্দেশ শুনার সাথে সাথে স্বেচ্ছায় তা মেনে নিল।" *(মিনহাজুল কুরআন ফিত-তারবিয়াহ, মুহাম্মাদ শাদীদ)।*

সাফিয়্যা বিনতে শাইবা বলেন, একদা আমরা আয়েশা (রা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরাইশ মহিলাগণ এবং তাদের গুণকীর্তন উল্লেখিত হল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, কুরাইশ মহিলাদের সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ! আনসার মহিলাদের তুলনায় অধিক মর্যাদার অধিকারিণী এবং কুরআন মজীদের সত্যতা স্বীকার ও তার উপর ঈমানদার নারী আমি আর দেখিনি। যখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলঃ

এবং নিজেদের বক্ষদেশের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে- *(নূরঃ ৩১)* তখন তাদের পুরুষ লোকেরা বাড়ি ফিরে গিয়ে নারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ এই আয়াত নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, বোন এবং অপরাপর আত্মীয়া মহিলাদের শুনালেন। এই নির্দেশ শুনার সাথে সাথে প্রতিটি মহিলা উঠে গিয়ে চাদর দিয়ে নিজেদের মাথা ঢেকে নিল। *(আবু দাউদ)*

শেখ মুহাম্মদ আলী আল রিফাই সাহাবাদের (রাঃ) সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন সাহাবারা (রাঃ) আল্লাহর হুকুমের অনুসরণের জন্য নিজেদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরবানী দিয়েছেন। কুরবানী দিতে দিতে উনারা ইসলাম যে উচ্চ আসনে রয়েছে সেই আসনে অসীন হয়েছিলেন। আর বর্তমান দিনের মুসলমান দাবীদাররা নিজেদের জীবনের কুরবাণী করার কথা তো অনেক দূরে, ইসলামকে কুরবানী দিতে দিতে নিজেদের মানে নামিয়ে আনতে তৎপর। আর এ কাজে তাদের সহযোগী হচ্ছে বর্তমান কালের আলেম নামধারী একদল 'মাগদুবের'দল।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাকে হুকুম করেছেন আমি নিজে যেন সর্বপ্রথম মুসলিম হওয়ার ঘোষণা দেইঃ

আপনি বলে দিনঃ **"আমাকে তো এই আদেশই করা হয়েছে যে, সকলের আগে আমি তাহার সম্মুখে মাথা নত করিয়া দিব। আমাকে তাকীদ করা হয়েছে যে, (কেহ যদি ইলাহর সাথে শরীক করে তবে সে করুক কিন্তু) তুমি কিছুতেই মুশরিকদের মধ্যে শামিল হবে না।"** *(সূরা আল-আনামঃ ১৪)*

বড় কুফর এবং তার শ্রেণী বিভাগ

বড় কুফর কুফরকারীকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আর তা হল বিশ্বাসের মধ্যে কুফরী। তার বহু শ্রেণী; তার মধ্যেঃ

মিথ্যার কুফরঃ

কুরআন ও হাদীসকে অস্বীকার করা; অথবা তাদের কোন অংশকে। কারণ আল্লাহ্‌ (সুব) বলেনঃ

"ওর থেকে কে বড় জালেম হতে পারে যে আল্লাহ্‌র (সুব) উপর মিথ্যা কথা বলে অথবা সত্য তার কাছে সমাগত হলে তাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। জাহান্নাম কি কাফেরদের থাকার জন্য যথেষ্ট নয়?" *(সূরা আনকাবুত ২৯ঃ ৬৮)*

"তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অস্বীকার কর?" *(সূরা আল-বাক্বারা ২ঃ ৮৫)*

অস্বীকার ও অহঙ্কারের কুফরীঃ

তা হল সত্যকে জেনেও তার অনুসরণ না করা যেমন ইবলিস করেছিল। তার প্রমাণ আল্লাহ্‌ বলেনঃ

"যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম আদমকে সেজদা করার জন্য তখন সকলে সেজদা করল ইবলিশ ছাড়া। ইবলিশ অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।" *(সূরা বাকারা ২ঃ ৩৪)*

কিয়ামতের দিনের সম্বন্ধে সন্দেহ বা মিথ্যা ধারণা পোষণ করা অথবা তাকে অস্বীকার করা এবং তাকে সত্য বলে না মানাঃ

যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ (সুব) বলেনঃ

“আমার মনে হয় না কেয়ামত ঘটবে এবং যদিও আমি আমার প্রতিপালকের কাছে ফেরত যাই অবশ্যই এর থেকে ভাল জিনিস সেখানে পাব। তাকে তার ঐ সাথী বলল যিনি তার সাথে কথা বলছিলেনঃ কিভাবে তুমি তাকে অস্বীকার কর যিনি তোমাকে মাটি হতে, সৃষ্টি করেছেন, তারপর মনি হতে, তার পর পূর্ণ মানুষ বানিয়েছেন।” *(সূরা কাহাফ ১৮ঃ ৩৬-৩৭)*

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কুফরীঃ

ইসলাম যা দাবি করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং তাতে বিশ্বাসও না করা। তার প্রমাণ- **আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ “যারা অস্বীকার করে ঐ সমস্ত জিনিসকে যে সম্বন্ধে তাদের ভয় দেখান হয় এবং তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।”** *(সূরা আহ্‌কাফ ৪৬ঃ ৩)*

নিফাকীর কুফরীঃ

তা হল মুখে ইসলামকে প্রকাশ করা এবং অন্তরে ও কাজে তার বিরোধিতা করা। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

“এটা এজন্য যে, তারা ঈমান এনেছিল, তারপর কুফরী করেছে ফলে তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে ফলে তারা আর বুঝতে পারে না।” *(সূরা মুনাফিকুন ৬৩ঃ ৩)*

অন্যত্র বলেনঃ **“মানুষদের ভিতরে অনেকে আছে যারা মুখে বলে- আল্লাহ্ এবং আখিরাতের উপর ঈমান এনেছি কিন্তু সত্যিকার অর্থে আনেনি।”** *(সূরা আল বাকারা ২ঃ ৮)*

অস্বীকারে কুফরীঃ

তা হল দ্বীনের প্রকাশ্য কোন জিনিসকে অস্বীকার করা। যেমন ইসলাম বা ঈমানের ভিত্তিগুলো এবং ঐ লোক সালাতকে অস্বীকার করে এবং ত্যাগ করে। সে তো কাফের বা ধর্মত্যাগী। এ রকমভাবে কোন বিচারক যখন আল্লাহ্‌র (সুব) আইনকে অস্বীকার করে কিংবা সেই অনুযায়ী বিচার না করে। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

“যা আল্লাহ্ (সুব) অবতীর্ণ করেছেন সে মতে যারা বিচার করে না তারাই কাফের।” *(সূরা আল মায়িদা ৫ঃ ৪৪)*

ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অস্বীকার করল সে যেন কুফরী করল।

ছোট কুফর এবং তার শ্রেণী বিভাগ

এই ছোট কুফর কুফরকারীকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। যেমনঃ

নিয়ামতের সাথে কুফরী করাঃ

প্রমাণ- আল্লাহ্ (সুব) মূসা (আঃ)-এর কওমের মু'মিনদের উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

“যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা দিলেন যদি তোমরা শুকরিয়া জানাও তবে অবশ্যই আমি তোমাদের সর্বাধিক বাড়িয়ে দেব এবং যদি তা অস্বীকার কর তবে নিশ্চয়ই আমার আযাব খুবই নির্মম।” *(সূরা ইব্রাহীম ১৪ঃ ৭০)*

আমলের ক্ষেত্রে কুফরীঃ

এটা ঐ সমস্ত পাপের কাজ যাকে শরীয়তের কুফরী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যদিও তার আমলকারীকে ঈমানদার বলেই বলা হয়েছে। যেমন নবী (সঃ) বলেনঃ “মুসলমানকে গাল দেয়া ফাসেকী কাজ এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।” *(সহীহ বুখারী)*

অন্যত্র বলেনঃ “যখন যেনাকারী যেনা করে তখন সে আর মু'মিন থাকে না এবং যখন মদ্যপ মদ পান করে তখন সে আর মু'মিন থাকে না।” *(সহীহ মুসলিম)*

কাফের ও কুফর

“তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতপর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কাফের কেউ মুমিন। *(সূরা আত তাগাবুনঃ ২)*

কুফর অর্থ কোন কিছুকে গোপন করা। ‘কুফর’ হচ্ছে এক ধরনের মুর্খতা বরং কুফরই হচ্ছে আসল মুর্খতা। মানুষ আল্লাহকে না চিনে মুর্খ হয়ে থাকলে তার চেয়ে বড় মুর্খতা আর কি হতে পারে ? শরীয়তের ভাষায় কুফর বলতে যা বুঝায় তা এখানে আলোচনা করবো। রাসূল(সাঃ) যে শরীয়ত আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন তার মূল বিষয় সমূহ যেগুলি অপরিহার্য, অপরিবর্তনীয় এবং অলঙ্ঘনীয় (অবশ্যই পালনীয় এবং পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই এবং পালন না করলে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে) হুকুম রূপে মেনে চলার জন্য মানব জাতির কাছে উপস্থাপন করেছেন সেগুলোর যে কোন একটি বিষয়কে

অস্বীকার করা বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকে কুফরী কাজ বা কুফরী বলে এবং যে ব্যক্তি এই কুফরীতে লিপ্ত হবে সে কাফেরে পরিণত হবে। অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী কোন বিধানকে বিশ্বাস করা এবং নবী (সাঃ) এর আনীত বিধানকে কিংবা বিধানের যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের। আবার ইসলামকে মানে এবং ইসলামের বিরোধী হুকুম-গুলিকেও মানে এমন ব্যক্তিও মুশরিক কাফের।

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে সকল নবীর উম্মতকে এবং আমাদেরকে ইসলাম নামক দ্বীন দিয়েছেন; এই ইসলাম দ্বীনের জন্য রাসূলদের মাধ্যমে জীবন পদ্ধতি বা শরীয়ত নাজিল করেছেন। একটি শরীয়ত নাজিল করার পর যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষ সেটাকে অমান্য করা শুরু না করেছে এবং বিকৃত না করে ফেলেছে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা আরেকটি শরীয়ত নাজিল করেননি। ঠিক এইভাবে ইহুদী এবং খৃষ্টানরা যথাক্রমে মুসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) এর উপর প্রেরিত তাওরাত ও ইনজিল কিতাবকে অমান্য করে বিকৃত করতে শুরু করার পর শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে, রাসূল হিসেবে আসমানি কিতাব 'আল কুরআন' এবং সুনির্দিষ্ট শরীয়ত দিয়ে পাঠিয়েছেন দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত । আল্লাহ বলেন :

"এবং বাস্তবিকই এই কিতাবে আমি কোন কিছুই বাদ দেই নাই।" *(আন'আমঃ ৩৮)* এবং "নিশ্চয়ই আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ (হে নবী) তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি। *(নাহলঃ ৮৯)*

রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন তাতে মানব জীবনের সকল অধ্যায়ের সুস্পষ্ট নিয়ম পদ্ধতি বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। কিভাবে শারীরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে হবে (নামায, রোজা, হজ্ব, ইত্যাদি), কিভাবে ব্যক্তি জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে আল্লাহতায়ালার ইবাদত বা হুকুমের অনুসরণ করতে হবে তা হুকুম আকারে রাসূল (সাঃ)-এর উপর নাজিলকৃত শরীয়তের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া আছে। অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্য(সুদ বিহীন এবং যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা–ইসলামী র্তগুলোকে একেবারে চূর্ণ করে দেয়াই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা দরকারি কাজ ও সর্বপ্রথম শর্ত। অর্থনীতি) কিভাবে করতে হবে; সমাজে বসবাসের জন্য- বিয়ে কিভাবে করতে হবে, সম্পত্তি কিভাবে বন্টন হবে, পিতা-মাতার হক, আত্মীয়ের হক, মুসলিম প্রতিবেশী এবং দরিদ্রের হক, সন্তানদের হক কিভাবে রক্ষা করতে হবে (ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা)। কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা কিভাবে অর্জন করতে হবে (ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা)। আল্লাহর দৃষ্টিতে যে সকল কাজ অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত সে সকল অপরাধের জন্য কিভাবে শাস্তি দিতে হবে(ইসলামী হুদুদ বা শাস্তি ব্যবস্থা)। মানুষের পারস্পরিক বিষয়াদি সংক্রান্ত যাবতীয় ঝগড়া, বিবাদের বিচারের ফয়সালা শুধুমাত্র আল্লাহতায়ালার নাযিলকৃত এবং মুহাম্মদ (সাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে কিভাবে করতে হবে (ইসলামী বিচার ব্যবস্থা)। ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ কেমন হবে এবং কিভাবে ইসলামী সংবিধান যার মূল তাওহীদের ঘোষণা "আল্লাহর সার্বভৌমত্ব" দ্বারা দেশ, জনগন এবং প্রশাসন পরিচালিত হবে (ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)। এবং ইসলামী রাষ্ট্র না থাকলেও কিভাবে সমস্ত দুনিয়ার মুসলিমরা এক খলিফার নেতৃত্বে একত্রিত ভাবে থাকবে (অর্থাৎ ছোট ছোট দল বানিয়ে বিভক্ত হয়ে যেন না যায়) ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের কিভাবে চেষ্টা করবে, কিভাবে দারুল কুফরের (শুধুমাত্র আল্লাহর আইন দ্বারা যেখানে দেশ পরিচালিত হয় না অর্থাৎ যেদেশে মানব রচিত আইনের সংবিধান দ্বারা সংসদ ও দেশ চলে) থেকে দারুল ইসলামের(শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক আল্লাহর আইন দ্বারা যে দেশ পরিচালিত হয়) দিকে হিজরত করতে হবে, এক খলিফা বা আমিরুল মুমিনীনের নেতৃত্বে কিভাবে জিহাদ করতে হবে। অমুসলিম জনগন এবং অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে মুসলিমদের আচরন কিভাবে করতে হবে(ইসলামী বিদেশনীতি)। আল্লাহ তায়ালা যে সকল খাদ্য এবং কাজকে হারাম করেছেন যেমন-শুকরের মাংস, মদ, আল্লাহর নামে যবেহ না দেয়া পশুর মাংস, ইত্যাদি অনুরূপ– সুদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী ইত্যাদি বিষয়াদি থেকে কিভাবে বেচে থাকতে হবে। কোন কোন কাজ আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে নিষিদ্ধ যেমন–কবীরা গুনাহ সমূহ, কোন কোন কাজ একজন মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং ইসলামে প্রবেশের শর্তসমূহ কি এবং ইসলাম গ্রহনের পর ফরজ ওয়াজিব দায়িত্ব সমূহ কি কি এবং কোন কোন কাজ মানদুব ও মুবাহ তা কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা শেষ নবী রাসূল (সাঃ) এর দ্বারা মুসলিমদের জন্য যে শরীয়ত নাযিল করেছেন অর্থাৎ জীবন-যাপন পদ্ধতি দিয়েছেন তাতে হুকুম আকারে বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন।

এখন যে সকল ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) আনীত ও প্রদর্শিত শরীয়তের পুরোটা বা যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করবে সে কাফের।

"আর যারা কাফির, তাদের জন্য রয়েছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব, আল্লাহ তাদের আমলসমুহ ব্যর্থ করে দেবেন।" *(মুহাম্মদ ৮-৯)*

আবার অনেক সময় মানুষ রাসূল (সাঃ) এর শরীয়ত মানে এবং মানব রচিত আইন কানুন ও মানে সে শিরককারী মুশরিক কাফের। তার প্রমাণ নিন্মলিখিত আয়াত

"যে কেউ রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা

নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।" *(আন-নিসা ১১৫-১১৬)*

এ আয়াত দ্বারা পরিস্কার রূপে প্রমাণিত হয় যে রাসূলের প্রদর্শিত পথের বিরোধিতা করা এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য কোন পথ গ্রহণ করা শিরক। এর শাস্তি হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম স্থান জাহান্নামে বন্দি করে রাখা। এ বিষয়ের ওপর এদিক দিয়ে আলোচনা হতে পারে যে এটা আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে প্রমাণিত কি না? যদি আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের কথা নির্ধারিত হয়, তাহলে তা নিয়ে কানাঘুষা করা এবং হেকমতের পরিপন্থী আখ্যা দেয়া, একে যুগের পরিপন্থী বলা এবং তা ছেড়ে নিজের মনগড়া পথের বা অন্য কারুর অন্ধ অনুকরণে অন্য পথের আশ্রয় নেয়া সুস্পষ্ট শিরক। আল্লাহ্ শিরককে কখনোই ক্ষমা করবেন না।

ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও কুফরীতে লিপ্ত হয়ে ইসলাম থেকে বের হওয়া

মানুষের এমন কিছু কথা ও কাজ রয়েছে যেগুলো দ্বারা সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, যদিওঃ

তার মাঝে ইসলাম ত্যাগ করার বা কুফরী করার কোন ইচ্ছা ছিলনা এবং সে যা বলেছে তা সে নিজে বিশ্বাস করেনা।

ইবনে হাজার আসকালানি (রহঃ) বলেছেনঃ মুসলিমীনদের মধ্যে এমন আছে যারা দ্বীন ত্যাগ করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও দ্বীন থেকে বের হয়ে যায় এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ না করা সত্ত্বেও (তারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়)।[১০৪]

শাঈখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেন, "বাস্তব এটাই যে, কেউ যদি এমন কিছু বলে বা করে, যেটা কুফরী, সে সেই কথা বা কাজের দ্বারা কাফের হয়ে গেল, যদিও তার কাফের হওয়ার ইচ্ছা ছিল না (লাম ইয়াকমুদ) কারণ কেউই কাফের হওয়ার ইচ্ছা রাখেনা, আল্লাহ্‌র যার ব্যাপারে ফয়সালা করেছেন সে ব্যতীত।[১০৫]

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবেঃ একজন ব্যক্তি যদি একটি মুর্তির সামনে সিজদা করে, তাহলে এই কাজটিই কুফর হিসেবে যথেষ্ট যা দ্বারা একজন ব্যক্তি দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায়, অবশ্য সে যদি তাকফিরের অযোগ্য হয় তাহলে ভিন্ন কথা (যেমন ইকরা বা যবরদস্তি বা ভুলে যাওয়া)। কিন্তু তাকফিরের ক্ষেত্রে এমন কোন শর্ত নেই যে, সেই ব্যক্তির মনে এই কাজ দ্বারা কুফরী করার (বা কাফির হওয়ার) ইচ্ছা থাকতে হবে। কারণ যেসব মুশরিকীন মৃতদেরকে ইবাদাত দেয় এবং তাদের কাছে দুয়া করা তাদের রিযক ও নিরাপত্তার জন্য- তারা কোনদিন এইসব (শির্কী) কাজ দ্বারা কাফির হতে চায় না; বরং তারা একে আল্লাহর নিকটস্থ হওয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। তার পরও তাদের কাজ গুলো ভয়াবহ শিরক এবং রিদ্দার (দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া) কাজ, অর্থাৎ তাকে মুশরিক হিসাবে গণ্য করা যায়।

আরেকটি উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) অথবা তাঁর রাসূল (সাঃ) সম্বদ্ধে ঠাট্টা করে বা খারাপ মন্তব্য করে, তার উপর তাকফির করার জন্য এটা জানার প্রয়োজন নেই যে সে কুফরী করতে চেয়েছিল না চায়নি; এবং (তার ওপর তাকফির করার জন্য) এটাও শর্ত নয় যে সে তার (কুফরী) কথার উপর বিশ্বাস এনেছে। বরং সে যদি ইচ্ছা সহকারে সেই বাক্য গুলো উচ্চারণ করে, (অর্থাৎ ভুল উচ্চারণের কারণে সেই কথা গুলো তার মুখ থেকে বের হয় নি), তাহলে শুধুমাত্র এই কথাগুলোই কুফর হিসেবে যথেষ্ট যা তাকে দ্বীন থেকে বহিস্কার করে দেয়। আসলে, 'কথা বা কাজটি করতে ইচ্ছা না থাকা' এবং 'কুফরী করার ইচ্ছা না থাকা'-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। দ্বিতীয়টা- 'কুফরী করার ইচ্ছা'-এর কোন গুরুত্ব নেই (সেই ব্যক্তির উপর তাকফিরের ক্ষেত্রে) এবং 'কুফরী করার ইচ্ছা'র উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি তাকফিরের উপর কোন প্রভাব রাখে না, (যখন কোন কথা বা কাজ কুফর আল আক্‌বার হয় যার দ্বারা একজন দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত হয়)।[১০৬] কিন্তু প্রথমটা- 'কথা বা কাজটি করার ইচ্ছা'- যার অর্থ হল যে সেই ব্যক্তি ইচ্ছা সহকারে কথাটি বলেছে বা কাজটি করেছে- এই বিষয়টির উপর তাকফির নির্ভরশীল, এক্ষেত্রে পরিস্থিতি যাচাই না করে তাকফির করা নিষেধ। এবং এই ক্ষেত্রে তাকফির করার পূর্বে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে এই কাজটি বা কথাটি মৃত্যুর মুখে জোর করে করানো অথবা বলানো হয়নি; অথবা উচ্চারণের ভুলে বা জ্ঞান না থাকার কারণে বলা হয়নি।

ইবনুল কাইয়ুম বলেছেনঃ যে ঘটনাটি ঘটেছিল, যে একজন লোক তার হারিয়ে যাওয়া উট ফিরে পেয়ে অতিরিক্ত খুশিতে বলে ফেলেছিলঃ "ও আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা এবং আমি তোমার রব।" যদিও সে স্পষ্ট কুফর উচ্চারণ করেছিল, সে তার এই কথা দ্বারা কাফির হয়ে যায়নি। এর কারণ হচ্ছে তার সেই কথাগুলো উচ্চারন করার ইচ্ছা ছিল না। এবং (ঠিক তেমনিই) যাকে জোর করে কুফরী কথা বলানো হয়েছে, সে অবশ্যই এমন কথা বলেছে যা কুফরী, কিন্তু সে কাফির হয়ে যায়নি কারণ তার এই কথাটি

---

১০৪. *ফাতহুল বারি (১২/৩৭৩)*

১০৫. *আস-সারিম লাল মাসলুল (পৃঃ১৭৪)*

১০৬. *কোন ব্যক্তি যদি অন্তরে কাফির হওয়ার ইচ্ছা রাখে, তাহলে সেই ইচ্ছার মাধ্যমেই কাফির হয়ে যাবে, সে কোন কুফরী কাজ করুক বা না করুক।*

উচ্চারণ করার ইচ্ছা ছিল না। (এবং) এই ব্যাক্তি তার মত নয় যে ঠাট্টা করেছে (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) অথবা দ্বীন সম্পর্কে)- কারণ যে ঠাট্টা করেছে, সে স্বেচ্ছায় কুফরী কথা উচ্চারণ করেছে, যদিও সেই কথা দ্বারা হয়তবা তার কাফের হওয়ার ইচ্ছা ছিল না। এই ক্ষেত্রে (যখন কেউ ঠাট্টা করে), তার কথার দ্বারা সে অবশ্যই কুফরী এবং রিদ্দাহ করল, যদিও সে শুধু ঠাট্টা করছিল; (এর কারণ হল যে তার সেই কথাগুলো উচ্চারণ করার ইচ্ছা ছিল) (কাসিদুর লিতাকাল্লুম বিল লাফয) এবং যদিও সে শুধু ঠাট্টা করছিল, তার জন্য কোন ওজর নেই যেমন ওজর আছে সেই ব্যাক্তির যাকে (কুফরী করতে) বাধ্য করা হয়, অথবা যার মুখ থেকে ভূল উচ্চারণের কারণে কুফরী কথা বেরিয়েছে, অথবা যে ভূলে গিয়েছিল।[১০৭]

শাঈখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যাক্তি কুফরী বাক্য উচ্চারণ করল, কোন প্রয়োজন (ইক্‌রা) ছাড়া এবং সে ইচ্ছা কওে এটা উচ্চারণ করল (অর্থাৎ তার মুখ থেকে ভূলে এইকথা বেরিয়ে যায়নি) তাহলে সে ব্যাক্তি সে (কুফরী) কথা দ্বারা প্রকাশ্যে (যাহিরান) এবং গোপনে (বাতিনান) কাফের হয়ে গেল। এবং আমরা জায়েয মনে করিনা যে তার ব্যাপারে এই কথা বলা যে, "হয়তবা সে অন্তরে মুমিন"।[১০৮]

পূর্বোক্ত কথার সাথে শাঈখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ সূরা নাহল ১০৬ নং আয়াতের তাফসিরে বলেছেন, "এটা জানা বিষয় যে তিনি (আল্লাহ) এই আয়াতে কুফরী দ্বারা (ই'তিক্বাদ) বিশ্বাসের কুফরীর কথা শুধু বুঝাননি। কারণ অন্তরের ব্যাপারে কাউকে জোর করা সম্ভব নয়, (শুধু কথা বা কাজের ক্ষেত্রে সম্ভব) বলেছেন 'ইক্‌রাহ' এর অর্থ হল যে শুধু তার ক্ষেত্রে ওজর আছে যাকে কুফরী কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়েছে, শারিরিক অত্যাচার করে এবং জানের ভয় দেখিয়ে। কিন্তু ইক্‌রাহর পরিস্থিতি (অথবা ভূল উচ্চারণ বা ভূলে যাওয়া) ছাড়া যে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করল, সে কাফের হয়ে গেল সে তার বাক্যে (অন্তর থেকে) বিশ্বাস করুক বা না করুক। কারণ যদিও একজন ব্যাক্তিকে একটি কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য করা সম্ভব, তাকে সেটা অন্তর থেকে কবুল এবং বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়, - এবং তাই পূর্বোক্ত আয়াতে (১৬ঃ১০৬) সেই (ইক্‌রাহ) বাধ্য করার কথা বলা হয়েছে, সেটা কথার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। এটাই প্রমাণ করে যে ইক্‌রার পরিস্থিতি ছাড়া এবং ভূল উচ্চারণ বা ভূলে যাওয়ার পরিস্থিতি ছাড়া, একজন ব্যক্তি তার কথা দ্বারা কাফের হয়ে যেতে পারে। তাই, তার কথাকে কুফরী (এবং সেই ব্যাক্তিকে কাফির) হিসেবে গণ্য করার জন্য এটা শর্ত নয় যে, সেই ব্যাক্তি তার (কুফরী) কথার উপর (অন্তর থেকে) বিশ্বাস রাখে।

বড় নিফাক ও মোনাফেকী

তা হল মুখে ইসলামকে প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরী ধারণা পোষণ করা। তার কয়েকটি শ্রেণী-

১) রাসূল (সঃ)-কে মিথ্যা বলে মানা;

২) নবী (সঃ) যা নিয়ে এসেছেন তার কোনটাকে মিথ্যা বলা;

৩) নবী (সঃ)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করা;

৪) নবী (সঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা কোন কোনটার সাথে শত্রুতা পোষণ করা;

৫) ইসলামে ক্ষতি হলে খুশী হওয়া;

৬) ইসলামের বিজয়কে অপছন্দ করা;

মুনাফিকদের শাস্তি কাফেরদের শাস্তি হতেও প্রচন্ড এবং তা আরও মারাত্মক। আল্লাহ্ বলেনঃ **"নিশ্চয়ই মুনাফিকদের ঠিকানা আগুনের সর্বনিম্ন স্থান।"** *(সূরা নিসা ৪ঃ ১৪৫)*

এই কারণে আল্লাহ্ (সুব) সূরা বাকারার প্রথম দিকে দু'টি আয়াতের মাধ্যমে কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন **১৩**টি আয়াতের মধ্যে। আমরা দেখতে পাই সুফীরা মুসলমান, সালাত পড়ে, রোযাও রাখে, কিন্তু তারা মুসলমানদের আক্বীদা নষ্ট করে দেয়, যখন আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যের কাছে দোয়া করাকে জায়েয বলে- যা বড় শির্কের অন্তর্ভূক্ত। তারা এই ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ্ (সুব) সর্বত্র বিরাজমান। আল্লাহ্ (সুব) যে আরশের উপর আছেন তাও তারা অস্বীকার করে। কুরআনের কোন কোন আয়াত ও সহীহ্ হাদীসকে পর্যন্ত অস্বীকার করে।

ছোট নেফাক বা ছোট মুনাফিকী

তা হচ্ছে আমলের মধ্যে মুনাফিকী যেমনঃ ঐ মুসলিম যে মুনাফিকদের ঐ সমস্ত দোষে দোষী যার সম্বন্ধে নবী (সঃ) বলেনঃ

১০৭. *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ইন (৩/৬৩)*

১০৮. *সারিম আল মাসলুল (পৃঃ৫২৪)*

"মুনাফিকদের নিদর্শন তিনটাঃ যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন তার নিকট আমানত দেয়া হয় তা নষ্ট করে।" *(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)*

নবী (সঃ) অন্যত্র বলেনঃ "যাদের মধ্যে এই চারটি দোষ আছে তারা পূর্ণ মুনাফিক এবং যার মধ্যে এর কোন একটাও আছে, তার মধ্যে এই মুনাফিকী থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ত্যাগ করে। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যদি প্রতিজ্ঞা করে ভঙ্গ করে, যদি চুক্তি করে তা ভাঙ্গে, যদি শত্রুতা করে সীমা অতিক্রম করে ।" *(সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মিলিত হাদীস)*

এই নেফাক নেফাকীকে ইসলাম থেকে বের করে না, কিন্তু তা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেনঃ আলেমদের কাছে এর অর্থ আমলের ক্ষেত্রে নেফাক। এটাই ছিল নবী (সঃ)-এর যামানায় মিথ্যার নেফাক।

মুনাফেক

মুনাফেক শব্দটি আরবী নেফক(نفق) ধাতু হতে নির্গত। যেমন–(نفق) শব্দটির অর্থ হচ্ছে এমন একটি সুড়ঙ্গপথ যার একদিক হতে প্রবেশ করার এবং অপরদিক হতে বের হবার রাস্তা রয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় অর্থ হচ্ছেঃ "দ্বীন ইসলামের এক দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশ করে অপর দরওয়াজা দিয়ে বের হয়ে আসা।" *(মুফরাদাতে ইমাম রাগেব)*

দ্বীন ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করার পর তা থেকে আবার ফিরে আসা দু'টি কারণে হতে পারে। (১) এ প্রবেশ হয়েছে শুধু লোক দেখানোর জন্য। আন্তরিকভাবে সে ইসলামকে গ্রহণ করেনি, বরং মন আত্মা তার কুফরের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। (২) দ্বিতীয়তঃ এ প্রবেশ ইসলামের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস-অনুরাগ ও মহব্বত নিয়েই হয়েছে। লোক দেখানোর জন্য সে ইসলামের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেনি। কিন্তু এ সম্পর্কটি এত দুর্বল যে অন্যান্য সম্পর্ক পূর্ণরূপে তার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। প্রথম শ্রেণীর নেফাককে"নেফাকী আকীদা" (বা বিশ্বাসগত মুনাফেক)। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নেফাককে "নেফাকী আমলী" (বা চরিত্রগত মুনাফেক) বলা হয়। যেমন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলবী (রঃ) তাঁর স্বলিখিত "ফওযুল কবীর" কিতাবে লিখেছেনঃ –"নবুয়াতী যুগে দু'ধরনের মুনাফেক বর্তমান ছিল,

(১) এক ধরনের মুনাফেক ছিল যারা মুখে কলেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করতো বটে, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে কুফর, নাস্তিকতা ও বেঈমানীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা হচ্ছে সেই মুনাফেক যাদের পরিণতি সম্পর্কে আল-কুরআন কঠোর ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ

"অর্থাৎ নিঃসন্দেহে এ সব মুনাফেক জাহান্নামের সর্বনিু প্রকোষ্ঠে অবস্থান করবে।" *(আন-নিসাঃ ১৪৫)*

(২) আর দ্বিতীয় ধরনের হলো ঐ সকল লোক যারা আন্তরিকতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের ঈমানে দৃঢ়তা ছিল না। নানারূপ দুর্বলতার শিকারে পরিণত হয়েছিল। যেমন এক শ্রেণীর লোক ছিল যারা সর্ব বিষয়ে জাতীয় চরিত্র ও কর্মধারাকে অনুসরণ করে চলতো। যদি তাদের সম্প্রদায় মুসলমান হয়ে যেত, তবে তারাও মুসলমান হত। আর তারা কাফের থাকলে এরাও কাফেরই থাকত। আর এক শ্রেণীর লোক ছিল যাদের অন্তঃকরণ পার্থিব স্বার্থসুলভ লালসায় পরিপূর্ণ ছিল, আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বতের জন্য কোন স্থানই তাদের অন্তরে খালি ছিল না। অথবা ধন-সম্পদের লোভ-লালসা ও হিংসা বিদ্বেষের বাতেনী রোগ তাদের মন-মগজ ও অন্তঃকরণকে এমনভাবে বিষাক্ত করেছিল যে, প্রার্থনার স্বাদ ও ইবাদতের বরকত অনুভব করার কোন সুযোগই অবশিষ্ট ছিল না। আবার কিছু লোক ছিল যাদেরকে অর্থনৈতিক চিন্তা ও কর্মব্যস্ততা এমনভাবে বস্তুবাদী ও দুনিয়ামুখী করে রেখেছিল যে, পরকালের চিন্তা-ভাবনা ও আশা-আকাংখা পোষণের কোন সুযোগই তারা পেত না। আবার এমন একদল লোকও ছিল যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুয়াতের প্রতি পূর্ণরূপে আস্থাবান ছিল না এবং তাদের অন্তরে অর্থহীন কুধারণা ও সন্দেহবাদীতা স্থান করে নিয়েছিল। কিন্তু এ কুধারণা ও সন্দেহবাদীতা এমন পর্যায়ে ছিল না যাতে করে তারা ইসলামের গন্ডীসীমা হতে বের হয়ে পড়ে। এ ধরনের আরো কিছু বৈষয়িক কারণ ছিল যার ফলে তাদের নবুয়াতে মুহাম্মদীর উপর অনিশ্চিত ও অসন্তুষ্ট করে রেখেছিল। এমনও লোক ছিল যারা স্বীয় গোত্রীয় ও বংশীয় স্বার্থে এবং তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতো। এমন কি হক ও বাতিলের সংগ্রামে ইসলামের স্বার্থকে পদাঘাত করতেও তারা কুণ্ঠিত হতো না। এ দ্বিতীয় শ্রেণীর নেফাককেই নেফাকে আমলী বা চরিত্রগত মুনাফেকী বলা হয়।"

মুনাফিক বনাম গুনাহগার

মুনাফেকীর যে সকল নিদর্শন ও আলামত ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি তার কোন একটি নির্দেশ ও আলামত কোন লোকের মধ্যে পরিদৃষ্ট হলে তাকে বিনা চিন্তায় মুনাফেক ধারণা করা উচিত নয়। মুনাফেকের যতগুলো বৈশিষ্ট্য উপরে বর্ণিত হয়েছে তার অধিকাংশের উৎসমূল হচ্ছে মানুষের আত্মিক দুর্বলতা ও সীমাহীন পার্থিব লোভ-লালসা। আর এ আত্মিক দুর্বলতা ও সীমাহীন পার্থিব লোভ-লালসা সমস্ত পাপেরও উৎসমূল। এ কারণেই একজন খাঁটি মুসলমানের থেকে এ সব কার্যাবলী প্রকাশ পাওয়া অসম্ভবের কিছুই নয়। কেননা, নবী-রাসূলগণ ব্যতীত মানুষ যতই দৃঢ় ও মজবুত ঈমানদার হোক না কেন তারা কখনই নিষ্পাপ নয়। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই গুনাহর প্রবৃত্তি (নাফস) বর্তমান। এ জন্যই একজন মুসলমান যেখানে খুব ভাল কাজ করছে

সেখানে তার থেকে পাপের কাজও হতে পারে–হচ্ছে। একজন মুনাফেকের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কোন সময় একজন মুসলমানের দ্বারা সে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়া কোনক্রমেই অসম্ভব নয়। সুতরাং এখানে মুনাফেক ও গুনাহগার মুসলমানের মর্যাদা এবং তাদের উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য ভালরূপে বুঝে নেয়া উচিত।

কোন মুনাফেক যখন ইসলামের তালিম তরবিয়াত ও জাতীয় কল্যাণের পরিপন্থী কোন কাজ সাফল্যের সাথে করে, তখন তার অন্তর এ খারাপ কাজের জন্য কোন প্রকার অনুতাপ করার পরিবর্তে বরং তার সাফল্যজনক কূটনৈতিকতার জন্য গর্ববোধ করে। কিন্তু একজন মুসলমানের দ্বারা কি এমন কাজ কখনো হতে পারে? যদি অলক্ষ্যে হয়ে যায়, তখন তার অন্তর ও মন-প্রাণের অবস্থা কি হতে পারে–কুরআনে হাকীম তার বর্ণনায় বলেছেঃ

"আর জান্নাত হচ্ছে সেই সকল মোত্তাকী লোকদের জন্য, যারা ভুলবশতঃ যদিও কোন অশ্লীল কাজ করে বা পাপের কাজ করে স্বীয় আত্মার উপর যুলুম করে, তবে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মনে আল্লাহ তায়ালার খেয়াল ও স্মরণ এসে যায়। আর তারা নিজেদের গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর এমন কে আছে যে, গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? কেহই নেই। আর এ সকল মোত্তাকী লোকেরা বুঝে শুনে জ্ঞাতস্বারে ঐ সকল কৃত গুনাহর কাজ আর দ্বিতীয়বার করে না।" *(আলে-ইমরাণ ঃ ১৩৫)*

আর একস্থানে বর্ণিত হয়েছেঃ

"আর নফসের প্রবল আবেগ-উচ্ছাসের মুখে পড়ে অজ্ঞতাবশতঃ যাদের থেকে গুনাহর কাজ হয়ে পড়ে, আর গুনাহ করার পর নিজেরা তাওবা করে এবং সংশোধিত হয়, এমন লোকদের বেলায় নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।" *(নাহলঃ ১১৯)*

উল্লেখিত আয়াত গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কয়েকটি বিষয় আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়।

প্রথমতঃ একজন মুসলমানের থেকে পাপের কাজ হওয়া সম্ভব এবং হয়েও থাকে।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের থেকে গুনাহর কাজ প্রকাশ হয়ে পড়লে তা বুঝে-শুনে হয় না বরং অজ্ঞতা ও নফসের আকস্মিক আবেগ-উচ্ছাসের দ্বারা পরাজিত ও প্রভাবিত হবার দরুনই হয়ে থাকে।

তৃতীয়তঃ মুসলমান পাপের কাজ করার পর তাদের অন্তঃকরণ আল্লাহর ভয়ে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে উঠে। আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর সুবিচারী গুণ বৈশিষ্ট্যটি তার চক্ষের সামনে মূর্তিমান হয়ে দন্ডায়মান হয়। তার ঈমানের কারণে ললাটভূমি ভীত, কম্পিত ও শংকায় ঘর্মাক্ত পানি দ্বারা সিক্ত হয়ে উঠে। কাল বিলম্ব না করে তারা স্বীয় অপরাধের জন্য রব্বুল আলামীনের দরবারে সিজদায় পড়ে অঝোরে রোদন করতে থাকে। আর প্রার্থনা করতে থাকে তাঁর নিকট ক্ষমা ও মাগফেরাতের জন্য। সংশোধন হয়ে যায় ভবিষ্যতের আগত দিনগুলোর জন্য।

আর চতুর্থ যে বিষয়টি আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়, তা হচ্ছে তৃতীয় বিষয়টির আর একটি দিক। অর্থাৎ তারা নিজেদের কোন পাপের কাজের উপর স্থির হয়ে থাকে না। বরং তা পরিহার করে চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায় এবং এ জন্য তাদের মন মগজ, লজ্জা ও অবমাননার ব্যাথায় ব্যাথিত হয়ে উঠে। কিন্তু মুনাফেকদের মধ্যে এহেন গুণাবলী আদৌ বর্তমান থাকে না। তারা শরীয়তের বিপরীত কাজগুলো নফসের কোন আকস্মিক আবেগ উচ্ছাসের বশবর্তী হয়ে করে না। বরং জেনে বুঝে ও সজাগ অনুভূতি নিয়েই দ্বিধাহীন চিত্তে করে। শরীয়তের বিরুদ্ধাচারণ করাকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে নেয়। তাদের কলবে তখন আর তাওবা ও এস্তেগফার দূরের কথা, আল্লাহর ভয় ভীতির নাম-গন্ধও বিদ্যমান থাকে না।

একজন মুনাফেক ও একজন গুনাহগার মুসলমানের মধ্যে এ হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য। মুনাফেকী হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে একটি বিপরীতধর্মী বিষ। তার মধ্যে আদৌ ঈমানের কোন চিহ্ন নেই। পক্ষান্তরে গুনাহ করার পর যদি মানুষ লজ্জিত না হয় এবং নিজের সংশোধনের জন্য ব্যাকুল হয়ে না উঠে, তবে এ গুনাহই শেষ পর্যন্ত মুনাফেকীর বীজ বপন করে। গুনাহর ব্যাপারে তার কর্ম চরিত্র যদি এমনিই থেকে যায়, তবে তার দ্বারাই মুনাফেকীর বীজ অংকুরিত হয়ে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে কালক্রমে বিরাট বিশাল বৃক্ষের রূপ ধারণ করে। আল্লাহ বলেনঃ

"তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তিনি যদি তাদেরকে তাঁর ফজল-করম দ্বারা অনুগ্রহ করেন, তবে অবশ্যই তারা তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে, সদকা দিবে এবং পুণ্যবান মুসলমান হবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন তাদেরকে তার ফজল ও করম দ্বারা অনুগ্রহ করলেন তখন তারা কৃপণতা প্রদর্শন করল। ফলে তারা আল্লাহর সহিত সাক্ষাত পর্যন্ত তাদের অন্তরে মুনাফিকী সৃষ্টি করে নিল। কেননা, তারা আল্লাহর সাথে যে চুক্তি করে ছিল সে চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলেছে তারা হল মিথ্যাচারী।" *(তাওবাঃ ৭৫-৭৭)*

উল্লেখিত কুরআনে হাকীমের বাণী দ্বারা বোঝা যায় যে, গুনাহ এক জিনিস এবং মুনাফিকী আর এক জিনিস। কিন্তু এদের উভয়ের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ গুনাহ কোন কোন সময় মুনাফিকীর ন্যায় দুরারোগ্য রোগও মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে। কলেরা- মহামারীর সময়কার সাধারণ একটি পেটের পীড়া-যেমন কোন কোন সময় কলেরায় রূপান্তরিত হয়।

এমনিভাবে গুনাহও কোন কোন সময় মানুষের মধ্যে মুনাফেকী সৃষ্টি করে। এ জন্যই আকস্মিক গুনাহর কাজ হয়ে পড়লে সে জন্য নির্ভয় ও নিশ্চিত থাকা উচিত নয়। বরং তার বিভিষিকাময় পরিণতি হতে নিরাপদ থাকার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। নতুবা তা মুনাফিকীর দূরারোগ্য রোগ আমাদের অলক্ষ্যে সৃষ্টি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

"তোমাদের আমল যেন এমনভাবে নিস্ফল ও ধ্বংস না হয় যা তোমরা বুঝতেও পারো না।" *(হুজুরাতঃ ২)*

শারী'আ নির্ধারিত অনুসরণ এবং অন্ধ অনুসরণ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজাহানের অধিপতি। এবং তাঁর দিকে সব কিছু ফিরে যায়----

কিছু ভাইদের প্রশ্নঃ যারা ফিক্হ (শরীয়ার) কোন ব্যাপারে দ্বিমত করে এমন দুজনের ক্ষেত্রে কি বিধান/ নিয়ম? নিজ মাজহাবের ইমামদের কথা মানা প্রত্যেকের জন্য কি আবশ্যক, না কি তাদের বিষয়গুলোর গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা উচিৎ? অনুগ্রহ করে আমাদেরকে রায়গুলি জানাবেন আর আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

তাই নিম্নোক্তভাবে আমি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলামঃ

যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট দলীল/প্রমাণ না থাকে এবং এর রায়/ বিধান যদি ইজতিহাদ[১০৯]-এর উপর ভিত্তি করে হয় তাহলে তারা তাদের (ইমামদের) মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ও পরহেজগার ব্যক্তির অনুসরণ করতে পারে – এটা মুসলিমদের উপর নির্ভর করে কাকে তারা অনুসরণ করবে এবং এক্ষেত্রে তাকে দোষারোপ করা যায় না। তবে যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট দলীল থাকে, তখন একজন মুসলিমকে তার মাজহাবের ইমামের কথা, যা দলীল বিরুদ্ধ, তা গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয় নি। প্রকৃতপক্ষে, যদি তার কাছে দলীল পৌঁছে যায় তবে তাকে ইমামের কথা পরিত্যাগ করতে হবে তিনি যে ইমামই হোন না কেন এবং এটা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। আলেমদের বা ইমামদের কথার পক্ষে (কুরআন অথবা সহীহ্ হাদীস থেকে) সুস্পষ্ট দলীল থাকা প্রয়োজন কারণ তাঁদের কথাই আমাদের জন্য দলীল নয়। প্রকৃতপক্ষে, আলেমদের কথা আমাদেরকে মূল দলীলগুলো বুঝতে এবং বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

যেহেতু আলেমদের কথা দলীল হিসেবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর কথার উপর দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হতে পারে তাই তারা কেউই এটা কখনও বলেননি। প্রকৃতপক্ষে এটা কুরআন, সুন্নাহ এবং মুসলিমদের ইজমার বিরুদ্ধে যায়, যেহেতু- আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনের অনেক জায়গায় আদেশ করেছেন তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করতে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

"এবং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে আনুগত্য কর যাতে তোমরা দয়া পেতে পার।" *(সূরা আলি 'ইমরান ৩:১৩২)*

এবং আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ **" বলুন! আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর...।"** *(সূরা নূর ২৪:৫৪)*

আরও বলেছেনঃ **"...যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদের উপর বিপর্যয় আপতিত হবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক আযাব তাদের গ্রাস করবে।"** *(সূরা নূর ২৪:৬৩)*

এবং আল্লাহ বলেছেনঃ **"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের এবং তোমরা যখন তার কথা শুনছো তখন তা থেকে বিমুক হয়ো না। আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা বলে-'আমরা শুনছি' কিন্তু তারা শোনে না। নিশ্চয় নিকৃষ্টতম জীব আল্লাহ কাছে ঐ সব বধির ও মূক যারা অনুধাবন করে না।"** *(সূরা আনফাল ৮:২০-২২)*

নিশ্চয়ই আলেমগণ (রহঃ) তাদের ছাত্রদের অন্ধভাবে অনুসরণ না করার উপদেশ দিতেন। উপরন্ত, তারা তাদের উপর দলীল গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতেন, যেহেতু এটা আবশ্যকীয় এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক তাই যদি কোন দলীল কারো কাছে পৌঁছে তারপর সে অবশ্যই সেই দলীল অনুসরণ করবে এবং এর বিপরীত সবকিছু বর্জন করবে। আল্লাহ বলেছেনঃ

"অনুসরণ কর যা তোমার রবের পক্ষ হতে হতে এসেছে, এবং তাঁকে ছাড়া অন্য আউলিয়াদের অনুসরণ করোনা। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।" *(সূরা আ'রাফ ৭:৩)*

সূরা আন-নূরে আল্লাহর সাক্ষ্য দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাসূলকে (সাঃ) মান্য করে আল্লাহ তাকে পথনির্দেশ দেনঃ **"এবং তোমরা যদি তাকে মেনে চল, তবে সৎপথ পাবে।"** *(সূরা নূর ২৪:৫৪)*

সুতরাং যে কেউ আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম আশ্-শাফেঈ অথবা ইমাম আহমদ (রহঃ) এর কথার জন্য কোন দলীল পরিত্যাগ করল সে মূল বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করলো যার ব্যাপারে মুসলিমরা একমত। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেনঃ "মুসলিমরা এ ব্যাপারে একমত যে যদি একটি রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ কারো কাছে পৌঁছে তবে এটা ঠিক নয় যে সে কারো কথায়

১০৯. ইজতিহাদঃ যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি যার দ্বারা ইসলামের আইন সম্পর্কে বিশদ গবেষণার পর কোন সিদ্ধান্ত দেয়া হয়।

তা পরিত্যাগ করবে।" এবং ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেনঃ "রাসূলের (সাঃ) পর প্রত্যেক ব্যক্তির কথা কথা গ্রহণ বা বর্জন করা যেতে পারে।"

সুতরাং যারা ধর্মান্ধ নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের ইমামকে অনুসরণের ক্ষেত্রে, এটা পূর্বগামীদের পথনির্দেশের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং ঐ মাযহাবের ইমামদের মতেরও বিপরীত। যেহেতু তারা সকলেই অন্ধ অনুসরণ ও ধর্মান্ধতার নিন্দার ব্যাপারে একমত ছিলেন। নিশ্চয়ই, মুসলিমদের জন্য এটা বাধ্যতামূলক যে তারা সুস্পষ্ট দলীলের অনুসরণ করবে যদিও সে মালিকী, হানাফী, শাফেঈ, হাম্বলী অথবা জাহিরী[১১০] অথবা অন্য যে কোন মাযহাবেরই হোক না কেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা যে কোন একটি মাযহাবে সত্যকে সীমাবদ্ধ করে দেননি, কারণ এসব মাযহাবের ইমামরাও মানুষ ছিলেন, যাদের দ্বারা সঠিক ও ভুল দুটোই হতে পারে। তাঁরা কেউই ভুল-ভ্রান্তির উর্ধে ছিলেন না।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, "আমাদের মাঝে এমন কেউ নেই যে রাসূলের (সাঃ) একটি সুন্নাহ (ভুলের বসে) এড়িয়ে যায়নি অথবা স্মরণ থেকে মুছে যায়নি, সুতরাং আমি যে রায় দেই না কেন অথবা যে মৌলিক তথ্য উপস্থাপন করি না কেন, সেখানে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর নীতির বিপরীত জিনিস থাকবে। সুতরাং সঠিক বিধান হলো রাসূল (সাঃ) এর বিধান এবং সেটাই আমার বিধান।

নিশ্চয়ই আলেমগণ (রহঃ) দ্বীনের অনেক ব্যাপারে মতনৈক্য করেছেনঃ- পরিশুদ্ধতা, সালাত, যাকাত, সওম, হজ্জ, বিক্রি, তালাক, জিহার[১১১] এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও। তবুও কোন আলেম (যিনি জ্ঞানে দৃঢ় ছিলেন) নেই যিনি এই কথা বলেছেন যে, একজন মানুষ দলীল ছাড়া আলেমদের যে কাউকে ইচ্ছা অনুসরণ করতে পারে, ব্যতিক্রম হল অন্ধ অনুসরণকারী যারা দলীল এবং গবেষণা করতে সমর্থ নয়।

যদি প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সমস্ত ভিন্ন মত ও কথার ক্ষেত্রে তার নিজ ইচ্ছার অনুসরণ এবং বাছাই করাকে অনুমোদন দেয়া হতো, তাহলে দ্বীন বিভিন্ন চিন্তাধারায় বিভক্ত হয়ে যেতো এবং কিতাব ও সুন্নাহ খুব কমই উপকারে আসতো। আমরা আল্লাহর কাছে এসব থেকে আশ্রয় চাই।

সুতরাং আমি এটাই বলি যার উপর সমস্ত মুসলিম একমত, তা হলো এটা বাধ্যতামুলক যে, দলীল অথবা প্রমাণ দেখার পর পূর্ববর্তী আলেমদের উপলব্ধি অনুসারে, তাদের কথার এবং কোন ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি চিন্তা করে, সমস্ত বিতর্কের ক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাহয় ফিরে যেত হবে।

উদাহরণ সরূপ, আলেমগণ বিতর্ক করেছেন যে বিষয়ে তোমার পবিত্রতা/ অযু ভেঙ্গে যায়। যেমন- উটের গোস্ত খাওয়া, একজন স্ত্রীলোককে সঙ্গম ছাড়া স্পর্শ করা এবং দুই গুপ্ত অঙ্গ ছাড়া কোন স্থান দিয়ে শরীর হতে কিছু বের হওয়া। কারণ কেউ কেউ বলেছেন যেসমস্ত জিনিষ বের হয়, তা ওযু ভেঙ্গে দেয় এবং তা একই সাথে নাপাক। নিশ্চয়ই, প্রত্যেক ইমামেরই এসব বিষয়ে একটি মত আছে। প্রমাণসরূপঃ– উটের গোশত খাওয়ার ব্যাপারে ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আশ্-শাফেঈর মত ছিল এটাতে অযু ভাঙ্গে না। কিন্তু অপরপক্ষে ইমাম আহমেদ (রহঃ) এর মত ছিল এতে অযু ভাঙ্গে। ইবনে হাজমও এটাকে পছন্দ করেছেন।

এ ব্যাপারে সঠিক মত হলো ইমাম আহমদের মত। যেহেতু রাসূল (সাঃ) এর দুটি নির্ভরযোগ্য হাদীস প্রমাণ করছে 'উটের গোশ্ত খাওয়া তোমার অযু ভেঙ্গে দেয়'। একটি হাদীস সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে জাবির বিন সামুরাহ (রাঃ) থেকে এবং অন্য হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী এবং অন্যরা সংগ্রহ করেছেন আল-বারা (রাঃ) থেকে।

স্ত্রীলোককে স্পর্শ করা অথবা আলিঙ্গন করা অথবা এরকম অন্য কিছুর ক্ষেত্রে – ইমাম শাফেঈর মত ছিল স্ত্রীলোককে স্পর্শ করলে অযু ভাঙ্গে অনুরাগ-আসক্তি থাক অথবা না থাক। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মত ছিল শর্তহীন স্পর্শতে তোমার অযু ভাঙ্গবে না। এবং ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রহঃ) এর বর্ণনা মত হলো এটা অনুরাগ/ যৌন উত্তেজনা ছাড়া অযু নষ্ট করে না।

তাই যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন দলীল পরীক্ষা করবে সে দেখবে ইমাম আবু হানিফার মাযহাব সঠিক মতের সবচেয়ে কাছাকাছি। এবং একটি বর্ণনায়, ইমাম আহমদও এই মতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং এটা সাঈখুল ইসলাম ইবন তাঈমিয়া এর পছন্দনীয়। যেহেতু আমাদের কাছে কোন দলীল পৌছেনি যা প্রমান করে যে স্পর্শ করলে অযু ভাঙ্গে তা আসক্তির সাথে হোক অথবা না হোক। তাই, দলীলের অভাবে/ অনুপস্থিতিতে, আমরা এর মূলের দিকে ফিরে যাই যা হলো অযু ভাঙ্গে না। এবং আবু হানিফার মত এই ব্যাপারে অন্য মতের তুলনায় বেশী স্পষ্ট, যেহেতু আমাদের কাছে বর্ণনা আছে যে, রাসূল (সাঃ) তার স্ত্রীদের চুম্বন করে সালাতে ফিরে গিয়েছিলেন এবং অযু করেননি, অথচ একই সাথে এই বর্ণনা আমাদের কাছে নেই যে এটি যৌনাসক্তির

[১১০] জাহিরীঃ দাউদ ইবনে আলীর একটি মাযহাব, যিনি কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট এবং আক্ষরিক (জাহির) অর্থের উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার একটি স্বাধীন পথ বেছে নিয়েছিলেন।

[১১১] আদ-জিহারঃ স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীর বক্তব্য "তুমি আমার মায়ের (পিঠ) মতো- 'Unlawful for me to approach'

সাথে অথবা যৌনাসক্তি ছাড়া। যদিও এই হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সমস্যা আছে। নিশ্চয়ই বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, আত্-তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ- ওয়াকী দ্বারা, আ'মাম হতে, হুবাইব বিন আবী তাবীই হতে, উরওয়াহ্ হতে আইশা (রাঃ) হতে- কিন্তু এতে ত্রুটি আছে। যেহেতু হুবাইব, উরওয়াহ্ হতে শুনেননি। কিন্তু এ বিষয়ে অন্য হাদীস আছে। এবং আল্লাহ ভাল জানেন।

ঠিক যেমন, রক্ত অথবা অন্য কোন পদার্থ যা শরীর হতে বের হয়- ইমাম আহমদের মত হলো- এ সমস্ত জিনিস অযু ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু ইমাম শাফেঈ বলেন এর কোন কিছুই সম্পূর্ণরূপে তোমার ওযু ভাঙ্গে না। এবং এটাই সঠিক মত, যা ইমাম মালিক এবং অন্য এক বর্ণনায় ইমাম আহমদ এই মতের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। এবং এটাই সিদ্ধান্ত যে ইমাম তাইমিয়া এবং অনেকে এটা মেনে নিয়েছেন। যেহেতু এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই যে শরীরের দুই গুপ্ত অঙ্গ ছাড়া অন্য কোন স্থান দিয়ে যাই বের হয়ে আসে তাতে অযু ভাঙ্গে।

সুতরাং এই উদাহরণগুলো আমি এটা দেখানোর জন্য দিয়েছি যে সত্য একজন আলেমের জন্য অথবা একটি দল বা কোন মাযহাবের পক্ষে নির্দিষ্ট নয়। উপরুদ্ধ, যে সত্য খুঁজে বের করবে কারণ প্রত্যেক মাযহাবে কিছু সঠিক জিনিষ ও কিছু ভুল জিনিস আছে।

যেমন হাম্বলী মাযহাব এই দ্বীনের অনেক ব্যাপারে সঠিক, ঠিক তেমনি শাফেঈ মালিকী এবং হানাফী মাযহাবও। ঠিক তেমনি ইমাম ইবন হাজম ও একা কিছু মত দিয়েছেন যা সত্যিকার অর্থে সঠিক। অনেক আলেমগণ মতবিরোধ করেছেন দলীলের প্রাপ্যতা, সত্যতা ও দুর্বলতার পার্থক্যের ভিত্তিতে, রহিত করা অথবা রহিত হওয়া বিষয়ে এবং শর্তহীন (মুতলাক) এবং যোগ্যতা (মুকাইয়াদ)-এর ব্যাপারে। তাই, সেই সঠিক অনুসারে আছে যে সত্যকে মেনে নেয় কোন পক্ষপাত/ মনের ঝোঁক ছাড়া। ঠিক যেমন সে কোন ভুলের বিরোধিতা করে কোন ব্যক্তি কুৎসা/ মিথ্যা অপবাদ এবং নিন্দা না করে অথবা তাকে নীচে না নামিয়ে। যেহেতু এই আলেমরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে চেষ্টা করছিলেন (মুজতাহিদ) এবং তারা সঠিক হোন অথবা না হোন তারা যেকোন পথে পুরস্কৃত হবেন।

সুতরাং এরপর, এটা কারও জন্য ফরয/ বাধ্যতামূলক নয় একজন আলেমকে অনুসরণ করা। এবং যেই এটা চিন্তা করে সে সঠিক পথ হতে অনেক দূরে। নিশ্চয়ই এটা ফরয নয় আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ছাড়া অন্য কাউকে অনুসরণ করা, কারণ তাঁর কথা সত্য এবং 'তিনি নিজের থেকে কিছু বলেন না।'

সেজন্য যে কোন আলেম অথবা মাযহাবের ইমামের কথা হতে আমরা সিদ্ধান্ত নেই না তা ব্যতীত যা সত্যের সাথে একমত। এবং এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে কেউই বিবেচনা করেনা সেই লোক ছাড়া যে পথ প্রদর্শিত হতে চায় এবং শয়তানী চক্র হতে আত্মাকে নিরাপদ/ রক্ষা করতে চায়। কতজন আছে যারা ইল্মের দাবী করে এবং লেখা নিয়ে ব্যস্ত অথচ তারা ধর্মোন্মাদ, অন্ধ অনুসারী এবং শুধু ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । তারা ক্রোধান্বিত হন যদি কেউ তাদের নির্দিষ্ট ইমামের বিপরীত যায় কিন্তু ক্রোধান্বিত হন না যখন কেউ আল্লাহর কুরআন অথবা রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহর বিরুদ্ধে যায়। সুতরাং, সঠিক ব্যক্তি সে যে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সাঃ) -এর সুন্নাহকে সমস্ত কথার উপর বিধান বানায়। যদিও যারা অসম্মত, তারা তার সাথে অসম্মত এবং তাকে ধর্মদ্রোহী সাব্যস্ত করে। প্রকৃতপক্ষে, এটা অন্ধ অনুসারীদের এবং ধর্মান্ধদের সাধারণ রীতি যে তারা মতবিরোধ করে তাদের ধর্মদ্রোহী ও ভ্রষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করা। এবং এটা প্রত্যেক মিথ্যাবাদীর অবস্থান এবং তাদেরও যারা সত্য হতে এবং সোজা পথ হতে বিমুখ কারণ যখন সে প্রমান ও দলীল আনতে অসমর্থ সে এ সমস্ত কৌশলের আশ্রয় নেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সাঃ)- এর সুন্নাহয় প্রমাণ আছে, যারা এর বাস্তবায়ন প্রতিরোধ করে চলছে। তারা অনেক আকৃতিতে আসে যা তাদের মেধার পক্ষ অবলম্বন করে এবং তাদের ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করে। যে সত্যের অনুসারী সে সমস্ত চেষ্টা চালাবে যেন যে সত্যের উপর সে আছে তা থেকে তাকে নড়ানো না যায়। সে অন্যকে সত্যের পথে ডাকবে এবং আল্লাহ তাকে সাহায্য এবং আশ্রয় দিবেন। এবং সেই বিজয়ী থাকবে যতক্ষণ সে আল্লাহর পথে চেষ্টা চালাবে দ্বীন এবং সত্যের বিজয়ের জন্য, এবং যতক্ষণ সে এই পথে থাকবে ততক্ষণ আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য আসা বন্ধ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

"আর যারা আমার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আয়াতসমূহ দেখার এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা এরূপ খাটি লোকদের সঙ্গে আছেন।" *(সূরা 'আনকাবুত ২৯:৬৯)*

আল্লাহ আরো বলেছেনঃ **"হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সমূহ দৃঢ় করবেন।"** *(সূরা মুহাম্মদ৪৭:৭)*

এবং যাকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন, আসলে তা তার শত্রুর শয়তানীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট। কিন্তু- ১ম দুটি বিষয় ছাড়া সাহায্য আসবে না– রাসূল (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথ অনুসারে কথা ও কাজে আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা। তাই যদি এই দুই শর্ত পরিপূর্ণ হয় তখন কোন কিছুই তাকে বাধা দিতে পারে না যদি তারা পূর্ব ও পশ্চিম হতে সকলে একত্রিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

“যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে, কেউই তোমাদের উপর জয়ী হতে পারে না, আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে তিনি ছাড়া এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? আর শুধু আল্লাহ্‌রই উপর মু'মিনদের ভরসা করা উচিত ।” *(সূরা আলি ‘ইমরান ৩:১৬০)*

এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর রাববুল ‘আলামীনেরই জন্য ।

সুন্নাত

‘সুন্নাত’ শব্দের আভিধানিক অর্থঃ **الطريق** ‘পথ’ । কুরআন মজিদে এই ‘সুন্নাত’ শব্দটি বহুক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে । একটি আয়াত হলঃ

“আল্লাহর সুন্নাত, যা পূর্ব থেকেই কার্যকর হয়ে রয়েছে । আর আল্লাহর এ সুন্নাতে কোনরূপ পরিবর্তন দেখবে না কখনো ।” *(ফাতাহ্‌ঃ ২৩)*

এ আয়াতে ব্যবহৃত সুন্নাত শব্দের শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ **طريقه** পথ, পন্থা এবং পদ্ধতি । এভাবে দেখা যায় যে, ‘সুন্নাত’শব্দটি যেমন আল্লাহর ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়েছে, তেমনি করা হয়েছে নবী ও রাসূলদের ক্ষেত্রেও ।

আল্লাহর সুন্নাত ও নবীর সুন্নাতঃ ইমাম রাগেব ইসফাহানী বলেন, আল্লাহ্‌ তা'য়ালার সুন্নাত বলা হয় তাঁর কর্মকুশলতার বাস্তব পন্থাকে, তাঁর আনুগত্যকারীর নিয়ম পদ্ধতিকে । আর নবীর সুন্নাত হচ্ছে সেই নিয়ম, পন্থা ও পদ্ধতি, যা তিনি বাস্তব কাজে ও কর্মে অনুসরণ করে চলতেন ।

হাদীস-বিজ্ঞানীদের পরিভাষায় ‘সুন্নাত’ হচ্ছে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর মুখের কথা, কাজ ও সমর্থন । অনুমোদনের বর্ণনা যাকে প্রচলিত কথায় বলা হয় ‘হাদীস’ । আর ফিকাহ্‌শাস্ত্রে ‘সুন্নাত’ বলা হয় এমন কাজকে, যা ফরজ বা ওয়াজিব নয় বটে; কিন্তু নবী করীম (সাঃ) তা প্রায়ই করেছেন । এখানে এ দুটো সুন্নাতের কোনটি-ই আলোচ্য নয় ।

আমাদের আলোচ্য সুন্নাত হল সেই মূল আদর্শ, যা আল্লাহ্‌ তা'য়ালা বিশ্ব-মানবের জন্যে নাযিল করেছেন, যা রাসূলে করীম (সাঃ) নিজে তাঁর জীবনে দ্বীনি দায়িত্ব পালনের বিশাল ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন; কেননা নবী করীম (সাঃ) যা বাস্তবভাবে অনুসরণ করেছেন, তার উৎস হল ওহী, যা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তিনি লাভ করেছেন । এ ‘ওহী’ দু'ভাগে বিভক্ত । একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালাম কুরআন মজীদ । আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ওহীয়ে খফী, বিশেষ পন্থায় আল্লাহ্‌র জানিয়ে দেয়া বিধান ও নির্দেশ । রাসূলে করীম (সাঃ) এর কর্মজীবনে এ দুটোরই সমন্বয় ঘটেছে পুরোপুরিভাবে । আর তাই হচ্ছে ‘সুন্নাত’ তাই হচ্ছে পরিপূর্ণ দ্বীন-ইসলাম । কুরআন মজীদে রাসূলের জবানীতে বলা হয়েছেঃ “আমি কোন আদর্শই অনুসরণ করি না' করি শুধু তাই যা আমার নিকট ওহীর সূত্রে নাযিল হয় ।” ওহীর সূত্রে নাযিল হওয়া আদর্শই রাসূলে করীম (সাঃ) বাস্তব কাজে ও কর্মে অনুসরণ করেছেন, তা-ই হচ্ছে আমাদের আলোচ্য ‘সুন্নাত’ । এই সুন্নাতেরই অপর নাম ইসলাম । কুরআন মজীদে এই সুন্নাতকেই ‘সিরাতুল মুস্তাকিম’ বলে অভিহিত করা হয়েছে । রাসূলের জবানীতে কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

“নিশ্চয়ই এ হচ্ছে আমার সঠিক সরল দৃঢ় পথ (সিরাতুল মুস্তাকীম) । অতএব তোমরা এ পথই অনুসরণ করে চলবে, এ ছাড়া অন্যান্য পথের অনুসরণ তোমরা করবে না । তা করলে তা তোমাদের এ পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে নিয়ে যাবে । আল্লাহ্‌ তোমাদের এরূপ-ই নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা ভয় করে চল ।” *(আনআমঃ১৫৩)*

ইমাম শাতেবী ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’-এর পরিচয় দান প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সেই পথ, যা অনুসরণের জন্যে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন । আর তা-ই সুন্নাত; আর অন্যান্য পথ বলতে বোঝানো হয়েছে বিরোধ ও বিভেদপন্থীদের পথ, যা মানুষকে ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় । আর তারাই হচ্ছে বিদয়াতপন্থী লোক ।

বিদ্‌য়াত

সুন্নাত হচ্ছে তা-ই, যা বিদ্‌য়াতের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয় । কেননা এ সুন্নাতের বিপরীতই হচ্ছে বিদ্‌য়াত । ইমাম রাগেব ‘বিদ্‌য়াত’ শব্দের অর্থ লিখেছেনঃ কোনরূপ পূর্ব নমুনা না দেখে এবং অন্য কিছুর অনুসরণ না করেই কোন কার্য নতুনভাবে সৃষ্টি করা । অর্থাৎ শরীয়াত প্রবর্তক যে কথা বলেন নি সে কথা বলা এবং তিনি যা করেন নি এমন কাজকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা-তা-ই হচ্ছে বিদয়াত । এমন সব কাজ করা বিদয়াত, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই ।

কুরআন মজিদে এ বিদআত শব্দটি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে দুটো আয়াতে ।

“আসমান-যমীনের সম্পূর্ণ নবোদ্ভাবনকারী, নতুন সৃষ্টিকারী ।” *(আল-বাকারা)*

“তিনি তো আসমান-যমীনের নব সৃষ্টিকারী ।” *(আনআমঃ ১০১)*

এ দুটো আয়াতেই আল্লাহ্ তা'য়ালাকে 'আসমান যমীনের বদীউন'-পূর্ব দৃষ্টান্ত পূর্ব উপাদান ও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই সৃষ্টিকারী বলা হয়েছে।

সূরা 'আল-কাহাফ'-এর এক আয়াতে 'বিদয়াত' শব্দের এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

"বল হে নবী, আমি আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের কথা কি তোমাদের বলব? তারা হচ্ছে এমন লোক, যাদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনাই দুনিয়ার জীবনে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে আর তারাই মনে মনে ধারনা করে যে, তারা খুবই ভাল কাজ করেছে।" *(আল কাহাফঃ ১০৩-১০৪)*

বিদয়াতপন্থীরাও ঠিক এমনি। তারা যেসব কাজ করে, আসলে তা আল্লাহ্র দেয়া নীতির ভিত্তিতে নয়। তা সত্ত্বেও তারা তাকেই নেক আমল এবং বড় সওয়াবের কাজ বলে মনে করে।

হযরত ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রাঃ) বর্নিত দীর্ঘ হাদীসে রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন "তোমাদের অবশ্যই অনুসরণ করে চলতে হবে আমার সুন্নাত এবং হিদায়াত প্রাপ্ত সত্যপন্থী খলীফাদের সুন্নাত! তোমরা তা শক্ত করে ধরবে, দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধরে স্থির হয়ে থাকবে (যেন কোন অবস্থায়ই তা হাতছাড়া হয়ে না যায়, তোমরা তা থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিচ্যুত হয়ে না পড়)"। (মুসনাদে আহমদ)

কুরআন মজীদে দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেনঃ

"আজকের দিনে তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ -পরিণত করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্যকভাবে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম-মনোনীত করলাম।" *(আল-মায়েদা ৩)*

এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ। তাতে নেই কোন অসম্পূর্ণতা, কোন কিছুর অভাব। এ দ্বীনে বিশ্বাসী ও এর অনুসরণকারীদের কোন প্রয়োজন হবে না এ দ্বীন ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকাবার, বাইরের কোন কিছু এতে শামিল করার এবং ভিতর থেকে কোন কিছু বাদ দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়ার কেননা এতে মানুষের সব মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অতএব না তাতে কোন জিনিস বৃদ্ধি করা যেতে পারে, না পারা যায় তা থেকে কোন কিছু বাদ দিতে। এ দুটোই দ্বীনের পরিপূর্ণতার বিপরীত এবং আল্লাহ্র উপরোক্ত ঘোষণার স্পষ্ট বিরোধী। ইসলামী ইবাদতের ক্ষেত্রে সওয়াবের কাজ বলে এমন সব অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করা, যা নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের জামানায় চালু হয়নি এবং তা দেখতে যতই চাকচিক্যময় হোক না কেন তা স্পষ্টই বিদয়াত, তা দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতার কুরআনী ঘোষণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ কারণেই ইমাম মালিক বলেছিলেনঃ "সেকালে যে কাজ দ্বীনি কাজ বলে ঘোষিত ও নির্দিষ্ট হয়নি, আজও তাকে দ্বীনি কাজ বলে মনে করা যেতে পারে না।"

অতীতকালের নবীর উম্মতদের দ্বারা নবীর উপস্থাপিত দ্বীন বিকৃত ও বিলীন হয়ে যাওয়ারও একমাত্র কারণই ছিল যে, তারা নবীর প্রবর্তিত ইবাদতে মনগড়াভাবে নতুন জিনিস শামিল করে নিয়েছিল। কিছুকাল পরে আসল দ্বীন কি, তা চিনবার আর কোন উপায়ই থাকল না।

'দ্বীন' তো আল্লাহ্র দেয়া এবং রাসূলের উপস্থাপিত জিনিস। তাতে যখন কেউ নতুন কিছু শামিল করে, তখন তার অর্থ এই হয় যে, আল্লাহ্ বা রাসুলে করীম (সাঃ) যেন বুঝতেই পারছিলেন না দ্বীন কিরূপ হওয়া উচিত আর এরা এখন বুঝতে পারছে, তাই নিজেদের বুঝমত সব নতুন জিনিস এর মাঝে শামিল করে এর ত্রুটি দূর করতে চাইছে এবং অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করে তুলছে। আর এর ভিতর থেকে কিছু বাদ-সাদ দিয়ে একে যুগোপযোগী করে তুলতে চাইছে। এরূপ কিছু করার অধিকার তাকে কে দিল? আল্লাহ্ দিয়েছেন? তাঁর রাসূল দিয়েছেন? ---না, কেউ ই দেয় নি, নিজ ইচ্ছে মতই সে করেছে। ঠিক এ দিকে লক্ষ্য করেই হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)বলেছেন। "যে ইবাদত সাহাবায়ে কেরাম করেন নি, সে ইবাদত তোমরা কর না। তাকে ইবাদত বলে মনে কর না, তাতে সওয়াব হয় বলেও বিশ্বাস কর না।"

এ বিদয়াত এমনই এক মারাত্মক জিনিস, যা শরীয়তের অর্থাৎ আল্লাহ্র দেয়া ও রাসূলের প্রদর্শিত ফরজ ওয়াজিবকে পর্যন্ত বিকৃত করে দেয়। শরীয়াতের ফরজ ওয়াজিবের প্রতি অন্তরে থাকে না কোন মান্যতা গণ্যতার ভাবধারা। শরীয়াতের সীমালংঘন করার অভ্যাস হতে থাকে। শরীয়াত বিরোধী কাজগুলোকে তখন মনে হতে থাকে খুবই উত্তম। যে লোক ইসলামে কোন বিদ্য়াত উদ্ভাবন করবে এবং তাকে ভাল ও উত্তম মনে করবে, সে যেন ধারণা করে নিয়েছে যে, নবী (সাঃ) রিসালাত ও নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন করেন নি, খেয়ানত করেছেন। কেননা তিনি যদি দায়িত্ব পালন করেই থাকেন, তাহলে ইসলাম ও সুন্নাত ছাড়া আর তো কোন কিছুর প্রয়োজন পরে না। সব ভালই তো তাতে রয়েছে।

সত্যিকারভাবে যে দ্বীন রাসূলের নিকট থেকে পাওয়া গেছে, ঠিক তা-ই পালন করে চলা উচিত সব মুসলমানের। না তাতে কিছু কম করা উচিত, না তাতে কিছু বেশী করা সঙ্গত হতে পারে। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে 'আহলি কিতাব কে লক্ষ্য করে।

"হে আহলি কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কর না আর আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রকৃত হক ছাড়া কোন কথা বল না ।"

সুন্নাতে রাসূল (সঃ) আঁকড়ে ধরা এবং বিদ্‌আ'ত থেকে সতর্ক থাকা অপরিহার্য

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি দ্বীনকে পূর্ণতা দান করেছেন এবং আমাদের জন্য সকল কল্যাণ বিধান করে ইসলামকে দ্বীন হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। শান্তি ও করুণা বর্ষিত হউক তাঁরই বিশেষ বান্দাহ ও রাসূল (সঃ) মুহাম্মাদের উপর যিনি অতিরঞ্জন, বিদআ'ত (নবপ্রথা) ও পাপাচার হতে মুক্ত থেকে তাঁর রবের আনুগত্য করার প্রতি আহ্বান করেছেন। আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর বংশধর ও সাহাবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর প্রদর্শিত পথের অনুসারী হবে সকলের উপর করুণা বর্ষণ করুন।

দ্বীনে ইসলামী একটি পরিপূর্ণ দ্বীন। আল্লাহ তায়া'লা স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে যে শরীয়ত প্রবর্তন করেছেন তা স্বয়ং-সম্পুর্ন বিধায় আমাদেরকে তা অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিদ'আত বা নতুন কোন প্রথার সংযোজন থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এই শিক্ষা সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের সঠিক অনুসারী তাবেয়ীনদের কাছ থেকে সর্বান্তঃ করনে গ্রহণ করেছেন।

নবী করীম (সাঃ) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন-'আমাদের এই ধর্মে (দ্বীনে) যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যান হবে। এই হাদীসটি বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-'কেউ যদি এমন কাজ করে যা আমাদের এই ধর্মে (দ্বীনে) নেই তাহলে তা প্রত্যাখ্যান হবে।' তিনি অন্য এক হাদীসে এরশাদ করেছেন-'তোমরা সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী খেলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করবে। আর, তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে। সাবধান! কখনও ধর্মে (দ্বীনে) নব প্রবর্তিত কোন বিষয় গ্রহণ করবে না। কেননা প্রত্যেক নব প্রবর্তিত বিষয়ই বিদআ'ত এবং প্রত্যেক বিদআ'তই পথভ্রষ্টাত।' রাসূল (সঃ) জুম'আর দিন খুৎবায় বলতেন-'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হেদায়াত হলো মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হেদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো মনগড়া নব প্রবর্তিত বিষয় বিদআ'ত এবং এরূপ প্রতিটি বিদাআ'ত-ই পথভ্রষ্টতা।

এই সমস্ত হাদীসে বিদাআ'ত প্রবর্তনের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং উম্মতকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। আর, এতে লিপ্ত হওয়া থেকে ভীতি প্রদর্শনকরা হয়েছে। এ বিষয়ে আরো অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

"রাসূল (সঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা বিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।" *(সূরা হাশর-৭)*

আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন-

"যারা তাঁর (রাসূল (সঃ)-এর) হুকুমের বিরোধীতা করে তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের উপর কোন ফেৎনা বা কোন মর্মন্তুদ শাস্তি আসতে পারে।" *(সূরা নূরঃ ৬৩)*

আল্লাহ পাক আরও বলেন-

"প্রকৃতপক্ষে, তোমাদের মধ্যে যারা পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহকে খুব বেশী স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের জীবনের এক সর্বোত্তম নমুনা বর্তমান রয়েছে।" *(সূরা আহ্যাবঃ ২১)*

আল্লাহ মহামহিম আরও বলেন-

"সেসব মুহাজির ও আনসার, যারা সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত কবুল করেছিল এবং যারা নিতান্ত সততার সাথে তাদের অনুসরণ করেছিল তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ তা'য়ালার উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য এমন জান্নাত সমূহ তৈরী করে রেখেছেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণধারা সর্বদা প্রবাহমান। এই জান্নাতে তারা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। বস্তুতঃ ইহা এক বিরাট সাফল্য।" *(সূরা তওবাঃ ১০০)*

আল্লাহ সুমহান আরও বলেন-

"আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করে ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে পছন্দ করে নিলাম।" *(সূরা মায়দাঃ ৩)*

এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রবর্তিত দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন, তাঁর নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছেন। নবী (সাঃ) তাঁর উপর অর্পিত বালাগে মুবীন বা স্পষ্ট বার্তাকে পৌছাবার এবং কথায় ও কাজে শরীয়তকে বাস্তবায়িত করার পরই পরলোক গমন করেন। তিনি এই বিষয়টি পরিস্কার করে বলে গেছেন যে, তাঁর পরে লোকেরা কথায় বা

কাজে যেসব নব প্রথার উদ্ভাবন করে শরীয়তের সাথে সম্পৃক্ত করবে সেসব বিদআ'ত বিধায় প্রত্যাখ্যাত হবে। যদিও এগুলো প্রবক্তার উদ্দেশ্য সৎ থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ বিদআ'ত থেকে জনগণকে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করেছেন। কেননা এটা ধর্মে (দ্বীনে) অতিরিক্ত সংযোজন যার অনুমতি আল্লাহ তায়া'লা কাউকে দেননি এবং ইহা আল্লাহর শত্রু ইহুদী ও খ্রীষ্টান কর্তৃক তাদের ধর্মে (দ্বীনে) নব নব প্রথা সংযোজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য সরূপ। এরূপ করার অর্থ এই দাড়ায় যে, ইসলামকে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ বলে। মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার সুযোগ প্রদান করা। এটা যে কত বড় ফাসাদ ও জঘন্য কর্ম এবং আল্লাহর বাণীর বিরোধী তা সর্বজন বিদীত।

আল্লাহ বলেন-

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।" *(সুরা মায়েদঃ ৩)*

সেই সাথে ইহা রাসূল (সঃ) পরিস্কার হাদীস সমূহ যেগুলোতে তিনি বিদআ'ত থেকে সতর্ক ও দুরে থাকতে বলেছেন সেগুলোরও সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মিলাদ মাহফিল বা নবীর জন্মোৎসব পালন বা এ জাতীয় অন্যান্য উৎসবাদির প্রবর্তনের মাধ্যমে এ কথাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'য়ালা এই উম্মতের জন্য ধর্ম (দ্বীন) কে পূর্ণতা দান করেননি এবং যা যা করণীয় তার বার্তা রাসূল (সঃ) উম্মতের নিকট পৌছাননি। তাই, এইসব পরবর্তীকালের লোকেরা এসে এমন কিছু প্রবর্তন করেছেন যার অনুমতি আল্লাহ তা'য়ালা তাদের দেননি, অথচ তারা ভাবছেন এতে আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হবে। নিঃসন্দেহে এতে মারাত্মক ভয়ের কারণ রয়েছে এবং তা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূল (সঃ) উপর আপত্তি উত্থাপনের শামিল। অথচ আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের জন্য ধর্ম (দ্বীন)-কে সর্বাঙ্গীনভাবে পূর্ণ করেছেন ও তাঁর নেয়ামত সম্পূর্ণ করেছেন এবং রাসূল (সঃ) ইসলামের স্পষ্ট বার্তা যথাযথভাবে পৌছিয়েছে। তিনি এমন কোন পথ যা জান্নাতের পানে নিয়ে যায় এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে উম্মতকে তা বাতলাতে কসূর করেননি। যেমন- আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স থেকে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ যত নবী পাঠিয়েছেন উম্মতের প্রতি তাদের দায়িত্ব এই ছিল যে, উম্মতের জন্য যা কিছু ভাল জানেন তাই বলবেন আর যা কিছু মন্দ বলে জানেন তা থেকে তাদেরকে সতর্ক করবেন'। সহীহ মুসলিমে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এ কথা সকলের জানা আছে যে, আমাদের নবী সকল নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ। তিনি সবার চেয়ে অধিকতর পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের পয়গাম ও উপদেশ বার্তা পৌছিয়েছেন। যদি মিলাদ মাহফিল আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত দ্বীনের অংশ হতো তাহলে তিনি নিশ্চয়ই উম্মতের কাছে বর্ণনা করতেন বা তাঁর সাহাবীগণ তা করতেন। যেহেতু এমন কিছু পাওয়া যায় না, অতএব, প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের সাথে এই মিলাদ মাহফিলের কোনই সম্পর্ক নেই বরং এটা বিদআ'ত যা থেকে রাসূল (সঃ) তাঁর উম্মতকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। যেমন পূর্বোল্লেখিত হাদীস সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

এক দল উলামায়ে কেরাম উপরোক্ত ও অন্যান্য দলীলের উপর ভিত্তি করে মিলাদ মাহফিল পালনের বৈধতা অস্বীকার করতঃ এ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। এটা জানা কথা যে, বিরোধপূর্ণ বিষয় এবং হালাল বা হারামের ব্যাপারে শরীয়তের নীতি হলো কোরআন ও হাদীসে রাসূল (সঃ)-এর মীমাংসা অনুসন্ধান করা। যেমন-

আল্লাহ তায়া'লা বলেছেণঃ

"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে কর্তা ব্যক্তিদের। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ তায়া'লা ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করে থাক। এটাই উৎকৃষ্ট এবং পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম পন্থা।" *(সুরা নিসাঃ ৫৯)*

আল্লাহ তায়া'লা আরও বলেন–

"তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করনা কেন তার মিমাংসা আল্লাহরই নিকট রয়েছে?" *(সুরা শুরা-১০)*

যদি এই মিলাদ মাহফিলের বিষয়টি সম্পর্কে কোরআন শরীফের দিকে ফিরে যাই তাহলে দেখতে পাই আল্লাহ তাঁর রাসূল (সঃ) যা আদেশ বা নিষেধ করেছেন আমাদের তা-ই অনুসরণ করার নির্দেশ দেন এবং জানান যে, তিনি এই উম্মতের জন্য তাদের ধর্ম (দ্বীন)-কে পূর্ণতা দান করেছেন। রাসূল (সঃ) যা নিয়ে এসেছেন তার মধ্যে মিলাদ অনুষ্ঠানের কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। সুতরাং এ কাজ সে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় যা আল্লাহ তায়া'লা আমাদের জন্য পূর্ণ করে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে আমাদেরকে তাঁর রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করার নির্দেশ রয়েছে।

এভাবে যদি আমরা এ ব্যাপারে সুন্নাতে রাসূল (সঃ)-এর দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে রাসূল (সঃ)-এ কাজ করেননি, এর আদেশও দেননি। এমনকি তাঁর সাহাবীগণও (তাঁদের উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি বর্ষিত হউক) তা করেননি। তাই আমরা বুঝতে পারি যে, এটা ধর্মীয় (দ্বীন) কাজ নয় বরং বিদআ'ত এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের উৎসব সমূহের অন্ধ অনুকরণ। যে ব্যক্তির সামান্যতম বিচক্ষণতা আছে এবং হক গ্রহণে ও তা অনুসন্ধানে সামান্যতম বিবেকও আগ্রহ রাখে তার বুঝতে কোন

অসুবিধা হবে না যে, ধর্মের (দ্বীনের) সাথে মিলাদ মাহফিল বা যাবতীয় জন্ম বার্ষিকী পালনের কোন সম্পর্ক নেই। বরং যে বিদআ'ত সমূহ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) নিষেধ ও সতর্ক করেছেন এটি সেগুলোরই অন্তর্ভূক্ত।

বিভিন্ন স্থানে অধিক সংখ্যক লোক এই বিদআতী কাজে লিপ্ত দেখে কোন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে প্রবঞ্চিত হওয়া সংগত নয়। কেননা ন্যায় বা হক লোকের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে জানা যায় না বরং শরীয়তের দলীল সমূহের মাধ্যমে তা অনুধাবন করা হয়। যেমন আল্লাহ তায়া'লা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে বলেছেন-

"তারা বলে ইহুদী ও খ্রীষ্টান ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে কখনও প্রবেশ করবে না। এটা তাদের মিথ্যা আশা। আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে যুক্তি প্রমাণ নিয়ে এসো।" *(সুরা বাকারা- ১১১)*

"যদি; আপনি এই পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের অনুসরণ করেন তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহ তায়া'লার পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেবে।" *(সুরা আন'আমঃ ১১৬)*

এই মিলাদ মাহফিল সমূহ বিদ'আত হওয়ার সাথে সাথে অনেক এলাকায় প্রায়শঃ তা অন্যান্য পাপাচার থেকেও মুক্ত হয় না। যেমন নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ, গান-বাজনা ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদি। সর্বোপরি এইসব মাহফিলে শিরকে আকবর সংঘটিত হয়ে থাকে। আর তা হলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও অন্যান্য আওলিয়ায়ে কেরামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা, তাদের কাছে দোয়া করা, সাহায্য ও বিপদ মুক্তির প্রার্থনা করা এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, তারা গায়েব জানেন, ইত্যাদি কাজ যা করলে লোক কাফের হয়ে যায়। কারণ, রাসূল (সঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেছেন-'সাবধান! ধর্মে (দ্বীনে) অতিরঞ্জন করো না। তোমাদের আগে যারা ছিল তারা ধর্মে (দ্বীনে) অতিরঞ্জনের ফলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।'

রাসূল (সঃ) আরও বলেব- তোমরা আমার এমন অতি প্রশংসা করো না যেমন খ্রীষ্টনগণ ইবনে মারইয়ামের (ঈসা আলাইহিস সালাম) অতি প্রশংসায় লিপ্ত হয়েছিল। আমি একজন বান্দা, তাই আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল (সঃ) বলে উল্লেখ করে।' ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

অতীব আশ্চর্য ও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, অনেক লোক এ ধরনের বিদআ'তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য খুবই তৎপর ও সচেষ্ট এবং এর বিপক্ষে যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করাতে স্বতঃ প্রস্তুত। অথচ তারা জামাতের নামাজে ও জু'মার নামাজে অনুপস্থিত থাকতে কুণ্ঠাবোধ করে না, যদিও তা আল্লাহ ওয়াজিব করেছেন। এমনকি এ বিষয়ে তারা মস্তক উত্তোলনও করে না এবং এটাও উপলব্ধি করে না যে, তারা একটি মারাত্মক অন্যায় কাজ করছে। নিঃসন্দেহে ঈমানের দূর্বলতা, ক্ষীণ বিচক্ষণতা তা নানা রকম পাপাচার হৃদয়ে আসন করে নেওয়ার ফলেই এরকম হয়ে থাকে। আল্লাহ পাপাচার হৃদয়ে আসন করে নেওয়ার ফলেই এরকম হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়া'লার কাছে আমাদের এবং সকল মুসলিমের জন্য সংযম ও নিরাপত্তা কামনা করি।

এর চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, অনেকের ধারণা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন। তাই তারা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে দাড়িয়ে যান। এটা মস্ত বড় অসত্য ও জ্ঞনহীন অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। রাসূল (সঃ) কিয়ামতের পূর্বে তাঁর কবর থেকে বের হবেন না, বা কারো সাথে যোগাযোগ করবেন না এবং কোন সমাবেশেও উপস্থিত হবেন না। বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত স্বীয় কবরেই অবস্থান করবেন এবং তাঁর পাক রূহ রবের নিকট উর্দ্ধতর ইল্লিনের সম্মানজনক স্থানে সংরক্ষিত থাকবে।

আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন-

"এরপর তোমাদের অবশ্যই মরতে হবে, অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের অবশ্যই পুণরুজ্জীবিত করা হবে।" *(সুরা মু'মিনুনঃ ১৬)*

রাসূল (সঃ) বলেছেন-'কিয়ামতের দিন আমার কবরই সর্ব প্রথম খন্ডিত হবে। আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং আমারই সুপারিশ সবার আগে গৃহীত হবে।'

এই আয়াত ও হাদীস শরীফ এবং এই অর্থে আরও যেসব আয়াত ও হাদীস এসেছে তার দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী (সাঃ) সহ অন্যান্য সব মৃত লোকগণ শুধুমাত্র কিয়ামতের দিনই তাদের কবর থেকে বের হবেন। সমস্ত মুসলিম আলেমগণের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐক্যমত (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এতে কারো মত বিরোধ নেই। সুতরাং সকল মুসলিমের উচিত এসব বিষয়ে অবহিত হওয়া এবং অজ্ঞ লোকেরা যেসব বিদআত ও কুসংস্কার আল্লাহ পাকের নির্দেশ ব্যতিরেকে প্রবর্তন করেছে সেসব বিষয়ে সতর্ক থাকা।

রাসূল (সঃ)-এর উপর দরূদ ও সালাম পড়া নিঃসন্দেহে একটি ভাল আমল এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক উত্তম পন্থা। যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে মুমিনগণ তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ পাঠাও।" *(সুরা আহযাবঃ ৫৬)*

নবী করীম (সাঃ) বলেন–'যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠায় আল্লাহ তায়া'লা এর প্রতিদানে তার উপর দশবার দরূদ পাঠান'।

সব সময়ই দরূদ পড়ার বৈধতা রয়েছে। তবে নামাজের শেষে পড়ার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ করা হয়েছে বরং অনেক আলেমের মতে নামাজের মধ্যে শেষ তাশাহ্হুদের সময় দরূদ পড়া ওয়াজিব। অনেক ক্ষেত্রে এই দরূদ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যেমন- আযানের পরে, জু'মাআর দিনে ও রাতে এবং রাসূল (সঃ) উল্লেখ হলে। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। এই বিষয়ে আমি যা সতর্ক করতে চেয়েছিলাম তা করেছি। আশা করি, আল্লাহ তায়া'লা যার প্রতি উপলব্ধির দ্বার খুলেছেন- ও যার দৃষ্টি শক্তিতে আলো দান করেছেন তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

আমার জেনে খুবই দুঃখ হয় যে, এরূপ বিদআ'তী অনুষ্ঠান এমন সব মুসলমান দ্বারাও সংঘটিত হচ্ছে যারা তাদের আকায়েদ ও রাসূল (সঃ)ল্লাহর মহব্বতের ব্যাপারে খুবই দৃঢ়তা রাখেন। যে এই সবের প্রবক্তা তাকে বলছি, যদি তুমি সুন্নী ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসারী হওয়ার দাবী রাখ তাহলে বল, তিনি স্বয়ং বা তার কোন সাহাবী বা তাদের সঠিক অনুসারী কোন তাবেয়ী কি এ কাজটি করেছেন, না এটা ইহুদী ও খ্রীষ্টান বা তাদের মত অন্যান্য আল্লাহর শত্রুদের অন্ধ অনুকরণ? এ ধরনের মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা প্রতিফলিত হয় না। যা করলে ভালবাসা প্রতিফলিত হয় তা হলো তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করা, যা কিছু তিনি বলেছেন তা বিশ্বাস করা, যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা। আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ করেছেন কেবল সেভাবেই তাঁর উপাসনা করা। এমনিভাবে, রাসূলের উল্লেখ করা হলে, নামাজের সময় ও সদা সর্বদা যে কোন উপলক্ষে তাঁল উপর দরূদ পাঠ করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রমাণিত হয়।

এই সমস্ত বিষয়ে প্রকৃত মুসলিমদের আক্বীদা হলো নিম্নরূপঃ

কুরআন ও সুন্নাতে রাসূল (সঃ) আঁকড়ে ধরা এবং রাসূল (সঃ), তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীন ও তাঁদের সঠিক অনুসারী তাবেয়ীনদের প্রদর্শিত পথে চলা। আল্লাহর মারেফতের ক্ষেত্রে সলফে সালেহীন, আয়েম্মায়ে দ্বীন ও ধর্মীয় (দ্বীন) শাস্ত্রবিদগনের পথ অনুসরণ করা এবং আল্লাহর সিফাতের (গুণাবলী) সেভাবে গ্রহণ করা যেভাবে কোরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং যা রাসূল (সঃ)-এর সাহাবীগণ সমর্থন ও গ্রহণ করেছেন মুসলিমগণ আল্লাহ তায়ালার সিফাতকে অবিকৃত ও দৃষ্টান্তহীন এবং কোন ধরণ ব্যতিরেকে বিনা দ্বিধায় সেভাবে প্রমাণিত ও বিশ্বাস করে চলেন যেভাবে উহা তাদের কাছে পৌছেছে। তারা তাবেয়ীন ও তাদের অনুসারী (যারা ছিলেন ইলম, ঈমান ও তাক্ওয়ার অধিকারী) সলফে সালেহীন ও আইম্মায়ে দ্বীনের পথই আঁকড়ে ধরে আছেন। তারা এ-ও বিশ্বাস করেন যে, ঈমানের মূল ভিত্তি হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)। (আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল (সঃ) বা প্রেরিত পুরুষ)। এটাই এক আল্লাহর উপর বিশ্বাসের মূল ভিত্তি ও ঈমানের প্রধান আমল এবং ইজমায়ে মুসলিমের (সমগ্র মুসলমানের ঐক্যমত) স্বীকৃতি অপরিহার্য্য।

এই মৌল বাক্যের অর্থ হলোঃ একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করা অবশ্য কর্তব্য, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছু বা যে কেউ হোক কারোর উপাসনা করা যাবে না। এই সেই হিকমত যার জন্য জ্বীন ও ইনসানকে সৃষ্টি করা হয়েছে, রাসূলগণকে (সঃ) প্রেরণ করা হয়েছে এবং আসমানী গ্রন্থ সমূহ অবতীর্ণ করা হয়েছে। এতে রয়েছে একমাত্র আল্লাহরই প্রতি বিনয় ও ভালবাসা, আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন। এরই নাম ইসলাম ধর্ম (দ্বীন) যা ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন না পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে না পরবর্তীদের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম দ্বীনে ইসলামের অনুগামী ছিলেন এবং ইসলামের অন্তর্নিহিত আত্মসমর্পনের গুণে গুণান্বিত ছিলেন। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এবং সেই সাথে অন্যের কাছেও আত্মসমর্পন করে বা প্রার্থনা করে সে মুশরিক। আর, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে না, সে আল্লাহর ইবাদত করতে অহঙ্কারী দাম্ভীক বলে বিবেচিত।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

"আমি প্রত্যেক জাতির প্রতি রাসূল (সঃ) প্রেরণ করেছি এই নির্দেশ দিয়ে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ দুরত্বে থাক।" *(সুরা নাহলঃ ৩৬)*

প্রকৃত মুসলিমগণ 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল (সঃ)' এই সাক্ষীর বাস্তবায়নে বিদআ'ত, কুসংস্কার এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর (সঃ) প্রবর্তিত শরীয়ত বিরোধী আচার অনুষ্ঠান বর্জনে দৃঢ় বিশ্বাসী।

ইসলামী শরীয়ত একটি পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্ম (দ্বীন)। এতে নতুন কিছু সংযোজনের কোন প্রয়োজন বা অবকাশ নেই। তাই মুসলমানদের শুধুমাত্র অনুকরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নব-নব ধর্ম (দ্বীন) প্রথা প্রবর্তনের জন্য বলা হয়নি। সাহাবা ও তাঁদের সঠিক অনুসারী তাবে'য়ীন থেকে সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ বিষয়টি সম্যকভাবে সমর্থন ও গ্রহণ করেছেন।

এ কথা মনে করা ঠিক নয় যে, রাসূল (সঃ)-এর জন্মোৎসব পালন বা এর সংশ্লিষ্ট শিরক ও অতিরঞ্জনকে নিষেধ করা কোনরূপ অনৈসলামিক কাজ এবং এতে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। বরং এটা তো রাসূলেরই আনুগত্য ও তাঁরই নির্দেশ পালন। তিনি বলেছেণ-

' সাবধান! ধর্মে (দ্বীনে) অতিরঞ্জন করো না। তোমাদের আগে যারা ছিল তারা ধর্মে (দ্বীনে) অতিরঞ্জনের ফলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।' তিনি আরও বলেছেন- 'তোমরা আমার এমন অতি প্রশংসা করো না যেমন খ্রীষ্টানগণ ইবনে মারিইয়াম (ঈসা আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি অতি প্রশংসা করেছে। আমি তো মাত্র একজন বান্দা। তাই আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল (সঃ) বলে উল্লেখ কর।'

উপরোল্লেখিত প্রবন্ধ সম্পর্কে এতটুকুই আমার বক্তব্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের ও অন্যান্য সকল মুসলমানকে দ্বীন উপলব্ধি করার, এর উপর কায়েম থাকার, সুন্নাতে রাসূল (সঃ) দৃঢ়ভাবে ধারণ করার এবং বেদআত থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি অশেষ দাতা ও পরম করুণাময়।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাঃ), তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীদের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করো।"

বিদ্‌য়াত কিভাবে চালু হয়

বিদ্‌য়াত চালু হওয়ার মূলে চারটি কার্যকরণ লক্ষ্য করা যায়

প্রথমটিঃ এই যে, বিদয়াতী তা নিজের থেকে উদ্ভাবিত করে সমাজে চালিয়ে দেয়। পরে তা সাধারণভাবে সমাজে প্রচলিত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়টিঃ কোন আলিম ব্যক্তিই হয়ত শরীয়তের বিরোধী একটা কাজ করেছেন, করেছেন তা শরীয়াতের বিরোধী জানা সত্ত্বেও; কিন্তু তা দেখে জাহিল লোকেরা মনে করতে শুরু করে যে, এ কাজ শরীয়তসম্মত না হয়ে যায় না। এভাবে এক ব্যক্তির কারনে গোটা সমাজেই বিদ্‌য়াতের প্রচলন হয়ে পড়ে।

তৃতীয়টিঃ এই যে জাহিল লোকেরা শরীয়াত বিরোধী কোন কাজ করতে শুরু করে। তখন সমাজের আলিমগণ সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে থাকেন, তার প্রতিবাদও করেন না, সেকাজ করতে নিষেধও করেন না। বলেন না- যে, এ কাজ শরীয়াতের বিরোধী তোমরা এ কাজ কিছুতেই করতে পারবে না। বিরুদ্ধতা না করার ফলে সাধারন লোকদের মনে ধারণা জন্মে যে, এ কাজ নিশ্চয়ই নাজায়েয হবে না, বিদয়াত হবে না। হলে কি আর আলিম সাহেবরা তার প্রতিবাদ করতেন না। এভাবে সমাজে সম্পূর্ণ বিদয়াত বা নাজায়েয কাজ শরীয়াতসম্মত কাজরূপে পরিচিত ও প্রচলিত হয়ে পড়ে।

চতুর্থটিঃ বহুকাল পর্যন্ত আল্লাহ্‌র হুকুমকৃত ও রাসূল (সাঃ)-এর প্রদর্শিত কোন একটি সুন্নাত তা সমাজের লোকদের সামনে বলা হয়নি, প্রচার করা হয়নি। তখন সে সম্পর্কে সাধারণের ধারণা হয় যে, এ কাজই নিশ্চয়ই জায়েয নয়, হুকুম হলে আলিম সাহেবরা কি এতদিন তা বলতেন না! এভাবে একটি শরীয়াতসম্মত কাজকে শেষ পর্যন্ত শরীয়ত বিরোধী বলে লোকেরা মনে করতে থাকে আরএ-ও একটি বড় বিদ্‌য়াত। যেমন- কুরআন আর সুন্নাহর সুস্পষ্ট হুকুম শুধুমাত্র ইসলামী আইন বা শরীয়াহ মুতাবিক রাষ্ট্রীয় সংবিধান হওয়া, শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করা, দারুল ইসলাম (ইসলামী রাষ্ট্র) থাকুক আর না থাকুক সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে এক খলিফার নেতৃত্বে একত্রিত থাকা এবং ইসলামের নামে ফিরকা বা দলাদলি না করা ইত্যাদি। এ সকল কাজ সমূহের ফরয হুকুম থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজের বেশীরভাগ লোকই জানে না যে তারা সকলে আল্লাহর ফরয হুকুম পালন করা ছেড়ে দিয়েছে এবং বিদয়াত নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। ফলে তারা শির্‌ক কুফর ও বিদয়াতে পতিত আছে।

বিদ্‌য়াত প্রচলিত হওয়ার আর একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণও রয়েছে। আর তা হল এই যে, মানুষ স্বভাবতই চিরন্তন শান্তি ও সুখ-বেহেশত লাভ করার আকাঙ্ক্ষী। আর এ কারণে সে বেশী বেশী নেক কাজ করতে চেষ্টিত হয়ে থাকে। দ্বীনের হুকুম আহকাম যথাযথ পালন করা কঠিন বোধ হলেও সহজসাধ্য সওয়াবের কাজ করার জন্যে লালায়িত হয় খুব বেশী। আর তখনি সে শয়তানের ষড়যন্ত্রে পড়ে যায়। নিজ থেকেই মনে করে নেয় যে, এগুলো সব নেক কাজ, সওয়াবের কাজ। সেগুলো শরীয়াতের ভিত্তিতেও বাস্তবিকই সওয়াবের কাজ কি না, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবার মত ইল্‌মী যোগ্যতাও যেমন থাকে না, তেমনি সে দিকে বিশেষ উৎসাহও দেখানো হয় না। কেননা তাতে করে চিরন্তন সুখ লাভের স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আর তাতেই তাদের ভয়।

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বিশ্বাস করতেন যে, শিরক তাওহীদের পরিপন্থী আর বিদ্‌য়াত সুন্নাতের বিপরীত। শির্‌ক 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালেমার' এই প্রথম অংশের অস্বীকৃতি। আর বিদয়াত হচ্ছে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কালেমার এই শেষাংশের বিপরীত এবং অন্তর থেকে তার অস্বীকৃতি।"

মুসনাদে দারেমী হাদীস গ্রন্থে হযরত হিসনের উদ্ধৃতি রয়েছেঃ "জনগণ তাদের দ্বীনের মধ্যে যে বিদয়াতই চালু করে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাদের নিকট থেকে অনুরূপ একটি সুন্নাত তুলে নিয়ে যান। পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর তা ফিরিয়ে আনেন না।"

সাধারণভাবে মুসলিম সমাজের প্রচলিত ধারণা হলঃ বিদ্‌য়াত দুপ্রকার। একটি হল ভাল বিদ্‌আত। আর দ্বিতীয়টির নাম মন্দ বিদয়াত, কেউ কেউ দ্বিতীয়টির নাম দিয়েছে ঘৃণ্যও জঘন্য বিদআত। কিন্তু বিদয়াতের এই বিভাগও বোধ হয় একটি অভিনব

বিদয়াত। কেননা বিদয়াতকে ভাল ও মন্দ এই দুইভাবে ভাগ করার ফলে বহু সংখ্যক বিদয়াতই ভাল বিদয়াত হওয়ার পারমিট নিয়ে ইসলামী আক্বীদা ও আমলের বিশাল ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করেছে অগোচরে। রাসূলের যুগে বিদয়াত-এর মধ্যে কোন 'হাসানা' ভাল দিক পাওয়া যায়নি। সাহাবী ও তাবেঈনের যুগেও নয়, রাসূলের বাণীতেও বিদয়াতকে এভাবে ভাগ করা হয়নি।

তাহলে মুসলিম সমাজে বিদয়াতের এ বিভাগ কেমন করে প্রচলিত হল? এর জবাব পাওয়া যাবে হযরত উমর ফারূকের (রাঃ) একটি কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে। এসম্পর্কে বুখারী শরীফের হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী বলেনঃ "আমি হযরত উমর (রাঃ)-এর সাথে রমযান মাসে মসজিদে গেলাম। সেখানে দেখলাম লোকেরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে নিজের নিজের নামায পড়ছে। আবার কোথাও একজন নামায পড়ছে, আর তার সঙ্গে পড়ছে কিছু লোক। তখন হযরত উমর (রাঃ) বললেনঃ আমি মনে করছি এ সব নামাযীকে একজন ভাল ক্বারীর পিছনে একত্রে নামায পড়তে দিলে খুবই ভাল হত। পরে তিনি তাই করার ফয়সালা করেন এবং হযরত উবাই ইবনে কায়াবের ইমামতিতে জামায়াতে নামায পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই সময় এক রাত্রে আবার উমর ফারূকের সাথে আমিও বের হলাম। তখন দেখলাম লোকেরা একজন ইমামের পিছনে জামায়াতবদ্ধ হয়ে তারাবীহর নামায পড়ছেন। এ দেখে হযরত উমর (রাঃ) বললেনঃ এতো খুব ভাল বিদয়াত।"

হাদীসের শেষভাগে উল্লিখিত উমর ফারুক (রাঃ)-এর কথাটিই হল বিদয়াতকে দুভাগে ভাগ করার বাক্যটি হল **نعمت البدعة هذه** এর শাব্দিক তরজমা হলঃ এটা একটা উত্তম বিদয়াত। আর একটি বিদয়াত যদি উত্তম হয়, তাহলে আপনা আপনি বোঝা যায় যে, আর একটি বিদয়াত অবশ্যই খারাপ হবে। এ হল এ ব্যাপারের মূল ইতিহাস। এখন অবস্থা হচ্ছে এই যে, যে কোন বিদয়াতকে সমালোচনা করলে বা সে সম্পর্কে আপত্তি তোলা হলে, তাকে বিদয়াত বলে ত্যাগ করার দাবি জানান হলে অমনি জবাব দেয়া হয়, "হ্যাঁ, বিদয়াত তো বটে, তবে বিদয়াতের সাইয়েয়া নয়, বিদয়াতে হাসানা' অতএব ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। বস্তুত বিদয়াতের মারাত্মক দিক-ই হচ্ছে এই। এ কারণে বাস্তবতার দৃষ্টিতে রাসূলের বাণী **كل بدعة ضلالة** 'সব বিদয়াত-ই গোমরাহী' অর্থহীন হয়ে যায়। কেননা যদি সব বিদয়াত-ই গোমরাহী হয়ে থাকে, তাহলে কোন বিদয়াত-ই হিদায়াত হতে পারে না। কিন্তু বিদয়াতের ভাগ বন্টন তার বিপরীত কথাই প্রমাণিত হয়। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, রাসূলের (সাঃ) কথা সব বিদয়াতেই গোমরাহী ঠিক নয়। কোন কোন বিদয়াত ভালও আছে। (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)। রাসূলের কথার বিপরীত ব্যাখ্যা দানের মারাত্মক দৃষ্টান্ত এর চেয়ে আর কিছু হতে পারে না।

আমাদের বক্তব্য এই যে, মূলত বিদয়াতকে 'হাসানা ও 'সাইয়্যেয়া' দুভাগে ভাগ করাই ভুল। আর হযরত উমর ফারূক (রাঃ)-এর কথা দ্বারা-ও এ বিভাগ প্রমাণিত হয় না। কেননা উমর ফারুকের কথার অর্থ মোটেই তা নয়, যা মনে করা হয়েছে। জামায়াতের তারাবীহ নামায পড়া মোটেই বিদয়াত (নতুন আবিষ্কার) নয়। রাসূলের জামানায় তা পড়া হয়েছে। রাসূলে করীম (সাঃ) দু'তিন রাত তারাবীহর নামায নিজেই ইমাম হয়ে পড়িয়েছেন একথাই সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ

নবী করীম (সাঃ) মসজিদে নিজের নামায পড়ছিলেন। বহু লোক তাঁর সঙ্গে নামায পড়ল। দ্বিতীয় রাত্রিতেও সে রূপ হল। এতে করে এ নামাযে খুব বেশী সংখ্যক লোক শরীক হতে শুরু করল। তৃতীয় বা চতুর্থ রাত্রে যখন জনগণ পূর্বানুরূপ একত্রিত হল, তখন নবী করীম (সাঃ) লোকদের বললেনঃ তোমরা যা করেছ তা আমি লক্ষ্য করেছি। আমি নামাযের জন্যে মসজিদে আসিনি শুধু একটি কারণে। তা হল, এভাবে জামায়াতবদ্ধ (তারাবীহ) নামায পড়লে আমি ভয় পাচ্ছি, হয়ত তা তোমাদের উপর ফরযই করে দেয়া হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ এ ছিল রমযান মাসের ব্যাপার। *(বুখারী ও মুসলিম)*

এ হাদীস অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, জামায়াতের সাথে তারাবীহ নামায পড়াবার কাজ প্রথম করেন নবী করীম (সাঃ) নিজে। করেন পর পর তিন রাত্র পর্যন্ত। আর রাসূল (সাঃ) একবার যে কাজ করেছেন এবং পরবর্তীতে সে কাজ করতে নিষেধও করে যাননি সে কাজ কিভাবে বিদয়াত হবে।

তা হলে হযরত উমর (রাঃ) জামায়াতের সাথে তারাবীহ পড়াকে 'বিদয়াত' বললেন কেন? বলা হয়েছে এ কারণে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর সময় জামায়াতের সাথে তারাবীহর নামায পড়া ২-৪দিন পর বন্ধ হয়ে যায়, তারপর বহু কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফত আমলে এ নামায জামায়াতের সাথে নতুন করে চালু করা যায়নি। এরপর হযরত উমর ফারূকের সময় এ জিনিস চালু হয়। এ হিসেবে একে বিদয়াত বলা ভুল কিছু হয়নি এবং তাতে করে তা সেই বিদয়াতও হয়ে যায়নি যা সুন্নাতের বিপরীত, যার কোন দৃষ্টান্ত রাসূলের (সাঃ) যুগে পাওয়া যায় না।

উমর ফারুক (রাঃ) যিনি বিদআতের সবচেয়ে বড় বিরোধী ছিলেন, তিনি বিদয়াত চালু করেছেন কিংবা তাঁর সামনে রাসূল (সাঃ) একবারও করেননি কিংবা অনুমোদন দেননি এমন বিদয়াতী কাজ করেছে লোকেরা আর তিনি কিছু বলেননি একথা অবিশ্বাস্য।

বিদয়াত সনাক্ত করার উপায়

যে কোন কিছু পরিমাপের জন্য একটি মাপকাঠি বা স্কেল রয়েছে। যেমন ঘরের মেঝের লম্বা মাপার জন্য মিটার এবং গজের ফিতা রয়েছে। রোগীর জ্বর পরিমাপের জন্য থার্মোমিটার রয়েছে। ঠিক তেমনি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইসলাম দ্বীনের

মধ্যে নতুন সংযোগ করা যে কোন বিষয় (বিদ'আত) সনাক্ত করার জন্য একটা মাপকাঠি বা স্কেল দিয়েছেন। আর এই মাপকাঠি হল আল কুরআন ও সহীহ হাদীস। বড় আলেম, বুযুর্গ, পীর বাবা, মুরুব্বী যা কিছু বলল বা করলো বা করতে উপদেশ দিল আমার কাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে যে মাপকাঠি বা স্কেল (কুরআন ও সুন্নাহ) দেয়া আছে তাতে যাচাই করে দেখবো। যদি তা কুরআন ও সুন্নাহতে কোথাও না পাওয়া যায় এবং সাহাবী,তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনরা এ সকল কাজ করেছেন বলে যদি কোন দলিল না থাকে তবে আমি নিশ্চিত হতে পারি এগুলো সব বিদ'আত। কারণ বুযুর্গ, আলেম, পীরবাবা যা বলে তাই দলিল না, তারা যা বলছে বা করছে বা করতে বলছে তা প্রমাণের জন্য কোরআন আর সুন্নাহর দলিল দরকার।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ "আমার সময়ের লোক অর্থাৎ সাহাবাগণ, তারপর আগমনকারী (তাবেঈন) ব্যক্তিগণ তারপর আগমনকারী (তাবে-তাবেঈন) ব্যক্তিগণ উত্তম।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

ইমাম ইব্রাহীম নখঈ বলেন, "কোন ব্যক্তি বা দলের গুনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে তার আমল সাহাবায়ে কিরামের আমলের বিপরীত।"

অতএব, সাহাবাগণ, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন গন যেসব কাজ করেননি সেই সব কাজ আলেম, অলি-আল্লাহ, হুজুর কেবলা, পীরবাবার নামে সওয়াবের আশায় শুরু করার নামই বিদ'আত। এখানে আমরা বর্তমান সমাজে বহুল প্রচলিত কিছু বড় বড় বিদয়াতের নাম উল্লেখ করব যেগুলির কোরআন আর সুন্নাহর কোন দলিল তো নাই উপরন্তু সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনদের মাঝেও কেউ কোনদিন এ সকল কাজ করেছে বলে দলিল পাওয়া যায়নি। এ সকল বিদ'আতের কিছু কিছু বিষয় আছে যা সরাসরি শিরক, কোন কোনটি কুফর আর কোন কোনটি হারাম পর্যায়ে পড়ে।

মুরতাদ

"তোমাদের মধ্যে যে সব লোক নিজের দীন থেকে সরে যাবে আর দীনত্যাগী অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়ায় ও আখিরাতে তাদের সব নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারা জাহান্নামবাসী এবং সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে।" *(আল-বাকারাঃ ২১৭)*

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনলো, অতঃপর কুফরী করল, পুনরায় ঈমান গ্রহণ করল, পুনরায় আবার কুফরী করল, অতঃপর কুফরী আক্বীদা বিশ্বাস ও কর্মকান্ড বাড়তেই থাকলো। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ক্ষমা করবেন না এবং কখনো তাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখাবেন না।" *(আন-নিসাঃ ১৩৭)*

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা সেই বান্দার তাওবাহ কবুল করেন না, যে ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী প্রকাশ করে। *(আহমাদ, সনদ সহীহ)*

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অন্ধকার রাতের মত ফিতনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে (কুফরী করে) বিকেলে কাফির হয়ে যাবে। বিকেলে মু'মিন হলে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দীন বিক্রি করে বসবে। *(মুসলিম কিতাবুল ঈমান)*

উল্লেখিত আয়াতে কারীমা ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ হলো যে, মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়। আবার মুসলমান হবার পর কুফরী করলে সে কাফির হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তার দীন ও ঈমানকে প্রত্যাহার করে কাফির হয় শরীয়তের পরিভাষায় তাকেই মুরতাদ বলা হয়।

ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত, অপরিহার্যভাবে মেনে চলার জন্য নির্ধারিত এক বা একাধিক বিষয়কে অস্বীকার করলে মুসলমান মুরতাদ হয়ে যায়। যে মুসলিম ব্যক্তি ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক অপরিহার্যরূপে মেনে চলার জন্য নির্ধারিত কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করলো বস্তুত সে আল্লাহর কিতাবের অংশ বিশেষের প্রতি ঈমান আনলো আর অস্বীকার করলো অংশ বিশেষকে এমতাবস্থায় সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত বলেই গন্য হবে। অর্থাৎ সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

শীয়া সম্প্রদায় এবং উহাদের মূল উৎসের স্বরূপ

হিজরীর পয়ত্রিশ সনে ওসমান (রাঃ) এর শাহাদতের পর আলী (রাঃ) এর বায়আত সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে মুসলিম জাতির মধ্যে দলীয় কোন্দল ও ঘরোয়া বিবাদের সুত্রপাত হয়। ঐ সময় মুসলিম সমাজে দলীয় কোন্দলের ইন্ধন যোগানোর জন্য এবং জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য যে দুষ্ট শ্রেণীর লোক ইসলামে অনুপ্রবেশ করে উহাদের অধিকাংশ অগ্নিপূজক ও ইয়ামানের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল।

ইসলামে অনুপ্রবেশকারীগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের আকীদা, সাহাবাগণ (রাঃ) সম্পর্কে এবং তাওহীদী আকিদায় গন্ডগোল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মতামত যাহির করে এক কুহেলিকার সৃষ্টি করেছে। এরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর মতে- আলী (রাঃ) হচ্ছেন স্বয়ং খোদা (নাউযু বিল্লাহ)। এরা আলীর (রাঃ) আমলেই আত্ম প্রকাশ করে।

আলী (রাঃ) এদের মুখচেনা পান্ডাগুলিকে ধরে আগুনে পুড়িয়ে মারেন। কিন্তু আবর্জনা শেষ হয়নি। এই দলের সদস্যরা যুগ যুগ ধরে এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক কথা প্রচার করে আসছিল। সে সময় হিন্দুদেরকে বুঝানোর জন্য এরা বলেছিল যে, আলী হলেন বিষ্ণুর দশম অবতার। এরা আলীর নামে একখানা কিতাব রচনা করে নেয়। উহার নাম রাখা হয় মাহদী পুরান। উহাতে উমাচারী বুদ্ধমত এমন কতগুলি শ্লোক, মন্ত্র ও টীকা লিখানো হয় যা সাধারণের বোধগম্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দুদেরকে উহা গ্রহণে আগ্রহী করা।

অপর দলের মতে আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের অংশীদার। আলীর নিকট এমন অনেক গোপন ইলম বা তথ্য ছিল যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল মাত্র তাকে দিয়ে গেছেন। এই সংবাদ প্রমাণ করার জন্য তারা নিম্নের তথ্য রচনা করেছে।

“আমি ও আলী একই নূরে সৃজিত হয়েছি”। এই হাদিসটি জাফর ইবনে আহম্মদ ইবনে আলী নামক ব্যক্তির প্রস্তুতকৃত। হারুন (আঃ) মুসা (আঃ) এর যেমন নবুয়তের অংশীদার ছিলেন, এই হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত গোপন কথা আলী (রাঃ) নিকট বা মাধ্যমে বলেছেন। তারা এই প্রসঙ্গে কুরআন চল্লিশ পারা বলে দাবী করে তন্মধ্যে দশ পারা আলীর (রাঃ) নিকট ওয়াহী হয় অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দিয়ে যান। এই সুবাদে তারা একটি হাদীস বানিয়েছে যা বহুল প্রচারিত।

“আমি ইলমের শহর, আলী উহার দরজা। অতএব ইলমের ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশপ্রার্থী যেন দরজায় এসে পৌঁছায়।” অর্থাৎ আলীর (রাঃ) মাধ্যমে উহা অর্জন করে। এবং উক্ত ইলম কেবলমাত্র আলীর (রাঃ) ভক্ত শীয়াদের নিকটই আছে। এই হাদীস সম্পর্কে হাদীসশাস্ত্রে পন্ডিতগণ মন্তব্য করেছেন। ইমাম বুখারী (রাঃ) বলেনঃ উহার কোনও সঠিক সূত্রই নেই। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেনঃ উহা প্রত্যাখ্যাত কথা।

শায়খুল ইসলাম ইমাম তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি শীয়া মতবাদের আবিস্কার করেছে, তার ধর্ম্মীয় মনোভাবের ভিত্তি আদৌ ছিল না, বরং তার উদ্দেশ্য বড়ই অসৎ ছিল। বলা হয়, সে যিনদীক ও মোনাফেক ছিল, পরে ইসলাম স্বীকার করে তলে কুফরী মত প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। এদের মাযহাবের ভিত্তি হল মিথ্যা কথার উপর। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম দিয়ে মিথ্যা কথা শরীয়তের বাণী বলে প্রচার করা এবং সহীহ হাদীস সমূহকে অস্বীকার করা। *(মাজমু আতুল ফাতাওয়া ত্রদোদশ খন্ড ৩১ পৃষ্ঠা)*

শীয়াদের বদনীতির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক নীতি হল, ব্যক্তি বিশেষকে বাড়াতে বাড়াতে এতদূর পৌছানো যে, যেন তারা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এজেন্ট বা মাধ্যম স্বরূপ। তাই এরা এদের বোযর্গ নামীয় শ্রেণীকে এমন সব উপাধিতে উল্লেখ করে যা কেবল অতিরঞ্জিতই নয়, বরং ইসলামী রীতির বর্হিভূত।

এ পরিপেক্ষিতে শীয়ারা তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে বাবুল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহ আয়াতুল্লাহ ইত্যাদি খেতাবে ভুষিত করে অর্থাৎ আল্লাহর নিকট পৌছানোর জন্য এরাই সোপন স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলাকে পাবার জন্য এদের দরজায় ধর্ণা দিতে হবে; পরিত্রাণ পাওয়া; হক না হক পথের সবকিছুর এরাই মাধ্যম; এমনকি জগতের সবাই এদের মুখাপেক্ষী, তাই এদের কতিপয় লোককে গাউস উপাধী দেয় কাউকে কুতুব বলে থাকে। শীয়ারা মুসলিমদের আকীদা লন্ডভন্ড করার জন্য বিভিন্ন কথা জাল করেছে এবং হাদীসের নামে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে যার ফলে সাধারণ লোক তো দূরের কথা, অনেক আলেমও ধোঁকা খাচ্ছে।

খারেজী

শীআ মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মতবাদের অধিকারী দলটি ছিল খারেজী। এরা ইসলামে সর্বপ্রথম বিদআতী দল এদের বক্তব্যের মধ্যে ছিল। মু'মিন হবে নিখুত খাটি। যে ব্যক্তি ঐরূপ না হবে সে কাফির-চিরজাহান্নামী। তাদের মতে পাপ কুফরীর সমার্থক। সকল কবীরা গুণাহকারীকে এরা কাফের বলে আখ্যায়িত করে (যদি তারা তওবা করে গুণাহ থেকে প্রত্যাবর্তন না করে) উপরন্তু সাধারণ মুসলমানকেও এরা কাফের বলতো। কারণ, প্রথমত, তারা পাপমুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত সাহাবীদেরকে তারা কেবল মুমিনই স্বীকার করতো না, বরং নিজেদের নেতা বলেও গ্রহণ করতো।

খলীফাকে কুরাইশী বংশোদ্ভুত হতেই এ কথা তারা স্বীকার করতো না। তারা বলতো, কুরাইশী, অ-কুরাইশী-যাকেই মুসলমানরা নির্বাচিত করে, সে-ই বৈধ খলীফা।

কুরআনকে তারা ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস হিসেবে মানতো। কিন্তু হাদীস এবং ইজমার ক্ষেত্রে তাদের মত সাধারণ মুসলমান থেকে স্বতন্ত্র ছিল।

এদের সবচেয়ে বড় দল আযারেকা নিজেদের ছাড়া অন্য সকল মুসলমানকে মুশরিক বলতো। এদের মতে নিজেদের ছাড়া আর কারো আযানে সাড়া দেয়া খারেজীদের জন্য জায়েজ নয়। অন্য কারো জবাই করা পশু তাদের জন্য হালাল নয়; কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও জায়েয নয়। খারেজী আর অ-খারেজী একে অন্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরা অন্য সব মুসলমানের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরযে আইন মনে করতো। তাদের স্ত্রী-পুত্র হত্যা করা এবং ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করাকে 'মোবাহ' মনে করতো। তাদের নিজেদের মধ্যকার যেসব লোক এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করে না, তাদেরকেও কাফের মনে করতো। তারা তাদের বিরোধীদের ধন-সম্পদ আত্মসাত করাকে হালাল মনে করতো। মুসলমানদের প্রতি তাদের কঠোরতা এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় তাদের কাছে অমুসলিমরা অধিক নিরাপত্তা লাভ করতো।

মুর্জিয়া

শিআ এবং খারেজীদের চরম পরস্পর-বিরোধী মতবাদের প্রতিক্রিয়া একটি তৃতীয় দলের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এ দলটিকে মুর্জিয়া বলে অভিহিত করা হয়।

একঃ কেবল আল্লাহ এবং রাসূলের মা'রেফাতের নামই ঈমান। আমল ঈমানের মূলতত্ত্বের পর্যায়ভূক্ত নয়। তাই, ফরয পরিত্যাগ এবং কবিরা গুণাহ করা সত্ত্বেও একজন লোক মুসলমান থাকে।

দুইঃ নাজাত কেবল ঈমানের ওপর নির্ভরশীল। ঈমানের সাথে কোন পাপাচার মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। কেবল শিরক থেকে বিরত থেকে তাওহীদ বিশ্বাসের ওপর মৃত্যু বরণই মানুষের নাজাতের জন্য যথেষ্ট।

কোন কোন মূর্জিয়া আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলে যে, শিরক থেকে নিকৃষ্ট যতবড় পাপই করা হোক না কেন, অবশ্যই তা ক্ষমা করা হবে।

এসব চিন্তাধারা পাপাচার ফাসেকী ও অশালীন কার্যকলাপ এবং যুলুম নির্যাতনকে বিরাট উৎসাহ যুগিয়েছে। মানুষকে আল্লাহর ক্ষমার আশ্বাস দিয়ে পাপাচারে উৎসাহী করে তুলেছে। এ চিন্তাধারার কাছাকাছি আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, আমর বিল মারূফ এবং নাহী আনিল মুনকার-ভাল কাজের নির্দেশ এবং খারাপ কাজে নিষেধ-এর জন্য যদি অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়-তা হলে এটা একটা ফেতনা। সরকার ছাড়া অন্যদের খারাপ কাজে বাধা দেয়া নিঃসন্দেহে জায়েয-কিন্তু সরকারের যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখ খোলা জায়েয নয়। আল্লামা আবুবকর জাসসাস এ জন্য অত্যন্ত কঠোর ভাষায় অভিযোগ করে বলেন, এসব চিন্তা যালেমের হস্ত সুদৃঢ় করেছে। অন্যায় এবং ভ্রান্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তিকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

মুরজিয়া ও জাহমিয়া মতবাদ তারা একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক। মুরজিয়ারা 'আমলের দিক দিয়ে ইসলামকে পঙ্গু করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে প্রকাশ করল যে, নামায, যাকাত, রোযা ইত্যাদি ইসলামী আদেশ সংক্রান্ত আমল সমূহের সাথে ঈমানের কোনই সম্পর্ক নেই। ফলে নামায, যাকাত বা রোযা আদায় করলে ঈমানের কোনও উন্নতি সাধিত হয় না বা এসব পুন্য কর্মের দ্বারা ঈমান বাড়ে না। অনুরূপ ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, চুরি ইত্যাদি অন্যায় কাজ ঈমানের জন্য ঈমান কমে যায় না। অতএব আমল সমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করার পর কোন গোনাহই মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়। মুরজিয়ারা এভাবে শরীয়াতের অনুশাসন বাতিল করে ঈমান কেবল মুখে মুখে উচ্চারণ ও মনে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট বলে প্রচার করল। অতএব যদি কেহ নামাযও পড়ে তার ফজিলত হবে ঈমানের সাথে সম্পর্কহীন পৃথক। অর্থাৎ নামায না পড়লে বা মদ্যপান করলে ঈমানের কোন ক্ষতি হবে না। এভাবে এরা ইসলামের বিধিনিষেধ পালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শিথিলতা ও সুবিধার আমদানী করল।

এদের পর জাহমিয়া গোত্ররা বললঃ ঈমান মুখে উচ্চারণের প্রয়োজন হয় না, অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট। অর্থাৎ কেবল তাসদীক বিল জিনানা-অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস রাখা।

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) তাদের আক্বীদা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ তাদের বিশ্বাস কালেমা শাহাদাত একবার পাঠ করার পর যত প্রকার অন্যায় করুক ঐ অন্যায়ের শাস্তি ভোগের জন্য আদৌ জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে না।

মুতাযিলা

এ সংঘাত মুখর যুগে একটি চতুর্থ মতবাদও জন্ম নেয়।খারেজী এবং মুর্জিয়াদের মধ্যে কুফর এবং ঈমানের ব্যাপারে যে বিরোধ চলে আসছিল, সে ব্যাপারে এদের নিজস্ব ফায়সালা এই ছিল যে, পাপী মুসলমান মুমিনও নয়, কাফেরও নয়, বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে।

এছাড়াও অনেক মু'তাযিলা ইসলামী আইনের উৎসের মধ্য থেকে হাদীস এবং ইজমাকে প্রায় বাতিলই করে।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন, খাওয়ারেজ ও মুতাযেলী উভয়ের বক্তব্য হল- "আমি নিশ্চিতরূপে স্বীকার করছি যে, ধর্মীয় অনুশাসনগুলি সমস্তই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যখন ধর্মীয় অনুশাসনগুলি কিয়দংশ ছেড়ে দেয়া হল তখন ঈমানের কিছু অংশ চলে গেল। অতএব যখন কিছু অংশ নষ্ট হল তখন তার ঈমান সম্পূর্ণভাবে চলে গেল। যেহেতু ঈমান অংশযুক্ত বস্ত নয়; উহার কিছু অংশ পরিত্যাগ করলে অন্যান্য অংশগুলি পালন সত্ত্বেও সে মু'মিন থাকবে না, কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে; বিধায় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ হবে" মু'তাযিলীদের মতে সে মু'মিনও নয়, কাফিরও নয়। এই মাসআলায় মু'তাযিলীদের সাথে খারেজীদের মতপার্থক্য হয়েছে।

মুতাযেলীগণ আবূ বকর (রাঃ), ওসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এই ৪ জন খলিফার খিলাফত স্বীকার করে থাকে। খারেজীগণ আবূ বকর ও ওমরের (রাঃ) খিলাফত স্বীকার করে। ওসমান ও আলীর (রাঃ) খিলাফত স্বীকার করে না। রাফেযীগণ কেবল মাত্র আলী (রাঃ) ছাড়া প্রথম তিনজন খলীফার খেলাফত আদৌ স্বীকার করে না।

তিনটি মৌলনীতি যা প্রত্যেক মুসলিমের জানা ওয়াজিব

যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় সেই তিনটি মৌল নীতি কি যা প্রত্যেক মানুষেরই জানা অবশ্য কর্তব্য? তুমি উত্তর দেবে বিষয় তিনটি হলঃ

(১) প্রত্যেক মানুষকে তার রব্ব (প্রতিপালক) সম্পর্কে জানা;

(২) তাঁর দ্বীন বা জীবন বিধান সম্পর্কে জানা; এবং

(৩) তাঁর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জানা;

প্রথম মৌল নীতি (*الأصل الأول*)

রব (আল্লাহ) সম্পর্কে জ্ঞান

যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমার রব্ব কে?" তা হলে বলঃ সেই মহান আল্লাহ্ যিনি আমাকে ও অন্যান্য সকল সৃষ্টি জীবকে তাঁর বিশেষ নে'য়ামতসমূহ দ্বারা লালন পালন করেন। তিনি আমার একমাত্র রব্ব, তিনি ব্যতীত আমার অন্য কোন মা'বুদ (রব্ব) নেই। এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনের প্রমাণ হচ্ছেঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা।" *(সূরা আল- ফাতেহা, ১ঃ১)*

আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই হচ্ছে তাঁর সৃষ্ট বস্তু এবং আমিও সেই সৃষ্ট জগতের একটি অংশ মাত্র। আর যখন তুমি জিজ্ঞাসিত হবে, "তুমি কিসের মাধ্যমে তোমার রব্ব কে চিনেছ?"

তখন তুমি উত্তর দেবে, তাঁর নিদর্শন সমূহ ও তাঁর সৃষ্টিরাজির মাধ্যমে (আমি আমার রব্ব কে চিনেছি)। তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে দিবা-রাত্রি, রবি-শশী (চন্দ্র-সূর্য) আর তাঁর সৃষ্ট বস্তু সমূহের মধ্যে রয়েছে সপ্ত আকাশ, সপ্ত যমীন এবং যা কিছু তাদের ভিতরে এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যস্থলে রয়েছে।

কুরআন থেকে প্রমাণঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"আর (দেখ) তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজ্দাহ করবে না, চন্দ্রকেও নয়। বরং সাজদাহ করবে একমাত্র সেই আল্লাহকে যিনি ঐ সকলকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে ইচ্ছুক হও।" *(সূরা আল-হা-মীম সাজ্দাহ, ৪১ঃ ৩৭)*

আরও প্রমাণঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"নিশ্চয় তোমাদের রব্ব (প্রতিপালক) হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি রজনীর (রাত্রির) দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন, যাতে উহারা ত্বরিৎ গতিতে একে অন্যের অনুসরণ করে চলে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে স্বীয় নির্দেশের অনুগত রূপে, (জেনে রাখো!) সৃষ্টি করার ও হুকুম প্রদানের মালিক (মুখতার) একমাত্র তিনিই। সর্বজগতের রব্ব (প্রতিপালক) সেই আল্লাহ মহা পবিত্র।" *(সূরা আল-আ'রাফ, ৭ঃ ৫৪)*

তিনি আমাদের একমাত্র রব্ব, তিনিই আমাদের ইলাহ (মা'বুদ)।

এ প্রসংগে কুরআনের ঘোষণাঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ
رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“হে মানব সমাজ! তোমরা দাসত্ব বরণ করবে (অর্থাৎ ইবাদত করে চলবে) সেই মহান প্রতিপালক-রব্বের যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পুর্ববর্তীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন, (আশা করা যায়) তোমরা মুত্তাকি (ধর্মভীরু) হতে পারবে। যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে করেছেন শয্যা স্বরূপ, আস্‌মানকে ছাদ স্বরূপ এবং যিনি আকাশ হতে বৃষ্টি ধারা অবতীর্ণ করেন, অতপর এর দ্বারা উদ্গত করেন নানা প্রকার ফল-মূল তোমাদের জীবিকা হিসেবে। অতএব তোমরা জেনে-শুনে কোন কিছুকেই আল্লাহর সমকক্ষ (অংশীদার) করোনা।” *(সূরা আল-বাকারা, ২ঃ ২১-২২)*

ইবনে কাসীর বলেছেন, “এ সমস্ত জিনিসের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই ইবাদতের একমাত্র যোগ্য।”

ইবাদতের প্রকার সমূহ যা আল্লাহ তাআ’লা নির্দেশিত করেছেন তা হচ্ছেঃ

(ক) الإسلام (আল- ইসলাম)- আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণ করা।

(খ) الإيمان (আল-ঈমান)- বিশ্বাস স্থাপন করা।

(গ) الاحسان (আল-ইহসান)- নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। দয়া-দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন, উপকার সাধন করা।

(ঘ) الدعاء (আদ-দো’য়া) প্রার্থনা, আহবান করা।

(ঙ) الخوف (আল-খাওফ) ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা ।

(চ) الرجاء (আর-রাজা) আশা-আকাংখা করা ।

(ছ) التوكل (আত্-তাওয়াক্কুল) নির্ভরশীলতা, ভরসা করা ।

(জ) الرغبة (আর-রাগ্‌বাহ) অনুরাগ, আগ্রহ।

(ঝ) الرهبة (আর-রাহ্‌বাহ) ভয় ভীতি।

(ঞ) الخشوع (আল-খূশূ) বিনয়-নম্রতা।

(ট) الخشية (আল-খাশিয়াত) অমংগলের আশংকা।

(ঠ) الإنابة (আল- ইনাবাহ) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে ফিরে আসা।

(ড) الاستعانة (আল-ইস্তে’আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা।

(ঢ) الاستعاذة (আল-ইস্তে-আযা) আশ্রয় প্রার্থনা করা।

(ণ) الاستغاثة (আল-ইস্তেগাসাহ) নিরুপায় ব্যাক্তির বিপদ উদ্ধারের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা।

(ত) الذبح (আয্-যাবাহ) আত্নত্যাগ বা কুরাবানী করা।

(থ) النذر (আন্-নযর) মান্নত করা।

এগুলি এবং অন্যান্য যে পদ্ধতি সমূহের আদেশ ও নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন সবকিছুই তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে, কেবলমাত্র তাঁর নিকটেই চাইতে হবে, অন্যের কাছে নয়। এর প্রমাণ হিসেবে কুরআনের ঘোষণাঃ

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

“আর সিজদার স্থানসমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। অতএব আল্লাহর সংগে কাউকেই আহবান করবে না।” *(সূরা আল-জিন ৭২ঃ ১৮)*

ফলতঃ কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়ের কোন একটি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো জন্য সম্পাদন করে তবে সে মুশরিক ও কাফের রূপে পরিগণিত হবে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদ হতে প্রমাণঃ

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

“যে ব্যক্তি এক আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করে, তার নিকট তার সমর্থনে কোনই যুক্তি প্রামাণ নেই তার হিসেব-নিকেশ হবে তার রবের কাছে, নিশ্চয়ই কাফের ও অবিশ্বাসী লোকেরা কখনই সফলকাম হতে পারবে না।” *(সূরা মু’মিনুন ২৩ঃ ১১৭)*

হাদীস হতে প্রমাণঃ الدعاء مخ العبادة

দো’য়া বা প্রার্থনা হচ্ছে এবাদতের সারাংশ। এর সমর্থনে কুরআন হতে প্রমাণঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

“আর তোমাদের রবব বলেনঃ তোমরা সকলে আমাকেই একক ভাবে ডাকবে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব, যারা অহমিকার বশে আমার বন্দেগী করা অস্বীকার করে, তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে অতিশয় ঘৃণিত অবস্থায়।” (সূরা মু’মিন, ৪০ঃ ৬০)

ভয়ঃ- এ প্রসংগে কুরআনের ঘোষণাঃ

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

“অতঃপর তোমরা তাদের ভয় করবে না। বরং আমাকেই ভয় করে চলবে, যদি তোমরা প্রকৃত মু’মিন বা বিশ্বাসী হয়ে থাক। *(সূরা আলে ইমরান ৩ঃ ১৭৫)*

আশাঃ- এর দলীল হিসেবে কুরআনের ঘোষণাঃ

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

আয়াতের অর্থঃ

“অতএব যে ব্যক্তি রবের সাক্ষাৎ লাভের আশা-আকাঙ্খা পোষণ করে, সে যেন সৎ কর্মগুলো নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করতে থাকে। আর নিজ রবের ইবাদতে অপর কাউকে শরীক না করে।” *(সূরা কাহাফ, ১৮ঃ ১১০)*

নির্ভরশীলতাঃ এ বিষয়ে কুরআনের ঘোষণাঃ

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

“আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর কর, যদি তোমরা প্রকৃত পক্ষে মু’মিন হও।” (সূরা মায়েদাহ্, ৫ঃ ২৩)

আল্লাহ আরও বলেছেনঃ

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

“আর যে ব্যক্তি সকল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হয়, তার জন্য তিনিই (আল্লাহ) যথেষ্ট।” *(সূরা তালাক, ৬৫ঃ৩)*

আগ্রহ ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিনয়ঃ এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণাঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

“নিশ্চয়ই এরা সৎকর্মে ত্বরিত ও সদা তৎপর ছিল। আর আশা ও ভয় সহকারে আমাকে আহবান করতো এবং আমার প্রতি এরা বিনয়-নম্র।” *(সূরা আম্বিয়া, ২১ঃ ৯০)*

অমংগলের আশংকাঃ এ ব্যাপারে কুরআন থেকে প্রমাণঃ

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“কখনই তাদের ভয় করোনা, একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল। যাতে করে তোমাদের প্রতি আমার নে’য়ামত সর্বতোভাবে পূর্ণ করে দিতে পারি, যাতে তোমরা (লক্ষ্যে পৌঁছার) সঠিকপথে পরিচালিত হতে পার।” *(সূরা আল-বাকারা, ২ঃ ১৫০)*

নৈকট্যলাভের কামনা এবং কৃত পাপের জন্যে অনুশোচনাঃ

এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনের ঘোষণাঃ

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

"আর তোমরা সকলে স্বীয় রবেবর পানে ফিরে এস এবং তোমাদের উপর আযাব সমাগত হবার পূর্বেই তাঁর নিকট সর্বতোভাবে আত্ন সমর্পণ কর, কেননা (আযাব আসার) পর তোমরা আর সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।" *(সূরা আল যুমার, ৩৯ঃ ৫৪)*

সাহায্য প্রার্থনা সম্পর্কে প্রমাণঃ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ **"(হে আমাদের রবব), আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।"** *(সূরা আল-ফাতেহা, ১ঃ ৫)*

আর হাদীস শরীফে এসেছেঃ إذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ بِا لـ

"যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই তা (বিনম্র ভাবে) চাইবে।" *(আহমদ ও তিরমিযী)*

আশ্রয় কামানা প্রসংগে কুরআনের ঘোষণাঃ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
مَلِكِ النَّاسِ

"বল, আমি বিশ্বমানবের প্রভু প্রতিপালক ও মানব মন্ডলীর অধিপতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" *(সূরা আন-নাস, ১১৪ঃ ১, ২)*

বিপন্ন ব্যক্তির আশ্রয় কামনাঃ এ প্রসংগে কুরআনের ঘোষণাঃ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ **"আরও (স্মরণ কর) যখন তোমরা (বিপন্ন অবস্থায়), তোমাদের রবেবর (প্রতিপালকের) নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছিলে তখন তিনিই তোমাদের আবেদনে সাড়া দিলেন (উহা কবুল করলেন)।"** *(সূরা আনফাল ৮ঃ ৯)*

আত্নত্যাগ ও কুরবানীঃ এই বিষয়ে পবিত্র কুরআনের ঘোষণাঃ

قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

("হে রাসূল) বলে দাওঃ আমার সলাত (নামায), আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ উৎসর্গকৃত বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য, তাঁর কোনই শরীক নেই এবং আমি এ জন্যই আদিষ্ট হয়েছি আর মুসলিমদের (আত্বসমর্পনকারীদের) মধ্যে আমিই প্রথম (অগ্রণী)।" *(সূরা আল-আন'আম ৬ঃ ১৬২-১৬৩)*

মান্নতঃ পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণঃ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

"তারা অংগীকার পূরণ করে আর সেদিনকে (কিয়ামত দিবসকে) ভয় করে চলে, যেদিনের বিপদ-আপদ হবে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী।" *(সূরা আদ-দাহার/ইনসান ৭৬ঃ ৭)*

দ্বিতীয় মৌল নীতি (***الأصل الثاني***)

প্রমানপঞ্জীসহ ইসলাম দ্বীন সম্পর্কে পরিচয় ও জ্ঞান লাভ। আর তা হচ্ছেঃ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ এবং অকুণ্ঠ নিষ্ঠার সংগে তাঁর আনুগত্য বরণ। আর সেই সংগে শির্কের কলূষ-কালিমা (অপবিত্রতা) হতে মুক্ত ও বিশুদ্ধ থাকা। উহার তিনটি পর্যায় রয়েছেঃ

(ক) ইসলাম, (খ) ঈমান ও (গ) ইহসান।

প্রথম পর্যায়ঃ ইসলাম (المرتبة الأولى)

ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটিঃ-

১) 'আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল'- একথার সাক্ষ্য প্রদান করা।

২) নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

৩) যাকাত সঠিকভাবে প্রদান করা।

৪) রামাযান মাসে সওম (রোযাব্রত) পালন করা ।

৫) আল্লাহর ঘর যিয়ারত (হজ্জ) করা ।

তাওহীদ সম্পর্কিত সাক্ষ্যদানের দলীল প্রমাণঃ

কুরআন হতেঃ

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানিগণও সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(আল ইমরান ৩: ১৮)*

এর তাৎপর্যঃ- (প্রকৃতপক্ষে তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য)ঃ

এর দু'টি দিক রয়েছেঃ একটি নেতিবাচক, অপরটি ইতিবাচক। নেতিবাচক দিকটি এই যে, সেই একক রব্ব ছাড়া কোনই মা'বুদ (ইলাহ) নেই :এর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর ইবাদত করা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ইতিবাচক, এর দ্বারা ইবাদত দৃঢ়তার সংগে একমাত্র আল্লাহ'র জন্যই সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর রাজত্বে যেমন কোন অংশীদার নেই, তেমনি তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রেও কোন অংশিদার থাকতে পারে না।

পবিত্র কুরআন হতে এর জলন্ত প্রমাণ ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ
إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"এবং স্বরন কর, যখন ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) নিজ পিতা ও নিজ সম্প্রদায়কে বলেনঃ তোমরা যাহাদের ইবাদত (পূজা /আর্চনা) করছঃ আমি তা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত (তাহাদিগের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই)। (আমি তাঁরই ইবাদত করি এবং সম্পর্ক আছে শুধু তাহার সাথে) যিনি আমাকে পয়দা (সৃষ্টি) করেছেন আর তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। ইবরাহীম এই ঘোষনাকে এক চিরন্তন কলেমারূপে রেখে গেছেন তাঁর পরবর্তীদের জন্যে, যাতে তারা এই বাণীর পানে ফিরে যেতে পারে। (সূরা-আয্-যুখরুফ ৪৩ঃ২৬-২৮)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

"বল হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক বানীর প্রতি আস যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমনীতি সরূপ (এক)। আমরা সকলে অংগীকার করি যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবো না, আমরা কোন কিছুই তাঁর শরীক করব না। আর আমরা আল্লাহ ছাড়া একে অপরকে কস্মিনকালেও প্রতিপালক বলে গ্রহন করব না, কিন্তু তারা যদি এতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমরা (আহলে কিতাবদের) বলে দাও, - তোমরা স্বাক্ষি থাক, আমরা হচ্ছি আল্লাহতে আত্মসমর্পিত মুসলিম।" *(সূরা আলে-ইমরান ৩ঃ ৬৪)*

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে আল্লাহর একজন (প্রেরিত) রাসূল তাঁর সাক্ষ্যদান সম্পর্কে কুরআন হতে অকাট্য প্রমাণঃ

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

"নিশ্চয় তোমাদের নিকট সমাগত হয়েছেন তোমাদেরই মধ্যহতে একজন রাসূল যাঁর পক্ষে দুর্বিষহ ও অসহনীয় হয়ে থাকে তোমাদের দুঃখকষ্টগুলি, যিনি তোমাদের জন্য সদা আগ্রহী ও উৎসুক। মু'মিনদের প্রতি যিনি চির স্নেহশীল ও সদা করুণাপরায়ণ।" *(সূরা আত্-তাওবা ৯ঃ ১২৮)*

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এ কথার তাৎপর্য এই যে, তিনি যা আদেশ করেন তা অনুসরণ করা, তিনি যে বিষয়ে সংবাদ প্রদান করেন তা সত্য বলে স্বীকার করা, আর যা নিষেধ করেন তা বর্জন করা এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা।

আল্লাহর একত্ব নামায (সলাত) ও যাকাত সম্পর্কে ব্যাখ্যাঃ

এ সম্পর্কে কুরআনের জ্বলন্ত প্রমাণ ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“এবং তাদের তো কেবল এ আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর ইবাদত করে দ্বীন ইসলামকে খালেস করে নিবে কেবল আল্লাহর জন্য। আর নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, যাকাত প্রদান করতে থাকবে। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে সুদৃঢ় দ্বীন।” *(সূরা আল-বাইয়্যেনাহ ৯৮ঃ ৫)*

রোযাব্রত (সওম)সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণাঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“হে মুমিনগণ, সিয়াম সাধনা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে, যেমনভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা সংযমশীল (মুত্তাক্বী) হয়ে থাকতে পার।” *(সূরা আল-বাকারা, ২ঃ১৮৩)*

হজ্জের প্রমাণ সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণাঃ

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“এবং হজ্বের উদ্দেশ্যে সফরের সামর্থ রাখে যে ব্যক্তি তার জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে কা’বাগৃহের হজ্ব করা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এ আদেশ অমান্য করে তা হলে (সে যেন মনে রাখে) আল্লাহ সমস্ত বিশ্বজগত হতেই বেনিয়ায বা অমুখাপেক্ষী।” *(সূরা আলে-ইমরান, ৩ঃ ৯৭)*

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ঈমান (المرتبة الثانية)

ঈমানের শাখা প্রশাখা সত্তরেরও অধিক। এর মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছেঃ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ মুখে উচ্চারণ করা। আর সর্বনিন্ম হচ্ছে পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরে সরিয়ে দেয়া, আর লজ্জাশীলতা হচ্ছে ঈমানের শাখা সমূহের মধ্যে একটি শাখা।

*ঈমানের রূকুন (**أركانه ستة**) ছয়টি*

যথাঃ (১) আল্লাহ। (২) ফিরিশতাকুল। (৩) আসমানী কিতাব সমূহ। (৪) রাসূলগণ। (৫) কিয়ামত দিবস ও (৬) তাকদীর বা ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা।

এর সমর্থনে কুরআনের দলীলঃ

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে এতে কোনই পূণ্য ও কল্যাণ নেই। বরং পূণ্যের অধিকারী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ, কিয়ামত, ফিরিশতাকুল, কিতাবসমূহ ও নবীকুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আর যে ব্যক্তি অর্থের প্রতি আসক্তি থাকা সত্বেও আত্মীয় স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের, সাওয়ালকারী ভিক্ষুকদের (মুসাফির) এবং দাস-দাসীদেরকে অর্থদান করে, এবং যে ব্যক্তি নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত প্রদান করে এবং অংগীকার করলে তা পূর্ণ করে থাকে। অর্থ সংকটে, দূঃখ-দারিদ্রে ও রণবিভীষিকায় অবিচলিত থাকে এরাই হচ্ছে সেই সমস্ত লোক যারা সত্যপরায়ন, আর এরাই হচ্ছে ধর্মভীরু পরহেযগার (মুত্তাক্বী)।” *(সূরা আল-বাকারাহ্ ২ঃ ১৭৭)*

তকদীর সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণাঃ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

“নিশ্চয় আমি প্রতিটি জিনিসের তাকদীর নির্ধারণ করে সৃষ্টি করেছি।” *(সূরা আল-কামার ৫৪ঃ ৪৯)*

তৃতীয় পর্যায়ঃ ইহসান (المرتبة الثالثة)

ইহসান-এর স্তম্ভ মাত্র একটি, সেটি হচ্ছে এটা মনে করা যে, ইবাদত করার সময় তুমি যেন তাকে (আল্লাহকে) দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি দেখতে না পার তবে এ কথা মনে করে নিতে হবে যে, নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন।

এর সমর্থনে কুরআনের ঘোষণা নিম্নরূপঃ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ **"যারা সংযমশীল (আল্লাহভীরু) ও সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ তাদের সংগে রয়েছেন ।"** *(সূরা আন্-নাহল ১৬ঃ ১২৮)*

আল্লাহ্ পাক আরও বলেছেনঃ

وتوكل على العزيز الرحيم. الذين يراك حين تقوم. وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع العليم.

"আর ভরসা কর সেই পরাক্রান্ত ও কৃপানিধানের উপর যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি নামাযে দাঁড়াও আর যখন তুমি নামায আদায়কারীদের সংগে উঠাবসা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা ।" *(সূরা আশ্-শু'আরা ২৬ঃ ২১৭-২২০)*

আল্লাহ পাক আরও বলেনঃ

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ

"এবং তুমি (হে রাসূল) যে কোন পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করনা কেন, আর তৎসম্পর্কে কুরআন হতে যা কিছু আবৃত্তি করনা কেন এবং তোমরা (হে জনগণ!) যে কোন কর্ম সম্পাদন করনা কেন আমি সেই সমস্ত কার্যাবলির পূর্ণ পর্যবেক্ষক হয়ে থাকি যখন তোমরা উহাতে প্রবৃত্ত হও ।" *(সূরা আল-ইউনূস ১০ঃ৬১)*

এ সম্পর্কে হাদীসের প্রমাণ হচ্ছে জিব্রীল 'আলায়হিস্ সালাম এর এই সুপ্রসিদ্ধ হাদীসঃ

হযরত 'ওমর বিন খাত্তাব রাযিআল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ "একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বসেছিলাম এমতাবস্থায় সেখানে মিশমিশে কালকেশ, ধবধবে সাদা পোষাক পরিহিত একজন ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল। ভ্রমণের কোন নিদর্শনই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিলনা, অথচ আমরা কেউ তাকে চিনতে পারছিলামনা। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং হস্তদ্বয় তাঁর উরুদেশে রাখলেন, এরপর বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করুন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাহ বললেনঃ

(১) "স্বাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ (ইলাহ) নেই এবং মুহাম্মদ সালাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল ।

(২) নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করা ।

(৩) যাকাত প্রদান করা ।

(৪) রমযান মাসে রোযাব্রত পালন করা এবং

(৫) হজ্জ; পথের সম্বল হলে আল্লাহর ঘর (কাবা শরীফ) যিয়ারত করা ।

আগন্তুক বললেনঃ আপনি ঠিক বলেছেন। তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করছেন আবার নিজেই তার সত্যায়ন করছেন। এতে আমরা আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী সাল্লাহল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন,ঃ (তা হলো এই যে,) আল্লাহ, ফিরিশতাকুল, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এরপর আগন্তুক বললেনঃ আমাকে ইহসান সম্পর্কে সংবাদ দিন। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যখন তুমি ইবাদতে লিপ্ত হবে, তখন তুমি "আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছ" একথা মনে মনে চিন্তা করবে, আর যদি এটা সম্ভব না হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে দেখছেন একথা মনে মনে ভাববে ।

অতঃপর আগন্তুক বললেনঃ "আমাকে রোয কিয়ামত সম্বন্ধে অবহিত করুন" নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ- এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা অধিক জানে না ।

এরপর আগন্তুক রোয কিয়ামতের নিদর্শন সমূহ জানতে চাইলে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেনঃ

যখন পরিচারিকা স্বীয় প্রভূর জন্ম দেবে, নগ্নদেহ ও নগ্ন পদ বিশিষ্ট ও জীর্ণ শীর্ণ পোষাক পরিহিত ছাগলের রাখালরা সুউচ্চ অট্টালিকায় বসবাস করবে, তখন রোয কিয়ামতের আগমন ঘটবে ।

হাদীস বর্ণনাকারী বলেনঃ আগন্তুক পরক্ষণেই প্রস্থান করলেন্ এরপর আমরা কিছুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ থাকলাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন উনি হচ্ছেন জিব্রীল 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম, তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

তৃতীয় মৌল নীতিঃ (*الأصل الثالث*)

সংবাদ বাহক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহর পুত্র, তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালেব, তাঁর পিতা হাশেম। হাশেম কুরায়শ বংশ উদ্ভূত এবং এটি আবর কওমের (গোষ্ঠীর/জাতির) মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র ইসমাঈলের বংশ হতে উদ্ভূত। (আমাদের নবীর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)। তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় জন্ম গ্রহন করেন। তিনি তেষট্টি (৬৩) বছর জীবিত ছিলেন, নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর এবং "নবী ও রাসূল" হিসেবে তেইশ বছর (অতিবাহিত করেছেন)।

সূরা "ইকরা" এবং সূরা মুদ্দাসসির অবতীর্ণ হবার সংগে সংগে তিনি যথা ক্রমে নবূওত ও রিসালাত প্রাপ্ত হয়েছেন। শির্ক থেকে সতর্ক করার জন্যে এবং অদ্বিতীয় আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারের জন্য নিজস্ব সংবাদবাহক হিসেবে আল্লাহ তাঁকে প্রেরন করেন।

এ সম্পর্কে কুরআনী ঘোষণাঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ
وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"হে কম্বলে দেহ আবৃতকারী। উঠে দাঁড়াও, সকলকে সতর্ক কর ও নিজ রবেবর মহিমা ঘোষণা কর। বস্ত্রসমূহ পাক-সাফ রাখ, শির্কের কদর্যতাকে সম্পূর্ণ বর্জন কর, বিনিময় লাভের আশায় ইহসান করো না। আর নিজ রবের (আদেশ পালনে) ধৈর্য ধারণ কর।" *(সূরা আল- মুদ্দাসসির ৭৪ঃ ১-৭)*

قُمْ فَأَنذِرْ

উঠে দাঁড়াও ও সতর্ক করঃ এর অর্থ শির্কের বিরুদ্ধে সতর্ক কর এবং তাওহীদের প্রতি আহবান জানাও।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

তোমার রবেবর মহিমা ঘোষণা করঃ এর অর্থ তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর মাহাত্ম প্রচার কর।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

তোমার পোষাক পরিচ্ছদ পাক-সাফ রাখঃ এর অর্থ "আমলসমূহ"কে শির্কের কলুষ কালিমা থেকে পবিত্র রাখ।

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

কদর্যতা বর্জন করঃ এর অর্থ প্রতিমা পূজা (শির্ক) ও প্রতিমা পূজকদের (মুশরিক) থেকে দূরে, বহু দূরে অবস্থান করে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার কর।

তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) বহু বছর ধরে অদ্বিতীয় আল্লাহর বানীর প্রচার কার্য চালাবার পর মি'রাজে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত (নামায) পড়ার আদেশ নিয়ে ফিরে আসেন। অতঃপর মক্কা ভূমিতে তিন বছর উক্ত সলাত সূচারুরূপে সম্পাদনের পর আল- মদীনায় হিজরত করার আদেশ প্রাপ্ত হন।

হিজরতের অর্থ শির্ক-কলুষিত স্থান পরিত্যাগ করে ইসলামী রাজ্যে গমন করা। এ উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মদীর) জন্য শির্ক-কলুষিত স্থান থেকে ইসলামী রাজত্বে হিজরত করা ফরয করা হয়েছে। এই হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুন্ন ও অব্যাহত থাকবে।

এর সপক্ষে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা নিম্নরূপঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ
أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا
إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً
فَأُوْلَـئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا

"নিশ্চয় যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের 'জান কবয' করার সময় ফিরিশতাগণ বলবে, কি অবস্থায় তোমরা (দুনিয়াতে) ছিলে? তারা বলবে, আমরা পৃথিবীতে ছিলাম অসহায় অবস্থায়। ফিরিশতাকূল বলবেনঃ আল্লাহর দুনিয়া কি এতটা প্রশস্ত ছিলনা যাতে তোমরা হিজরত করতে পারতে? অতএব এরা হচ্ছে সেই সব লোক যাদের শেষ আশ্রয় হবে

জাহান্নাম। আর এ হচ্ছে নিকৃষ্টতম আশ্রয় স্থল। কিন্তু যেসব আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এমনভাবে অসহায় হয়ে পড়ে যে, কোন উপায় উদ্ভাবন করতে তারা সমর্থ হন না। পক্ষান্তরে পথ সম্বন্ধেও তারা কোন সহায় সম্বল খুঁজে পায় না, এদের আল্লাহ ক্ষমার আশ্বাস দিচ্ছেন, বস্ততঃ আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও পাপ মোচনকারী" (সূরা আন্-নেসা ৪ঃ ৯৭-৯৯)

কুরআনে আরও বলা হয়েছেঃ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ

"হে আমার মুমিন বান্দাগণ! আমার যমীন হচ্ছে প্রশস্ত। অতএব তোমরা একমাত্র আমারই বান্দেগী করতে থাক" *(সূরা আল-আনকাবুত ২৯ঃ ৫৬)*

আল বাগাবী রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি বলেনঃ "এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কারণ এই যে, যে সমস্ত মুসলমান হিজরত না করে মক্কায় রয়েছে, আল্লাহ তাদের বিশ্বাসী বলে আহবান করেছেন।"

হিজরতের সমর্থনে হাদীস হতে প্রমাণঃ

"আল্লাহর নবী বলেছেন, তওবা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না আর সূর্য পশ্চিম গগনে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তওবার দ্বারও বন্ধ হবে না।"

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনায় অবস্থান করার পর অন্যান্য আদেশগুলি প্রাপ্ত হন। যথা যাকাত, দান-খায়রাত, রোযাব্রত পালন, কা'বাগৃহ পরিদর্শন, আযান, জিহাদ, ভাল কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ ইত্যাদি।

হিজরতের পরের দশ বছর তিনি মদীনায় অতিবাহিত করেন। এরপর ইহলোক ত্যাগ করেন। (আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হোক!)

তাঁর প্রচারিত দ্বীন রোয কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যামান থাকবে। তিনি তাঁর উম্মতকে যাবতীয় সৎকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করে দিয়েছেন আর যাবতীয় অপকর্ম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। সর্বোত্তম যে পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন তা হচ্ছে তাওহীদের পথ, আর দেখিয়েছেন সেই পথ যা আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং তাঁর পছন্দনীয়। এবং সর্ব নিকৃষ্ট বস্তু যা হতে তিনি সকর্ক করে দিয়েছেন তা' হচ্ছে শির্ক এবং এমন সব কাজ যা আল্লাহ অপছন্দ করেন।

আল্লাহ নবী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লম) কে এই নিখিল ধরণীর সকল মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং সমস্ত জ্বিন ও ইনসানের পক্ষে তার আনুগত্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

এর সমর্থনে কুরআরেন ঘোষণাঃ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

"বল (হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয় সাল্লাম) হে মানব মন্ডলী। আমি (আল্লাহ কর্তৃক) তোমাদের সকলের জন্য প্রেরিত রাসূল।" *(সূরা আল-আ'রাফঃ ১৫৮)*

মহান আল্লাহ স্বীয় নবীর মাধ্যমে তাঁর এই ধর্মকে পূর্ণ পরিণত করেছেন। এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনের আয়াত এইঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

"তোমাদের (কল্যাণের জন্যে) আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, আমার নে'য়ামতকে তোমাদের প্রতি সুসম্পন্ন করলাম আর ইসলামকে তোমাদের ধর্ম (দ্বীন) হিসেবে মনোনীত করলাম।" *(সূরা আল-মায়েদাঃ ৩)*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের অবধারিত মৃত্যু সম্পকে কুরআনের বজ্র গম্ভীর ঘোষণাঃ

إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون

"(হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তোমার মৃত্যু হবে এবং ওদের কে একদিন মরতে হবে। বস্তুতঃ তোমরা সকলে তোমাদের প্রভূর সন্নিধানে মহাপ্রলয়ের দিনে বাদ বিসম্বাদ করতে থাকবে।" *(সূরা আয্-যুমারঃ ৩১-৩২)*

আর মানুষ যখন মরবে, তখন তাকে অবশ্যই (কিয়ামতের দিন) পুনরুথিত করা হবে। এ বিষয়ে কুরআনে অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন বলা হয়েছেঃ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

"আমি তোমাদের মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছি আর ওর মাধ্যেই তোমাদের প্রত্যাবর্তিত করব এবং তার থেকেই একদিন আবার তোমাদের বের করে আনব।" *(সূরা আত্-তাহাঃ ৫৫)*

এ প্রসংগে কুরআন হতে আরও দলীল প্রমাণঃ

وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا
ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا

"আল্লাহ তোমাদের যমীন হতে উদ্ভূত করেছেন এক বিশেষ প্রণালীতে। এরপর তিনি আবার এতে প্রত্যাবর্তিত করাবেন এবং (এর মধ্য হতে) বের করবেন যথাযথ প্রকারে।" *(সূরা আন্-নূহঃ ১৭-১৮)*

আর পুনরুত্থানের পর প্রত্যেক (জ্বিন ও ইনসান) এর চুলচেলা হিসেব-নিকেশ নেওয়া হবে এবং তাদের আমল অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করা হবে। এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনের ঘোষণাঃ

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى

"আর নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলে অবস্থিত সমস্ত কিছুই একমাত্র আল্লাহরই অধিকারভুক্ত। তিনি দুস্কর্মকারীদের কর্মানুসারে তাদের উপযুক্ত বদলা দিবেন, পক্ষান্তরে পুণ্যফল দিবেন সৎকর্মশীলদের।" *(সূরা আন্-নাজমঃ ৩১ আয়াত)*

আর যারা পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করে, তারা কাফির বা অবিশ্বাসী পবিত্র কুরআন এর প্রমাণঃ

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

"কাফেররা মনে করে যে, তাদের পুনরুত্থিত করা হবে না। (হে রাসূল), তুমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দাওঃ হাঁ, আমার প্রভুর শপথ, নিশ্চয় তাদের উত্থিত করা হবে, তখন তোমদের জ্ঞাত করানো হবে, আর আল্লাহর নিকট একাজ অতি সহজ।" *(সূরা তাগাবুনঃ ৭)*

আল্লাহ পাক, সমস্ত নবীদের প্রেরণ করেছেন শুভ সংবাদ প্রদানার্থে আর (অকল্যাণ হতে) সতর্ক করার জন্য। পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণঃ

رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

"এই রাসূলগনকে আমরা প্রেরণ করেছিলাম সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে যেন রাসূলগনের আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানবকূলের পক্ষে কৈফিয়ত দেওয়ার মতো কিছুই না থাকে।" *(সূরা আন্-নিসা ৪ঃ১৬৫)*

রাসূদের মধ্যে হযরত নূহ 'আলায়হিসসালাম প্রথম আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ এবং তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সংবাদবাহক নাবী ও রাসূলদের মধ্যে সীলমোহর স্বরূপ। হযরত নূহ 'আলায়হিস্ সালাম সর্বপ্রথম রাসূল, এর সমর্থনে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণাঃ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ **"নিশ্চয়ই (হে রাসূল!) আমি ওহী প্রেরণ করেছি তোমার প্রতি যেমন অহী প্রেরণ করেছিলাম হযরত নূহ 'আলায়হিস্সালামের প্রতি ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের প্রতি"**। *(সূরা আন্-নিসা ৪ঃ১৬৩)*

নূহ 'আলায়হিস্সালাম হতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত প্রতিটি জাতির নিকট সংবাদবাহক প্রেরণ করা হয়েছিল' যাতে করে তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাগুতের পূজা থেকে বিরত থাকে।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

"প্রত্যেক উম্মতের নিকট আমি এক একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যেন তোমরা সকলে আল্লাহর ইবাদত করতে থাক ও সকল প্রকার তাগুতের পূজাঁ থেকে বেঁচে থাক।" *(সূরা আন্-নাহলঃ ৩৬)*

আল্লাহ পাক সমস্ত মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাগুতকে (প্রতিমা পূজাসহ গায়রুল্লাহর পূজা ও আনুগত্য বরণ) অস্বীকার করার আদেশ প্রদান করেছেন।

প্রখ্যাত মনীষী ইবনুল কাইয়েম রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি বলেছেনঃ"তাগুত" শব্দটির অর্থ হলঃ সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তি।

এই ব্যক্তিটি উপাস্য ব্যক্তি হতে পারে আবার উপাসনাকারীও হতে পারে, অনুগত ব্যক্তিও হতে পারে আবার যার আনুগত্য করা হয় সেই ব্যক্তিও হতে পারে। 'তাগুত অনেক প্রকারের রয়েছে।

এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটিঃ

যথাঃ-

(১) শয়তান (তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হোক)।

(২) যার উপাসনা করা হয় এবং সে উক্ত উপাসনায় পুরোপুরি সম্মত থাকে।

(৩) যে ব্যক্তি নিজের উপাসনার জন্যে মানুষকে আহ্বান জানায়।

(৪) যে ব্যক্তি অদৃশ্য বা ভবিষ্যৎ জ্ঞান আছে বলে দাবী করে।

(৫) যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনে যার কোন প্রমাণ বা সমর্থন মেলেনা এমন সব আইন-কানূন দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালনা করে।

পবিত্র কুরআন এর প্রমাণ স্বাক্ষ্যঃ

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"ইসলাম ধর্ম বা দ্বীনের মধ্যে কোন প্রকারের জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ নেই, নিশ্চয় হেদায়াত বিভ্রান্তি পরস্পর হতে স্পষ্টরূপে পৃথক হয়ে গেছে। তাই যে ব্যক্তি সমস্ত "তাগুতকে" অমান্য করল এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনল, নিশ্চয় সে এমন একটি সুদৃঢ় বন্ধন বা অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরল যা কোনদিন ছিন্ন হবার নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজ্ঞাতা।" *(সূরা আল-বাকারাঃ ২৫৬)*

এটাই হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ তাৎপর্য।

আর হাদীস রয়েছেঃ

"সব শীর্ষ হচ্ছে ইসলাম এবং ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে নামায, আর এর উচ্চুর শৃংগ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ)। আর আল্লাহই হচ্ছেন প্রত্যেক ব্যাপারে সর্বজ্ঞাতা।

("তিনটি মৌলনীতি যা প্রত্যেক মুসলিমের জানা ওয়াজিব", লেখনীটি ইমাম মোহাম্মদ বিন আঃ ওয়াহ্হাব এর الأصول الثلاثة وأدلتها *পুস্তিকা থেকে সরাসরি সংকলিত)*

আর্‌কানুল ঈমান, বা ঈমানের স্তম্ভ সমূহ (أركان الإيمان)

তা হলো আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর ফিরিশ্‌তাদের, কিতাব সমূহের, রাসূলগণের, ও শেষ দিবসের, এবং ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি ঈমান আনা।

এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **বরং প্রকৃত পক্ষে সৎকাজ হল-যে ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফিরিশ্‌তাদের উপর, এবং সমস্ত নাবী রাসূলগণের উপর**। *(সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-১৭৭)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **সবাই বিশ্বাস রাখে, আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্‌তাদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, এবং তাঁর নাবীদের প্রতি, তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না**। *(সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-১৮৫)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরুপে সৃষ্টি করেছি**। *(সূরা আল-ক্বামার, আয়াত-৪৯)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ ঈমান হলঃ তুমি আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ ও শেষ দিবসের (আখিরাতের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। আরো বিশ্বাস রাখবে ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি। *(মুসলিম শরীফ)*

ঈমানের সংঙ্গাঃ তা হলো মুখে বলা, এবং অন্তরে বিশ্বাস করা, ও বাস্তবে অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে সম্পাদন করা। ঈমান আনুগত্যে বৃদ্ধি হয়, নাফারমানী ও অবাদ্ধতায়হ্রাস পায়।

আল্লাহ ত'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **প্রকৃত মু'মিন তারাই যখন তাদের নিকটে আল্লাহর নাম স্বরণীত হয় তখন তাদের অন্তর কেঁপে উঠে। আর যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াত পঠিত হয় তখন তাদের ঈমান বর্ধিত হয়। তারা তাদের রব্বর উপরেই ভরসা করে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, এবং আমার প্রদত্ত রুযী হতে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। তারাই হল সত্যিকার ঈমানদার।**

(সূরা আল-আনফাল, আয়াত-২-৪)

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **এবং যে আল্লাহর প্রতি, ও তাঁর ফিরিশ্‌তাদের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, এবং রাসূলগণের প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি, বিশ্বাস স্থাপন করেনা তারা চরম পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে**। *(সূরা আন-নিসা, আয়াত-১৩৬)*

ঈমানের শাখাসমূহঃ নবী (সাঃ) বলেনঃ "ঈমানের ৬৩ হতে ৬৯ শাখা আছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম হল কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা। সর্বনিম্ন হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো।" *(মুসলিম)*

ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ফতহুল বারীতে বলেনঃ ইবনে হিব্বান যা বলেছেন তার সারমর্ম হল- এই বিভাগগুলোর শ্রেণীবিভাগ মানুষের অন্তরে আমলে, জিহবার কাজ এবং শারীরিক কাজ।

১) অন্তরের কাজ হল বিশ্বাস ও নিয়ত। এর ২৪টি ভাগ। আল্লাহর উপর ঈমান, এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হল তার জাতের উপর এবং ছিফাতের উপর এবং তৌহিদের উপর ঈমান। কারণ আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ, **"তার মত কেউ নেই। কিন্তু তিনি শোনেন ও দেখেন।"** *(সূরা শুরাঃ ১১)*

তিনি ছাড়া অন্য যা কিছু আছে তাদেরকে তৈরী করা হয়েছে এবং ইবাদত অন্যের জন্য না করা। যেমন দোয়া, সাহায্য অথবা এ জাতীয় অন্যান্য কার্য, ফেরেশতাদের উপর ও আখেরাতের উপর ঈমান আনা। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হল কবরের সওয়াল এবং পুনরুত্থান এবং কবর থেকে উঠান, হিসাব নিকাশ, মীযান, পুলছেরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের আগুন। আল্লাহর সাথে মহব্বত, ভালবাসা এবং শত্রুতা তাঁর কারণেই। নবী (সাঃ)-এর সাথে মহব্বত এবং তাঁর সম্মান করার ধারণা করা। তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হল তাঁর উপর দরূদ পড়া এবং তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা এবং এখলাছ। তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হল রিয়া ও নেফাককে ত্যাগ করা। তওবা করা, ভয় করা, আশা করা, শুকরিয়া আদায় করা, সততা, ছবর, আল্লাহর বিচারে রাজী থাকা এবং তাওয়াক্কুল রহমত বিনয়-নম্রতা। এর মধ্যে প্রবেশ করে বড়দের প্রতি সম্মান, ছোটদের প্রতি ভালবাসা এবং অহংকার ও আত্মগর্ব ত্যাগ করা, হিংসা বিদ্বেষ ত্যাগ করা এবং ত্যাগ করা।

২) জিহবার আমলঃ এর মধ্যে সাতটা ভাগ অন্তর্ভূক্ত। কালেমা শাহাদত পড়া, কুরআন তেলাওয়াত করা, এলেম শেখা এবং অন্যকে শেখানো। দোয়া, যিকির, তার মধ্যে আছে এস্তেগফার করা এবং খারাপ কথা থেকে বিরত থাকা।

৩) শরীরের আমলঃ এর মধ্যে ৩৮টি ভাগ আছে।

(ক) এর মধ্যে কতকগুলো চোখের সাথে জড়িত সেগুলো ১৫টি। এর মধ্যে আছে পবিত্রতা। এর মধ্যে আছে অন্যকে খাবার খাওয়ানো এবং মেহমানদের সম্মান, রোযা রাখা ও নফল ও ফরয। এতেকাফ করা, লাইলাতুল কাদর খোজা, হজ্জ ও ওমরা করা, তাওয়াফও সেই রকম। দ্বীনকে জিন্দা রাখার জন্য অন্যত্র হিজরত করা, তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত শির্কের দেশ থেকে হিজরত করা। নজরকে পূর্ণ করা, কসম পূর্ণ করা, এর মধ্যে সত্যিকারভাবে আল্লাহর নামে কসম খাওয়া প্রয়োজন। কাফ্ফারা আদায় করা- যেমন প্রতিজ্ঞা পালনের, রোজার মাসে দিনের বেলা সহবাসের ইত্যাদি।

(খ) এর মধ্যে যা অনুসরণের সাথে জড়িত। সেগুলো হল ছয়টি। বিবাহের দ্বারা নিজের ইজ্জত রক্ষা করা এবং পরিবারের হক আদায় করা, বাপ মায়ের খেদমত করা। এর মধ্যে তাদের কষ্ট না দেয়া এবং বাচ্চাদের ইসলাম মত প্রতিপালন করা। আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখা, নেতাদের মান্য করা-পাপের কাজ ছাড়া অন্যত্র, দাসদের সাথে সদয় ব্যবহার করা।

(গ) অন্য কতকগুলো যা সাধারণভাবে সকলের সাথে জড়িতঃ এর মধ্যে ১৭টি ভাগ আছেন। ন্যায় বিচারের সাথে আমীরের দায়িত্ব পালন করা, মুসলমানদের দলের সাথে থাকা, আমিরের কথা মান্য করা, যদি না কোন পাপের হুকুম দেয়। মানুষের মধ্যে মিলমিশ ঘটান, তার মধ্যে খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করা, বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করা, নেক কার্যে ও তাকওয়ার কার্যে সহযোগিতা করা। এর মধ্যে নেকের প্রতি আদেশ ও অন্যায় হতে বিরত হওয়া অন্তর্ভূক্ত। হজ্জ কায়েম করা, জিহাদ করা, তার মধ্যে যুদ্ধের জন্য তৈরী হওয়া এবং আমানত আদায় করা, তার মধ্যে গনিমতের ১/৫ বাইতুল মালে দেয়া। ফরজ আদায় করা, প্রতিবেশীকে সম্মান করা, ব্যবসা বাণিজ্য ভালভাবে করা, তার মধ্যে হালাল উপায়ে মাল কামাই করা এবং হক দেখে দেখে খরচ করা, তার মধ্যে আসে বাহুল্য খরচ না করা, সালামের উত্তর দেয়া ও হাঁচির জবাব দেয়া, মানুষদের কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, খেল তামাশা হতে বিরত থাকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করা।

এ হাদীস এটাই দেখাচ্ছে যে, তাওহীদ হচ্ছে ঈমানের সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম স্তর। তাই দা'য়িদের উপর দায়িত্ব হচ্ছে সে সর্বোচ্চ দিয়ে শুরু করে তারপর নিচের দিকে নামবে। প্রথমে ভিত্তি তারপর দেয়াল তারপর যেটা যত দরকারী। কারণ, তাওহীদই আরব ও আজমকে এক করেছে এবং ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেছে তাওহীদের রাষ্ট্র।

ঈমান বাড়ে এবং কমেঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আর যখন তাদের কাছে তাঁর (আল্লাহর) আয়াত পঠিত হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়।** *(সূরা আল-আনফাল, আয়াত-২)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বেড়ে যায়।** *(সূরা আল-ফাতহ্-আয়াত, ৪)*

সুতরাং অনুগত্য ও নৈকট্যশীলতা যত বৃদ্ধি পায়, ঈমানও ততো বৃদ্ধি পায়। আর অনুগত্য ও নৈকট্যশীলতা যত হ্রাস পায়, ঈমানও ততো হ্রাস পায়। যেমন-অবাধ্যতা ও নাফরমানী ঈমানে কু-প্রভাব ফেলে, যদি তা (নাফরমানী) বড় ধরণের শির্ক বা কোন কুফুরী কাজ হয় তাহলে আসল ঈমানকে ধ্বংস করে দিবে। আর যদি ছোট ধরণের কোন নাফরমানী হয় তাহলে ঈমানের পরিপূর্ণতায় ঘাটতি আসে এবং তা কুলষিত ও দুর্বল হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন।** *(সূরা আন, নিসা, আয়াত-৪৮)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **তারা কসম খেয়ে বলে যে আমরা বলি নাই। অথচ তারা কুফরী বাক্য বলেছে এবং ইসলাম দ্বীন গ্রহণ করার পর কুফুরী করেছে।** *(সুরা আত্তাওবাহ্-আয়াত, ৭৪)*

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ ব্যাভিচারী পরিপূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়না, চোর পরিপূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় চুরি করেনা, এবং মদ্যপায়ী পরিপূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় মদ পান করেনা, (অর্থাৎ উক্ত সময়ে তাদের ঈমান অপূর্ণ ও দুর্বল হয়ে যায়)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

ঈমানের ছয়টি রোকন এবং তার বিস্তারিত আলোচনা

প্রথম রুক্ন বা স্তম্ভঃ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান (الركـ الأول: اميما بـ با لـ عزوجل)

(১) ঈমানের বাস্তবায়নঃ

প্রথমতঃ বিশ্বাস পোষণ করা যে, এ বিশ্ব জগতের একজন রব রয়েছেন। যিনি স্বীয় সৃষ্টি রাজত্ব, পরিচালনা ও কর্ম ব্যাবস্থাপনায় রুযীদাতা, জীবন দাতা, মৃত্যুদাতা, ক্ষমতাশীল, এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনকারী হিসেবে এক ও অদিত্বীয়। তিনি ব্যতীত কোন রব নেই।

তিনি একাই যা ইচ্ছা তা করেন, এবং যা চান তার হুকুম করেন। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, আবার যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। তাঁরই হাতে আসমান জমিনের রাজত্ব। তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল ও জ্ঞাত রয়েছেন। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

সকল আদেশ তাঁরই এবং সর্ব প্রকার কল্যাণ তাঁরই হাতে, তাঁর কর্ম সমূহে কোন শরীক নেই। তাঁর কর্মে তাঁকে কেহ পরাজয় কারী নেই। বরং মানব জাতি, জ্বীন জাতি ও ফিরিশ্তা মন্ডলী সহ সকল সৃষ্টি জীব তাঁরই দাস বা বান্দা । তারা তাঁর রাজত্ব, শক্তি ও ইচ্ছা হতে বের হতে পারেন না।

তাঁর কর্ম সমূহ অগনিত কোন সংখ্যাই তা শিমাবদ্ধ করতে পারেনা। এ সকল বৈশিষ্টের তিনিই একমাত্র অধিকারী, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি ব্যতীত কেউ এ (বৈশিষ্ট্য) সমূহের অধিকার রাখেনা। এসব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সহিত সম্পর্কিত ও সাব্যস্ত করা হারাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদাত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে।** *(সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-২১-২২)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **বলুন হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও, এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।** *(সূরা আলি-ইমরান, আয়াত-২৬)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **আর পৃথিবীতে বিচরণশীল মাত্রই সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন, তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সব কিছুই এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে রয়েছে।** *(সূরা হুদ, আয়াত-৬)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **জেনে রেখ তাঁরই সৃষ্টি ও তাঁরই বিধান, আল্লাহ বরকতময় যিনি বিশ্ব জগতের রবব-প্রতিপালক।** *(সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত- ৫৪)*

দ্বিতীয়তঃ এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সুন্দর নাম সমূহ ও পুত-পবিত্র পূর্ণ গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয়। যার কিছু বান্দাদের জন্য তাঁর পবিত্র গ্রন্থ ও শেষ নাবী ও নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্ব উত্তম নাম। তাই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃত কর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।** *(সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত-১৮০)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি ইহা সংরক্ষন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ বেজোড়, তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

আর এই আকীদাহ- বিশ্বাস দু'টি বড় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ।

প্রথমঃ নিশ্চয় আল্লাহ্র সুন্দর নাম ও মহান গুণ রয়েছে, যা পরিপূর্ণ গুনাবলীর প্রমাণ করে, তাতে কোন প্রকারের অপরিপূর্ণতা ও ত্রুটি নেই। সৃষ্টিজীবের কোন কিছুই তার মত ও তার অংশীদার হতে পারেনা।

الحيّ (আল-হাইয়্যু) তাঁর (আল্লাহর) নাম সমূহের একটি নাম। الحياة (আল-হায়াত) তাঁর সিফাত বা গুণ যা মহান আল্লাহর জন্য সমুচিত সঠিক পন্থায় সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। আর এ জীবন এক চিরস্থায়ী পরিপূর্ণ জীবন। তাতে জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি সর্ব প্রকার পূর্ণতার সমাবেশ রয়েছে। আল্লাহ চিরঞ্জীব তাঁর লয় ও ক্ষয় নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আল্লাহ্ ছাড়া কোন সঠিক উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারেনা এবং নিদ্রাও নয়।** *(সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-২৫৫)*

দ্বিতীয়ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল দোষ ও ত্রুটি যুক্ত গুণ হতে সম্পূর্ণভাবে পুত-পবিত্র যেমন-নিদ্রা অপারগতা, মূর্খতা ও জুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি।

তিনি আরো পুত ও পবিত্র সৃষ্টিজীবের সাথে সাদৃশ্য রাখা হতে। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর (আল্লাহর) জন্য যে সকল গুণ অস্বীকার করেছেন, তা অস্বীকার করা অপরিহার্য।

আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল গুণকে নিজের জন্য অস্বীকার করেছেন সে গুণের বিপরীত গুণে পরিপূর্ণ ভাবে গুনান্বিত, এই বিশ্বাস রাখা।

সুতরাং যখন আল্লাহকে তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে মুক্ত করব, তখন তন্দ্রার বিপরীত চির জাগ্রত এবং নিদ্রার বিপরীত চিরঞ্জীব পরিপূর্ণ দু'টি গুণকে সাব্যস্ত করা হবে।

অনুরুপ ভাবে আল্লাহকে প্রতিটি অপরিপূর্ণ গুণ থেকে মুক্ত করলে সাথে সাথে তার বিপরীত পরিপূর্ণ গুণ সাব্যস্ত হয়ে যায়। তিনিই একমাত্র পরিপূর্ণ আর তিনি ব্যতীত সবই অপরিপূর্ণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **(সৃষ্টিজীবের) কোন কিছুই তাঁর অনুরুপ নয়। আর তিনি সব শুনেন এবং সব দেখেন।** *(সূরা আশ্শুরা, আয়াত-১১)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **আর আপনার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।** *(সূরা ফুস্সিলাত, আয়াত-৪৬)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **আকাশ ও পৃথিবীতে কোন কিছুই আল্লাহকে অপারগ করতে পারে না।** *(সূরা ফাতের, আয়াত-৪৪)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **আর আপনার প্রতিপালক বিস্মৃত হওয়ার নন।** *(সূরা মারিইয়াম, আয়াত- ৬৪)*

আল্লাহর নাম, তাঁর গুণ ও কর্ম সমূহের প্রতি ঈমান আনা, আল্লাহ্ ও তাঁর ইবাদাতকে জানার একমাত্র পথ।

কারণ আল্লাহ্ তা'আলা এই পার্থিব জগতে তাঁর সরাসরি দর্শনকে সৃষ্টিজীব হতে গোপন রেখেছেন, এবং তাদের জন্য এমন জ্ঞানের পথ খুলে দিয়েছেন, যার দ্বারা তারা তাদের রব্বইলাহ্-মা'বুদকে জানবে এবং সঠিক জ্ঞান অনুযায়ী তাঁর ইবাদাত করবে।

সুতরাং বান্দা তার গুনময় মা'বুদের ইবাদাত করে, মুআত্তিল (আল্লাহর নাম ও গুনাবলী অধিকারী) অনস্তিত্বের ইবাদাত করে, মুমাচ্ছিল (মশরিক বা সাদৃশ্যবাদী) প্রতিমার ইবাদাত করে। আর মুসলিম ব্যক্তি এক ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহর ইবাদাত করে, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি, এবং তাঁর সমকক্ষ ও কেউ নয়।

আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত বিষয় গুলোর লক্ষ্য রাখা উচিতঃ

(১) সংযোজন ও বিয়োজন ব্যাতীত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সকল সুন্দর নাম সমূহ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত রয়েছে তার উপর ঈমান আনা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি এক মাত্র সব কিছুর মালিক, যাবতীয় দোষ-ক্রটি হতে পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, পর্যবেক্ষক, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্মশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র।** *(সূরা আল-হাশর, আয়াত-২৩)*

হাদীসে এসেছেঃ

অর্থঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, কারণ সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। তুমি ছাড়া কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই। তুমি (মান্নান) অনুগ্রহকারী, আসমান জমিনের সৃষ্টিকারী। হে সম্মানিত ও মর্যাদাবান! হে চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক বাহক!

অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা কি জান? সে কিসের (অসিলায়) আল্লাহকে আহ্বান করেছে? তাঁরা বললেনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্লেনঃ শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় সে আল্লাহকে তাঁর এমন ইসমে আজমের (মহান নামের) অসিলায় আহ্বান করেছে, যার দ্বারা আল্লাহকে আহ্বান করলে আল্লাহ্ আহ্বানে সাড়া দেন, এবং আবেদন করলে তিনি দান করেন। *(ইমাম আবু দাউদ ও আহ্‌মাদ হাদীসটি বর্ণনা করেন)*

(২) আল্লাহ্ নিজেই নিজের নাম রেখেছেন। সৃষ্টি জীবের কেউ তার নাম রাখে নাই। এবং তিনি নিজেই এই সকল নাম দ্বারা স্বীয় প্রশংসা করেছেন। ইহা সৃজিত নতুন নয়। ইহার উপর ঈমান আনা।

(৩) আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ এমন পরিপূর্ণ অর্থবোধক যাতে কোন প্রকারের কোন ক্রটি নেই। তাই এ নাম সমূহের প্রতি ঈমান আনা যেমন ওয়াজিব, তেমনি এর অর্থের উপর ঈমান আনাও ওয়াজিব।

(৪) এ সমস্ত নামের অর্থ অস্বীকার ও অপব্যাক্ষা না করে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা ওয়াজিব।

(৫) প্রতিটি নাম হতে সাব্যস্ত বিধি-বিধান ও ফলাফল এবং এর প্রভাবের প্রতি ঈমান আনা।

এ পাঁচটি বিষয়কে আরো স্পষ্ট করার জন্য আমরা আল্লাহর নাম السميع আস্‌সামী' (শ্রবণ কারী) দ্বারা উদাহরণ পেশ করবো।

السميع এতে নিম্নে বর্ণিত বিষয় গুলো লক্ষ্য রাখা প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

(ক) السميع (আস্‌সামী') আল্লাহর নাম সমূহের একটি নাম। এ কথার প্রতি ঈমান আনা। কারণ এর বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে এসেছে।

(খ) আরো ঈমান আনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই নিজেকে এ নামে নাম করণ করেছেন, এ নামে কথা বলেন এবং তা কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন।

(গ) السميع (আস্‌সামী') আস্‌সামউ বা (শোনা) অর্থকে শামিল করে। যা আল্লাহর গুণ সমূহের একটি গুণ।

(ঘ) السميع (আস্‌সামীয়) নাম হতে উদ্ভূত "শ্রবণ করা বা শোনা" গুনটি অস্বীকার ও অপব্যাখা না করে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা ওয়াজিব।

(ঙ) নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু শুনেন এবং তাঁর শুনা সকল ধনিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, এই বিশ্বাস রাখা। এ ঈমানের ফলাফল ও প্রভাব হলো আল্লাহর পর্যবেক্ষণ ও তাঁর ভয়-ভীতি আবশ্যক হয়ে যায়, এবং এ দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহর কাছে কোন কিছু গোপন থাকেনা।

এমনি ভাবে আল্লাহর গুণ العَلِي (আল-আলী) সাব্যস্ত করার সময় নিম্নের বিষয় গুলো লক্ষ্য রাখা উচিতঃ

(১) কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সকল সিফাত বা গুণ কোন প্রকার অপব্যাখা ও সঠিক অর্থ ত্যাগ না করে প্রকৃতার্থে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা।

(২) দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় দোষ অসম্পূর্ণ গুণ হতে মুক্ত, বরং তিনি সু-পরিপূর্ণ গুণে গুনান্বিত।

(৩) আল্লাহর গুণাবলীর সাথে সৃষ্টিজীবের গুণ সমূহের সাদৃশ্য না করা। কারণ আল্লাহর অনুরুপ কোন কিছু নেই। না তাঁর গুণে এবং না তাঁর কর্মে।

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ (সৃষ্টি জীবের) কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। আর তিনি সব শুনেন, এবং সব দেখেন। *(সূরা আশ্‌শুরা, আয়াত-১১)*

(৪) এসব গুণের রূপ ও ধরণ-গঠন জানার কোন প্রকার আশা আকাঙ্খা না করা। কেননা আল্লাহ গুণের রূপ ও ধরণ-গঠন তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানেনা। ফলে সৃষ্টিজীবের তা জানার কোন পথ নেই।

(৫) এ সব গুণাবলী হতে সাব্যস্ত বিধি-বিধান এবং এর প্রভাব ও দাবীর প্রতি ঈমান আনা। সুতরাং প্রতিটি গুণের সাথে ইবাদাত সম্পৃক্ত।

এখন পাঁচটি বিষয় আরো স্পষ্ট হওয়ার জন্য সিফাতুল ইস্‌তিওয়া ((الاستواء) এর উদাহরণ পেশ করব।

আল-ইস্‌তিওয়া ((الاستواء)গুণটি সাব্যস্ত করতে নিম্নে বর্ণিত বিষয় গুলো লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য।

(১) আল-ইস্‌তিওয়া (আল্লাহ্‌ তা'আলা স্ব-সত্তায় আরশের উপরে রয়েছেন) এ গুণটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা এবং এর প্রতি ঈমান আনা, কেননা ইহা কুরআন ও হাদীসে একাধিকবার প্রমানিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ পরম দয়াময় (আল্লাহ্‌ তা'আলা স্ব-সত্তায়) আরশের উপর রয়েছেন। *(সূরা ত্বাহা, আয়াত-৫)*

(২) আল-ইস্‌তিওয়া ((الاستواء) গুণটিকে যথাযোগ্য ও পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। আর এর প্রকৃত অর্থ হলোঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আরশের উপরে বিরাজমান রয়েছেন, যেমন তাঁর মহত্ত্বের ও শ্রেষ্টত্বের শোভা পায়।

এর অর্থ আল্লাহ তাঁর আরশের উপরে সমাসীন প্রকৃত পক্ষে। তাঁর মর্যাদার জন্য যে ভাবে শোভা পায়।

(৩) আল্লাহ তা'আলার আরশের উপর বিরাজমান থাকাকে সৃষ্টি জীবের আসন গ্রহণের সাথে উপমা না দেওয়া। কেননা আল্লাহ আরশের মুখাপেক্ষী নন। তিনি আরশের মুহ্‌তাজ নন। কিন্তু সৃষ্টি জীবের সমাসীনতা সম্পূর্ণ সতন্ত্র, সৃষ্টিজীব এর মুহ্‌তাজ বা মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **(সৃষ্টি জীবের) কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। আর তিনি সব শুনেন, এবং সব দেখেন।** *(সূরা আশ্‌শুরা, আয়াত-১১)*

(৪) আল্লাহ তা'আলার আরশের উপর বিরাজমানের ধরণ ও পদ্ধতি নিয়ে তর্কে লিপ্ত না হওয়া। কেননা এটা গাইবী (অদৃশ্যের) বিষয়, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানেনা।

(৫) এ গুণটি হতে সাব্যস্ত বিধি-বিধান ও ফলাফল এবং এর প্রভাবের প্রতি ঈমান আনা, আর তা হলো আল্লাহ্‌ তা'আলার যথাযোগ্য মহত্ত ও শ্রেষ্টত্ব সাব্যস্ত করা, যা সমগ্র সৃষ্টি হতে তাঁর উর্দ্ধে ও সুউচ্চে (আরশের উপর) অবস্থানই প্রমাণ করে।

আরো প্রমাণ করে সকল আত্মার তাঁরই দিকে ঊর্ধমূখী হওয়া, যেমন সিজ্‌দাকারী সিজ্‌দায় বলেঃ (سبحان ربي الأعلى) আমি আমার রব্বের পবিত্রতা বর্ণনা করি যিনি সু-উচ্চ ও ঊর্ধে।

তৃতীয়তঃ এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাই একমাত্র সত্যিকার মা'বুদ বা উপাস্য এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদাত পাওয়ার অধিকার রাখেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাগুত (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করা অর্থাৎ শির্‌ক করা) থেকে নিরাপদ ও বিরত থাকবে।** *(সূরা আন-নহল, আয়াত-৩৬)*

আর প্রত্যেক রাসূলই স্বীয় উম্মাতকে বলতেনঃ

অর্থঃ **তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন সত্য উপাস্য নেই।** *(সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত-৫৯)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **আর তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠ ভাবে (শির্‌কমুক্ত থেকে) একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে** । *(সূরা আল-বাইয়্যেনাহ-আয়াত- ৫)*

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে,

অর্থঃ তুমি কি জান? বান্দার উপর আল্লাহর হক্ব বা অধিকার কি? আর আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার কি?

আমি (মু'য়াজ রাঃ) বল্লাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত । রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ বান্দার উপর আল্লাহর হক্ব হলো- তাঁর (আল্লাহর) ইবাদাত করা, এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার না করা । আল্লাহর উপর বান্দার হক্ব হলো- যারা তাওহীদের উপর থেকে শির্‌ক মুক্ত থাকে তাদেরকে শাস্তি না দেওয়া ।

সত্য মা'বুদঃ তিনিই সত্য মা'বুদ, অন্তর যার ইবাদাত করে, যার ভালবাসায় অন্তর ভরে যায়, অন্যের ভালবাসার প্রয়োজন পড়েনা । যার আশা আকাংখাই অন্তরের জন্য যথেষ্ট অন্যের কাছে আশা ও আকাংখার প্রয়োজন হয়না । যার নিকট চাওয়া পাওয়া, সাহায্য প্রার্থনা ও তাঁকে ভয়-ভীতি করাই অন্তরের জন্য যথেষ্ট । অন্য কারো কাছে চাওয়া পাওয়ার প্রার্থনা করা, কাউকে ভয়-ভীতি করার প্রয়োজন নেই ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **এটা একারণেও যে, আল্লাহই সত্যঃ আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার উচ্চে, মহান** । *(সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত- ৬২)*

আর ইহাই বান্দার কর্মের দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষনা করা । ইহাই তাওহীদে উলুহীয়্যাহ্ ।

(২) ইবাদাতের সংজ্ঞাঃ

ইহা ঐ সব আকীদা-বিশ্বাস, অন্তর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের কর্ম যা আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন ও পছন্দ করেন । ইহা ছাড়া কোন কিছু সম্পাদন করা বা বর্জন করা যা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করায় তাও ইবাদাত ।

অনুরুপ ভাবে কুরআন ও হাদীসে বিধিবদ্ধ প্রতিটি কর্ম ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত ।

ইবাদাত বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে ।

আন্তরিক ইবাদাতঃ যেমন- ঈমানের ছয়টি রুক্ন, ভয়, আশা, ভরসা, আগ্রহ, ও ভীতি ইত্যাদি ।

প্রকাশ্য ইবাদাতঃ যেমন- নামায, যাকাত, রোযা ও হাজ্জ ।

ইবাদাত ততক্ষনণ পর্যন্ত গ্রহণ যোগ্য হবে না যতক্ষন না তা দু'টি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ।

প্রথমঃ সকল ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করা এবং তার সাথে শির্‌ক না করা । আর ইহাই (شهادة أن لا إله إلا الله) "আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই" এ শাক্ষ্য প্রদানের অর্থ ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **জেনে রাখ, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাত আল্লাহরই নিমিত্তে । যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদাত এজন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয় । নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা করে দেবেন । আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফিরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না** । *(সূরা আয্‌যুমার, আয়াত-২-৩)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **আর তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশকরা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্টভাবে (শির্‌কমুক্ত থেকে) একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে** । *(সূরা আল-বাইয়্যেনাহ-আয়াত- ৫)*

দ্বিতীয়ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে, শরীয়াত নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ করা ।

এর অর্থঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে কাজ যে ভাবে করেছেন সে কাজ সেই নিয়মে করা, কোন প্রকার কম বেশী না করা ।

আর ইহাই (شهادة أن محمدًا رسول الله) "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল" এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভাল বাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন, আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। *(সূরা আলি-ইমরান, আয়াত-৩১)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, এবং যা থেকে বারণ করেছেন তা হতে বিরত থাক**। *(সূরা আল-হাশর, আয়াত-৭)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **অতএব তোমার পালন কর্তার কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষন পযর্ন্ত তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নিবে**। *(সূরা আন্-নিসা, আয়াত-৬৫)*

দু'টি বিষয় ছাড়া ইবাদাত (দাসত্ব) পরিপূর্ণতা লাভ করেনাঃ

প্রথমঃ আল্লাহকে পূর্ণ ভালবাসা, অর্থাৎঃ আল্লাহর ভালবাসা ও আল্লাহ যা ভালবাসেন তাঁর ভালবাসাকে অন্য সকল বস্তুর ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেওয়া।

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহর নিকট পূর্ণ বিনয়-নম্রতা ও আনুগত্য প্রকাশ করা। অর্থাৎঃ বান্দা আল্লাহ তা'আলার আদেশ সমূহ পালনের ও নিষেধাজ্ঞা হতে বেঁচে থাকার মাধ্যমে বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করবে।

সুতরাং পূর্ণ বশ্যতা, বিনয়-নম্রতা, আশা-আকাঙ্খা ও ভয়-ভীতির সাথে পূর্ণ ভালবাসাকে ইবাদাত বলা হয়। এর মাধ্যমেই বান্দার ইবাদাত স্বীয় রব সৃষ্টি কর্তার জন্য বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহর জন্য ইবাদাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

অতএব বান্দার ফরজ বিধান পালন করার মাধ্যমে তাঁর (আল্লাহর) নৈকট্য অর্জন করাকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।

বান্দার নফল ইবাদাত যতই বৃদ্ধি পাবে ততই তাঁর নৈকট্য ও মর্যাদা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পাবে। আর আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুনায় ইহা জান্নাতে প্রবেশ করার উপায় হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা-অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না**। *(সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত-৫৫)*

(৩) আল্লাহর তাওহীদ (একতাত্ববাদ) এর দলীল ও প্রমাণ পঞ্জী

আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের স্বপক্ষে অজশ্র সাক্ষ্য ও প্রমাণ পঞ্জী রয়েছে। যারা এ প্রমাণ পঞ্জীকে নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করবে, তাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস আল্লাহ তা'আলার কর্ম, নাম ও গুনাবলী এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে একত্ববাদকে আরো বৃদ্ধি ও দৃঢ় করবে।

নিম্নের সে সকল সাক্ষ্য ও প্রমাণ-পঞ্জীর কিছু নমুনা পেশ করা হলোঃ

(ক) এ পৃথিবী সৃষ্টির বিশালতা, সূক্ষ্ম কারীগরী, রকমারী সৃষ্টি এবং এসব পরিচালনার সুদক্ষ নিয়ম-নীতি।

যে ব্যক্তি এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সর্ম্পকে তার একিন-বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে।

তেমনি যে নভোমন্ডল-ভূমন্ডল, সূর্য-চন্দ্র, মানুষ-পশু, উদ্ভিদ-লতাপাতা ও জড় পদার্থ সর্ম্পকে চিন্তা করবে, সে নিশ্চিত ভাবে জানতে পারবে যে, এসবের এক জন স্রষ্টা রয়েছেন, যিনি স্বীয় নামসমূহ, গুনাবলী ও উপাস্য পরিপূর্ণ আর ইহাই প্রমাণ করে যে, তিনিই একমাত্র যাবতীয় ইবাদাত পাওয়ার প্রকৃত অধিকার রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **"আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা পথ প্রাপ্ত হয়। আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি, অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।"** *(সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত-৩১-৩২-৩৩)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **তাঁর (আল্লাহর) আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র! নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।** *(সূরা আর-রূম, আয়াত-২২)*

(খ) আল্লাহ তা'আলা রাসূলদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহিমুস সালাম) যে শরীয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন নিদর্শন ও অকাট্য প্রমাণাদি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এসব প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি একমাত্র যাবতীয় ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য।

আর আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিজীবের জন্য যে সব নিয়ম-বিধান প্রনয়ণ করেছে, তা প্রমাণ করে যে, এসব সেই বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় হতে এসেছে সৃষ্টিজীবের যাবতীয় কল্যাণ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও মিযান বা মানদন্ড যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।** *(সূরা আল-হাদীদ, আয়াত-২৫)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **বলুনঃ যদি মানব ও জ্বীন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য এক হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।** *(সূরা আল-ইসরা, আয়াত-৮৮)*

(গ) ফিৎরাত (সৃষ্টিগত স্বভাব বা প্রকৃতি) যার উপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের আত্মাসমূহকে সৃষ্টি করেছেন, তা আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে। ফিৎরাত অন্তরের স্থায়ী জিনিস, তাই যখন কোন মানুষ কষ্ট পায় তখন তা অনুভব করতে পারে, এবং আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। মানুষ যদি সন্দেহ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ মুক্ত হয় যা ফিৎরাতকে পরির্বতন করে দেয় তবে সে অন্তরস্থল থেকে নাম, গুণ, ও ইবাদাত প্রাপ্য, একমাত্র আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দিবে এবং আল্লাহ তা'আলা রাসূলদেরকে যে শরীয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছে তাতে আত্মসম্পর্ন করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **তুমি একনিষ্ঠ ভবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক দ্বীন। কিন্ত অধিকাংশ মানুষ জানেনা। সকলেই তাঁর অভিমুখী হও এবং ভয় কর, নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।** *(সূরা আর-রূম, আয়াত-৩০-৩১)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ প্রত্যেক শিশুই ফিৎরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান, অথবা অগ্নী পূজক বানায়। যেমন নিখুঁত জানোয়ার নিখুঁত বাঁচ্চা জন্ম দেয়। তাতে কোন প্রকার ত্রুটি থাকেনা।

অতঃপর এই আয়াত পাঠ করলেনঃ

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

অর্থঃ **এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন।** *(সূরা আর-রূম, আয়াত-৩০)*

দ্বিতীয় রুক্নঃ ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান (الركن الثاني: الإيمان بالملائكة)

(১) ফিরিশ্তাদের পরিচয়

ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমানঃ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনেক ফিরিশ্তা রয়েছেন। তিনি তাদেরকে নূর (জ্যোতি) হতে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিগতভাবে তারা আল্লাহর অনুগত। তারা কখনও আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হননা, বরং যা আদিষ্ট হন তা পালন করেন। তারা দিবা রাত্রি আল্লাহর তাসবীহ্ (পবিত্রতা) বর্ণনায় রত, কখনও ক্লান্ত হননা। তাদের সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানেনা। আর আল্লাহ তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার (কর্মের) দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **"বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, এবং ফিরিশ্‌তাদের উপর ।"** *(সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-১৭৭)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **সকলেই বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্‌তাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থ সমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ।** *(সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-২৮৫)*

জিব্‌রাঈল (আলাইহিস্‌ সালাম) এর প্রসিদ্ধ হাদীসে এসেছেঃ যখন তিনি (জিব্‌রাঈল) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-ঈমান, ইসলাম, ও ইহসান, সম্পর্কে ।

তিনি (জিব্‌রাঈল) বলেনঃ আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবগত করুণ ।

তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ ঈমান হলঃ আল্লাহ তাঁর ফিরিশ্‌তাদের, তাঁর কিতাব সমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা, এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনা ।

ইসলাম ধর্মে ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমানের স্থান ও তার বিধানঃ

ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমান আনা, ঈমানের ছয়টি রুক্‌নের দ্বিতীয় রুক্‌ন বা স্তম্ভ । ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কোন ব্যক্তির ঈমান সঠিক ও গ্রহণ যোগ্য হবেনা । সম্মানিত ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব হওয়ার উপর সকল মুসলমান একমত । যারা সকল ফিরিশ্‌তাদের অথবা তাঁদের আংশিকের অস্তিত্বকে যাদের কথা আল্লাহ্‌ উল্লেখ করেছেন, অস্বীকার করবে তারা কুফুরী করলো, এবং কুরআন, হাদীস ও ইজমার বিরোধিতা করলো ।

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **যে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে, তাঁর ফিরিশ্‌তাদেরকে, তাঁর কিতাব সমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে ও কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করবে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূরে গিয়ে পড়বে** । *(সূরা আন-নিসা, আয়াত-১৩৬)*

(২) ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমান আনার পদ্ধতিঃ

ফিরিশ্‌তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত ভাবে ঈমান আনা । সংক্ষিপ্ত ঈমান নিন্মের বিষয় গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে ।

প্রথমঃ তাদের অস্তিত্বের স্বীকার করা, তারা আল্লাহর সৃষ্টি জীব, আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন । তাদের অস্তিত্ব প্রকৃত, তাদেরকে আমাদের না দেখা, তাদের অনস্তিত্বের অর্থ নয়, কারণ পৃথিবীতে অনেক সুক্ষ্ম সৃষ্টিজীব রয়েছে, তাদেরকে আমরা দেখতে পাইনা, অথচ তারা প্রকৃত পক্ষ্যে রয়েছে ।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালামকে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন । কতিপয় সাহাবী কিছু ফিরিশ্‌তাদেরকে মানুষের আকৃতিতে দেখেছেন ।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল তার মুসনাদে আব্দুল্লাহ্‌ বিন মাসউদ হতে বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেনঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্‌রাঈল আলাইহিস্‌ সালাম কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে ছয় শত পাখা বিশিষ্ট অবস্থায় দেখেছেন । প্রত্যেক পাখা একেক প্রান্ত ঢেকে রেখেছে ।

জিব্‌রাঈলের (আলাইহিস সালাম) প্রসিদ্ধ হাদীস যা ইমাম মুসলিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, তাতে প্রমাণিত হয় যে, জিব্‌রাঈল (আলাইহিস্‌ সালাম) মানুষের আকৃতীতে ধপধপে সাদা পোষাকে, মিশ মিশ কালো চুলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসেছিলেন । তাঁর উপর ভ্রমণের কোন নিদর্শন ছিলনা । সাহাবাদের কেহ তাঁকে চিনতে পারে নাই ।

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহ্‌ তাদেরকে যে সম্মান দিয়েছেন, তাদেরকে সেই সম্মান দেওয়া । তারা আল্লাহর বান্দা বা দাস । আল্লাহ্‌ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন, তাদের মর্যাদাকে উঁচু করেছেন এবং তাদেরকে নৈকট্য দান করেছেন । তাদের কেহ্‌ কেহ্‌ আল্লাহর ওয়াহী ইত্যাদির রাসূল বা দূত । আল্লাহ্‌ তাদেরকে যতটুকু ক্ষমতার মালিক করেছেন, তারা ততটুকু ক্ষমতারই মালিক । তার পরও তারা তাদের নিজেদের ও অন্যদের লাভ-ক্ষতির মালিক নয় । এই জন্য আল্লাহ্‌ ছাড়া তাদেরকে এ রুবুবীয়াতের বা রব্বত্তের গুনে গুনান্বিত করা তো দূরের কথা, যেমন- নাসারারা রূহুল কুদ্দুস (জিব্‌রাঈল আলাইহিস্‌ সালাম) সম্পর্কে ধারণা করেছে বরং তাদের জন্যে ইবাদাতের কোন অংশ পালন করা বৈধ নয় ।

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ তারা বললঃ **দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছে। তাঁর জন্য কখনও ইহা যোগ্য নয়। বরং তাঁরা (ফিরিশ্‌তারা) তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারেনা এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে।** *(সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত-২৬ ও ২৭)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **তারা আল্লাহ্ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেনা এবং যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে।)** *সূরা আত-তাহরীম, আয়াত-৬)*

প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর এতটুকু ঈমান আনা ওয়াজেব। তাদের উপর অপরিহার্য যে, ইহা জানবে ও বিশ্বাস করবে। কেননা এ বিষয়ে অজ্ঞতা কোন গ্রহণ যোগ্য ওযর বা কারণ নয়।

ফিরিশ্‌তাদের প্রতি বিস্তারিত ঈমান আনা নিম্নের বর্ণিত বিষয় গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রথমতঃ ফিরিশ্‌তাদের সৃষ্টির মূল উৎস

আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদের কে নূর হতে সৃষ্টি করেছেন, যেমন-জ্বিন জাতিকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন, এবং আদম সন্তানদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের সৃষ্টি হলো আদম আলাইহিস্ সালাম এর সৃষ্টির পূর্বে।

হাদীসে এসেছেঃ

অর্থঃ ফিরিশ্‌তারা নূর হতে, জিনেরা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ হতে, আর আদম আলাইহিস্ সালাম মাটি হতে সৃষ্ট। *(মুসলিম শরীফ)*

দ্বিতীয়তঃ ফিরিশ্‌তাদের সংখ্যা

ফিরিশ্‌তারা সৃষ্ট জীব, তাদের আধিক্যের জন্যে আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্‌লা ছাড়া তাদের সংখ্যা কেহ জানেনা। আকাশে প্রতি চার আংগুল পরিমাণ জায়গায় একেক জন ফিরিশ্‌তা সিজ্‌দারত অথবা দন্ডায়মান অবস্থায় রয়েছেন। সপ্তম আকাশে আল-বায়তুল মা'মুরে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা প্রত্যহ প্রবেশ করছেন। তাদের আধিক্যতার জন্যে দ্বিতীয় বার ফিরে আসার সুযোগ পাবেন না। কিয়ামত দিবসে জাহান্নাম উপস্থিত করা হবে, তার সত্তর হাজার লাগাম হবে। প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা হবে, তারা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে আসবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আর আপনার পালন কর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।** *(সূরা আল-মুদ্দাছির, আয়াত- ৩১)*

হাদীসে এসেছে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ আকাশ গর্জন করছে, আর গর্জন করারই কথা। কারণ প্রত্যেক জায়গায় সিজ্‌দা কারী ও রুকুকারী ফিরিশ্‌তা রয়েছে।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল-বাইতুল মা'মুর সম্পর্কে বলেনঃ

অর্থঃ বাইতুল মা'মুরে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন, তারা দ্বিতীয় বার ফিরে আসার সুযোগ পাবেননা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেনঃ

অর্থঃ জাহান্নাম কে নিয়ে আসা হবে, সে দিন তার সত্তর হাজার লাগাম হবে। আর প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা হবে। *(মুসলিম)*

এখানে ফিরিশ্‌তাদের এক বিরাট সংখ্যা প্রকাশিত হল। যারা প্রায় (৭০০০০*৭০০০০=) ৪৯০ কোটি জন ফিরিশ্‌তা তবে বাকী ফিরিশ্‌তাদের সংখ্যা কত হতে পারে? পবিত্রতা সেই সত্তার যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে পরিচালনা করেন। তাদের সংখ্যা পরিসংখ্যান করে রেখেছেন।

তৃতীয়তঃ ফিরিশ্‌তাদের নাম

কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের জন্যে যে, সকল ফিরিশ্‌তাদের নাম উল্লেখ্য করেছেন, তাদের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন তিনজন।

(১) জিব্‌রীলঃ তাকে জিবরাঈল ও বলা হয়। তিনিই রুহুল কুদ্দস, যিনি ওয়াহী-যা অন্ত-রের সুধা-নিয়ে রাসূলগণের নিকট অবতরণ হন।

(২) মিকাঈলঃ তাকে প্রশান্তি বলা হয়। বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্বে নিয়োযিত, যা জমির জীবিকা স্বরূপ। আল্লাহ্ যেখানে বর্ষণের আদেশ দেন সেখানে বর্ষণ পরিচালনা করেন।

(৩) ইস্রাফীলঃ তিনি শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছেন। পার্থিব্য জীবন শেষে পারলৌকিক জীবন শুরু হওয়ার ঘোষনা সরূপ, এবং এর দ্বারাই, (মৃত) দেহ সমূহের পুনরুজীবন ঘটবে।

চতুর্থতঃ ফিরিশ্তাদের সিফাত বা বৈশিষ্ট্যঃ ফিরিশ্তারা প্রকৃত সৃষ্টি জীব। তাদের প্রকৃত শরীর রয়েছে যা সৃষ্টিগত ও চরিত্র গত গুনে গুনান্বিত, নিন্মে তাদের কিছু গুন বর্ণনা করা হলোঃ

(ক) তাদের সৃষ্টি মহান এবং তাদের শরীর হলো বিশাল আকৃতিরঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা ফিরিশ্তাদেরকে শক্তিশালী ও বড় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আসমান ও যমিনে যে বড় বড় কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, তারা তার উপযোগী।

(খ) তাদের ডানা রয়েছেঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্তাদের জন্যে দুই, তিন ও চার বা ততোধিক পাখা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যেমন- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্রীল (আলাইহিস্ সালাম) কে দেখেছিলেন, তার নিজস্ব আকৃতি ছয়শত পাখা বিশিষ্ট অবস্থায়। যা আকাশের প্রান্তভাগ ঢেকে রেখেছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এবং ফিরিশ্তাদেরকে করেছেন দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। *(সূরা ফাত্বির, আয়াত- ১)*

(গ) তাদের পানাহার প্রয়োজন হয় নাঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা পানাহারের মুহ্তাজ বা মুখাপেক্ষী নন। তারা বিবাহ করেননা, সন্তান ও হয়না।

(ঘ) ফিরিশ্তারা অন্তর বিশিষ্ট ও জ্ঞানীঃ তাঁরা আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন, এবং আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলেছেন। তারা আদম ও অন্যান্য নাবীদের সাথে ও কথা বলেছেন।

(ঙ) তাদের নিজস্ব আকৃতি ছাড়া অন্য আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছেঃ আল্লাহ স্বীয় ফিরিশ্তাদেরকে পুরুষ মানুষের আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। ইহা মূর্তি পূজকদের ভ্রান্ত ধারণার খন্ডন। যারা ধারণা করে যে ফিরিশ্তারা আল্লাহর মেয়ে বা কন্যা। তাদের আকৃতি ধারনের পদ্ধতি আমাদের জানা নেই। তবে তারা এমন সুক্ষ্ম আকৃতি ধারণ করে যে তাদের ও মানুষের মাঝে পার্থক্য করা কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে।

(চ) ফিরিশ্তাদের মৃত্যুবরণঃ মালাকুল মাউত বা জান কবজকারী ফিরিশ্তা সহ সকল ফিরিশ্তারা কিয়ামত দিবসে মৃত্যু বরণ করবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে যে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সে দায়িত্ব পালন করার জন্য পুনরুত্থান করা হবে।

(ছ) ফিরিশ্তাদের ইবাদাতঃ ফিরিশ্তারা আল্লাহর অনেক ধরণের ইবাদাত করেন। নামায, দু'আ, তাস্বীহ রুকু, সিজদাহ, ভয়-ভীতি ও ভালবাসা ইত্যাদি।

তাদের ইবাদাতের বর্ণনা নিরুপঃ

(১) তারা ক্লান্তহীন ভাবে আল্লাহর ইবাদাতে সর্বদায় রত থাকেন।

(২) তারা একনিষ্টতার সাথে আল্লাহ তা'আলার জন্যে ইবাদাত করেন।

(৩) তারা নাফারমানী বর্জন করে সর্বদায় আনুগত্যে মাশগুল থাকেন, কেননা তারা মা'সুম অর্থাৎ নাফারমানী ও পাপাচার হতে মুক্ত।

(৪) অধিক ইবাদাত করার সাথে সাথে আল্লাহর জন্য বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **তারা রাত্রি দিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং ক্লান্ত হয়না**। *(সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত-২০)*

পঞ্চমতঃ ফিরিশ্তাদের কর্ম সমূহঃ ফিরিশ্তারা অনেক বড় বড় কাজ সম্পাদন করেন, যার দায়িত্ব আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন।

সে কাজ গুলো নিরূপঃ

(১) আরশ বহন করা।

(২) রাসূলগণের উপর ওয়াহী অবতীর্ণের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিশ্তা।

(৩) জান্নাত ও জাহান্নামের পাহারাদার।

(৪) উদ্ভিদ, বৃষ্টি বর্ষণ ও বাদল পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত।

(৫) পাহাড়-পর্বতের দায়িত্ব প্রাপ্ত।

(৬) শিংগায় ফুৎকারের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিশ্তা।

(৭) আদম সন্তানের কর্ম লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব প্রাপ্ত।

(৮) আদম সন্তানকে হিফাজত করার দায়িত্ব প্রাপ্ত। আল্লাহ্ যখন আদম সন্তানের উপর কোন কাজ নির্ধারণ করেন, তখন তারা তাকে পরিত্যাগ করেন, অতঃপর আল্লাহ তাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছিলেন, তা পতিত হয় বা সংঘটিত হয়।

(৯) মানুষের সাথে থাকার ও তাদেরকে কল্যানের দিকে আহ্বানের দায়িত্ব প্রাপ্ত।

(১০) জরায়ুতে বীর্য সঞ্চার, মানুষের (দেহে) অন্তরে আত্না প্রক্ষেপ, তার রিযিক, কর্ম ও সৌভাগ্য বা দূর্ভাগ্য লিপিবদ্ধে দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিশ্তা।

(১১) মৃত্যুর সময় আদম সন্তানের আত্না কবজ করার দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিশ্তা।

(১২) মানুষকে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ এবং উত্তর অনুযায়ী শান্তি বা শাস্তি প্রদানে দায়িত্ব প্রাপ্ত।

(১৩) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর তাঁর উম্মতের সালাম পৌঁছানোর দায়িত্ব প্রাপ্ত। তাই মুসলিম ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর তার সালাম প্রেরণের জন্য তাঁর কাছে (তাঁর কবরের কাছে) ভ্রমণের প্রয়োজন হয় না। বরং পৃথিবীর যে কোন স্থান হতে তাঁর উপর সালাম, ও দরুদ পাঠ করাই যথেষ্ট। কারণ ফিরিশ্তারা তার সালাম পৌঁছিয়ে দেন। মাসজিদে নববীতে এক মাত্র নামাজ পড়ার উদ্দেশে ভ্রমণ করা বৈধ রয়েছে।

উল্লেখিত এ প্রসিদ্ধ কাজ সমূহ ব্যতীত তাদের (ফিরিশ্তাদের) আরো অনেক কাজ রয়েছে। নিন্মে এর প্রমাণ বর্ণিত হলোঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চার পাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে**। *(সূরা গাফির, আয়াত-৭)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **আপনি বলে দিন, যে কেউ জিব্রাঈলে শত্রু হয়- যেহেতু তিনি আল্লাহর আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন**। *(সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-৯৭)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রনায় থাকে এবং ফিরিশ্তারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্না**। *(সূরা আল-আনআম, আয়াত- ৯৩)*

ষষ্ঠতঃ আদম সন্তানের উপর ফিরিশ্তাদের অধিকারঃ

(ক) তাদের প্রতি ঈমান আনা।

(খ) তাদেরকে ভাল বাসা, সম্মান করা, ও তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা।

(গ) তাদেরকে গালি দেওয়া, মর্যাদা ক্ষুন্য করা, ও তাদেরকে নিয়ে হাসি রহস্য করা হারাম।

(ঘ) ফিরিশ্তারা যা অপছন্দ করেন তা হতে দূরে থাকা। কারণ, আদম সন্তানরা যাতে কষ্ট পায়, তারাও তাতে কষ্ট পায়।

ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান আনার সুভ-ফলাফলঃ

(ক) ঈমান পরিপূর্ণ হয়। কারণ তাদের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কারো ঈমান পরিপূর্ণ হবেনা।

(খ) তাদের সৃষ্টি কর্তার মহত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর শক্তি ও রাজত্বে জ্ঞান অর্জন। কারণ, সৃষ্টিকর্তার, শ্রেষ্ঠত্ব হতে সৃষ্টি জীবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়।

(গ) তাদের গুনাগুন, তাদের অবস্থা, ও কর্ম জানার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) আল্লাহ তা'আলা যখন মু'মিনদেরকে ফিরিশ্তা দিয়ে হিফাজত করেন, তখন তাদের (মু'মিনদের) শান্তি ও তৃপ্তি অর্জন হয়।

(ঙ) ফিরিশ্তাদেরকে ভাল বাসাঃ তাদের ইবাদাত সঠিক পন্থায় হওয়ায় ও মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে ।

(চ) খারাপ ও নাফারমানী পূর্ণ কাজকে অপছন্দ করা ।

(ছ) আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের গুরুত্ব দেন এই জন্য তাঁর প্রশংসা করা । যেমন আল্লাহ্ ঐ সকল ফিরিশ্তাদের কাউকে তাদেরকে (বান্দাদেরকে) হিফাজতের, ও কর্ম লিখার ইত্যাদি কল্যাণ জনক কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন ।

তৃতীয় রুক্নঃ আসমানী গ্রন্থ সমূহের প্রতি ঈমান (الرکـ بـ الثالث :اميما بـ بالكتب.)

রাসূলগনের উপর আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনা, ইহা ঈমানের তৃতীয় রুক্ন বা স্তম্ভ ।

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণ কে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছেন । এবং তাঁদের (রাসূলগণের) উপর কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করেছেন, মাখলুকাতের হিদায়াত ও রহমত সরূপ । যাতে-দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যশীল হয় । এবং যাতে তাদের চলার একটি সুন্দর পথ হয় । আর মানুষ যে বিষয়ে মতনৈক্যে লিপ্ত, তার সমাধানকারী বা ফায়সালাকারী হয় ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও মিযান (মানদন্ড) যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্টা করে** । *(সূরা আল-হাদীদ, আয়াত-২৫)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অর্ন্তভুক্ত ছিল । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাবীদেরকে পাঠালেন সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে । আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন** । *(সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-২১৩)*

(১) কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার মূল কথা

কিতাব সমূহের প্রতি ঈমানঃ এ কথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহর অনেক কিতাব রয়েছে । যা তিনি তাঁর রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) উপর নাযিল করেছেন । আর তা সত্যিকার অর্থে তাঁর (আল্লাহর) বাণী । আর তা হল জ্যোতি ও হিদায়াত । আর নিশ্চয় এ কিতাব সমূহের মধ্যে যা রয়েছে তা সত্য ও ন্যায় সিদ্ধ, এর অনুসরণ করা ও তদানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব । একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এ কিতাব সমূহের সংখ্যা কেউ জানেনা ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আর আল্লাহ্ মূসার সাথে কথোপথন করেছেন সরাসরি** । *(সূরা আন্-নিসা, আয়াত-১৪৬)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দিবে, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়** । *(সূরা আত্ তাওবাহ-আয়াত-৬)*

(২) কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার বিধান

সকল কিতাবের প্রতি ঈমান আনা যা আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) উপর অবতীর্ণ করেছেন, আল্লাহ তা'বারাকা ও তা'আলা সত্যিকার অর্থে কিতাব সমূহের মাধ্যমে কথা বলেছেন । এবং তা (আল্লাহর পক্ষহতে) অবতীর্ণ, মাখলুক বা সৃষ্ট নয়, আর যে ব্যক্তি তা (কিতাব সমূহ) অথবা তাঁর কিছুকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন স্বীয় রাসূলের উপর এবং সে সমস্ত কিতাবের উপর যে গুলো অবতীর্ণ করা হয়েছিল ইতিপূর্বে । যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশ্তাদের উপর, তাঁর কিতাব সমূহের উপর, এবং রাসূলগণের উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করবেনা, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে** । *(সূরা আন্-নিসা, আয়াত-১৩৬)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়। অতএব এর অনুসরণ কর এবং ভয়কর-যাতে তোমরা করুনা প্রাপ্ত হও।** *(সূরা আল-আনআম, আয়াত-১৫৫)*

(৩) এসব কিতাবের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা এবং তা অবতীর্ণ করার পিছনে হিক্‌মাত বা রহস্য

প্রথমতঃ যাতে রাসূল (আলাইহিস সালাম) এর উপর অবর্তীণ কিতাব তাঁর উম্মাতের জন্য জ্ঞান কোষ স্বরূপ হয়। ফলে তারা তাদের দ্বীন সম্পর্কে জানার জন্যে এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

দ্বিতীয়তঃ যাতে রাসূল (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর অবর্তীন কিতাব তাঁর উম্মাতের প্রত্যেক মতনৈক্য পূর্ণ বিষয়ে ইনসাফ ভিত্তিক বিচারক হয়।

তৃতীয়তঃ যাতে অবর্তীণ কিতাব রাসূল (আলাইহিস্ সালাম) এর ইন্তেকালের পর দ্বীন সংরক্ষণকারী হিসাবে দাঁড়াতে পারে, স্থান ও কালের যতই দুরুত্ব হোকনা কেন। যেমন-আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর (পরবর্তী) দাওয়াতের অবস্থা।

চতুর্থতঃ যাতে এ অবর্তীণ কিতাব সমূহ আল্লাহর পক্ষহতে হুজ্জাত (পক্ষ বিপক্ষের দলীল) স্বরূপ হয়। যেন সৃষ্টি জীব এর (কিতাব সমূহের) বিরোধিতা করা এবং এর আনুগত্য হতে বের হয়ে যাওয়ার সমর্থ্য না রাখে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **সকল মানুষ একই জাতি সত্ত্বার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাবীদেরকে পাঠালেন সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন।** *(সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-২১৩)*

(৪) কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার নিয়ম

আল্লাহর কিতাব সমূহের প্রতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত ভাবে ঈমান আনা হয়ে থাকে।

সংক্ষিপ্ত ঈমানঃ এ বিশ্বাস করবে (ঈমান আনা) যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণের উপর অনেক কিতাব অবর্তীণ করেছেন।

বিস্তারিত ভাবে ঈমানঃ ইহা হলো, আল্লাহ কুরআন কারীমে যে সকল কিতাবের নাম উল্লেখ্য করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনা। তা হতে আমরা জেনেছি-কুরআন, তাওরাত, যাবুর, ইনজীল, এবং ইব্রাহীম, ও মূসা এর প্রতি অবতীর্ণ পুস্তিকা সমূহ (আলাইহিমুস সালাম)।

আরো ঈমান আনা যে, ঐসকল কিতাব ছাড়াও আল্লাহর অনেক কিতাব রয়েছে, যা তাঁর নাবীগণের উপর অবর্তীণ করেছেন। আর আল্লাহ ছাড়া ঐ সকল কিতাবের নাম ও সংখ্যা কেউ জানেনা।

এ কিতাব গুলো অবর্তীণ হয়েছে যাবতীয় সৎকর্ম ও ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিমিত্তে সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁর তাওহীদ (একত্ববাদ) বাস্তবায়ন এবং পৃথিবীতে শির্‌ক ও অন্যায়-অনাচার দূরীভূত করার জন্য। মূলত সকল নাবীদের দাওয়াত এক মূলনীতির (তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শির্ক বর্জনের) উপর ছিল, যদিও তাঁরা নিয়ম কানুন ও বিধি-বিধানে কিছুটা ভিন্ন রকম ছিলেন।

এ ঈমানও রাখা যে, পূর্ববর্তী রাসূলদের প্রতি (আল্লাহর পক্ষ হতে) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল। আর আল-কুরআনের প্রতি ঈমান আনা হলোঃ তা (অন্তরে ও মুখে) স্বীকৃতি দেওয়া এবং কুরআনে যা রয়েছে তা অনুস্বরণ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনরাও। সকলেই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্‌তাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থ সমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি।** *(সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-২৮৫)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **তোমরা অনুস্বরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুস্বরণ করোনা।** *(সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত-৩)*

পূর্ববতী কিতাবের চেয়ে কুরআনের কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট রয়েছেঃ

- আল-কুরআন স্বীয় শব্দ, অর্থ এবং ওতে যে জ্ঞান ও পার্থিব তথ্য রয়েছে তা সর্ব বিষয়ে এক অলৌকিক শক্তি।

- আল-কুরআন সর্ব শেষ আসমানী কিতাব, কুরআনের মাধ্যমে আসমানী কিতাবের সমাপ্তি ঘটেছে। যেমন-আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রিসালাতের দ্বারা সকল রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।
- সকল প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন হতে আল্লাহ কুরআনকে হেফাজত করবেন। ইহা অন্যান্য কিতাব হতে স্বতন্ত্র কেননা সে সব কিতাবে বিকৃতি ও পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটেছে।
- আল-কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন ও সংরক্ষণকারী।
- কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবের রহিতকারী।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য পূর্বেকার কালামের সামর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হিদায়াত**। *(সূরা ইফসুফ, আয়াত-১১১)*

(৫) পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সংবাদ গ্রহণ করা

আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি যে, পূর্ববর্তী কিতাবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের নিকটে ওয়াহীর মাধ্যমে যে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য, তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এর অর্থ এ নয় যে, বর্তমানে আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের) নিকট যে কিতাব রয়েছে তা গ্রহণ করবো। কারণ তা বিকৃত করা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের নিকট যে ভাবে অবতীর্ণ করেছেন সে ভাবে নেই। পূর্ববর্তী কিতাব হতে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর কিতাবে (কুরআনে) যে সংবাদ দিয়েছেন তা হতে আমরা নিশ্চিত ভাবে জেনেছি যে, কেউ কারও গোনাহ বহন করবে না। মানুষ তাই পায় যা সে করে, তার কর্ম শীঘ্রই দেখানো হবে, অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **তাকে কি জানানো হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে এবং ইব্রাহীমের কিতাবে যে, তার দায়িত্ব পালন করে ছিল? কিতাবে আছে যে, কেউ কারও গোনাহ বহন করবে না, এবং মানুষ তাই পায় যা সে করে। আর তার কর্ম শীঘ্রই দেখানো হবে, অতঃপর তাকে পূর্ণ-প্রতিদান দেয়া হবে**। *(সূরা আন-নজম, আয়াত-৩৬-৪১)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে, ইব্রাহীম ও মূসার কিতাব সমূহে**। *(সূরা আল-আ'লা, আয়াত-১৬-১৯)*

পূর্ববর্তী কিতাবের বিধানঃ কুরআনে যে সকল বিধান রয়েছে তা মেনে চলা আমাদের অপরিহার্য। তবে পূর্ববর্তী কিতাবে যা রয়েছে তা নয়। কারণ আমরা দেখবো পূর্ববর্তী কিতাবে যে বিধান রয়েছে তা যদি আমাদের শরিয়াতের পরিপন্থী হয়, তবে আমরা তা আমল করবো না, তা বাতিল এ জন্যে নয়, বরং তা সে সময় সত্য ছিল, এখন তা আমল করা আমাদের উপর অপরিহার্য নয়। কারণ তা আমাদের শরীয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর যদি তা আমাদের শরীয়াতের অনুরূপ হয়, তবে তা সত্য বলে বিবেচিত হবে। আমাদের শরীয়াত তা সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

(৬) কুরআন ও হাদীসে যে সকল আসমানী কিতাবের নাম উল্লেখ্য হয়েছে তা হলো

- কুরআন কারীমঃ কুরআন হল আল্লাহর বানী যা তিনি শেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর নাযিল করেছেন।

  কুরআন সর্ব শেষ অবতীর্ণ কিতাব। আল্লাহ কুরআনকে বিকৃতি ও পরির্বতন হতে হিফাজত করার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন, এবং সকল আসমানী কিতাবের রহিতকারী করেছেন।

  আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

  অর্থঃ আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। *(সূরা আল-হিজর, আয়াত-৯)*

  তিনি আরো বলেনঃ

  অর্থঃ **আমি আপনার প্রতি অবতীর্ন করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সে গুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণা বেক্ষণকারী। অতএব আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন**। *(সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত-৪৮)*

- তাওরাতঃ তাওরাত ঐ কিতাব যাকে আল্লাহ মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর নূর (জ্যোতি) ও হিদায়াত স্বরূপ নাযিল করেছিলেন। বানী ইসরাঈলের নাবী ও আলেমগণ এর দ্বারা ফায়সালা করতেন। সুতরাং মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব তাওরাত এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব, বর্তমান তথা কথিত ইয়াহুদীদের হাতে বিকৃত তাওরাতের প্রতি নয়।

  আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

  অর্থঃ **আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে, আল্লাহর আনুগত্যশীল নাবী, আল্লাহভক্ত ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইয়াহুদীদের ফায়সালা দিতেন। কেননা তাদেরকে আল্লাহর এই গ্রন্থের দেখা শোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল**। *(সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত-৪৪)*

- ইঞ্জীলঃ ইঞ্জীল ঐ কিতাব যা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর নাযিল করেছিলেন, যা পুর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী। সুতরাং ঐ ইঞ্জীলের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব, যা সঠিক মূলনীতি সহ আল্লাহ ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর নাযিল করেছিলেন। খৃষ্টানদের নিকট বিক্রিত ইঞ্জীল সমূহে নয়।

  আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

  অর্থঃ **আমি তাদের পেছনে মারিয়ামের পুত্র ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাকে ইঞ্জীল প্রদান করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের-সত্যায়ন করে, পথ প্রদর্শন করে এবং এটি আল্লাহভীরুদের জন্যে হেদায়াত ও উপদেশবানী**। *(সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত-৪৬)*

  তাওরাত ও ইঞ্জীলে যা রয়েছে তন্মধ্যে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রিসালাতের সুসংবাদ রয়েছে।

  আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

  অর্থঃ **যারা আনুগত্য করে এ রাসূলের, যিনি নিরক্ষর নাবী, যার সম্পর্কে তাদের নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশদেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষনা করেন ও নিষিদ্ধ করেন নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ, আর তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়েছেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল**। *(সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত-১৫৭)*

- যাবুরঃ যাবুর ঐ কিতাব যা আল্লাহ্ দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর নাযিল করেছিলেন। সুতরাং ঐ যাবুরের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব যা আল্লাহ দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর নাযিল করেছিলেন। সে যাবুর নয় যা ইয়াহুদীরা বিকৃত করে ফেলেছে।

  আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

  অর্থঃ **আর দাউদকে দান করেছি যাবুর**। *(সূরা আন-নিসা, আয়াত-৬৩)*

- ইব্রাহীম ও মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর সুহুফ বা পুস্তিকা সমূহঃ

  তা ঐ সকল পুস্তিকা যা আল্লাহ ইব্রাহীম ও মূসা (আলাইহিস্ সালাম) কে দিয়েছিলেন। কুরআন ও হাদীসে যা উল্লেখ্য হয়েছে তা ছাড়া এ সকল পুস্তিকা নিরুদ্দেশ।

  আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

  অর্থঃ **তাকে কি জানানো হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে এবং ইব্রাহীমের কিতাবে যে, তার দায়িত্ব পালন করে ছিল? কিতাবে আছে যে, কেউ কারো গোনাহ বহন করবে না, এবং মানুষ তা পায় যা সে করে। আর তার কর্ম শীঘ্রই দেখানো হবে, অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে**। *(সূরা আন-নজম, আয়াত-৩৬-৪১)*

  তিনি আরো বলেনঃ

  অর্থঃ **বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে। ইব্রাহীম ও মূসার কিতাব বা পুস্তিকা সমূহে**। *(সূরা আল-আ'লা, আয়াত- ১৪-১৯)*

চতুর্থ রুক্নঃ রাসূলদের প্রতি ঈমান (الركـ الرابع: اميما ـ بالرسل)

(১) রাসূল (আলাইহিমুস্ সালাম) দের প্রতি ঈমান আনা

ইহা ঈমানের রুক্ন সমূহের একটি রুক্ন, যার প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কোন ব্যক্তির ঈমান পরিপূর্ণ হবেনা।

রাসূলগণের প্রতি ঈমান হলঃ এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর অনেক রাসূল রয়েছে যাদেরকে তিনি তাঁর রিসালাত প্রচার করার জন্য নির্বাচন করেছেন। যারা তাঁদের অনুস্বরণ করবে, তারা হিদায়াত (সঠিক পথ)পাবে। আর যারা তাঁদের অনুস্বরণ করবেনা তারা পথ ভ্রষ্ট হবে। আল্লাহ তাদের নিকট যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রচার করেছেন। তারা অর্পিত আমানত আদায় করেছেন, এবং স্বীয় উম্মাতকে কল্যাণের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর পথে যথাযথ জিহাদ করেছেন। এবং যা সহ প্রেরিত হয়েছেন তার কোন অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও গোপন না করে স্বজাতির উপর হুজ্জাত (পক্ষ-বিপক্ষের দলীল) কায়েম করেছেন। আল্লাহ যে সকল রাসূলদের নাম আমাদের কাছে উল্লেখ্য করেছেন, আর যাদের নাম উল্লেখ্য করেন নাই তাদের সকলের প্রতি আমরা ঈমান আনবো।

প্রত্যেক রাসূলই তাঁর পূর্ববর্তী রাসূল আগমণের সুসংবাদ দিতেন, এবং পরবর্তী রাসূল পূর্ববতী রাসূলের সত্যায়ন করতেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, এবং তদীয় বংশ ধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নাবীকে তাঁদের পালন কর্তার পক্ষ হতে যা দান করা হয়েছে, তৎসমূদয়ের উপর। আমরা তাঁদের মধ্যে পার্থক্য করিনা। আর আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী**। *(সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-১৩৬)*

আর যে ব্যক্তি কোন রাসূলকে মিথ্যা জানল, সে যেন অস্বীকার করল যা সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। এবং যে ব্যক্তি তাঁর (রাসূলের) অবাধ্য হলো, সে মূলত তাঁর অবাধ্য হলো যিনি তাকে আনুগত্যের আদেশ করেছেন। (অর্থাৎ আল্লাহর)।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অস্বীকার করি এবং এরাই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃত পক্ষে এরাই সত্য অস্বীকারকারী। আর যারা সত্য অস্বীকার কারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমান জনক শাস্তি**। (সূরা আন-নিসা, আয়াত-১৫০-১৫১)

(২) নবুওয়াতের হাকীকাত

নবুওয়াত হলোঃ স্রষ্টা (আল্লাহ) ও সৃষ্টি জীবের (বান্দার) মাঝে তাঁর শরিয়াত প্রচারের মাধ্যম। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নবুওয়াতের জন্য মনোনীত করেন এবং নবুওয়াত দিয়ে সম্মানিত করেন। এতে আল্লাহ ছাড়া কারো কোন প্রকার ইখতিয়ার নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আল্লাহ ফিরিশ্তা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা**। *(সূরা আল-হাজ্ব, আয়াত-৭৫)*

নবুওয়াত (আল্লাহ কর্তৃক) প্রদত্ত, কারো অর্জিত নয়, অধিক ইবাদাত বা আনুগত্যের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। কোন নাবীর ইচ্ছায় বা তাঁর চাওয়ার মাধ্যমে ও আসেনা। ইহা শুধু মাত্র মহান আল্লাহর নির্বাচন ও মনোনয়ন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমূখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন**। *(সূরা আশ্‌শুরা, আয়াত-১৩)*

(৩) রাসূল প্রেরণের হিক্মাত বা রহস্য

রাসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) প্রেরণের হিক্মাত বা রহস্য নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ বান্দাদেরকে বান্দার ইবাদাত করা হতে মুক্ত করে বান্দার প্রতিপালকের (আল্লাহর) ইবাদাতে নিয়ে যাওয়া এবং সৃষ্টিজীবের দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে স্বীয় প্রতিপালকের (আল্লাহর) স্বাধীন ইবাদাতের পথ দেখানো।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।** *(সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত-১০৭)*

দ্বিতীয়তঃ যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্যের সাথে (মানুষকে) পরিচয় করা। সে উদ্দেশ্য হলো তাঁর একত্ববাদ বিশ্বাস ও ইবাদাত করা। ইহা এক মাত্র রাসূলগণের মাধ্যমে জানা যায়। যাদেরকে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি জীব হতে মনোনয়ন করেছেন এবং সকলের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগূত (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত) থেকে নিরাপদ থাক।** *(সূরা আন-নহল, আয়াত-৩৬)*

তৃতীয়তঃ রাসূলগণ প্রেরণের মাধ্যমে মানুষের উপর হুজ্জাত (পক্ষ-বিপক্ষের দলীল) প্রতিষ্ঠিত করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে, আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।** *(সূরা আন-নিসা, আয়াত-১৬৫)*

চতুর্থতঃ কিছু অদৃশ্যের বিষয় বর্ণনা করা, যা মানুষ তাদের জ্ঞান দ্বারা উপলদ্ধী করতে পারেনা। যেমন-আল্লাহর নাম সমূহ ও তাঁর গুনসমূহ এবং ফিরিশ্তাদের ও শেষ দিবস সম্পর্কে জানা ইত্যাদি।

পঞ্চমতঃ যাতে তাঁরা (রাসূলরা) অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ হয় কেননা আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম চরিত্রে পূর্ণ করেছেন। এবং তাঁদেরকে সংশয় ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে মুক্ত রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **তারা এমন ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহ পথ-প্রদর্শন করে ছিলেন, অতএব আপনিও তাদের পথ অনুস্বরণ করুন।** *(সূরা আল-আনআম, আয়াত-৯০)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **তোমাদের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মধ্যে উত্তম আদর্শ-রয়েছে।** *(সূরা আল-আহ্যাব, আয়াত-২১)*

ষষ্ঠতঃ আত্ম শুদ্ধি ও পবিত্র করণ এবং আত্ম বিনষ্টকারী হতে সর্তক-সাবধান করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াত সমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষাদেন কিতাব ও হিক্মাত।** *(সূরা আল-জুমু'আহ-আয়াত-২)*

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ আমি উত্তম আদর্শ পরিপূর্ণ করার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি। *(আহ্মাদ ও হাকেম)*

(৪) রাসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) দায়িত্ব সমূহ

রাসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে, তা নিন্মে বর্ণিত হলঃ

- শরীয়াত প্রচার করা, মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদাত হতে মুক্ত হওয়ার আহ্বান করা।

  আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

  অর্থঃ তাঁরা (নাবীগণ) আল্লাহর রিসালাত প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তাঁরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। *(সূরা আল-আহ্যাব, আয়াত-৩৯)*

- দ্বীনের অবতীর্ণ বিধান বর্ণনা করা।

  আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

  অর্থঃ আপনার কাছে আমি উপদেশ ভান্ডার (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐ সব বিষয় বিবৃত করেন, যে গুলো তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে। *(সূরা আন-নাহাল, আয়াত-৪৪)*

- উম্মাতকে কল্যাণের পথ প্রদর্শণ ও অকল্যাণ হতে সতর্ক সাবধান করা, এবং তাদেরকে পূণ্যের সুসংবাদ ও তাদেরকে শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন করা।

  আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

  অর্থঃ সুসংবাদ্দাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। *(সূরা আন-নিসা, আয়াত-১৬৫)*

- মানুষকে কথায় ও কাজে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আদর্শবান করে তুলা।

- আল্লাহর শরীয়াত বান্দাদের মাঝে প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ণ করা।

- রাসূলগণের (আলাইহিস্ সালাম) স্বীয় উম্মাতের বিপক্ষে শেষ দিবসে এ স্বাক্ষ্য দেওয়া যে তাঁরা তাদের নিকট স্পষ্ট ভাবে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছায়েছেন।

  আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

  অর্থঃ আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি প্রতিটি উম্মাতের মধ্য থেকে সাক্ষী উপস্থাপন করব এবং আপনাকে তাদের উপর সাক্ষী উপস্থাপন করব। *(সূরা আন-নিসা, আয়াত, ৪১)*

(৫) ইসলাম সকল নাবীদের দ্বীন

ইসলাম সকল নাবী ও রাসূলগণের দ্বীন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য দ্বীন বা দ্বীন একমাত্র ইসলাম। *(সূরা-আলে-ইমরান, আয়াত-১৯)*

তাঁরা সকলেই এক আল্লাহর ইবাদাত করার দিকে, এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত বর্জন করার আহবান জানাতেন। যদি ও তাদের শরীয়াত ও বিধি-বিধান ভিন্ন রকম ছিল, কিন্তু তাঁরা সকলেই মূলনীতীতে একমত ছিলন, তা হলো তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থ ঃ নাবীরা (আলাইহিমুস্ সালাম) একে অপরে বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। *(বুখারী)*

(৬) রাসূলগণ মানুষ তাঁরা "গাঈব" জানেন না

ইলমে গাইব জানা উলুহীয়াতের (আল্লাহর) বৈশিষ্ট, নাবীগণের গুণ নয়। কারণ তাঁরা অন্যান্য মানুষের মত মানুষ। তাঁরা পানাহার করেন, বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হন, নিদ্রা যান, অসুস্থ হন ও ক্লান্ত হন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আপনার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তাঁরা সবাই খাদ্য গ্রহণ করত এবং হাটে বাজারে চলা ফেরা করত**। *(সূরা আল-ফুরকান, আয়াত-২০)*

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, এবং তাঁদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি**। *(সূরা আর-রা'দ, আয়াত-৩৮)*

তাঁদেরকে চিন্তা, দুঃখ আনন্দ ও কর্ম প্রেরণা স্পর্শ করে যেমন-সাধারণ মানুষকে পেয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর দ্বীন প্রচার করার জন্য মনোনয়ন করেছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে (রাসূলদেরকে ইলমে গাইব হতে) যা অবগত করান তা ব্যতীত কোন ইলমে গাইব জানেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **তিনি অদৃশ্মের জ্ঞানী, পরন্ত তিনি অদৃশ্যের বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রেও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন**। *(সূরা আল-জ্বিন, আয়াত-২৬-২৭)*

(৭) রাসূলগণ মা'সূম বা নিস্পাপ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রিসালাত প্রদান ও প্রচার করার জন্য তাঁর সৃষ্টি জীব হতে উত্তম জাতীকে নির্বাচন করেছেন।

যারা সৃষ্টিগত ও চরিত্র গত দিক হতে পরিপূর্ণ, আল্লাহ তাঁদেরকে কবীরাহ্ গুনাহ হতে নিরাপদে রেখেছেন। সকল ত্রুটি হতে তাঁদেরকে মুক্ত করেছেন। যাতে তাঁরা আল্লাহর ওয়াহী স্বীয় উম্মাতের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হন।

আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর (আল্লাহর) রিসালাত প্রচারের ব্যাপারে যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে তাঁরা যে মা'সূম তা সর্বজন সিদ্ধ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **হে রাসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতি পালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর রিসালাত কিছুই পৌঁছালেন না, আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে নিরাপদে রাখবেন**। *(সূরা আল-মায়িদাহ, ৬৭)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **তাঁরা (নাবীগণ) আল্লাহর রিসালাত প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন, তাঁরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না**। *(সূরা আল-আহ্যাব, আয়াত-৩৯)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **যাতে আল্লাহ তা'আলা জেনে নেন যে, রাসূলগণ তাঁদের পালন কর্তার রিসালাত পৌঁছিয়েছেন কিনা। রাসূলগণের কাছে যা আছে, তা তাঁর জ্ঞান-গোচর। তিনি সব কিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন**। *(সূরা আল-জ্বিন, আয়াত-২৮)*

এবং যখন তাঁদের কারো পক্ষ হতে এমন কোন ছোট পাপ কর্ম প্রকাশিত হয় যা তাবলীগের (দ্বীন প্রচারের) সাথে সম্পর্কৃত নয়। নিশ্চয় তখন তা তাঁদের নিকট বর্ণনা করা হবে। আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ ও তাঁর দিকে ধাবমান হওয়ার সাথে সাথেই মনে হবে যেন (এই পাপ) তাঁদের কাছ থেকে প্রকাশ পায় নাই, এবং এর বিনিময়ে তাঁরা তাঁদের পূর্বের মর্যাদার চেয়ে আরো উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ তাঁর নাবীদেরকে (আলাইহিমুস্ সালাম) পূর্ণ সৎ চরিত্রে ও ভাল গুণে বিশেষিত করেছেন। এবং তাঁদের মান মর্যাদা সুউচ্চ অবস্থান ক্ষুন্ন করে এমন সকল জিনিস হতে তাঁদেরকে আল্লাহ পুত-পবিত্র রেখেছেন।

(৮) নাবী ও রাসূলগণের সংখ্যা ও তাঁদের মধ্যে যারা উত্তম

রাসূলগণের সংখ্যা তিন শত দশের কিছু বেশী প্রমাণিত হয়েছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যখন রাসূলগণের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেনঃ

অর্থঃ তিনশত পনের জনের বিরাট এক দল। *(হাকিম)*

আর নাবীদের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী। আল্লাহ তাঁদের কারোও কথা তাঁর কিতাবে আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন, আর কারোও কথা বর্ণনা করেন নাই। আল্লাহ তাঁর কিতাবে পঁচিশ জন নাবী ও রাসূলের নাম উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আর এমন কতক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে বর্ণনা করেছি ইতি পূর্বে, এবং এমন কতক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে বর্ণনা করিনি**। *(সূরা আন-নিসা, আয়াত১৬৪)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইব্রাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ-প্রদর্শন করেছি-তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে। এমনি ভাবে আমি সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। আরও যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা, এবং ইলিয়াসকে। তাঁরা সবাই পূণ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এবং ইসমাঈল, ঈসা, ইউনুস, লূতকে প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি। আরো তাঁদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে, আমি তাঁদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি**। *(সূরা আল-আনআম, আয়াত-৮৩-হতে, ৮৭)*

আল্লাহ নাবীদের কাউকে অন্যদের উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আমি নাবীদেরকে কতককে কতকের উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছি**। *(সূরা আল-ইসরা, আয়াত-৫৫)*

এবং আল্লাহ রাসূলদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **এ রাসূলগণ আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দান করেছি।** *(সূরা আল-বাক্বারা-আয়াত-২৫৩)*

রাসূলগণের মধ্যে যারা উলুলআয্‌ম (উচ্চ অভিলাষী) তাঁরা সর্ব উত্তম। তাঁরা হলেন নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা, ঈসা, ও আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **অতএব আপনি ধৈর্য ধরুন, যেমন উলুল আয্‌ম (উচ্চ অভিলাষী) রাসূলগণ ধৈর্য ধরেছেন।** *(সূরা আল-আহক্বাফ, আয়াত-৩৫)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **যখন আমি নাবীগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইব্‌রাহীম মূসা ও মারিইয়ামের পুত্র ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম, আরো অঙ্গীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার।** *(সূরা আল-আহযাব, আয়াত-৭)*

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব শেষ নাবী, মুত্তাকীনদের ইমাম, আদম সন্তানের সরদার। নাবীরা যখন একত্রিত হন তখন তিনি তাঁদের ইমাম। যখন তাঁরা কোন জায়গাহ হতে প্রতিনিধি দল হিসাবে আগমণ করেন তখন তিনি তাঁদের প্রবক্তা হন। তিনি মাকামে মাহমুদের (প্রশংসিত স্থানের) মালিক, যে স্থানকে নিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই ঈর্ষা করবে।

অবতরণ স্থান, হাউজ ও হামদ-বা প্রশংসার ঝান্ডার মালিক। শেষ দিবসে সমস্ত সৃষ্টি জীবের সুপারিশকারী, জান্নাতের ওয়াসীলা নামক স্থান ও মর্যাদার মালিক। আল্লাহ তাকে তাঁর দ্বীনের সর্বোত্তম শরীয়াত বিধি-বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন। এবং তাঁর উম্মাতকে সর্ব উত্তম উম্মত রূপে এই পৃথিবীতে মানুষের কল্যানের জন্য পাঠানো হয়েছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর উম্মাতের জন্য বহু মর্যাদা ও উত্তম বৈশিষ্ট দিয়েছেন। যা তাদের পূর্ববর্তীদের হতে সতন্ত্র। সৃষ্টির দিক দিয়ে তাঁরা সর্ব শেষ উম্মত আর পুনরুত্থানে তাঁরা সর্ব প্রথম উম্মত।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ আমি ছয়টি বৈশিষ্টে সকল নাবীদের উপর প্রাধান্য পেয়েছি। *(মুসলিম)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেনঃ

অর্থঃ আমি কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের সর্‌দার, আমারই হাতে হামদের পতাকা থাকবে। ইহা কোন গর্বের বিষয় নয়। কিয়ামত দিবসে আদম (আলাইহিস্ সালাম) ছাড়া সকলেই আমার পতাকার অধীন থাকবে। *(তিরমিযী ও আহমাদ)*

মর্যাদার দিক দিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরে যিনি তিনি হলেন ইব্‌রাহীম খালীলুর রহমান (আলাইহিস্ সালাম) সুতরাং (আল্লাহর) দু'বন্ধু-মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) উলুল আযমদের সর্বশ্রেষ্ট। অতঃপর তিন জন (নূহ, মূসা ও ঈসা) সর্বশ্রেষ্ট (অন্য সব নাবীদের চেয়ে)।

(৯) নাবীদের (আলাইহিমুস্ সালাম) মু'জিযাহ্

আল্লাহ্ তাঁর রাসূলদের সহযোগিতা করেছেন বড় বড় নিদর্শন ও উজ্জ্বল মু'জিযার (অলৌকিক শক্তির) দ্বারা। যাতে হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা প্রয়োজন সাধন হয়।

যেমন- কুরআন কারীম, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া, লাঠি ভয়ানক সাঁপে পরিণত হওয়া, ইত্যাদি।

অতঃপর মু'জিযাহ্ (স্বাভাবিক নীতি ভঙ্গকারী-অলৌকিক শক্তি) নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের দালীল, আর কারামাহ্ (অলীদের জন্যও অলৌকিক শক্তি) নবুওয়াতের সত্যতা সাক্ষ্যকারী প্রমান সরূপ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শণাবলী সহ প্রেরণ করেছি।** *(সূরা আল-হাদীদ, আয়াত-২৫)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ প্রত্যেক নাবীই নিদর্শন বা মু'জিযাহ প্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু মু'জিযার তুলনায় মানুষ ঈমান আনে নাই। আর আমি যা প্রাপ্ত হয়েছি তা সেই ওয়াহী যা আমার নিকট (আল্লাহ) অবতীর্ণ করেছেন। ফলে আমি আশাবাদী যে, কিয়ামত দিবসে তাঁদের চেয়ে আমার অনুসারী বেশী হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(১০) আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনা-ঈমানের মূলনীতি সমূহের একটি অন্যতম মূলনীতি। এর উপর ঈমান আনা ছাড়া কারোও ঈমান পরিপূর্ণ হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেসব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি।** *(সূরা আল-ফাতহ, আয়াত-১৩)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ আমি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে, মানুষের সাথে যুদ্ধ করব যতক্ষন না তারা-আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, এবং আমি আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দিবে। *(মুসলিম)*

নিম্নে বর্ণিত বিষয়ের উপর ঈমান আনার মাধ্যমে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবে।

প্রথমতঃ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা বা জানা। তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম, হাশিম কুরাইশ বংশ, আর কুরাইশ আরব বংশ আর আরব ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম আল-খালীল এর বংশধর, তাঁর ও আমাদের নাবীর উপর সর্ব উত্তম দরুদ ও সালাম বর্ষিত হউক। তাঁর তেষট্টি বছর বয়স হয়েছিল। নবুয়াতের পূর্বে চল্লিশ বৎসর, নাবী ও রাসূল হওয়ার পরে তেইশ বৎসর।

দ্বিতীয়তঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন সে বিষয়ে তাঁকে বিশ্বাস করা, যে বিষয় তিনি আদেশ করেছেন, তার অনুসরণ করা। যে বিষয় হতে তিনি নিষেধ করেছেন ও সতর্ক করেছেন তা হতে বিরত থাকা। তিনি যে বিধান দান করেছেন সে অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করা।

তৃতীয়তঃ তিনি জ্বিন ইন্‌সান সকলের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল এ কথার বিশ্বাস রাখা। সবাইকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আপনি বলুন হে মানব সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।** *(সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত-১৫৮)*

চতুর্থতঃ তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনা, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নাবী।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নাবী।** *(সূরা আল-আহযাব, আয়াত-৪১)*

এবং তিনি আল্লাহর খালীল ও আদম সন্তানের সর্দার বা নেতা। তিনি মহান শাফায়াতের মালিক, এবং জান্নাতে সুউচ্চ অয়াসীলা নামক স্থান তাঁরই জন্য। তিনি হউযে কাউসারের মালিক। তাঁর উম্মাত সর্বশ্রেষ্ঠ বা উত্তম।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **তোমরাই শ্রেষ্ট উম্মত যা মানুষের (কল্যাণের) জন্য সৃজিত হয়েছে।** *(সূরা-আলি-ইমরান, আয়াত, ২০)*

অধিকাংশ জান্নাতবাসী হবে তাঁরই উম্মত এবং তাঁর রিসালাত পূর্ববর্তী সকল রিসালাতের রহিত কারী।

পঞ্চমতঃ আল্লাহ তাঁকে মহান মু'জিযাহ্ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন দ্বারা সহযোগিতা করেছেন। তা হল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহর বাণী যা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে সংরক্ষীত।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **বলুনঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য একত্রিত হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।** *(সূরা আল-ইসরা, আয়াত-৮৮)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।** *(সূরা আল-হিজর, আয়াত-৯)*

ষষ্ঠতঃ নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রিসালাত প্রচার করেছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মাতদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। সকল প্রকার কল্যাণের সন্ধান দিয়েছেন, ও তার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। সকল প্রকার অকল্যাণ হতে তাঁর উম্মাতকে নিষেধ করেছেন। ও তা হতে তাদেরকে সাবধান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে-দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।** *(সূরা আত্‌তাওবাহ, আয়াত-১২৮)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ আমার উম্মাতের পূর্বে আল্লাহ যত নাবী (আলাইহিস্ সালাম) প্রেরণ করেছেন, তাদের উপর দায়িত্ব ছিল নিজ উম্মাতের জন্য যা কল্যানকর তাদেরকে তার সন্ধান দেওয়া। আর যা কল্যাণকর নয় তা হতে তাদেরকে সতর্ক করা। *(মুসলিম শরীফ)*

সপ্তমতঃ তাঁকে (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালবাসা, ও তাঁর ভালোবাসাকে নিজের জানের ও সকল সৃষ্টিজীবের ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেওয়া। তাঁকে সম্মান করা, মর্যাদা দেওয়া, ইহ্‌তেরাম করা, ও তাঁর আনুগত্য করা। নিশ্চয় ইহা সে হক্ব বা অধিকার যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য সাবস্ত করেছেন। কারণ তাঁর ভালবাসা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর ভালবাসা, এবং তাঁর আনুগত্য প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর আনুগত্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।** *(সূরা আলি-ইমরান, আয়াত-৩১)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ তোমাদের কেহই ততক্ষন পর্যন্ত মু'মিন হতে পারেনা যতক্ষন পর্যন্ত আমি তাদের নিকট তাদের ছেলে সন্তান, পিতামাতা, ও সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তম না হবো। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অষ্টমতঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর দরুদ ও সালাম বেশী বেশী পাঠ করা। কারণ কৃপণ ঐ ব্যক্তি যার নিকট নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম উল্লেখ্য হওয়ার পরও তাঁর উপর দরুদ পাঠ করেনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ নাবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরা নাবীর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ কর।** *(সূরা আল-আহ্‌যাব, আয়াত-৫৬)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ যে, ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর এর বিনিময়ে দশবার রহম করবেন। *(মুসলিম শরীফ)*

নিম্নের স্থান গুলোতে তাঁর (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর দরুদ পাঠ করা অত্যান্ত গুরুত্ব পূর্ণ।

নামাযের তাশাহুদে, বিতর নামাযের দোয়ায় কুনুতে, জানাযার নামাযে, জুম'আর খুৎবাতে। আযানের পর, মাসজিদে প্রবেশ ও মাসজিদ হতে বের হওয়ার সময়। দু'আর সময় এবং যখন (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম উল্লেখ্য করা হয়, আরো অন্যান্য স্থানে।

নবমতঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সকল নাবী (আলাইহিমুস্ সালাম) তাঁদের রবের নিকট জীবিত। শহীদদের কবরের জীবন হতে তাঁদের (আলাইহিমুস্ সালাম) কবরের জীবন আরো বেশী পরিপূর্ণ ও উচ্চ। তবে তাঁদের কবরের জীবন, পৃথিবীর জীবনের মত নয়। তা এমন জীবন যার বিবরণ সর্ম্পকে আমরা জানিনা, সে জীবন তাঁদের হতে মৃত্যুর নামও দূর করেনা।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ আল্লাহ জমিনের জন্য নাবীদের লাশ ভক্ষণ কে হারাম করে দিয়েছেন। *(আবু দাউদ ও নাসায়ী)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেনঃ

অর্থঃ যখনই কোন মুসলমান আমাকে সালাম দেয় তখনই আল্লাহ আমার রুহ্ বা আত্মা আমার নিকট ফিরিয়ে দেন তার সালামের উত্তর দেওয়ার জন্য। *(আবু দাউদ)*

দশমতঃ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সামনে উচু আওয়াজ না করা, অনুরুপ তাঁর কবরে তাঁর উপর সালাম দেওয়ার সময় উচু আওয়াজ না করা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ইহ্‌তেরামের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **হে মু'মিনগণ! তোমরা নাবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর-উঁচু করনা, এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচু স্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচু স্বরে কথা বলোনা। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবেনা।** *(সূরা আল-হুজরাত, আয়াত-২)*

দাফনের পর তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্মান করা, তাঁর জীবিত অবস্থায় সম্মান করার ন্যায়।

অতঃপর তাঁকে আমরা সম্মান করবো যে ভাবে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে সম্মান করতেন।

কারণ তাঁরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সকল মানুষের চেয়ে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিক অনুসরণকারী ছিলেন। তাঁরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরোধিতা করা হতে এবং দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কিছু দ্বীনের মাঝে সংযোজন করা হতে অধিক দূরে থাকতেন।

একাদশতমঃ তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদেরকে, পরিবার-পরিজনকে ও স্ত্রীদেরকে ভালবাসা ও তাঁদের সকলের সাথে বন্ধুত্ব রাখা। তাঁদের মর্যাদাহানী হতে বা তাঁদেরকে গালী দেওয়া হতে ও তাঁদের চরিত্রে কোন প্রকার আঘাত হানা হতে সাবধান থাকা। কারণ আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাজি হয়েছেন, ও তাঁদেরকে তাঁর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহচর হিসাবে নির্বাচন করে নিয়েছেন। এই উম্মাতের উপর তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আর যারা সর্ব প্রথম হিজরত কারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।** *(সূরা আত্ তাওবাহ, আয়াত-১০০)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালী দিওনা, সেই সত্যার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বতের সমপরিমান (আল্লাহর পথে) ব্যায় করে, তবুও তাদের এ বিশাল ব্যায় সাহাবাদের আল্লাহর রাস্তায় এক মুদ্ (প্রায় ৭০০গ্রাম) বা অর্ধ মুদ্ ব্যায় করার সমান হবে না। *(বুখারী)*

সুতরাং পরবর্তী লোকদের উচিত সাহাবাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং নিজেদের মনে তাঁদের ব্যাপারে যাতে কোন প্রকার কুটিলতা না থাকে এ জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **যারা তাঁদের পরে আগমন করেছে তাঁরা বলেঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখনা। হে আমাদের পালন কর্তা, আপনি দয়ালু পরম করুণাময়।** *(সূরা আল-হাশর, আয়াত-১০)*

দ্বাদশতমঃ তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করা হতে বিরত থাকা। কারণ অতিরঞ্জিত করা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বড় কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মাতকে তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করা হতে ও তাঁর প্রশংসা করার সময় সীমা লংঘন করা হতে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁকে তার চেয়ে মর্যাদা দেওয়া হতে সতর্ক করেছেন। কারণ ইহা একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ আমি একজন বান্দা বা দাস, সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর রাসূল বল। তোমরা আমাকে আমার মর্যাদার চেয়ে উচু করনা এটা আমি ভালবাসিনা।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেনঃ

অর্থঃ তোমরা আমার ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করনা যেমন খৃষ্টানরা ঈসা বিন মারইয়াম (আলাইহিস্ সালাম) এর ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করেছিল। *(বুখারী)*

তাঁকে (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আহ্বান করা, ও তাঁর কাছে ফরিয়াদ করা। তাঁর কবরের পাশ দিয়ে ত্বাওয়াফ করা, তাঁর নামে নজর মানা, পশু জবেহ্ করা বৈধ নয়।

এ সকল কাজ আল্লাহর সাথে শরীক করার নামান্তর, অথচ আল্লাহ অন্যের ইবাদাত করা হতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপ ভাবে তাঁকে ইহতেরাম না করায় তাঁর প্রতি অনিহা প্রকাশ পায়। তাঁর মান হানি করা, তাঁকে তুচ্ছ জানা তাঁর ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, ইসলাম হতে মুরতাদ বা বের হয়ে যাওয়া ও আল্লাহর সাথে কুফুরী করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আপনি বলুনঃ তোমরা কি আল্লাহর সাথে তাঁর হুকুম-আহ্কামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিলে? ছলনা করনা, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর।** *(সূরা আত্ তাওবাহ-আয়াত-৬৫-৬৬)*

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সত্যিকার ভালবাসা তাঁর নীতির ও সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পথের বিরোধিতা না করার দিকে প্রেরণা যোগায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।** *(সূরা আলি-ইমরান, আয়াত-৩১)*

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্মানের ব্যাপারে বেশী-কমে সীমালংঘন না করা ওয়াজিব।

তাই তাঁকে উলুহীয়াতের (মা'বুদের) গুনে গুনান্বিত করা যাবেনা। তাঁর মর্যাদা সম্মান ও ভালবাসার অধিকার কমানোও যাবেনা, যার অন্যতম বৈশিষ্ট হল তার শরীয়াতের অনুসরণ করা, তার নীতির উপর চলা ও তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুকরণ করা।

ত্রয়োদশতমঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনা পূর্ণাঙ্গ হবে তাঁকে সত্যায়িত ও তিনি যে শরীয়াত নিয়ে এসেছেন তার উপর আমল করার মাধ্যমে, এটা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্য করার অর্থ।

তাঁর আনুগত্য বস্তুত আল্লাহরই আনুগত্য, আর তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাফারমানী বস্তুত আল্লাহরই নাফারমানী। আর তাঁকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস ও অনুসরণের মাধ্যমেই তাঁর প্রতি পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনা হয়ে থাকে।

পঞ্চম রুক্নঃ শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (الركـ ن الخامس: اميما ن باليوم الآخر)

(১) শেষ দিবসের (আখেরাতের) প্রতি ঈমান

এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, পার্থিব জীবন শেষ হয়ে মৃত্যু ও কবর জীবনের মাধ্যমে অন্য জগত শুরু হবে। এভাবে কিয়ামত সংঘটিত হবে, তারপর পুনরুত্থান, হাশর, নাশর, ও হিসাব নিকাশের পর ফলাফল প্রাপ্ত হয়ে জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাবে।

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের রুক্ন সমূহের অন্যতম একটি রুক্ন। যার প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কোন বান্দার ঈমান পরিপূর্ণ হবেনা। আর যে ব্যক্তি শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **বরং সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, ও কিয়ামত দিবসের উপর।** *(সূরা আল-বাক্বারা-আয়াত, ১৭৭)*

জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম)এর হাদীসে এসেছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ জিব্রাঈল বলেনঃহে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ঈমান সর্ম্পকে অবগত করুণ। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ ঈমান হলঃ আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশ্তা, তাঁর কিতাব সমূহ, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহিমুস সালাম) এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা, আরো ঈমান আনা ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি। *(মুসলিম শরীফ)*

শেষ দিবসের পূর্বে কিয়ামতের যে সকল আলামত সংঘঠিত হবে তার প্রতি ঈমান আনা, যে গুলি সর্ম্পকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন।

আলেমগণ এ আলামতকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।

(ক) ছোট আলামতঃ যা কিয়ামত নিকটে হওয়া বুঝায়, ইহা অনেক রয়েছে। অধিকাংশ সংঘঠিত না হলেও অনেক সংঘঠিত হয়ে গেছে। যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) প্রেরণ। আমানতের খিয়ানত করা। মাস্জিদ অধিক মাত্রায় সাজ সজ্জা ও তা নিয়ে গর্ব করা। বড় বড় অট্রালিকা নিয়ে রাখালদের গর্ব করা। ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ ও তাদের নিহত হওয়া। সময় নিকটবর্তী হওয়া, আমল কমে যাওয়া, ফিৎনা-ফাসাদ প্রকাশ পাওয়া, অধিক হত্যা হওয়া, ব্যভিচার ও অন্যায় কাজ অধিক মাত্রায় হওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **কিয়ামত আসন্ন ও চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।** *(সূরা আল-ক্বামার-আয়াত-১)*

(খ) বড় আলামতঃ যা কিয়ামতের পূর্ব মূহুর্তে সংঘঠিত হবে এবং কিয়ামত শুরু হওয়ার সতর্ক করবে। এমন বড় আলামত দশটি। একটিও প্রকাশিত হয়নি।

বড় আলামত সমূহ যেমনঃ ইমাম মাহ্দীর আগমণ, দাজ্জালের আগমণ, ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর আকাশ হতে ন্যায় বিচারক হিসাবে অবতরণ, তিনি খৃষ্টানদের ক্রুসেড ভেঙ্গে দিবেন, দাজ্জাল ও শুকুরকে হত্যা করবেন। করের আইন রহিত করবেন। ইসলামী শরীয়াত অনুপাতে বিচার পরিচালনা করবেন। ইয়াজুজ, মা'জুজ বের হবে। তাদের ধ্বংসের দু'আ করবেন, অতঃপর তারা মারা যাবে। তিনটি বড় ভূমি কম্প হবে। পূর্বে একটি, পশ্চিমে একটি, জাজিরাতুল আরবে একটি। ধোঁয়া বের হবে, তা হল আকাশ হতে প্রচন্ড ধোঁয়া নেমে এসে সকল মানুষকে ঢেকে নিবে। কুরআন জমিন হতে আকাশে তুলে নেওয়া হবে। পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হবে। এক (অদ্ভুত) চতুস্পদ জন্তু বের হবে। ইয়ামানের আদন (জায়গার নাম) হতে ভয়ানক আগুন বের হয়ে মানুষদের শামের দিকে নিয়ে আসবে। এটাই সর্বশেষ বড় আলামত।

হুযাইফা বিন উসাঈদ আল-গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন। তিনি (হুযাইফা) বলেনঃ

অর্থঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট আগমণ করলেন, এমতাবস্থায় আমরা এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ছিলাম। তিনি বল্লেন তোমরা কি বিষয় আলোচনা করতেছ? তাঁরা বল্লেন আমরা কিয়ামতের ব্যাপারে আলোচনা করতেছি। তিনি বল্লেনঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষন না তোমরা তার পূর্বে দশটি আলামত সংঘঠিত হতে দেখবে। অতঃপর আলামত সমূহ উল্লেখ করলেনঃ ধোঁয়া, দাজ্জাল, চতুস্পদ জন্তু পশ্চিম দিক হতে সূর্য উঠা, ঈসা বিন মারিইয়াম এর আগমণ, ইয়াজুজ-মা'জুজ আগমণ, তিনটি ভূমি কম্প- একটি পূর্বে আর একটি পশ্চিমে, আর একটি জাজিরাতুল আরবে, শেষ আলামত হল ইয়ামান হতে আগুন বের হয়ে মানুষদেরকে হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে। *(মুসলিম শরীফ)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেনঃ

অর্থঃ আমার উম্মাতের শেষ ভাগে ইমাম মাহ্দী বের হবেন, তার উপর আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষন করবেন। জমিন উদ্ভিদ জন্ম দিবে। সুস্থ্য ও সচ্ছল লোকদের মাল প্রদাণ করা হবে। চতুস্পদ জানুয়ারের সংখ্যা বেড়ে যাবে। উম্মাতের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তিনি সাত অথবা আট বছর বসবাস করবেন। *(হাকেম)*

বর্ণিত আছে যে ঐ নিদর্শন গুলো পর্যায় ক্রমে সংগঠিত হবে, যেমন পুথির মালায় পুথি পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে। এগুলোর একটি সংঘঠিত হওয়ার পর পরই অপরটি সংঘঠিত হবে। এ দশটি নিদর্শন সংঘঠিত হওয়ার পর পরই আল্লাহর আদেশে কিয়ামত সংঘঠিত হবে।

কিয়ামত দ্বারা কি বুঝায়ঃ কিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ দিন, যে দিন মানুষ আল্লাহর আদেশে তাদের কবর হতে বের হবে, হিসাব নিকাশের জন্য, অতঃপর সৎকর্মশীল সুফল ও শাস্তি এবং অসৎ কর্মশীল শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **সে দিন তারা কবর থেকে দ্রত বেগে বের হবে-যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে।** *(সূরা আল-মাআরিজ, আয়াত-৪৩)*

এ দিনের একাধিক নাম কুরআন কারীমে উল্লেখ্য হয়েছে।

যেমন- (يوم القيامة) ইয়াওমুল ক্বিয়ামাহ, (القارعة)আল-ক্বারিয়াহ, ((يوم الحساب)ইয়াওমুল হিসাব, ((يوم الدين)ইয়াওমুদ্দিন, (الطامة) আত্ত্বামাহ, ((الواقعة) আল-ওয়াক্বিয়াহ, ((الحاقة) আল-হাক্কাহ, ((الصاخة)আস্সাখ্খাহ, ((الغاشية) আল-গাশিয়াহ, ইত্যাদি।

(يوم القيامة) *ইয়াওমুল ক্বিয়ামাহ্ঃ*

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **কিয়ামাত দিবসের শপথ।** *(সূরা আল-ক্বিয়ামাহ, আয়াত- ১)*

(القارعة) আল-ক্বারিয়াহ্ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **(আল ক্বারিয়াহ্) করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কি?** *(সূরা আল-ক্বারিয়াহ, আয়াত-১-২)*

(يوم الحساب) ইয়াওমুল হিসাবঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কোঠর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়।** *(সূরা ছোয়াদ, আয়াত- ২৬)*

(يوم الدين) ইয়াওমুদ্ দিনঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **এবং পাপিষ্টরা থাকবে জাহান্নামে, তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে।** *(সূরা আল- ইন্‌ফিতার, আয়াত-১৪-১৫)*

(الطّامة) আত্‌ত্বামাহ্ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে।** *(সূরা আন্ নাযিআত, আয়াত-৩৪)*

(الواقعة) আল-ওয়াক্বিয়াহ্ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে।** *(সূরা আল-ওয়াকিয়াহ্, আয়াত- ১)*

(الحاقة) আল-হাক্কাহ্ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **সুনিশ্চিত বিষয়, সুনিশ্চিত বিষয় কি?** *(সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত-১-২)*

(الصّاخة) আস্‌সাখ্‌খাহ্ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **অতঃপর যে দিন কর্ণ বিদারক আওয়াজ আসবে।** *(সূরা আবাসা-আয়াত, ৩৩)*

(الغاشية) আল-গাশিয়াহ্ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?** *(সূরা আল-গাশিয়াহ, আয়াত-১)*

(২) শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার নিয়মঃ

শেষ দিবসের প্রতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত ভাবে ঈমান আনা।

শেষ দিবসের প্রতি সংক্ষিপ্ত ঈমান আনা হলঃ এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, এমন একটি দিন রয়েছে, যে দিন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করবেন। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব কর্মের প্রতিদান প্রদান করবেন। একদল জান্নাতী হবে, অপর দল জাহান্নামী হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **বলুনঃ নিশ্চয় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই একটি নির্ধারিত দিনে একত্রিত হবে।** *(সূরা আল-ওয়াকিয়াহ্-আয়াত- ৪৯-৫০)*

শেষ দিবসের প্রতি বিস্তারিত ঈমান হলঃ মৃত্যুর পর যা কিছু সংঘঠিত হবে তার প্রতি

বিস্তারিত ঈমান আনাঃ

আর ইহা নিম্নে বর্ণিত বিষয় গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রথমতঃ ফিৎনাতুল কবর বা কবরের পরিক্ষা

আর তা হলো, মৃত্যু ব্যক্তিকে দাফনের পর তাকে তার রব্ব, দ্বীন ও নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হবে। অতঃপর যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আল্লাহ সত্যের উপর অটল রাখবেন।

যেমন হাদীসে এসেছেঃ

অর্থঃ যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হবে, সে বলবেঃ আমার রব্বআল্লাহ আমার দ্বীন আল-ইসলাম, আমার নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

ফিরিশ্তাদ্বয়ের প্রশ্ন করা ও তাঁর পদ্ধতি, মু'মিনরা ও মুনাফিকরা কি উত্তর দিবেন এ সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীসের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব।

দ্বিতীয়তঃ কবরের শাস্তি ও শান্তি

কবরের শাস্তি ও শান্তির প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব।

নিশ্চয় ইহা (কবর) জাহান্নামের গর্তের একটি গভীর গর্ত, অথবা জান্নাতের বাগানের একটি বাগান।

আর কবর আখিরাতের প্রথম ধাপ বা স্টেশন। যে ব্যক্তি কবর হতে মুক্তি পাবে (তার জন্য) কবরের পরে ধাপ গুলো হতে মুক্তি পাওয়া সহজ হবে। আর যে ব্যক্তি, কবর হতে মুক্তি পাবেনা তার জন্য এর পরের ধাপ গুলো মুক্তি পাওয়া আরো কঠিন হবে। যার মৃত্যু হল তখন হতে তার কিয়ামত শুরু হয়ে গেল।

অতঃপর আত্না ও শরীর, উভয়ে কবরে শাস্তি বা শান্তি ভোগ করবে। আর কখনো কখনো শুধু আত্না ভোগ করবে। আর কবরের আযাব বা শাস্তি শুধু মাত্র যালেমদের জন্য, আর শান্তি শুধু মাত্র সত্যবাদী মু'মিনদের জন্য।

আর মৃত্যু ব্যক্তি কবর জীবনের শাস্তি অথবা শান্তি প্রাপ্ত হবে, চাই

ভূগর্ভস্ত করা হোক বা নাই হোক। যদি ও মৃত্যু ব্যক্তিকে আগুনে জালিয়ে দেওয়া হয়, অথবা পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, অথবা হিংস্র পশু পাখি খেয়ে ফেলে তার পরও সে এ শাস্তি অথবা শান্তি ভোগ করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর।** *(সূরা গাফির, আয়াত- ৪৬)*

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ হায়!! যদি তোমরা (তাদেরকে) দাফন না করতে তা হলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করতাম তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনানোর জন্য। *(মুসলিম)*

তৃতীয়তঃ শিঙ্গায় ফুৎকার

শিঙ্গা হল বাঁশী সরূপ, যাতে ইস্রাফীল (আলাইহিস্ সালাম) ফুৎকার দিবেন। প্রথম ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ যা জিবীত রাখবেন তা ছাড়া সকল সৃষ্টি জীব মৃত্যুবরণ করবে। দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই পৃথিবী সৃষ্টি হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত সৃষ্টিজীবের আর্বিভাব হয়েছিল, তারা সকলেই উঠে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমিনে যারা আছে সকলে বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সে ব্যতীত। অতঃপর আবার ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষনাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে।** *(সূরা আয্যুমার, আয়াত-৬৮)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ অতঃপর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথে সকলেই স্কান্ধ উচু করবে। অতঃপর সকলেই জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে যাবে। তার পর আল্লাহ হালকা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। বৃষ্টি হতে মানুষের দেহ তৈরী হবে। তার পর সিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই সকলে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে। *(মুসলিম)*

চতুর্থতঃ পুনরুত্থান

তা হলো শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়ার সময় আল্লাহ সকল মৃতদের জীবিত করবেন।

তারা সকলে সমগ্র বিশ্বের প্রতি পালকের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা শিঙ্গায় ফোঁকা ও প্রত্যেক আত্নাকে স্ব-শরীরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলে সকল মানুষ তাদের কবর হতে দাঁড়িয়ে জুতা বিহীন নাঙ্গা পা, বস্ত্র-বিহীন-উলঙ্গ শরীর, খাৎনা বিহীন ও দাঁড়ি-গোঁফ বিহীন অবস্থায় দ্রুত ময়দানের দিকে ছুটে যাবে।

ময়দানের অবস্থান দীর্ঘ হবে, সূর্য তাদের নিকটবর্তী হবে, সূর্যের উত্তাপ বেড়ে যাবে। এ উত্তপ্ত ও কঠিন অবস্থান দীর্ঘ হওয়ায় শরীর হতে নির্গত ঘামে হাবু-ডুবু খাবে, কারো ঘাম পায়ের দু'গিঁঠা পর্যন্ত, কারো দু'হাটু পর্যন্ত, কারো মাজা পর্যন্ত, কারো বক্ষ পর্যন্ত, কারো দু'কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছবে। আর কেউ-সম্পূর্ণ ভাবে হাবুডুবু খাবে, এ সব হলো তাদের (ভাল-মন্দ) কর্ম অনুপাতে।

পুনরুত্থান সত্য ও নিশ্চিত, যা ইসলামী শরীয়া (কুরআন ও হাদীস) অনুভূতি শক্তি ও বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা প্রমাণিত।

ইসলামী শরীয়াঃ এর স্বপক্ষে প্রমাণ কুরআনে অনেক আয়াত ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে**। (সূরা আত্তাগাবুন, আয়াত-৭)

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব**। *(সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত, ১০৪)*

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে সকলেই স্কান্ধ উচু করবে অতঃপর সকলেই জ্ঞান হারা হয়ে পড়ে যাবে। তার পর আল্লাহ হালকা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। বৃষ্টি হতে মানুষের দেহ তৈরী হবে। তার পর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথেই সকলে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে। *(মুসলিম)*

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ বলে, কে জীবিত করবে অস্থি সমূহকে যখন সে গুলো গলে পচে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সে গুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্ব প্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত। *(সূরা ইয়াসীন, আয়াত-৭৮-৭৯)*

الحسঃ (আল-হিস্স) বা অনুভূতী হতে দলীল হলঃ

আল্লাহ এই পৃথিবীতে অনেক মৃত্যুকে জিবীত করে তাঁর বান্দাদেরকে দেখিয়েছেন। আর এ বিষয়ে সূরা বাক্বারায় পাঁচটি উপমা রয়েছে, মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর সম্প্রদায় যাদেরকে আল্লাহ তাদের মৃত্যুর পর জীবিত করেছিলেন।

বানী ইস্রাঈলের এক নিহিত ব্যক্তিকে জীবিত করেছিলেন। ঐ সম্প্রদায়কে জীবিত করেছিলেন-যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের গ্রাম ত্যাগ করেছিল। ঐ ব্যক্তিকে যে, জনপদ দিয়ে অতিক্রম করেছিল, ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর পাখি সমূহকে।

العقلঃ (আল-আক্বল) বা বিবেক হতে দলীল হলঃ

ইহা দু'ভাবে হতে পারেঃ

- আল্লাহ আসমান ও যমিন এবং এতদ্বয়ের মধ্যে যা রয়েছে সকলকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ আসমান যমিন প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। যিনি প্রথম সৃষ্টির উপর ক্ষমতাবান তিনি (তাকে) পূনরায় সৃষ্টি করার ব্যাপারে অপারগ নন।
- যমিন শুশক ও নির্জীব হয়ে যায়, অতঃপর বৃষ্টি অবতীর্ণ করে যমিনকে সতেজ ও সজীব করে তুলেন, সর্ব প্রকার সবুজ-শ্যামল গাছ পালা উৎপন্ন হয়, সুতরাং যিনি এ মৃত যমিনকে জীবিত করতে সক্ষম তিনিই মৃতদের পূনরায় জীবিত করাতেও সক্ষম।

পঞ্চমতঃ হাশর, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও প্রতিফল

আমরা ঈমান আনবো যে, সকল দেহের হাশর নাশর হবে, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তাদের মাঝে বিচারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং সকল সৃষ্টিজীবকে স্বীয় কৃত কর্মের প্রতিদান ও প্রতিফল প্রদান করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **এবং আমি তাদেরকে একত্রিত করব, অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়বনা**। *(সূরা আল-ক্বাহাফ, আয়াত-৭৪)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **অতঃপর যার আমল নামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ নাও, তোমরা ও আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে**। *(সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত-১৯-২১)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **অতঃপর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ হায় আমায় যদি আমার আমলনামা না দেয়া হতো। আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব।** (*সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত-২৫-২৬*)

অতঃপর হাশর হলঃ মানুষদেরকে তাদের হিসাব-নিকাশের জন্য ময়দানে একত্রিত করা।

হাশর ও পুনরুত্থানের মধ্যে পার্থক্যঃ

পুনরুত্থান হলঃ দেহ সমূহকে পুনরুজ্জীবিত করা।

হাশর হলঃ পুনরুত্থিত ব্যক্তিদেরকে অবস্থান ময়দানে একত্রিত করা।

হিসাব, নিকাশ, ও প্রতিফলঃ আল্লাহু তা'বারাকা ও তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সামনে দাঁড় করাবেন, ও তাদেরকে তাদের সম্পাদীত কর্ম সম্পর্কে অবগত করবেন।

অতঃপর মু'মিন মুত্তাকীনদের হিসাব নিকাশ হল, শুধু মাত্র তাদের নিকট তাদের কর্ম পেশ করা হবে। যাতে তারা তাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বুঝতে পারে, যা (অনুগ্রহ) আল্লাহ তাদের নিকট হতে দুনিয়াতে গোপন রেখেছিলেন। আর আল্লাহ আখিরাতে তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। আর তাদের হাশর হবে তাদের ঈমান অনুপাতে। ফিরিশ্তারা তাদেরকে স্বাগত জানাবে ও জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ প্রদান করবে, আর তাদেরকে অস্থিরতা ও সকল প্রকার ভয়-ভীতি এবং এ কঠিন দিনের ভয়াবহতা হতে নিরাপত্তা দিবে, অতঃপর তাদের মুখমন্ডল উজ্জল হবে। আর মুখমন্ডল সে দিন হাসি-খুশী, আনন্দ-উৎফুল্ল সুসংবাদ প্রাপ্ত হবে। অতঃপর বিমুখ মিথ্যাবাদীদের (কাফেরদের) হিসাব নিকাশ অত্যান্ত কঠিনভাবে হবে। শুক্ষ্ম প্রত্যেকটি ছোট বড় কর্মের। কিয়ামত দিবসে তাদেরকে তাদের মুখের উপর টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে ফেলা হবে, তাদেরকে লাঞ্চিত করার জন্য ও তাদের কৃত কর্মের ফল হিসাবে এবং তাদের মিথ্যা বলার কারণে।

কিয়ামত দিবসে সর্ব প্রথম হিসাব নেওয়া হবে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মাতের, তাদের সাথে সত্তর হাজার লোক তাদের পূর্ণ তাওহীদের বদৌলাতে বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ঐ সকল লোক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের ভাষায় যাদের গুণ বর্ণনা করেছেন, তারা কারো নিকট ঝাড় ফুঁক অনুসন্ধান করেননি, লৌহ্ জাতীয় কোন কিছুর ছেঁক দিয়ে চিকিৎসা নেননি। কোন দিন বদ ও নেক ফল গ্রহণ করেননি। আর তারা তাদের রব্বের উপরেই ভরসা করতেন। আর তাঁদের মধ্যে হলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী উক্কাশা বিন মিহসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। আর বান্দার সর্ব প্রথম হিসাব নেওয়া হবে আল্লাহর হক্ব-সালাতের (নামাযের)। এবং মানুষের মাঝে সর্ব প্রথম ফায়সালা করা হবে রক্তপাতের।

ষষ্ঠতঃ হাউজ

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাউজের প্রতি ঈমান আনবো। আর ইহা বিশাল হাউজ ও সম্মানিত অবতরণ স্থান। কিয়ামতের মাঠে জান্নাতের আল-কাউসার নামক নদী হতে শরাব প্রবাহিত হবে। এতে অবতরণ করবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মু'মিন উম্মাতেরা।

হাউজের কিছু বৈশিষ্টঃ ইহার শারাব দুধের চাইতে সাদা, বরফের চাইতে ঠান্ডা, মধুর চাইতে অধিক মিষ্টি। মিশকের চাইতে সুগন্ধি, ইহা সুপ্রসস্ত যার দৈর্ঘ ও প্রস্থ সমান, এর প্রতিটি প্রান্তের আয়তন এক মাসের পথের সমান। এতে জান্নাত হতে প্রবাহিত দু'টি নালা রয়েছে। আর এর পানি পাত্র আকাশের তারকারাজির চাইতে অধিক। যে ব্যক্তি ইহা হতে একবার পানি পান করবে, সে আর কখনও পিপাসিত হবে না।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ আমার হাউজের আয়তন এক মাসের পথ সমতুল্য, তার পানি দুধের চাইতে সাদা ও তার ঘ্রাণ মিশকের চাইতে সুগন্ধি, তার পানি পাত্র আকাশের তারকা রাজির সংখ্যার ন্যায়। যে ব্যক্তি ইহা হতে একবার পানি পান করবে সে আর কখনও পিপাসিত হবেনা। (*বুখারী*)

সপ্তমতঃ শাফায়াহ্

যখন সেই মহান প্রান্তরে মানুষের বিপদ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, এবং সেথায় তাদের অবস্থান দীর্ঘ হবে। তখন তারা এ প্রান্তরের ভয়াবহ বিপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তাদের রব্বর নিকট সুপারিশ করা হোক এর প্রচেষ্টা করবে। রাসূলদের মধ্য হতে যারা উলুল আজম (নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ও ঈসা) (আলাইহিস সালাম) তাঁরা অপারগতা স্বীকার করবেন। পরে ইহা সর্ব শেষ রাসূল আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকটে পৌঁছাবে যার আগের ও পরের গুনাহ্ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন স্থানে দাঁড়াবেন যে স্থানে আগের ও পরের সকলেই তাঁর প্রশংসা করবে। এবং এর দ্বারা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহা সম্মান ও উঁচু মর্যাদা প্রকাশিত হবে। তার পর আরশের নিচে সিজ্দা করবেন, আল্লাহ তাঁর নিকট অনেক প্রশংসা, উপযুক্ত আদেশ ইলহাম করবেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) এর দ্বারা তাঁর (আল্লাহর) প্রশংসা করবেন, ও তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করবেন। তার পর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রব্বের নিকট (তাদের জন্য) সুপারিশ করার অনুমতি চাইবেন। আল্লাহ তা'আলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সৃষ্টিজীবের সুপারিশ করার জন্য ঐ অনুমতি দিবেন। যাতে বান্দাদের মাঝে অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা ভোগের পর সুষ্ট ফায়সালা করা হয়।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ কিয়ামত দিবসে সূর্য নিকটে হবে। এমনকি ঘাম অর্ধ কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তারা এই অবস্থাতেই থাকবে। ফলে তারা আদম (আলাইহিস্ সালাম) অতঃপর ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) অতঃপর মূসা (আলাইহিস্ সালাম) অতঃপর ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) অতঃপর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে প্রার্থনা করবে।

অতঃপর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুপারিশ করবেন। যাতে সৃষ্টিজীবের মাঝে ফায়সালা সুসম্পূর্ণ করা হয়। অতঃপর তিনি জান্নাতের দিকে অগ্রসর হবেন, ও জান্নাতের দরজার কড়া (খোলার জন্য) ধরবেন। আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রশংসিত স্থানে অবতরণ করাবেন। সে স্থানের সকলে প্রশংসা করবে। *(বুখারী)*

এ মহান শাফায়াত আল্লাহ একমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এ ছাড়া তিনি আরো অনেক শাফায়াতের অধিকারী হবেন।

(১) জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমুতির জন্যে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শাফায়াত।

তার প্রমাণঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ আমি কিয়ামত দিবসে জান্নাতের দরজার নিকটে আসবো, দরজা খোলার অনুমতি চাবো। অতঃপর জান্নাতের প্রহরী বলবেন, আপনি কে? আমি উত্তরে বলবঃ আমি মুহাম্মাদ, অতঃপর প্রহরী বলবেঃ আপনার জন্যই শুধু দরজা খোলার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি, আপনার পূর্বে কারো জন্য (দরজা) খুলিনি। *(মুসলিম)*

(২) তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শাফায়াত ঐ সকল ব্যক্তির জন্য যাদের নেকী ও বদী বা সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সমান হয়ে গেছে। তাদের জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে শাফায়াত করবেন। ইহা কিছু বিদ্যানদের অভিমত। কিন্তু এ ব্যাপারে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম হতে কোন সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়নি।

(৩) তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শাফায়াত, ঐ সম্প্রদায়ের জন্যে যারা জাহান্নামের অধিকারী হয়ে গেছে, তাদেরকে জাহান্নামে না দেওয়ার ব্যাপারে। এর প্রমাণ হলঃ

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসঃ

অর্থঃ আমার উম্মাতের মধ্যে যারা কাবীরাহ্ গোনাহ্ করেছে তাদের জন্য আমার শাফায়াত। *(আবু দাউদ)*

(৪) তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শাফায়াত, জান্নাতে জান্নাতীদের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে।

তার প্রমাণঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসঃ

অর্থঃ হে আল্লাহ আবূ সালমাকে মাফ কর এবং সঠিক পথ প্রাপ্তদের সাথে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দাও। *(মুসলিম)*

(৫) তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শাফায়াত, ঐ সকল সম্প্রদায়ের জন্য যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে।

এর প্রমাণঃ উক্কাশাহ্ বিন মিহ্সান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসঃ সত্তর হাজার লোকের ব্যাপারে, যারা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার (উক্কাশাহ্) জন্য দু'আ করলেনঃ

অর্থঃ হে আল্লাহ্ তাকে (উক্কাশাকে) তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(৬) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উম্মাতের মধ্যে হতে যারা কাবীরাহ্ গোনাহ করায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করার ব্যাপারে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শাফায়াত।

এর প্রমাণ হলঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসঃ

অর্থঃ আমার উম্মাতের কাবীরাহ্ গোনাহ্ কারীদের জন্য আমার শাফায়াত। *(আবু দাউদ)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আরো একটি হাদীস হলঃ

অর্থঃ এক দল লোক নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শাফায়াতে জাহান্নাম হতে বের করা হবে, অতঃপর তারা জান্নাতে যাবে। তাদেরকে জাহান্নামী বলে নাম করণ করা হবে। *(বুখারী)*

(৭) যারা শাস্তির হক্বদার হবে তাদের শাস্তি হালকা করার ব্যাপারে তাঁর শাফায়াত, যেমন-তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাচা আবু তালেবের জন্য শাফায়াত।

এর প্রমাণঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস হলঃ

অর্থঃ সম্ভবত কিয়ামতের দিবসে আমার শাফায়াত তার শাস্তি লাঘবে উপকারে আসবে, তাই শাস্তি হিসাবে শুধু পায়ের গিঠা পর্যন্ত দু'টি জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, ফলে মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

আল্লাহর নিকট শাফায়াত গ্রহণ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে।

(ক) শাফায়াত কারীর ও শাফায়াত কৃত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকতে হবে।

(খ) শাফায়াত কারীর শাফায়াত করার ব্যাপারে আল্লাহর অনুমতি থাকতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি, আল্লাহ সন্তুষ্ট**। *(সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত, ২৮)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করার কে অধিকার রাখে?** *(সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-২৫৫)*

অষ্টমতঃ মিযান বা মানদন্ড

মিযান বা মানদন্ড সত্য এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। আর ইহা (মিযান বা মানদন্ড) আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে স্থাপন করবেন, বান্দাদের আমল মাপার ও তাদের কর্মের প্রতিদান প্রদানের জন্য। ইহা বাস্তব মিযান বা মানদন্ড কাল্পনিক নয়, এর দু'টি পাল্লা ও রশি রয়েছে, এর দ্বারা কর্ম অথবা আমলনামা অথবা স্বয়ং কর্ম সম্পাদন কারীকে মাপা হবে। সবই মাপা হবে, তবে ওজন ভারি-হালকার বিষয়বস্তু হবে শুধু কর্ম। কর্ম সম্পাদনকারী ও আমল নামা নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আমি কিয়ামত দিবসে ন্যায় বিচারের মিযান বা মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমানও হয় আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহনের জন্য আমিই যথেষ্ট**। *(সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত-৪৮)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **আর সে দিন যথার্থই ওজন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারি হবে, তারাই সফলকাম হবে। এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াত সমূহ অস্বীকার করতো**। *(সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত-৮-৯)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ পবিত্রতা অর্জন করা ঈমানের অর্ধেক। আল-হামদুলিল্লাহ্ (সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য) বাক্যটি ওজনের পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দেয়। *(মুসলিম)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেনঃ

অর্থঃ কিয়ামত দিবসে এমন মিযান বা মানদন্ড স্থাপন করা হবে, তাতে যদি সাত আসমান ও সাত জমিনও মাপা হয় সম্ভব হবে।

নবমতঃ আস্ সিরাত বা পুল সিরাত

আর আমরা পুল সিরাতের প্রতি ঈমান আনবো। আর তা হলো জাহান্নামের পিঠের উপর স্থাপিত পুল, যা ভয়-ভীতি সন্ত্রস্ত অতিক্রম স্থল বা পথ। এর উপর দিয়ে মানুষ জান্নাতের দিকে অতিক্রম করবে। কেউ অতিক্রম করবে চক্ষের পলকের ন্যায়। কেউ অতিক্রম করবে বিজলীর ন্যায়। কেউ বাতাসের ন্যায়। কেউ পাখির ন্যায়। কেউ ঘোড়ার ন্যায় চলবে। কেউ মুসাফিরের ন্যায় চলবে। কেউ ঘন ঘন পা রেখে চলবে। সর্ব শেষ যারা অতিক্রম করবে তাদেরকে টেনে ফেলা হবে। সকলেই অতিক্রম করবে তাদের কর্মের ফলাফল অনুপাতে। এমন কি যার আলো তার পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুলের পরিমাণ হবে সেও অতিক্রম করবে। কাউকে থাবা মেরে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি পুল সিরাত অতিক্রম করতে পারবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সর্ব প্রথম আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতঃপর তাঁর উম্মাত পুল সিরাত পাড়ি দিবেন। আর সে দিন একমাত্র রাসূলগণ কথা বলবেন। রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) দের কথা হবে। (اللهم سلم سلم অর্থঃ হে আল্লাহ্ মুক্তি দাও, মুক্তি দাও।

জাহান্নামে পুল সিরাতের দু'ধারে হুকের ন্যায় কন্টক থাকবে, এর সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেহ্ জানেনা। সৃষ্টি-জীব হতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন তাকে থাবা মেরে (জাহান্নামে) ফেলে দেয়া হবে।

পুল সিরাতের কিছু বর্ণনাঃ

ইহা তরবারীর চাইতে ধারালো, আর চুলের চাইতে সূক্ষ্ম ও পিচ্ছিল জাতীয়। ইহাতে আল্লাহ্ যাদের পা স্থীর রাখবেন, শুধু মাত্র তাদেরই পা স্থীর থাকবে, আর ইহা অন্ধকারে স্থাপিত হবে। আমানত ও আত্নীয়তা বন্ধনকে পুল সিরাতের দু'পার্শে দন্ডায়মান অবস্থায় রাখা হবে, যারা ইহা সংরক্ষন করেছেন তাদের স্বপক্ষে, আর যারা সংরক্ষন করেনি তাদের বিপক্ষে সাক্ষী দেওয়ার জন্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় (পুল সিরাতে) পৌঁছবেনা এটা আপনার পালন কর্তার অনিবার্য ফায়সালা। অতঃপর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিব।** *(সূরা মারইয়াম, আয়াত-৭১-৭২)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেনঃ

অর্থঃ জাহান্নামের পিঠের উপর পুল সিরাত স্থাপন করা হবে, আর সর্ব প্রথম আমি ও আমার উম্মাত তা অতিক্রম করবো। *(মুসলিম)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ

অর্থঃ জাহান্নামের পুল স্থাপন করা হবে, অতঃপর আমিই সর্ব প্রথম অতিক্রম করবো। আর সে দিন রাসূলদের দু'আ হবে, আল্লাহুম্মা সাল্লিম, সাল্লিম, (হে আল্লাহ! মুক্তি দাও, মুক্তি দাও)। *(বুখারী মুসলিম)*

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ

অর্থঃ আমি সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি যে, পুল-সিরাত চুলের চাইতে সূক্ষ্ম আর তরবারীর চাইতে ধারালো হবে। *(মুসলিম)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ আমানত ও আত্নীয়তার বন্ধনকে প্রেরণ করা হবে, অতঃপর পুল সিরাতের ডানে ও বামে দাঁড়াবে, তোমাদের মধ্যে সর্ব প্রথম যারা অতিক্রম করবে, তারা বিজলীর ন্যায় অতিক্রম করবে, তার পর যারা অতিক্রম করবে তারা বাতাসের ন্যায়। তার পর পাখির ন্যায় অতিক্রম করবে, তার পর মুসাফিরের ন্যায় অতিক্রম করবে, তাদের কর্ম তাদেরকে অতিক্রম করাবে। আর তোমাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুল সিরাতের পার্শ্বে দন্ডায়মান থাকবেন, এবং বলবেনঃ হে রব্বমুক্তি দাও, মুক্তি দাও। এভাবে বান্দাদের কর্ম অপারগ হয়ে যাবে, এমন কি কিছু লোক হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম করবে। পুল সিরাতের দু'ধারে ঝুলন্ত হুকের ন্যায় কন্টক থাকবে, যাদেরকে গ্রেফতার করার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে তাদেরকে গ্রেফতার করবে। অতঃপর কিছু আহত হয়ে মুক্তি পাবে, আর কিছু চাপাচাপি করে জাহান্নামে পড়ে যাবে। *(মুসলিম)*

দশমতঃ আল-কানত্বারাহ্

আমরা ঈমান আনবো এ কথার প্রতি যে, মু'মিনেরা পুল সিরাত অতিক্রম করে কানতারাতে অবস্থান করবে বা দাঁড়াবে। আর ইহা (কানত্বারাহ্) হল জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান, এখানে ঐ সকল মু'মিনদেরকে দাঁড় করানো হবে, যারা পুল সিরাত অতিক্রম করে এসেছে এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়েছে, জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে একে অপরের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে (এখানে দাঁড় করানো হবে)। অতঃপর তাদের পরি-শুদ্ধির পর জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ মু'মিনেরা জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে, তার পর তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী কানত্বারাহ্ নামক স্থানে একত্রিত করা হবে। তার পর দুনিয়াতে তাদের মাঝে যে জুলুম নির্যাতন ঘটেছিল একে অপরের পক্ষ হতে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। যখন তারা এসব হতে মুক্ত হবে তখন তাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর শপথ সেই সত্তার যার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রাণ, নিশ্চয় তাদের প্রত্যেকের দুনিয়ার বাসস্থান হতে জান্নাতের বাসস্থান উত্তম। *(বুখারী)*

একাদশতমঃ জান্নাত ও জাহান্নাম

আমরা ঈমান আনবো যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, এ দু'টি (জান্নাত ও জাহান্নাম) বর্তমান বিদ্যমান রয়েছে, আর ইহা কখনো ধ্বংস হবে না এবং চিরস্থায়ীও নয়, বরং সর্বদায় রয়েছে। আর জান্নাতবাসীদের নি'আমত শেষ ও ঘাটতি হবে না, অনুরূপ জাহান্নামীদের মধ্যে যার ব্যাপারে আল্লাহ চিরস্থায়ী শাস্তির ফায়সালা করেছেন তার শাস্তি কখনও বিরত ও শেষ হবে না।

তবে তাওহীদ পন্থীরাঃ আল্লাহর রহমতে ও শাফায়াত কারীদের শাফায়াতে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবেন।

জান্নাত হলঃ অতিথীশালা, যা আল্লাহ্ কিয়ামতে মুত্তাকীনদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। তথায় রয়েছে প্রবাহিত নদী উন্নত ও সুউচ্চ কক্ষ, মনোলোভা রমণী, সমূহ। তথায় আরো রয়েছে মনঃপূত-মনোহর সামগ্রী যা কোন দিন কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ন শ্রবণ করেনি, আর কোন মানুষের অন্তরেও কোন দিন কল্পনায় আসেনি। জান্নাতের নি'আমত চিরস্থায়ী কোন দিন শেষ হবেনা। জান্নাতে কোড়া সমতুল্য জায়গাহ্ দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে উত্তম। আর জান্নাতের সুগন্ধী চল্লিশ বৎসর দূরত্বের রাস্তা হতে পাওয়া যায়। জান্নাতে মু'মিনদের জন্য সব চাইতে বড় নি'আমত হলো আল্লাহকে সরাসরি স্বচক্ষে দর্শনলাভ করা।

কিন্তু কাফেররা আল্লাহর দর্শনলাভ হতে বঞ্চিত হবেঃ আর যারা মু'মীনদের জন্য তাদের রব্বর দর্শনকে অস্বীকার করলো সে বস্তুর এই বঞ্চিত হওয়াতে মু'মিনদেরকে কাফেরদের সমকক্ষ করলো। আর জান্নাতে একশতটি ধাপ রয়েছে, এক ধাপ হতে অপর ধাপের দূরুত্ব আসমান হতে জমিনের দূরত্ব অনুরূপ। আর সবচেয়ে উন্নত ও উত্তম জান্নাত হল, জান্নাতুল ফিরদাউস আল-আলা। এর ছাদ হল আল্লাহর আরশ। আর জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে, প্রত্যেক দরজার পার্শ্বের দৈর্ঘ "মক্কা "হতে "হাজার" এর দূরত্বের সমান। আর এমন দিন আসবে যে দিনে ইহা ভিড়ে পরিপূর্ণ হবে, আর জান্নাতে নূন্যতম মর্যাদার অধিকারী যে হবে তার দুনিয়া ও আরো দশ দুনিয়ার পরিমান জায়গা হবে।

আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সর্ম্পকে বলেনঃ

অর্থঃ **পরহেজগার মু'মিনদের জন্য তৈরী করা হয়েছে**। *(সূরা আলি-ইমরান, আয়াত-১৩৩)*

জান্নাতবাসীদের চিরস্থায়ী ও জান্নাত ধ্বংস হবে না।

এই সর্ম্পকে তিনি বলেনঃ

অর্থঃ **তাদের পালন কর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালন কর্তাকে ভয় করে**। *(সূরা আল-বাইয়্যেনাহ, আয়াত-৮)*

জাহান্নামঃ ইহা শাস্তির ঘর যা আল্লাহ্ কাফের ও অবাদ্ধদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। তথায় বিভিন্ন প্রকার কঠিন শাস্তি রয়েছে। তার পাহারাদার হবে নিষ্ঠুর ও নির্দয় ফিরিশতারা। আর কাফেররা তথায় চিরস্থায়ী থাকবে। তাদের খাদ্য হবে যাক্কুম (কাঁটা যুক্ত) আর পানিয় হবে পুঁজ, দুনিয়ার আগুনের তাপ জাহান্নামের আগুনের তাপ মাত্রার সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চাইতে ৬৯ (উনসত্তর) গুন বেশী, এর প্রত্যেকটি অংশ দুনিয়ার আগুনের ন্যায় বা তার চাইতে আরো উত্তাপ, আর এই জাহান্নাম তার অধিবাসী নিয়ে পরিতুষ্ট হবেনা বরং বলবে যে, আরো আছে কি? তার সাতটি দরজা হবে। প্রত্যেকটি দরজার জন্য নির্ধারিত জাহান্নামীমের অংশ থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম সর্ম্পকে বলেনঃ

অর্থঃ **কাফিরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে**। *(সূরা আলি-ইমরান, আয়াত-১৩১)*

জাহান্নামীরা চিরস্থায়ী এবং তা ধ্বংস হবেনা।

এ সর্ম্পকে তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন, এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে**। *(সূরা আল-আহযাব, আয়াত-৬৪-৬৫)*

(৩) শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার ফলাফল

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার অনেক সূফল রয়েছে।

- ছাওয়াবের আশায় আনুগত্য ও কর্ম সম্পাদনে আগ্রহী ও উৎসাহী হওয়া।

- এ দিবসের শাস্তির ভয়ে অবাদ্ধতায় লিপ্ত ও ততপ্রতি সন্তষ্ট থাকা হতে ভয় করা ।
- আখেরাতে মু'মিনরা যে নি'আমত ও ছাওয়াব পাবে এ আশা- আকাঙ্খায় দুনিয়ার ছুটে যাওয়া জিনিস হতে নিজের শান্তনা লাভ করা ।
- ব্যক্তি ও সমাজিক জীবনে সৌভাগ্যের মূল উৎস হল শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা । কারণ মানুষ যখন এ কথার প্রতি ঈমান আনবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জীবকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করবেন ও তাদের হিসাব নিকাশ নিবেন, এবং তাদের কর্মের প্রতিদান প্রদান করবেন । মায্‌লুমের (অত্যাচারিত) পক্ষে যালিম (অত্যাচার কারী) ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন । তখন সে আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, সকল অকল্যাণের জড় নিঃশেষ হয়ে যাবে । সমাজে কল্যাণ বিস্তার লাভ করবে, এবং সর্বত্র সম্মান-মর্যাদা, শাস্তি ও নিরাপত্তা ছড়িয়ে পড়বে । প্রশান্তি ও নিরাপত্তা বেড়ে যাবে ।

ষষ্ঠ রুক্নঃ ভাগ্যের প্রতি ঈমান (الرکـ ﻥ السادس: اميما ﻥ بالقدر)

(১) কদরের (ভাগ্যের) সংগা ও তার প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব

কদর বা (ভাগ্য) হলঃ আল্লাহর অনন্ত জ্ঞান ও হিকমাত অনুযায়ী সৃষ্টি কূলের জন্য ভাগ্য নির্ধারণ । আর ইহা আল্লাহর কুদরতের উপর নির্ভলশীল, আর তিনি সর্ব বিষয় ক্ষমতাশীল তিনি যা ইচ্ছা তাহাই করেন ।

আর ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা আল্লাহ্ তা'আলার রুবুবীয়াতের (রব্বত্তের) প্রতি ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত । আর ইহা ঈমানের ছয়টি রুক্নের অন্যতম একটি রুক্ন, এর প্রতি ঈমান আনা ছাড়া এই ছয়টি রুক্নের প্রতি ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবে না ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিত রুপে সৃষ্টি করেছি । *(সূরা আল-ক্বামার, আয়াত-৪৯)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ প্রত্যেক জিনিসই পরিমিত, এমনকি অপারগতা ও অলসতা অথবা অলসতা ও অপারগতাও । *(মুসলিম)*

(২) ভাগ্যের স্তর

চারটি স্তর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবেঃ

প্রথমতঃ আল্লাহর অনন্ত জ্ঞানের প্রতি ঈমান আনা, যা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **তুমি কি জাননা যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অবগত যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে, নিশ্চয় ইহা কিতাবে লিখিত আছে আর নিশ্চয় ইহা আল্লাহর নিকট সহজ** । *(সূরা আল-হাজ্ব আয়াত-৭০)*

দ্বিতীয়তঃ লাউহে মাহ্ফুজে আল্লাহর জানা মোতাবেক ভাগ্য সমূহ লিখে রাখার প্রতি ঈমান আনা ।

আল্লাাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি** । *(সূরা আন-আম আয়াত-৩৮)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ আসমান-জমিন সৃষ্টির ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি জীবের ভাগ্য সমূহ লিখে রেখেছেন । *(মুসলিম)*

তৃতীয়তঃ আল্লাহর কার্যকরী ইচ্ছা ও তাঁর ব্যাপক শক্তির প্রতি ঈমান আনা ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ জগত সমূহের রব্বআল্লাহর ইচ্ছার বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পারে না । *(সূরাতুত্ তাকভীর আয়াত -২৯)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ ব্যক্তিকে বলেনঃ যে ব্যক্তি তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লক্ষ করে বলেছিলেনঃ

আল্লাহ এবং আপনি যাহা চেয়েছেন (ওয়াও দ্বারা আত্বফ করে)।

অর্থঃ তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে? বরং তিনি একাই চেয়েছেন। *(আহ্‌মাদ)*

চতুর্থতঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বস্তুর সৃষ্টি কর্তা ইহার প্রতি ঈমান আনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর অভিবাবক**। *(সূরা-আয্‌যুমার আয়াত- ৬২)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন**। *(সুরা আস্ সাফ্‌ফাত আয়াত, ৯৬)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল আবিস্কারক ও তার আবিস্কারকে সৃষ্টি করেন। *(বুখারী)*

(৩) ভাগ্যের প্রকার

- সকল সৃষ্টি জীবের সাধারণ ভাগ্য লিপিবদ্ধ করণ। আর ইহাই আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগে লাউহে মাহ্‌ফুজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

- সারা জীবনের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করণ। আর তা হল বান্দার মাঝে রুহ্ বা আত্মা ফুঁকে দেওয়ার সময় হতে তার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে নির্ধারণ করা।

- বাৎসরিক ভাগ্য নির্ধারণ করা। ইহা হল, প্রত্যেক বৎসর যা কিছু সংঘটিত হবে তা নির্ধারন করা। আর ইহা প্রত্যেক বৎসরের মহিমান্বিত রজনীতে হতে থাকে।

  আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

  অর্থঃ **এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়**। *(সূরা-আদ্‌দুখান আয়াত-৪)*

- দৈনন্দিন ভাগ্য নির্ধারন করণ, আর তা হল সম্মান, অপমান, (কিছু) দেওয়া না দেওয়া জীবিত করা, মৃত্যু দান ইত্যাদি যা দৈনন্দিন সংঘটিত হবে, তা নির্ধারন করা।

  আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

  অর্থঃ **আসমান ও যমিনে বিচরণশীল সকলেই তাঁর কাছে প্রার্থী, প্রত্যেকদিন (সময়) কোন না কোন কর্মেরত রয়েছেন**। *(সূরা আর-রাহ্‌মান আয়াত- ২৯)*

(৪) ভাগ্যের ব্যাপারে সালাফদের আকিদাহ বা বিশ্বাস হল

নিশ্চয় আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা রববতার মালিক বা অধিকারী। নিশ্চয় আল্লাহ সকল সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টির পূর্বে তাদের ভাগ্য সমূহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাদের বয়স, রুযী, কর্ম সমূহ নির্ধারন করে রেখেছেন। আরো লিখে রেখেছেন যে, সুখ অথবা দুঃখের দিকে তারা ধাবিত হবে।

প্রত্যেক জিনিসই স্পষ্ট কিতাবে হিসাব করে রেখেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। আর যা হয়েছে ও হবে তা সবই জানেন। আর যা হয় নাই যদি তা হতো কি ভাবে হতো তাও জানেন। আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন।

আর নিশ্চয় বান্দার ইচ্ছা ও শক্তি রয়েছে, যা দ্বারা তাদেরকে যে সকল কাজের সমর্থবান করেছেন তা সম্পাদন করে এই বিশ্বাস রেখে যে আল্লাহ্ যা চান শুধু মাত্র তাই হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **যারা আমার পথে সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো**। *(সূরা-আল-আন্‌কাবুত আয়াত- ৬৯)*

আর নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দার ও তার কর্মের সৃষ্টি কর্তা আর তারাই এই কর্ম গুলো প্রকৃত পক্ষে সম্পাদনকারী। ওয়াজেব ছাড়াতে ও হারাম কাজ করাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে কারো কোন হুজ্জাত বা দলীল দাঁড় করানোর সুযোগ নেই, বরং বান্দাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পূর্ণ দলীল রয়েছে। বিপদ-আপদে ভাগ্যকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ হলেও নিন্দনীয় ও পাপের কাজে ভাগ্যের অযুহাত

দেয়া বৈধ নয়। যেমন-নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদম ও মূসা (আলাইহিমাস সালাম) এর পরস্পর বিতর্কের ব্যাপারে বলেনঃ

অর্থঃ আদম ও মূসা (আলাইহিমাস সালাম) বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন, অতঃপর মূসা (আলাইহিস্ সালাম) বল্লেনঃ হে আদম (আলাইহিস্ সালাম) তোমাকেই তো তোমার পাপ জান্নাত হতে বহিস্কার করেছিল। তার পর আদম (আলাইহিস্ সালাম) তাঁকে বল্লেনঃ হে মূসা! (আলাইহিস্ সালাম) তোমাকেই তো আল্লাহ্ তাঁর রিসালাত ও কথাপকোতনের জন্য নির্বাচন করে নিয়েছিলেন? তার পরও তুমি আমাকে এমন বিষয়ের উপর দোষারুপ করতেছ যা আল্লাহ্ আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার উপর নির্বাচন করে রেখেছেন। অতঃপর আদম (আলাইহিস্ সালাম) মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর জয়ী হলেন। *(মুসলিম শরীফ)*

(৫) বান্দাদের কর্ম সমূহ

যে সকল কাজ আল্লাহ তা'আলা এই নিখিল বিশ্বে সৃষ্টি করেছেন তা দু' ভাগে বিভক্তঃ

প্রথমঃ আল্লাহ্ তা'আলার কর্ম সমূহের মধ্যে যে সকল কর্ম তাঁর সৃষ্টি জীবের মাঝে পরিচালনা করেন, তাতে কাহারো কোন প্রকার ইচ্ছা ও ইখ্তিয়ার নেই। বস্তুর সকল ইচ্ছা আল্লাহর জন্য। যেমন জীবিত করা মৃত্যু দান করা সুস্থ্য ও অসুস্থ্য করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আর আল্লাহই তোমাদের ও তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন**। *(সূরা আস্ সাফ্‌ফাত ৯৬)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **যিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদেরকে পরিক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ট?** *(সুরা-আল মূল্ক আয়াতঃ ২)*

দ্বিতীয়ঃ আর যে সকল কর্ম সৃষ্টিজীব সম্পাদন করে থাকে, তা সবই ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত। আর ইহা সম্পাদন কারীর ইখ্তিয়ার ও ইচ্ছায় সংঘঠিত হয়, কারণ ইহা আল্লাহ্ তাদের উপর অর্পণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **যে তোমাদের মধ্যে সোজা পথে চলতে চায়**। *(সূরা আল-তাকভীর, আয়াত-২৫)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **অতএব যার ইচ্ছা হয় ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফুরী করুক**। *(সূরা আল-ক্বাহাফ, আয়াত-২৯)*

ভাল কাজ সম্পাদনের জন্য তারা প্রশংসার হক্বদার, আর খারাপ কাজ করার জন্য তারা অপমানের হক্বদার। আল্লাহ্ শুধু মাত্র ঐ কাজ করার জন্য শাস্তি দিবেন, যাতে বান্দার পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আর আমি বান্দাদের উপর জুলুমকারী নই**। *(সূরা ক্বাফ, আয়াত-২৯)*

আর মানুষ ইচ্ছা ও নিরুপায়ের পার্থক্য জানে। যেরূপ কেহ ছাদ হতে সিঁড়ি বেয়ে নিজ ইচ্ছায় অবতরণ করেন, আর কখনো কেহ্ তাকে ছাদ হতে ফেলে দিতে পারে। প্রথম উদাহরণ হল ইচ্ছার, আর দ্বিতীয় উদাহরণ হল নিরুপায়ের।

(৬) আল্লাহর সৃষ্টি ও বান্দার কর্মের মাঝে সমঝতা

আল্লাহ্ বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন ও তার (বান্দার) কর্ম সমূহকে সৃষ্টি করেছেন। ও তাকে ইচ্ছা ও শক্তি দিয়েছেন। তাই বান্দাই প্রকৃত পক্ষে তার কর্মের সম্পাদন কারী। সারাসরি তা আদায় কারী, কারণ তার ইচ্ছা ও শক্তি রয়েছে।

অতঃপর সে যদি ঈমান আনে তবে সে তার ইচ্ছায় ও ইরাদায় ঈমান আনলো। আর সে যদি কুফুরী করে তবে সে তার ইচ্ছায় ও পূর্ণ ইরাদায় কাফের হল। যেমন আমরা বলে থাকি যে, এই ফল এই গাছের আর এই ফসল এই ক্ষেতের। অর্থ হলঃ নিশ্চয় ইহা হতে উৎপন্ন হয়েছে। আর আল্লাহর দিক হতে, এর অর্থ হবেঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ ইহাকে ইহা হতে সৃষ্টি করেছেন। এই দুইয়ের মাঝে কোন প্রকারের বিরোধ নেই।

আর এর দ্বারা (শারউল্লাহ) আল্লাহর প্রনয়ণ ও তাঁর নির্ধারণ এক বলে বিবেচিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্ম সমূহকে সৃষ্টি করেছেন**। *(সূরা আস্ সফ্‌ফাত, আয়াত-৯৬)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **অতএব যে দান করে এবং আল্লাহ্ ভীরু হয়, এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব, আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয়, এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের জন্যে সহজ পথ দান করব।** *(সূরা আল-লাইল, আয়াত-৫-১০)*

(৭) ভাগ্যের ব্যাপারে বান্দার করণীয়

ভাগ্যের ব্যাপারে বান্দার করণীয় কাজ হল দু'টিঃ

প্রথমঃ সাম্ভব্য কাজ সম্পাদনের ও সতর্কিত কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। তাঁর কাছে (আল্লাহর কাছে) আরো চাইবে যেন তাকে সহজ সাধ্য কাজ সহজ করেদেন, আর কঠিন সাধ্য কাজ হতে তাকে বিরত রাখেন।আর তাঁর উপর ভরসা করবে ও তাঁর কাছে আশ্রয় চাইবে। অতঃপর কল্যাণ অর্জনের জন্য ও অকল্যাণ বর্জনের জন্য তাঁর নিকটেই মুখাপেক্ষী হবে।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ তোমার কল্যাণকর কাজের প্রতি আগ্রহবান হও, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর, আর অপারগতা প্রকাশ করিওনা। আর তুমি যদি কোন কষ্টের সম্মখীন হও তবে এই রুপ বলিওনা যে আমি যদি এই কাজ করতাম তাহলে এই হত। বরং বল যে, আল্লাহ্ যা নির্ধারিণ করেছেন ও চেয়েছেন তাই করেছেন, কারণ যদি কথাটি শায়তানের কর্ম খুলে দেয়।

দ্বিতীয়ঃ বান্দা তার জন্য নির্ধারিত বিষয়ের উপর ধৈর্য ধারণ করবে, ঘাবড়াবেনা। অতঃপর জানবে যে, নিশ্চয় ইহা আল্লাহর পক্ষ হতে, সুতরাং সন্তোষ্ট চিত্তে মেনে নিবে। আরো জ্ঞাত হবে-যে বিপদ তাকে আক্রমন করেছে তা ভূল করে আসেনি। আর যে বিপদ তোমাকে আক্রমন করেনি তা তার জন্য আসার ছিলনা।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ আরো জ্ঞাত হবে-যে বিপদ তোমাকে আক্রমন করেছে তা তোমাকে ভুল করে আসেনি। আর যে বিপদ তোমাকে আক্রমন করেনি তা তোমার জন্য আসার ছিলনা।

(৮) ভাগ্য ও ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা

ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য। কেননা ইহা আল্লাহর রব্বত্ত্বের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অন্তর্ভুক্ত। তাই সকল মু'মিনের পক্ষে আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য।

কারণ আল্লাহর কর্ম ও ফায়সালা সকলই ভাল (ন্যায় পরায়ণ) ইনসাফ ভিক্তিক হিক্মাত পূর্ণ। সুতরাং যার আস্থা থাকবে যে, নিশ্চয় যা (সুখ-দুঃখ) তাকে পৌঁছিয়াছে তা তাকে ভূল করার ছিলনা আর যা তাকে ভূল করেছে তা তাকে পৌঁছার ছিলনা সে পেরেশানী ও সন্দেহ্ হতে বেঁচে থাকবে। আর তার জীবন হতে ব্যাকুলতা ও দোদুল্যমানতা দূর হবে। চলে বা হারিয়ে যাওয়া বস্তুর উপর চিন্তিত হবে না। আর তার ভবিষ্যৎ কে ভয় পাবেনা। আর এর মাধ্যমে সে সব চাইতে সৌভাগ্য পূর্ণ হবে, আত্নার দিক দিয়ে সব চাইতে পূত-পবিত্র হবে, আর সব চাইতে শান্ত হবে। আর যে জানতে পারবে যে, তার বয়স সীমিত, রুযী পরিমিত, সে নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারবে যে, কাপুরুষত্বা বয়স বাড়াতে পারে না। কার্পন্নতা রুয বাড়াতে পারে না। তাহলে সবই লিখিত রয়েছে। বিপদের উপর ধৈর্য ধারণ করবে, পাপ ও ক্রটি পূর্ণ কর্ম সম্পাদন করার কারনে ক্ষমা চাইবে। আর আল্লাহ্ যা (তার জন্য) নির্ধারিণ করেছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তবেই আদেশের আনুগত্য আর বিপদের উপর ধৈর্য ধারণের মাঝে সম্বন্নয় গড়তে সক্ষম হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রকার বিপদ আসে না, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।** *(সূরা আত্তাগাবুন, আয়াত-১১)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আপনি আপনার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।** *(সূরা গাফের, আয়াত-৫৫)*

(৯) হিদায়াত দু' প্রকারঃ (হিদায়াতের দু'টি অর্থ)

প্রথমঃ হিদায়াত অর্থঃ সত্যের সন্ধান দেওয়া, সৎপথ প্রর্দশন করা। আর সকল সৃষ্টি জীবই এর মালিক। আর সকল রাসূল ও তাঁদের অনুসারীগণ এরই মালিক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন।** *(সূরা আশ্‌শুরা, আয়াত-৫২)*

দ্বিতীয়ঃ হিদায়াত এর অর্থ আল্লাহ কর্তৃক বান্দাদেরকে (ভাল কাজের) তাওফীক প্রদান করা ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠা বা অটল রাখা, (আর ইহা) তাঁর মুত্তাকীন বান্দাদের জন্য দয়া ও অনুগ্রহ স্বরূপ। আর এই হিদায়াতের একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আপনি যাকে ভালবাসেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন।** *(সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত-৫৬)*

(১০) (আল্লাহর) কুরআনে বর্ণিত ইরাদা দু' প্রকারঃ

প্রথমঃ ইরাদা কাউনিয়া ক্বাদারিয়া, তা হল সকল সৃষ্টিকূলের তরে নির্ধারিত ঘটনীয় ইচ্ছা, সুতরাং আল্লাহ্ যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। আর ইহা (ইরাদা কাউনিয়া ক্বাদারিয়া) অবশ্যই পতিত হবে। কিন্তু ইরাদা শারয়ীয়া এর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত (ইহাকে) ভালবাসা ও এর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া জরুরী নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য খুলে দেন।** *(সূরা আনআম, আয়াত-১২৫)*

দ্বিতীয়ঃ ইরাদা দ্বীনিয়া শারয়ীয়া, তা হল ধর্মীয় নির্দেশ বা উদ্দেশ্য ও তার আহল অনুসারী কে ভালবাসা ও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। ইরাদা দ্বীনিয়া শারয়ীয়া বাস্তবায়িত হবে না, যতক্ষন পর্যন্ত এর সাথে ইরাদা কাউনিয়া সংযুক্ত না হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ **আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ চান, তোমাদের জন্য কঠিনতা চান না।** *(সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-১৮৫)*

আর ইরাদা কাউনিয়া অধিক ব্যাপক, কারণ সকল শারয়ী উদ্দেশ্য যা বাস্তবায়িত হয় তা সৃষ্টিগত দিক হতেও বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য উদ্দেশ্যিত।

আর পতিত সকল কাওনী উদ্দেশ্য বা ঘটমান ইচ্ছা শরীয়াতে তা উদ্দেশ্যিত নয়। যেমন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ঈমানের মাঝে উভয় প্রকার ইরাদা বা ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়েছিল। আর আবু জাহল এর কুফুরীতে শুধুমাত্র ইরাদা কাওনিয়া বা ঘটমান ইচ্ছা ছিল। আর যাতে ইরাদা কাউনিয়া পাওয়া যাবে না, যদিও তা শারীয়াতের দিক থেকে প্রত্যাশিত, যেমন আবু জাহেলের ঈমান। সুতরাং যদি ও আল্লাহ্ নাফারমানী পূর্ণ ইচ্ছা করেন ঘটবার দিক থেকে, এবং সৃষ্টিগত দিক থেকে তা চান কিন্তু তা দ্বীন হিসাবে পছন্দ করেন না, ভাল বাসেন না, ও তার প্রতি নির্দেশ ও দেন না। বরং তার প্রতি বিদ্বেষ রাখেন, অপছন্দ করেন, তা হতে নিষেধ (বান্দাদেরকে) করেন ও তা সম্পাদন কারীকে সাবধান করেন।

আর এসব তাঁরই নির্ধারণ তবে আনুগত্য পূর্ণ কর্ম ও ঈমান আনা নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে ভালবাসেন, এবং এর নির্দেশ দেন, এবং এর সম্পাদন কারীকে নেকী ও সুন্দর প্রতিদানের ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) দিয়েছেন, তাঁর ইরাদা ছাড়া তাঁর নাফারমানী করা যায় না। আর আল্লাহ্ তা'আলা যা চান শুধু তাই পতিত হয়।

আল্লাহ্ তা'আল বলেনঃ

অর্থঃ **(আল্লাহ) তাঁর বান্দাদের জন্য কুফুরী পছন্দ করেন না।** *(সূরা আয্‌যুমার, আয়াত-৬)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **আল্লাহ্ ফাসাদ (অশান্তি) পছন্দ করেন না।** *(সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-২০৫)*

(১১) ঐ সকল আস্‌বাব বা কারণ সমূহ যা ভাগ্য পরিবর্তন করে

আল্লাহ্ এই ভাগ্যের জন্য কিছু কারণ তৈরী করে রেখেছেন যা ইহাকে পরিবর্তন ও প্রতিরোধ করে। যেমন-দু'আ, সাদাকাহ্ ঔষধ, সতর্কতা অবলম্বন, (নিজের) কর্ম দক্ষতা ব্যাবহার করা, কারণ সবই আল্লাহর ফায়সালা ও তাঁর ভাগ্য নির্ধারণ, এমনকি অপারগতা- অক্ষমতা ও বিজ্ঞতা-বুদ্ধিমত্তা।

(১২) ভাগ্যের মাস্‌আলা বা বিষয়টি আল্লাহর সৃষ্টি জীবের মাঝে তাঁর একটি রহস্যময় বিষয়

ভাগ্য নির্ধারণ আল্লাহর গোপন রহস্য, তাঁর সৃষ্টি জীবের মাঝে এ কথাটি শুধু মাত্র ভাগ্যের গোপন দিকের জন্য প্রযোয্য। কারণ সকল জিনিসের হাকীকাত শুধুমাত্র আল্লাহ্ জানেন। মানুষ তা অবগত হতে পারে না। যেমন আল্লাহ্ পথ ভ্রষ্ট করেন, হিদায়াত করেন, মৃত্যু দান করেন, জীবিত করেন, নিষেধ করেন, ও কিছু প্রদান করেন।

যেমন তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ যখন ভাগ্যের কথা স্বরণ হবে তখন তোমরা তা নিয়ে তর্ক বির্তকে লিপ্ত না হয়ে চুপ থাকবে। *(মুসলিম)*

তবে ভাগ্যের অন্যান্য দিক ও তাঁর মহা হিক্‌মাত স্তর, মর্যাদা ও তাঁর প্রভাব মানুষের নিকট বর্নণা করাও তা তাদেরকে জানানো বৈধ রয়েছে।

কারণ ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের রুক্‌ন সমূহের একটি অন্যতম রুক্‌ন, যা শিক্ষা করাও জানা একান্ত কর্তব্য।

যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন জিব্‌রীল (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট ঈমানের রুক্‌ন সমূহ উল্লেখ করেন তখন বলেনঃ

অর্থঃ উনি হলেন জিব্‌রীল তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমণ করেছেন।

(১৩) ভাগ্যের দ্বারা দলীল দেওয়া

ভবিষ্যতে কি হবে বা না হবে এই সর্ম্পকে আল্লাহর পূর্ব জ্ঞান, (ইহা) অদৃশ্য ইহা তিনি ব্যতীত কেহ জানেনা। (ইহা) মানুষ ও জ্বিনদের অজানা। এতে কোন ব্যক্তিরই স্বীয় পক্ষ গ্রহণের দলীল নেই। আর যে বিষয় ফায়সালা হয়ে গেছে তার উপর ভরসা করে কর্ম ত্যাগ করা ঠিক নয়। সুতরাং ভাগ্য আল্লাহর বিরুদ্ধে ও তাঁর সৃষ্টির কাহারো জন্য দলীল বা হুজ্জাত নয়।

যদি খারাপ কাজ করার উপর ভাগ্যের দ্বারা দলীল দেওয়া বৈধ হতো, তাহলে অত্যাচারী শাস্তি প্রাপ্ত হতনা, মুশরিক ব্যক্তি হত্যা হতো না, হদ্‌ বা বিধান প্রতিষ্ঠিত হতনা, আর কেহ্‌ অত্যাচার করা হতে বিরত থাকতো না। আর ইহা দ্বীন ও দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করার মাধ্যম হত, যার ভয়াবহতা সকলের জানা।

আর যারা ভাগ্য দ্বারা দলীল দেয়, তাদেরকে আমরা বলবো তুমি জান্নাতী না জাহান্নামী এ ব্যাপারে তোমার নিকট নিশ্চিত জ্ঞান নেই। আর যদি তোমার নিকট এই ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান থাকত অবশ্যই আমরা তোমাকে সৎকাজের আদেশ দিতাম না ও অন্যায় থেকে নিষেধও করতাম না। বরং তুমি কর্ম সম্পাদন কর নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাকে তাওফীক প্রদান করবেন, আর তুমি জান্নাত বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কিছু কিছু সাহাবা যখন ভাগ্যের হাদীস সমূহ শুনতেন তখন বলতেনঃ এখন তুমি আমার চাইতে বেশী প্রচেষ্টাকারী নও। (অর্থাৎ আমি বেশী প্রচেষ্টাকারী)। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আত্মপক্ষ সমর্থনে ভাগ্যের দ্বারা দলীল দেওয়া সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

অর্থঃ তোমরা কর্ম সম্পাদন করতে থাকো যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজ সাধ্য হবে, সুতরাং যারা সৌভাগ্যবান হবে তাদেরকে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের যে কাজ সেই কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। আর যারা দূর্ভাগ্যবান হবে, তাদেরকে তাদের দূর্ভাগ্যবান ব্যক্তিদের যে কাজ সেই কাজ সহজ করে দেওয়া হবে।

অতঃপর নিম্নের আয়াত পাঠ করলেনঃ

অর্থঃ **অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয়, এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয়, এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব**। *(সূরা আল-লাইল, আয়াত-৫-১০)*

(১৪) আসবাব বা (মাধ্যম সমূহ) গ্রহণ করা

বান্দার নিকট দু' প্রকার কাজ উপস্থিত হয়ঃ

- এমন কর্ম যাতে বাহানা বা অজুহাত রয়েছে তা সম্পাদনে সে অপারগ নয়।
- এমন কর্ম যাতে বাহানা ও অজুহাতের অবকাশ নেই, তা পালনে সে ধৈর্য ধারণ করে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা বিপদ পতিত হওয়ার পূর্বেই বিপদ সর্ম্পকে জানেন।

তাঁর (আল্লাহর) বিপদ সর্ম্পকে জ্ঞান রয়েছে এর অর্থ এই নয় যে, তিনিই বিপদ গ্রস্ত ব্যক্তিকে বিপদে পতিত করেছেন, বরং এই বিপদ পতিত হয়েছে এর নির্ধারিত কারণ সমূহের দ্বারাই।

যদি বিপদ হতে রক্ষাকারী মাধ্যম যা ব্যবহার ও গ্রহণ করার জন্য ইসলামী শরীয়াত অনুমতি দিয়েছেন পরিত্যাগ করার কারণে পতিত হয়, তবে সে নিজেকে হিফাজত না করার কারণে ও তাঁকে বিপদ হতে রক্ষাকারী মাধ্যম গ্রহণ না করার কারণে দোষী হবে।

আর যদি এই বিপদ প্রতিরোধ করার তার ক্ষমতা না থাকে তবে সে মা'জুর হবে।

সুতরাং মাধ্যম গ্রহণ করা ভাগ্য ও ভরসার পরিপন্থী নয় বরং ইহা (মাধ্যম গ্রহণ করা) এরই (ভাগ্য ও ভরসারই) অন্তর্ভুক্ত।

আর যখন ভাগ্য পতিত হয়ে যায় তখন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ও তা মেনে নেয়া ওয়াজিব হয়ে যায় ও নিজের কথার দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করবে। (قدّر الله وما شاء فعل) অর্থঃ আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন ও চেয়েছেন তাই করেছেন। তবে ভাগ্য পতিত হওয়ার পূর্বে মানুষের দায়িত্ব হল বৈধ মাধ্যম গ্রহণ করা ও ভাগ্যের দ্বারা ভাগ্যের প্রতিরোধ করা। নাবীগণ নিজেদেরকে নিজেদের শত্রু থেকে হিফাযতকারী পদ্ধতি ও মাধ্যম গ্রহণ করেছিলেন, অথচ তাঁরা আল্লাহর ওয়াহীও নিরাপত্তা দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকল ভরসা কারীদের নেতা ছিলেন, তা সত্বে ও তিনি মাধ্যম গ্রহণ করতেন আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা থাকার পরও।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। *(সূরা আল-আনফাল, আয়াত-৬০)*

তিনি আরো বলেনঃ

অর্থঃ **তিনি তোমার জন্য যমিনকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।** *(সূরা-আল-মূলক, আয়াত-১৫)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা, সবল মু'মিন আল্লাহর কাছে অধিক উত্তম ও প্রিয়, তবে উভয়ের মাঝে কল্যাণ নিহত রয়েছে। যা তোমাকে উপকার করবে তা আদায়ে তুমি অগ্রশীল হও। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর অপারগতা প্রকাশ করিওনা। তোমাকে কোন বিপদ স্পর্শ করলে তুমি বলিওনা যে নিশ্চয় আমি এই কাজ করলে এই এই হতো বরং তুমি বলঃ আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন ও চেয়েছেন তাই করেছেন।

কারণ ((لو) লাউ বর্ণটি শায়তানের কর্মকে খুলে দেয়। *(মুসলিম)*

(১৫) ভাগ্যকে অস্বীকার কারীর বিধান

যে ব্যক্তি ভাগ্যকে অস্বীকার করল সে ইসলামী শরীয়াতের মূলনীতি সমূহের একটি অন্যতম মূলনীতিকে অস্বীকার করলো। আর এর মাধ্যমে সে কুফুরী করলো। কিছু কিছু সালাফ সালেহ্ বলেনঃ

((ناظروا القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا، وإن أقروا به خصموا)).

অর্থঃ তোমরা কাদরীয়াহ সম্প্রদায়ের সাথে জ্ঞান দ্বারা মুনাযারা কর, তারা যদি অস্বীকার করে তাহলে তারা কুফুরী করলো আর যদি তারা স্বীকার করে তাহলে তারা (তোমাদের সাথে) ঝগড়া করলো।

(১৬) ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনার ফলাফল

ফায়সালা ও ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনার অনেক শুভ-পরিনাম সুন্দর প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব রয়েছে যা জাতীয় ও ব্যক্তি জীবনে কল্যাণ নিয়ে আসে।

(ক) নিশ্চয় ইহা (ভাগ্যের প্রতি ঈমান) বিভিন্ন প্রকার নেক আমল ও ভাল গুন অর্জন করার সুযোগ জন্ম দেয়। যেমন আল্লাহর ইখ্লাস বা একনিষ্ঠতা, তাঁর উপর ভরসা করা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর কাছে কিছু পাওয়ার আশা করা, তাঁর প্রতি ভাল ধারণা রাখা ধৈর্য ধারণ করা, প্রখর সহনশীলতা, নৈরাশ্যতা দূর করা, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, একমাত্র আল্লাহর শুকরিয়া করা, তাঁর অনুগ্রহ দয়া পেয়ে খুশী হওয়া। একমাত্র আল্লাহর জন্য বিনয় নম্রতা প্রকাশ করা, উদাসিনতা ও অহংকার ত্যাগ করা। আল্লাহর প্রতি ভরসা করতঃ ভাল পথে ব্যায় করার মন মানুষিকতা ও সৃষ্টি করে। বীরত্ব সৃষ্টি করে, ভাল কাজ করার দিকে অগ্রসর করে, অল্পে তুষ্ট থাকার গুন তৈরী করে, আত্ম সম্মানী করে, উচ্চাভিলাশী করে, কর্ম দক্ষতা সৃষ্টি করে, কর্ম সম্পাদনের প্রচেষ্টা তৈরী করে সুখে-দুখে মধ্য পথ অবলম্বনকারী তৈরী করে, হিংসা ও প্রতিবাদ করা থেকে নিরাপদে রাখে। বাজে গাল- গল্প বাতিল কাজ হতে বিবেককে মূক্ত রাখে। আত্মার প্রশান্তি ও তৃপ্তির ব্যবস্থা করে।

(খ) ভাগ্যের প্রতি ঈমান ওয়ালা ব্যক্তি তার জীবনে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত হয়।

অধিক নি'য়ামত তাকে পথ ভ্রষ্ট করতে পারে না, আর বিপদে নৈরাশ হয় না। আর সে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, তাকে যে বিপদ স্পর্শ করেছে তা (তার জন্য) আল্লাহর নির্ধারণ মাত্র, তার পরিক্ষা স্বরুপ। ঘাবড়ায় না বিচলিত হয় না। বরং ধৈর্য ধারণ করে ও নেকীর আশা রাখে।

(গ) নিশ্চয় ইহা পথ ভ্রষ্টের কারণ সমূহ ও জীবনের অশুভ সমাপনী হতে হেফাজত করে। ইহা তার জন্য (মু'মিনের জন্য) সঠিক পথে প্রতিষ্ঠা থাকার স্থায়ী প্রচেষ্টা, নেক কাজ বেশী বেশী করার সুযোগ, নাফারমানী পূর্ণ ও ধ্বংসাত্ত কাজ থেকে বিরত থাকার সুযোগ করে দেয়।

(ঘ) নিশ্চয় ইহা মু'মিনদের জন্য সুদৃঢ় অন্তর ও পূর্ণ বিশ্বাসের দ্বারা ভয়ানক ও কঠিন কর্মকে প্রতিহত করার মনভাব তৈরী করে দেয়, মাধ্যম বা উপকরণ গ্রহণ করার সাথে।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ কি আর্শ্চয্য! নিশ্চয় মু'মিনের সকল কর্মই ভাল, আর ইহা শুধু মু'মিনদের জন্য খাস, যদি তাকে কোন আনন্দ স্পর্শ করে সে প্রশংসা করে, ফলে তা তাঁর জন্য কল্যাণ হয়। আর যদি তাকে কোন বিপদ স্পর্শ করে সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণ হয়। (*মুসলিম)*

মুসলিমদের আক্বীদা

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন হলো আমাদের কিবলা (গন্তব্য) যার দিকে আমাদের প্রতিনিয়ত ছুটে চলা। আর এই ছুটে চলার জন্য আমাদের ইঞ্জিন হলো 'আক্বীদা'। এই আক্বীদা আমাদের এগিয়ে নেয় সামনের দিকে আর এই আক্বীদাই আমাদের বারণ করে পিছপা হতে বা থেমে যেতে।

যখনই আক্বীদার ঘাটতি হয় বা এর প্রভাব কমে যায়, তখন বান্দা সৎকাজের ব্যাপারে নিতান্ত গাফেল হয় অথবা একেবারেই তা থেমে যায়। যার ফলশ্রুতিতে, বান্দা তার মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যায় আর অন্যান্য কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। বান্দা সবসময় দু'টি পথের একটি পথে চলতে থাকে-

১) ঈমানের দ্বারা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দিকে, অথবা

২) শয়তানের পাল্লায় পড়ে বিভ্রান্তির দিকে।

আক্বীদা কোন দাবী নয় বা কতগুলো শব্দের সমষ্টি নয়। ভাষাবিদ দিয়ে এর তত্ত্ব আলোচনা করে পাতার পর পাতা এমনকি মস্ত বড় বই লিখেও কোন কাজ নেই। 'আক্বীদা' একটি নিশ্চয়তা যার শেকঁড় গাঁথা থাকে অন্তরে আর তা ডালপালা ছড়ায় বাহ্যিক কার্যকলাপ দ্বারা। কোরআনে বারবার ঈমানের সাথে 'আমলে সলিহ' এর কথা বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, আক্বীদার সাথে অব্যশই আমল থাকতে হবে। কারণ, আক্বীদার প্রমানই হলো আমল।

আমাদের ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করতে চাইলে অবশ্যই কাজের মাধ্যমে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। অন্যথায় ঈমানের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হবেঃ

" অবশ্যই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তারাই সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম।"(৯৮:৭)

" আর যে কেউ ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে তার জন্য এর বিনিময় উত্তম পুরষ্কার রয়েছে।"(১৮:৮৮)

"--- যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও আখিরাতের প্রতি এবং নেক কাজ করেছে তাদের কোন ভয় নেই, এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"(৫:৬৯)

" যে ঈমান আনলো এবং নেক কাজ করলো, তাদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না।"(৬:৪৮)

" আর আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল, যে তওবা করে, ঈমান আনে, নেক কাজ করে ও সৎ পথে অটল থাকে।"(২০:৮২)

" তবে তারা নয়, যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আশা করা যায়, সে সফলকামদের অন্ত র্ভূক্ত হবে।"(২৮:৬৭)

" তোমাদের ধন-সম্পদ সন্তান সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে। যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তারাই পাবে বহুগুন পুরষ্কার। আর তারা প্রাসাদ সমূহে নিরাপদে থাকবে।"(৩৪:৩৭)

" সুসংবাদ দিন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।"(২:২৫)

" আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"(২:৮২)

" আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহের রক্ষনাবেক্ষন তো শুধু তারাই করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, আর আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। বস্তুতঃ এদের সম্পর্কে আশা করা যায় যে, তারা হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।"(৯:১৮)

" কি করবেন আল্লাহ্‌ তোমাদের শাস্তি দিয়ে যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন ? আর আল্লাহ্‌ হলেন আশ শারীক (সৎকাজের সমাদরকারী) এবং আল আলীম (সর্বজ্ঞ)।"(৪:১৪৭)

এভাবেই ঈমান ও আমলের সম্পৃক্ততার কথা কোরআনে স্পষ্টভাবে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। এমন স্পষ্ট আয়াতগুলো শুধু তারাই উপেক্ষা করতে পারে যারা অন্ধ চোখে নয় বরং অন্তরে।

"বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হলো বক্ষস্থিত হৃদয়।"(২২:৪৭)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস থেকেও এর ব্যাপারে প্রচুর প্রমাণ মেলে যে, ঈমান ও আমল ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ননা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশী। অথবা ষাটটিরও কিছু বেশী। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্'-এর ঘোষনা দেয়া, আর এর সর্ব নিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসরণ করা আর লজ্জা ঈমানের বিশিষ্ট একটি শাখা।"(সহীহ মুসলিম)

"তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে), আর এটাই ঈমানের সর্বনিম্ন স্ত র।"(সহীহ মুসলিম)

"---- যারা এদের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) জিহাদ করবে, সে মুমিন। যে মুখ দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সে মুমিন। আর যে অন্তর দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সেও মুমিন। এরপর আর সরিষার দানার পরিমানও ঈমান নেই।"(সহীহ মুসলিম)

মুখে ঈমানের দাবী অনেকেই করে, কিন্তু সত্যিকার ঈমানদার কয়জন ? আমলের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া এই দাবী একেবারে মিথ্যা। এমন ধোকাবাজী আর সত্যিকার ঈমানের মাঝে আকাশ পাতাল তফাৎ, আসুন এই উম্মাহর দুটি প্রজন্মের দিকে তাকাই। প্রথম প্রজন্ম হলো সাহাবাদের যা সর্বশ্রেষ্ঠ; আর দ্বিতীয় প্রজন্মটি একালের।

সাহাবাদের প্রজন্মটি হলো সেই সোনালী প্রজন্ম যার আদর্শকে পুজি করে আমরা এগুতে চাই। এই প্রজন্মটিকে জাহিলিয়াতের গ্রাস থেকে মুক্ত করে, শিরকের কলুষতাকে ঝেড়ে তাওহীদের আলোকে নিয়ে আসে এই 'আক্বীদা'; আর তাদের অন্তরে গেঁথে দেয় ঈমান যার আলোতে উদ্ভাসিত হয় এই সোনালী প্রজন্ম।

আক্বীদার ভিক্তিতেই গড়ে ওঠে এই প্রজন্ম এবং তা থেকেই তৈরী হয় সেই সব অসামান্য চরিত্রগুলো। আসুন একটু কাছ থেকে দৃশ্য গুলো দেখি, কিভাবে তাদের মাঝে আক্বীদার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং তাদের জীবনে এনেছে পরিবর্তন। আসলে তাদের এতো অগনিত দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব তা বুঝতে পারিনা। সেই প্রজন্মে মাঝ থেকে কাদের কথা বলব ? আনসারদের কথা নাকি মুহাজিরদের কথা ? প্রবীনদের কথা, তরুনদের কথা নাকি সেই বাচ্চাগুলোর কথা ? পুরুষদের কথা নাকি মহিলাদের কথা ? তাদের কোন সময়ের কথা বলবো, সমৃদ্ধির কথা নাকি দুঃখ-কষ্টের কথা ?

তাদের কোন কথা বলবো, দিনের বেলা ঘোড়া দৌড়ানো নাকি রাতের ইবাদত ? আল্লাহ্র রাস্তায় জীবন দেয়ার দৃষ্টান্তগুলো নাকি সমস্ত সম্পদ কুরবানী করার দৃষ্টান্ত ? তাদের কোন গুনের কথা বলবো, সততা, নিষ্ঠা নাকি তওবা ?

তাই মানুষগুলোর প্রতিটি দৃষ্টান্তই যেন ঈমানের আভায় পরিপূর্ণ, ইয়াকীনের আলোতে মোড়ানো, ইখলাছের উচ্চ শিখরে বাঁধানো। তাদের দিকে তাকালে সবারই মনে প্রশ্ন জাগে, " কি সেই জিনিস যা তাদেরকে এত দ্রুত অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এলো; আর তারা হলো সর্বশ্রেষ্ট ?

আসুন আমরা সেই সব দৃশ্যের গভীরতায় ডুবে যাই-----

আমরা দেখি বিলাল তার মনিব উমাইয়া বিন খালাফ এর সাথে প্রকাশ্য বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে শুধুমাত্র 'আহাদ', 'আহাদ' (আল্লাহ্ এক)-ই বলতে থাকে যদিও তার পৃষ্ঠদেশ উত্তপ্ত বালুর উপর ছিল এবং বুকের উপর ভারী পাথর রাখা ছিল। এবং খাব্বাব তাঁর শরীরের প্রতিটি অংশে উত্তপ্ত লোহা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহ্র এই দ্বীনে অটল থাকে। এবং ইয়াসিরের পরিবার প্রচন্ড শাস্তি ও যন্ত্রনা ভোগ করে, এবং সুমাইয়াকে হত্যা করা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ঈমান দূর্বল হয়নি তারা দৃঢ়ভাবে রাসূল (সাঃ)-এর অঙ্গীকার বিশ্বাস করেছিল, তিনি বলেছিলেনঃ 'ও ইয়াসিরের পরিবার ধৈর্য্য ধর এবং সহ্য করে যাও, জান্নাত তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

মুহাজিরগণ তাদের স্ত্রী, সন্তান, ধন সম্পত্তি সব পরিত্যাগ করে কোন শর্ত ছাড়া, মরুভূমি পাড়ি দিয়ে মক্কা থেকে মদীনায়, কোন সম্বল ছাড়া শুধুমাত্র ঈমান নিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করেন।

আবু উবায়দা বদরের যুদ্ধে তার পিতাকে হত্যা করে, এবং আবু বকর আস-সিদ্দিক তাঁর নিজের পুত্রকে এবং মুসায়েব তাঁর ভাই উবায়েদ ইবনে উমায়েরকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

আমরা যদি একটু পিছনের দিকে দেখি তাহলে দেখব আনসারগণ আল-আকাবার রাতে রাসূল (সাঃ) এর কাছে হাতে হাত রেখে আনুগত্যের অঙ্গীকার করে। তারা খুব ভালো করেই জানত যে, আরবরা তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হবে এবং সবদিক থেকে তাদের গোত্রের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের প্রাণনাশ হতে পারে। তারপরও তারা তাদের নতুন অঙ্গীকারকে বেশি লাভজনক মনে করে এবং তা পূরণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়।

আমরা তাদেরকে তাদের মুহাজিরুন ভাইদের সাথে ঘর, টাকা এবং সম্পদ ভাগ করে নিতে দেখি, যেমন আল্লাহ্ তাদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ

"মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও যারা কার্পন্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম ।" (আল-হাশর:৯)

চলুন আমরা তাদের মুখ থেকেই শুনি বদরের যুদ্ধের দিনের ঘটনা, যখন তারা রাসূল (সাঃ)-কে বলছিলেনঃ 'আপনি এগিয়ে যান, ও আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ), আপনি যেদিকে নিয়ে যেতে চান। আমরা তাঁর শপথ করে বলছি যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন যদি আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে সাগর অতিক্রম করার, আমরা আপনাকে অনুসরণ করবো, একজন ব্যক্তিও আমাদের মধ্যে পিছিয়ে পড়বে না। আল্লাহ্র অনুগ্রহে আপনি এগিয়ে যান।'

এবং এখানে উহুদের দিন রাসূল (সাঃ)-কে বাঁচাতে গিয়ে সাতজন শহীদ হয়ে যায়। এবং হুনায়েনের যুদ্ধে যখন ১২,০০০ যোদ্ধা রাসূল (সাঃ) হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন ৮০ জন আনসার ঝাপিয়ে পড়ে এবং হাওয়াযিন গোত্র হতে জয় ছিনিয়ে নেয় এবং গনীমতের মাল একত্র করে। রাসূল (সাঃ) এই গনীমতের মাল ভাগ করেন এবং প্রথমে আনসারগণ ব্যতীত পলাতকদের দেন এবং শেষে দেন যারা ফিরে গিয়েছিল তাদেরকে এবং যাদের অন্তর ইসলামের প্রতি নত হয়েছিল। তখন আনসারগণ রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাস করেন, " হে আল্লাহ্র রাসূল, আমাদের অংশ কোথায়?" তিনি বললেন, "তোমরা কি এটাতে সন্তুষ্ট না যে, যখন অন্যরা গনীমতের মাল বা ভেড়া ও উট নিয়ে ঘরে ফিরছে, আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে ঘরে ফিরছ ?" তারা তখন কেঁদে ফেললো এবং বললঃ "আমরা আমাদের অংশে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-কে পেয়েই সন্তুষ্ট।" (বুখারী)

আমরা যদি মদীনার দিকে ফিরে তাকাই, দেখবো আবু বকর আস-সিদ্দীক তাঁর সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিয়েছেন মুসলিম মুজাহিদদের সহযোগীতার জন্য, অথচ ঘরে তাঁর সন্তানদের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ছাড়া আর কিছুই রেখে আসেন নি। এবং অন্যদিকে উমর ইবনে আল-খাত্তাব তাঁর অর্ধেক ধন-সম্পত্তি দান করে দেন, এবং উসমান (রাঃ) গোটা মুসলিম বাহিনীকে সম্পূর্ণ তার নিজের খরচে সমৃদ্ধ করেন।

আমরা যদি খন্দকের দিকে একটু দেখি যখন আহযাব (শত্রুসংঘ) মদীনা ঘেরাও করে ফেলে, এক মাস যাবৎ পরিখার পিছনে মুসলিমরা অবস্থান করে, যতক্ষন পর্যন্ত না–

" তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত।" (আল-আহযাব:১০)

এবং হঠাৎ ঈমানদারগণ তাদের অন্তরের ঈমান দ্বারা পরিচালিত হয়ে চিৎকার করে উঠেঃ

"----- এটা তো সেই বিষয় যা সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন--- ।" (আল-আহযাব:২২)

আমরা বিস্ময়ের সাথে দেখতে পাই কষ্ট এবং কঠিনতার বছরে ('উসরাহ) হাজার হাজার ঈমানদারগণ তাদের সমস্ত আরাম স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিপক্ক ফসল ত্যাগ করে রাসূল (সাঃ) এর সাথে তাবুকের দিকে যাত্রা করে। তারা অল্প পানি সমৃদ্ধ মশক এবং শুকনো খেজুর নিয়ে শূন্য মরুভুমি পার হয়, তারা প্রিয় রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গ দিতে পেরেই খুশি ছিল।

এখন যদি আমরা আবার মদীনার দিকে তাকাই, দেখব তাদের কান্না যারা জিহাদে ব্যয় করার মত কিছুই খুজে পায়নি, এবং রাসূল (সাঃ)-ও যাদের অস্ত্রাদিতে সজ্জিত করতে পারেন নিঃ

"যখন তারা তোমার নিকট এই উদ্দেশ্যে আসে যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান করবে, আর তুমি বলে দিয়েছ- আমার নিকট তো কোন বাহন নেই যার উপর আমি তোমাদেরকে উপবিষ্ট করাবো, তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষু সমূহ হতে অশ্রু বইতে থাকে এই অনুতাপে যে, তাদের ব্যয় করার মত কোন সম্বল নেই।" (আত-তাওবাহ:৯২)

আমরা মদীনার রাস্তায় তাকাই, দেখব সমস্ত রাস্তা ফেলে দেয়া মদ দ্বারা সয়লাব হয়ে গিয়েছিল, যখন এটি পান না করার আদেশ নাযিল হয়ঃ

"হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মাদক, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর এসব গর্হিত বিষয়, শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয় সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ্র স্মরণ হতে ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে। সুতরাং এখনো কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?" (আল-মায়িদা:৯০-৯১)

আমরা যদি আল-খানসাআ'র কথা শুনি কাদিসিয়াহর যুদ্ধে যার চার ছেলে শহীদ হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেনঃ' সমস্ত প্রসংসা আল্লাহ্র যিনি আমাকে তাদের মৃত্যুর মাধ্যমে সম্মান দান করেছেন' । এটা তিনিই যিনি ইসলাম গ্রহনের পূর্বে কবিতার ভাষায় বলেছিলেনঃ

"যদি আমার চারপাশে এত শোককারী না থাকত

আমি আত্মহত্যা করতাম,"

এবং তাঁরা ঐ সাহাবিয়াতগণ যারা মুখমন্ডল ঢেকে চলতেন কারণ, তাদের প্রতি কোরআনের নির্দেশ আসেঃ

" তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে--- ।" (আন-নুর:৩১)

বনি দীনার গোত্রের একজন মহিলা ছিলেন, যাকে উহুদের যুদ্ধে তাঁর স্বামী, পিতা ও ভাইয়ের শহীদ হবার সংবাদ দেয়ার পর তিনি বলেনঃ' আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) কেমন আছেন ?' উত্তরে বলা হল তিনি সুস্থ আছেন। যখন সে তাকে জীবিত দেখেন, বললঃ' আপনার সুস্থতার তুলনায় যেকোন বিপর্যয় বহন করা সহজ।'

আল-গামিদিয়াহ নামক একজন মহিলা জিনাহ করে। যদিও কেউ তা সম্পর্কে জানতে পারে নি, আল্লাহ্‌ তাকে রক্ষা করেন, সে নিজেই তার গুনাহ স্বীকার করে এবং নিজেকে রাসূল (সাঃ) এর হাতে সোপর্দ করে, তাঁর কাছে মিনতি করে যেন পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে পবিত্র করা হয়। সে নিজের জীবন ত্যাগ করে তাঁর রবকে খুশি করার জন্য এবং এমন বিশুদ্ধ অনুশোচনার মধ্যে যে, মদীনার সত্তরজন মানুষকে যদি তা ভাগ করে দেয়া হতো তাহলে তা তাদের জন্য মাগফেরাতের জন্য যথেষ্ট ছিল।

এবং মহৎ সাহাবা আবু যার তাঁর গাল মাটিতে পেতে বিলালকে পা দিয়ে তার উপর মাড়াতে আহ্বান জানায়। এই অনুশোচনায় যে তিনি বিলালকে 'হে কালো মহিলার ছেলে' বলে অভিহিত করেছিলেন।

প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের মহানুভবতার এ সমস্ত এবং অন্যান্য আরও উদাহরন দেখে আমরা বলতে পারি কোরআনে আল্লাহ্‌ যা বলেছেন তার পুনরাবৃত্তি করাঃ

" মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল; তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভুতিশীল; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাঁদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এইরূপই এবং ইন্‌জীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে পুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডে দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা কৃষকের জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ্‌ মু'মিনদেরকে সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর-জ্বালা সৃষ্টি করেন, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্‌ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও পুরস্কারের।" (আল-ফাত্‌হ:২৯)

এগুলো ছিল অতীতের পাতা থেকে এবং আমাদের জন্য এটা উল্টে বর্তমান পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া বেশ কঠিন। আমরা অনিচ্ছাভরে এটা ত্যাগ করি এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও বর্তমানের মুখাপেক্ষী হই। আমরা বাস্তবের দিকে তাকালে দেখতে পাই সর্বত্র অন্ধকার এবং মানুষের দুর্বল ও নড়বড়ে ঈমান। আমাদের বর্তমান অবস্থার কোন বর্ণনার প্রয়োজন নেই, আমরা প্রত্যেকেই তা দেখি এবং এর দুঃখজনক পরিস্থিতির মাঝেই বেঁচে আছি। এটা আমাদের জন্য খুবই যন্ত্রনাদায়ক যে, আজ এই উম্মাহ বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, এর আক্বীদা 'ইরজা' এবং 'তাক্‌ফীরী' এর মধ্যে দোদুল্যমান এবং প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস বিরোধী মতবাদ, কুসংস্কার ও খেয়ালখুশী দ্বারা পরিব্যাপ্ত। আমাদের শাসকরা খোলাখুলিভাবে এবং আপত্তিকরভাবে পশ্চিমাদের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ নতুবা নাস্তিক, ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের প্রতি সমস্ত ভালোবাসা জমিয়ে রাখে এবং মুসলিম, মুওয়াহীদ এবং মুজাহিদদের প্রতি সমস্ত ঘৃণা ও শত্রুতা প্রকাশ করে। যদিও তারা আল্লাহ্‌র আইন বর্জন করে এবং পরিবর্তন করে তারপরও তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে। তারা এসব নিকৃষ্ট কাজ করতে সাহায্য নেয় কিছু সংখ্যক ভন্ড ও স্বল্পমূল্যে দ্বীনকে বিকৃতিকারী উলামাদের কাছ থেকে।

এ সমস্ত শাসকরা তাদের বশ্যতা স্বীকারের জন্য মুসলিমদের জোরপূর্বক অঙ্গিকারবদ্ধ করে, তাদের নাস্তিকতাকে সমর্থন করার জন্য এবং তাদের আইনের কাছে বিচার চাওয়ার জন্য। রাষ্ট্রনীতি একটি নতুন ধর্মে পরিনত হয়েছে যা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, সংবাদপত্র এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে এবং তরুনদের মস্তিস্কে স্থায়ী হচ্ছে। এই নতুন ধর্মবিশ্বাসের ডাক রাজনীতি ও ধর্মকে পৃথক করার জন্য, যাতে মসজিদে চলে আল্লাহ্‌র নির্দেশে এবং সংসদ থেকে নিয়ে সারা দেশ চলে শাসক গোষ্ঠীর নির্দেশে। ভ্রষ্ট উলামারা মানুষদের ইজরা'র ধর্মবিশ্বাস শিক্ষা দেয়, যেমন– "কাজ তেমন জরুরী না যতক্ষণ পর্যন্ত " ঈমান অন্তরে থাকে " এবং এই সমস্ত শাসকরাও ঈমানদারদের অন্তর্ভূক্ত"। সুফীবাদ, বাহা'বাদ, ক্বাদীয়ানিয়া, নুসাইরিয়াহ এবং অন্যান্য প্রথভ্রষ্ট ধর্মবিশ্বাস সমূহকে সত্য আক্বীদার মধ্যে তাদের গরল, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ মতবাদ ও অন্ধবিশ্বাস ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মুক্ত রাজত্ব দেয়া হয়েছে। অপরদিকে, একটি বিশৃঙ্খল জবাব হিসেবে, খাওয়ারিজ গোত্র এর বিভিন্ন মাজহাব-এর মাধ্যমে নতুন বিষয় উদ্ভব করেছে মুসলিমদের অবিশ্বাসী চিহ্নিত করার জন্য।

আমরা এ সমস্ত পথভ্রষ্ট গোত্রসমূহের মধ্যে আমাদের পূর্ববর্তী জ্ঞানীদের আক্বীদা খুঁজলে খুব কমই পাবো। কারণ এটি প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এবং সমাজের কোথাও কোন চিহ্ন না রেখে প্রত্যেকের মন ও মস্তিষ্ক থেকে উধাও হয়ে গেছে, শুধু মাত্র তারা ব্যতীত, যাদের উপর আমাদের রব তাঁর দয়া ও রহমত দান করেছেন এবং তারা সংখ্যায় অতি নগন্য।

আমরা আমাদের চারপাশে যেসব উদাহরণ দেখি তা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, আমাদের সমাজে সত্য বিশ্বাস প্রায় অনুপস্থিত এবং আমাদের মানুষের মনে আক্বীদা এর পথ হারিয়ে ফেলছে, অথবা খুবই ছোট একটি স্থান দখল করে আছে। এটা হল

বর্তমানের বর্ণনা যেখানে আমাদের শোচনীয় অবস্থা– যেখানে আমরা দুর্বল হয়ে আছি আর তা দেখে বিলাপ করছি। বর্তমানের পাতায় এই অন্ধকার, ঐ আলোকে আরও ম্লান করে দেয় যেটা আমরা ক্ষনকালের জন্য উপভোগ করি যখন আমরা আমাদের পূর্ববর্তী উজ্জ্বল ও সর্বোৎকৃষ্ট উম্মতের ব্যাপারে অনুসন্ধান করি।

বর্তমান ও অতীতের মধ্যে বিস্তৃতি ও সংযোগের অযোগ্য ব্যবধান এবং দুই পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা উভয়ই নিজেকে সত্য ঈমানদার দাবী করে। সত্য বিশ্বাস হল একটি ব্যানার যা উভয় প্রজন্ম দ্বারাই উত্তোলিত। এক প্রজন্ম এটি এবং এর যাবতীয় কার্যাদি সত্য বিশ্বাসের মতবাদ নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করেছে, অন্য প্রজন্ম উত্তরাধিকার সূত্রে এবং প্রচলিত প্রথা হিসেবে এটি উত্তোলন করে, কিন্তু এমনভাবে কাজ করে যাতে এর সত্য রূপ লুকায়িত থাকে। আমরা কি এখন এই শিক্ষা পেয়েছি যে, বিশ্বাসের ছাপ কোন কাজের না যদি না এটি যথোপযুক্ত কাজ এবং ত্যাগের সদৃশ্য হয় ?

ইমাম আশ-শাফি'ঈ (রহঃ) বলেনঃ ' যদি মানুষ সূরা আল-আসরের মর্ম বুঝত তাহলে এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট হত'। আল্লাহ্ এই সূরায় বলেনঃ

"মহাকালের শপথ ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারনে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।" (সূরা-আসর)

আমরা আত-তাওহীদ সংশ্লিষ্ট আক্বীদার কথা বলে থাকি। আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সব নবী-রাসূলের আক্বীদা। আমাদের পূর্ববর্তী জ্ঞানীদের, আস-সালাফ-আস-সালিহ এবং মুসলিম পন্ডিত ও আদর্শ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সত্যের অনুসারীদের আক্বীদা। শুধুমাত্র তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তিতর্ক বা দার্শনিক বিতর্কের খাতিরে নয়, বরং আমাদের উম্মতের বিশ্বাসসমূহকে সংশোধন ও প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস এবং ভ্রম–যা তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে তা বিশুদ্ধকরনের জন্য আক্বীদার কথা বলব।

আমরা এটি পুনরাবৃত্তি করছি, যাতে করে এটি আমাদের অন্তরের গভীরে স্থাপিত হয় এবং এর বাধ্য-বাধকতা সমূহ আমাদের কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আমরা আল্লাহ্র সামনে সে সমস্ত প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস যা আমাদের পূর্ববর্তী আলেমদের আক্বীদার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ন তার থেকে ক্ষমা চাই এবং আমরা তাঁর সাহায্য চাই যাতে আমাদের কথা ও কাজে অসামঞ্জস্যতা না থাকে।

মুসলিম হিসেবে এই হল আমাদের আক্বীদাহ

▶ ঈমান হল জিহ্বার দ্বারা একটি ঘোষণা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজ এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা। ঈমান আনুগত্যের কাজ দ্বারা বর্ধিত হয় এবং অবাধ্যতাজনিত কাজের মাধ্যমে হ্রাস পায়, এবং এই অনুযায়ী ঈমানদারগণ বিভিন্ন ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হন।

▶ গুনাহ এবং অবাধ্যতাজনিত কাজ দ্বারা ঈমান হ্রাস পায়, কিন্তু এর নির্যাস অকার্যকর করে দেয় না, যেখানে বড় অবিশ্বাস (আল-কুফর আল-আকবার) এটিকে সমূলে উৎপাটন করে।

▶ কুফর (অবিশ্বাস) দুই ধরনেরঃ ১) বড় কুফর ২) ছোট কুফর। প্রথমটির মাধ্যমে যে কাউকে সম্পূর্নরূপে ইসলামের বহির্ভূত করে এবং অবিশ্বাসী হিসেবে চিহ্নিত করে। দ্বিতীয়টি হল অবাধ্যতামূলক কোন কাজকে সংকেত প্রদান ও ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে একটি অতিরঞ্জিত নামে অভিহিত করা। 'বড় কুফর' ও 'ছোট কুফর'–এর মতো একই ভাবে প্রযোজ্য শিরক, নিফাক, যুল্ম এবং ফিস্ক।

▶ একজন মুসলিম আল্লাহ্র কোন হুকুমের অমান্য করলে কাফির (অবিশ্বাসী) হয়ে যায় না, হোক তা সংখ্যায় অনেক বা কম, ও সে তার জন্য অনুশোচনা করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্তর দ্বারা সেকাজকে বৈধ মনে করে। একজন ফাসেক যে গুনাহ ও অসৎ কাজ যা সে সম্পাদন করে তার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও– এ অবস্থাতে তাকে কাফির বলা যায় না। যদিও সে তা চালিয়ে যায় এবং তার জন্য অনুশেচনা করে না এবং ঐ অবস্থাতেই মারা যায়। তার তাকদীর আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর কিয়ামতের দিন নির্ভর করবে। তিনি তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন অথবা জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দিতে পারেন এবং এক পর্যায়ে সেখান হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

▶ যখন ঈমান ও ইসলাম একত্রে উল্লেখ করা হয়, তখন প্রথমটি অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করাকে এবং পরবর্তীটি কাজের দ্বারা সম্পাদন করাকে বুঝানো হয়। যখন আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয় তখন উভয়টিই ইসলামের দ্বীন-এর কথা সম্পূর্ণভাবে বোঝায়।

▶ আমরা কাউকে কাফির হিসেবে গননা করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সম্পাদিত কাজটি পরিষ্কারভাবে 'কুফর' বোঝা যায় এবং অবিসম্বাদীত প্রমান তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করা যায় যাতে করে এটা পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে প্রমানিত হয় যে, সে জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং স্বেচ্ছায় কাজটি সম্পাদন করেছে।

▶ আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, জীবন দানকারী ও জীবন গ্রহণকারী, পুনরুত্থানকারী, উত্তরাধিকারী সমস্ত ভাল এবং ক্ষতি করার অধিকারী, আমরা তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ মানি না।

" তুমি জিজ্ঞাস কর– আমি কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য রবের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হচ্ছেন প্রতিটি বস্তুর রব ।" (সূরা আনআম:১৬৪)

▶ তিনি মহিমান্বিত এবং সুউচ্চ, তাঁর কোন সাদৃশ্য, পুত্র, অংশীদার বা প্রতিযোগী নেই ।

" বলঃ তিনিই আল্লাহ্‌ একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ্‌ কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী । তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন, এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই ।" (আল-ইখলাস)

▶ একমাত্র মহান আল্লাহ্‌ই ইবাদতের যোগ্য এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, তাঁর বান্দাদের সমস্ত কিছু তাঁর কাছেই একমাত্র সমর্পন করতে হবেঃ ভয়, আশা, স্মরণ, আবেদন, ভালবাসা ও আত্মসমর্পন, সাহায্য ও আরোগ্য, অনুরোধ, নির্ভরতা, উৎসর্গ, সিজদা এবং ইবাদতে অন্যান্য সকল উপায়ে ।

▶ আমরা গাছপালা, পাথর বা কবরের কাছে রহমত চাই না । আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর নামের গুনাবলী ব্যবহার করে, আমাদের সম্পাদিত ভালো কাজে বা জীবিত কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মাধ্যমে আমরা সাহায্য চাই । আমরা কবরের চারদিকে মৃতদের নিকট হতে রহমতের আশায় হেটে বেড়াই না, আর না জিন বা মৃত ভালো লোকদের কাছে সাহায্যের জন্য বলি, না আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারও সিজদা করি । যে কেউই এর যে কোন একটি কাজ সম্পাদন করে, সে সুস্পষ্ট শিরক-এ-আকবার (বড় শিরকে) লিপ্ত হয় ।

▶ আমরা আল্লাহ্‌র পার্শ্বে অন্য কোন ইলাহ্‌ নেই না, আল্লাহ্‌ ছাড়া আমরা অন্য কোন বিধানের কাছে বিচার চাই না, কারণ আল্লাহ্‌ সৃষ্টিকর্তা । আল্লাহ্‌র সেই সার্বভৌমত্ব আছে এবং তাই তিনি বিচার করেন, আদেশ দেন, নিষেধ করেন, রায় দেন এবং আইন প্রণয়ন করেন । আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞানী এবং সর্বজান্তা ।

▶ যে কেউই আল্লাহ্‌র আইনের উপর আইন প্রণয়ন করে এবং তাঁর আইন অন্য কারও আইন দ্বারা পরিবর্তন করে, সে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যায়, এরকম ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র অংশীদার এবং বিচারকার্যে সমান হিসেবে দাঁড় করায়, এর ফলে সে ইসলামের বাইরে চলে যায় । যদি এই ব্যক্তি কোন শাসক হয় তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করতে হবে এবং তাকে পদচ্যুত করতে হবে ।

▶ কোন রকম উপেক্ষা, অর্থ বদলানো বা কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য বোঝানো - ইত্যাদি ব্যতীতই আল্লাহ্‌র সকল নাম ও গুনাবলী যা তিনি কোরআনে বা তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন তা সমর্থন করি । আমরা আল্লাহ্‌র গুনাবলীর মতো কোন জ্ঞানের দাবীও করিনা, কারণঃ **" কোন কিছুই তাঁর সাদৃশ্য নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।"**(সূরা-শুরা:১১)

তাঁর সদৃশ কেউ নেই, সেটা তাঁর নামে, তাঁর গুনাবলীতে বা কোন কাজে যেটাতেই হোক ।

▶ আমরা আল্লাহ্‌র ঐ সমস্ত গুনাবলী সমর্থন করি যা তিনি তাঁর নিজের জন্য ঘোষনা দিয়েছেন এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) ও স্বীকার করেছেন, যথাঃ জ্ঞান, যোগ্যতা, শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, মুখমন্ডল, হাত এবং অন্যান্য গুনাবলী যা কোনটাই তাঁর সৃষ্টির সদৃশ নয় ।

▶ আমরা বলি যেভাবে আমাদের রব বলেছেনঃ **" দয়াময় (আল্লাহ্‌) আরশে সমাসীন ।"** (ত্বাহা:৫)

আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্টির উর্ধ্বে এবং সুউচ্চে তাঁর আরশে সমাসীন । তিনি আরশে আসীন রয়েছে তা আমরা জানি, কিন্তু কিভাবে আসীন রয়েছেন তা আমাদের অজানা । এতে বিশ্বাস করা একটি আবশ্যকতা (ওয়াজিব), এবং কিভাবে আসীন আছেন তা সম্পর্কে বলা একটি বিদ'আত ।

▶ আল্লাহ্‌ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন এবং যখন ও যেভাবে ইচ্ছা করেন । কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আনন্দিত হন, হাসেন, ভালবাসেন, ঘৃণা করেন, সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং ক্রোধান্বিত হন (যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন) । তাঁর কর্মে তিনি তাঁর কোন সৃষ্টির সদৃশ নন এবং কিভাবে এসব কর্ম সম্পাদিত হয় তা সব মরনশীলদের অজানা ।

▶ কোরআন হল আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নাযিলকৃত সত্য কিতাব যাকে সৃষ্ট বলা যায় না এবং যা কোন দিক দিয়েই মানব জাতির কথোপকথনের সদৃশ নয়, এটি তাঁর দ্বারা এমনভাবে কথিত যার কোনকিছুই আমাদের জ্ঞাত নয় ।

▶ আমরা ফেরেশতা, নবী এবং রাসূল দের বিশ্বাস করি ।

▶ আমরা রাসূলদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহে বিশ্বাস করি এবং তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করি না ।

▶ আমরা বিশ্বাস করি যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র দাস ও রাসূল । তিনি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, সর্বশেষ নবী এবং সকল ধার্মিক ব্যক্তির নেতা ।

▶ আমরা বিশ্বাস করি, সজাগ অবস্থায় এবং সশরীরে মক্কার আল-হারাম মসজিদ হতে তাকে জেরুযালেমের আল-আক্‌সা মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং জান্নাত হতে যতটা উচুতে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন ততটা উপরে তিনি অধিষ্ঠিত হন ।

▶ আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, প্রতীক্ষিত মাহদী (অথবা সত্যানুসারী ইমাম) এই পৃথিবীতে শেষ জামানায় রাসূল (সাঃ) এর উম্মাতের ভেতর হতেই আসবেন ।

▶ আমরা ঐ সময়ের সংকেত বিশ্বাস করি । আদ-দাজ্জাল (মিথ্যা মসীহ্) এর আর্বিভাব । স্বর্গ হতে মরিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) এর অবতরন । পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়, পৃথিবী হতে হিংস্র জন্তুর আর্বিভাব এবং কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য সংকেত ।

▶ আমরা বিশ্বাস করি কবরে দুই ফেরেশতা কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ, মুনকার এবং নাকীর, একজনের রব, দ্বীন ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ব্যাপারে ।

▶ আমরা মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি, আমরা শেষ বিচারের দিন, আমলনামা পাঠ, মানদন্ড (যার উপর সম্পাদিত কাজ পরিমাপ করা হবে), আস-সীরাত (জাহান্নামের আগুনের উপর স্থাপিত পুল) এবং শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস করি ।

▶ আমরা পাপীদের জন্য কবরের আজাবে বিশ্বাস করি । আল্লাহ্ আমাদের তা হতে রক্ষা করুন । কবর হল হয় জান্নাতের একটি চারণভূমি নতুবা জাহান্নামের আগুনের জন্য গর্ত সরূপ এবং প্রতিটি বান্দা তাই পায় যার সে উপযুক্ত ।

▶ আমরা বিশ্বাস করি সেই মধ্যস্থতায় যা রাসূল (সাঃ) কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মতের জন্য সংরক্ষণ করেছেন ।

▶ আমরা আল-হাওস-এ বিশ্বাস করি যা আল্লাহ্ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা রাসূল (সাঃ)-কে সম্মান সরূপ কিয়ামতের দিন প্রদান করবেন, তাঁর উম্মতের পিপাসা মেটানোর জন্য ।

▶ আমরা বিশ্বাস করি যে, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই সত্য । এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কখনও তা অদৃশ্য হবে না ।

▶ আমরা বিশ্বাস করি যে সকল জান্নাতবাসী কোন প্রকার পরিবেষ্টন ছাড়া এবং খালি চোখেই তারা তাদের রবের সরাসরি সাক্ষাত পাবে । আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন:

" সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে । তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে ।" (সূরা-কিয়ামত:২২-২৩)

▶ আমরা আল-ক্বাদার (আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত রায়)-এর ভালো ও মন্দে বিশ্বাস করি এবং বলিঃ

"------ তুমি বলঃ সমস্তই আল্লাহ্র নিকট হতে----- ।" (আন-নিসা:৭৮)

ভালো এবং মন্দ উভয়ই আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত রায় । পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই তাঁর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় ।

▶ আমরা বিশ্বাস করি মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর দাসদের অবিশ্বাসকারী বা অবাধ্য হতে আদেশ দেন না, না তিনি এরকম ব্যক্তিদের উপর সন্তুষ্ট হন:

" ----তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না ।" (সূরা-যুমার:৭)

এবং যদি তিনি নাস্তিকদের জন্য নাস্তিকতা নির্ধারন করে দেন, তিনিই শুধুমাত্র এর কারণ জানেনঃ আল্লাহ্র তরফ হতে ন্যায় বিচার, বান্দার নিজের আত্মার বিরুদ্ধে কৃত পাপকর্ম এবং তার পূর্বে সম্পাদিত পাপের শাস্তি হিসেবে এটি হতে পারে ।

" তোমার নিকট যে কোন কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহ্র তরফ হতে এবং তোমার উপর যে অকল্যাণ নিপতিত হয় তা তোমার নিজ হাতে হয়ে থাকে--- ।" (সুরা-নিসা:৭৯)

এ সমস্ত কিছুই আল্লাহ্র ইচ্ছায় সংঘটিত হয় । তিনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তাই হবে এবং যা ইচ্ছা করেন না তা হবে না । এবং আল্লাহ্ তার কোন বান্দার প্রতি কখনো অন্যায় করেন নাঃ

" নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না----- ।"(সুরা-নিসা:৪০)

▶ আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্ তাঁর বান্দার কার্যাদি সৃষ্টি করে থাকেনঃ

" প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও ।" (সুরা-আস-সাফ্ফাত:৯৩)

এবং বান্দারা নিজেদের কাজ সম্পাদন করে থাকে বাস্তবে, রূপক অর্থে নয় ।

▶ আমরা রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবাদের ভালোবাসি, আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেকের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তারা সকল উম্মাতের শ্রেষ্ঠ উম্মাত । আমরা তাদের জ্ঞানকে স্মরণ করি, তাদের শ্রদ্ধা করি এবং তাদের সাথে মিত্রতা পোষণ করি । আমরা সেসব জিনিষ হতে বিরত থাকি যেসবে তাঁরা অমত পোষণ করেছেন । তাদের প্রতি ভালোবাসা ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান (উৎকৃষ্ট ব্যবহার)-এর অংশ । তাদের ঘৃণা করা হল মুনাফেকী এবং অবিশ্বাস ।

▶ আমরা সমর্থন করি আবু বকর আস্-সিদ্দিককে প্রথম খলিফা হিসেবে, সমস্ত উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট হবার জন্য। এরপর উমর বিন আল-খাত্তাব এরপর উসমান বিন আফ্‌ফান এবং এরপর আলী বিন আবী তালিবকে - আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেকের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। তাঁরা হলেন সত্যের অনুসারী খলিফা এবং ন্যায়পরায়ণ নেতৃবৃন্দ যাদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ "তোমাদের অবশ্যই আমার সুন্নাতের এবং সত্যের অনুসারী খলীফাগনের সুন্নাত অনুসরন করতে হবে, এটি শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাক।" (আবু দাউদ এবং তিরমিযী- আবু নাযিহ আল-'ইরবাদ বিন সারিয়াহ বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ)

▶ আস-সালাফ-এর উলামাগণ (এই উম্মাতের প্রথম প্রজন্ম এবং যারা তাদের পদানুসরণ করেন) সর্বোত্তম উপায়ে কথা বলেছেন। তাঁদের মধ্যে যারা খারাপ কথা বলেন তারা অবশ্যই সঠিক পথে নেই।

এই হল আমাদের আক্বীদাহ– যেটি আমাদের কাছে জীবনের চাইতে ও বেশী মূল্যবান এটি সময়ের পরীক্ষা পার হয়েছে এবং চৌদ্দ শতাব্দী ধরে বলিষ্ঠ আছে। এটি অবিশ্বাসকারীদের আক্রমনের, মুনাফিকদের সন্দেহ বিস্তার এবং প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে মতাবলম্বীদের উদ্ভাবিত বিদ'আতের পরও চলতে থাকবে। অনেক মুসলিম কর্তৃক শিথিল ও উপেক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে।

আমাদের আক্বীদাহর নিজস্ব সত্ত্বা নিয়ে টিকে থাকা ও স্থায়ীত্বই প্রমাণ করে যে এটি মহিমান্বিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্র তরফ থেকে। সকল ধর্মমত বিলুপ্ত বা নিপাতিত হয়েছে এবং সকল ধর্ম পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু একমাত্র ইসলামই বিশুদ্ধ ও সত্য রয়ে গিয়েছে, কারণ এটিই একমাত্র সত্য যা কোন মিথ্যাচার দ্বারা আক্রান্ত অথবা সন্দেহ দ্বারা আন্দোলিত হবে না। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

" আমিই কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক।" (সূরা-আল-হিযর:৯)

এটি এমন একটি ধর্মবিশ্বাস যা আমাদের একটি মজবুত, সঠিক ভীত তৈরী করে দেয়, যাতে করে আমরা আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, নিশ্চিত যে আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় যিনি ইবাদতের যোগ্য। কারণ, তিনি হচ্ছেন মালিক এবং যা কিছু তাঁর তাতে রাজত্ব তিনিই করেন এবং এই জন্য যে, তিনি তাঁর সকল গুনাবলীতে পূর্ণাঙ্গ। তাঁর উপরে বা তিনি ব্যতীত আমাদের আর কোন লক্ষ্য নেই, আর না এর চেয়ে বড় কোন লক্ষ্য আছে, কারণ তিনি সর্বোত্তম।

এটি একটি ধর্মবিশ্বাস যেটি আল্লাহ্‌কেই সর্বক্ষমতার অধিকারী মানে এবং এই কর্তৃপক্ষের নিকট সাক্ষ্যদান ও সমর্পন করা ঈমানের একটি শর্ত এবং এটি মনে রাখা এর একটি পূর্বশর্ত ও একনিষ্ঠতার চিহ্নঃ

" আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিনা নারীর সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না।"(সূরা-আল-আহযাব:৩৬)

" অতএব তোমার রবের শপথ ! তারা কখনোই বিশ্বাসস্থাপনকারী হতে পারবে না যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের সৃষ্ট বিরোধের বিচারক না করে অতঃপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহন না করে এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে।"(সূরা-নিসা:৬৫)

এটি এমন একটি ধর্মবিশ্বাস যা তখনও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ফয়সালা চায় যখন অমত দেখা দেয়ঃ

" হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহ্র ও রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের জন্য যারা উলিল-আমর তাদের; অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক, এটিই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি।"(সূরা-নিসা:৫৯)

এভাবে আমাদের আক্বীদাহ বোধশক্তির সমন্বয় ঘটায় এবং বৈসাদৃশ্যের যেকোন সম্ভাবনা মুছে ফেলে। এটি আমাদেরকে সেই লক্ষ্য এবং পথ প্রদান পূর্বক ঈমানদারদের ঐক্যবদ্ধ করে একই পথে। পৃথক পৃথক দেশ, জাতি ও বর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাদের একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হতে দেখা যায়।

আমাদের আক্বীদা এমন একটি ধর্মমত যা প্রত্যেকটি ব্যক্তির সত্ত্বাকে পৃথকভাবে এই পৃথিবীতে নিজস্ব কার্যাবলীর রক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, একই সাথে এর জন্য দায়ী করে থাকে। কারন সে জানে কিয়ামতের দিন তাকে বলা হবেঃ

" তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।"(সূরা-ইসরা:১৪)

এটি করার মাধ্যমে ঈমানদারগণের অন্তরে আক্বীদা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেটি তাকে আল্লাহ্র কোন আদেশ, আইন ও বিচার অমান্য করতে বাধা দেয়। এটা তাকে সরল সঠিক পথে ফিরতে সাহায্য করে যদি সে তা থেকে বিচ্যুত হয় অথবা সীমালংঘন করে। এটা তাকে আল্লাহ্র রাস্তায় ক্রমাগত সংগ্রাম করতে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পরিচালিত করে।

এটা হল আমাদের আক্বীদার সাথে অন্যান্য সকল জ্ঞানতত্ত্ব এবং দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য এবং এটি এই আক্বীদাকে সর্বোচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলাম এই আক্বীদাকে এমন সুপ্রতিষ্ঠিত স্থানে অধিষ্ঠিত করে যে অন্য সকল মতবাদ ও জ্ঞানতত্ত্ব

তা অর্জনের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং তাদের ধর্মমত ও আমাদের আক্বীদার মধ্যে এই বিশাল ব্যবধান থাকার ফলে, তারা এই আশাও প্রজ্জ্বলিত রাখতে পারেনা যে এর নীতি সমূহের সমকক্ষ হবে, আর এতে পৌছানো তো অসম্ভব।

সা'সা বিন মুআউইয়াহ রাসূল (সাঃ) কাছে আসেন ও পাঠ করেনঃ

" কেউ অনু পরিমান সৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে, এবং কেউ অনু পরিমান অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।"(সূরা-যিলজালাহ:৭-৮)

এতে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ" আমার জন্য অন্য কোন আয়াত ব্যতীত শুধু এটি শোনাই যথেষ্ট।"(ইমাম আহমেদ থেকে বর্ণিত। আত-তাফসীরে আন-নাসাঈ ও এটি বর্ণনা করেন)

আমাদেরটি এমন এক আক্বীদাহ যা সরাসরি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সাঃ) এবং ঈমানদারগনের সাথে আমাদের মিত্রতা স্থাপন করে। এছাড়া অন্যরা সবাই আল্লাহ্ হতে তাদের যথেষ্ট ব্যবধানের জন্য এবং আল্লাহ্র বিরোধীতার করার জন্য শত্রু ও ঘৃণিত।

এটি এমন একটি আক্বীদাহ যা এর অনুসারীদের এই দুনিয়ার জীবনের সংকীর্ণতা ও অপ্রয়োজনীয়তা থেকে বের করে আখিরাতের বিশালতা এবং জাকজমকতা ও উৎকর্ষতার কাছে নিয়ে যায়। এই আক্বীদাহর মানুষদের সর্বদা মাটিতে হাটতে দেখা গেলেও তারা এই জীবন ও পরবর্তী উভয় জীবনের জন্য তারা নিজেদের প্রস্তুত রাখে। তারা একটি ক্ষণস্থায়ী নিকৃষ্ট জীবনের জন্য সংগ্রাম করে না, বরং তারা এখান থেকে শুধুমাত্র ঐ সাহায্যই নিতে চায় যা তাদের আল্লাহ্র রাস্তায় গমন ও পরবর্তী জীবনে সাহায্য করবেঃ

" এই পার্থিব জীবন খেল তামাশা ও আমোদ প্রমোদের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রকৃত পক্ষে পরকালের আরামই হবে তাদের জন্য মঙ্গলময় যারা ধ্বংস হতে বেঁচে থাকতে চায়। তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করবে না?" (সূরা-আনআম:৩২)

" আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।"(সূরা-ত্বাহা:৭৩)

এটি এমন একটি আক্বীদাহ যারা একে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে তারা সম্মানজনক জীবন যাপন করে, কোন রকম অপমান বা অমর্যাদা ব্যতীত, যদিও তাদের অবস্থা স্বাচ্ছন্দ্য ও কষ্টে, জয়ে ও পরাজয়ে-এর মাধ্যে দোদুল্যমান কিন্তু কোনকিছুই তাদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনকে ছুঁতে পারে না তাদের বিশ্বাসের জন্য তারা তাদের সম্মান ও মর্যাদা তাদের রবের নিকট হতেই পায়, যিনিঃ

" -----মহান, শ্রেষ্ঠ।"(সূরা-বাকারা:২২৫) এবং **"---তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"**(সূরা-আস-সাফ্ফ:১)

তারা না কোন ধন-সম্পদ বা প্রভাব থেকে সম্মান নেয়, না এই পৃথিবীতে অন্য কোন শক্তি হতে বরং তারা হল নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত জলজ্যান্ত উদাহরনঃ

"----কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ্রই, আর তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের----।"(সূরা-মুনাফিকুন:৮)

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না ও বিষন্ন হয়ো না এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরাই সমুন্নত হবে।" (সূরা আলি-'ইমরান:১৩৯)

এটা এমন একটি আক্বীদাহ যা এর অনুসারীদের এই পৃথিবীতে আত্মবিশ্বাস ও মনের শান্তি যোগায় এবং আখিরাতের সুসংবাদ দেয়। এটা তাদেরকে তাদের রবের সাথে সাক্ষাতের জন্য আগ্রহী করে তোলে, যার জন্য তারা সমস্ত কষ্ট ও কাঠিন্যের স্বাদ গ্রহণ করে।

আর্‌কানুল ইসলাম বা ইসলামের স্তম্ভ সমূহ (أركا ن اسلام)

প্রথম স্তম্ভঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল" এ সাক্ষ্য দেওয়া (*الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.*)

এ দু' সাক্ষ্য ইসলামের প্রবেশ পথ ও তার মহান স্তম্ভ। কোন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারবে না যতক্ষন না সে এ দু' সাক্ষ্য মুখে উচ্চারণ করবে ও সাক্ষ্যদ্বয়ের দাবী অনুযায়ী আমল করবে।

আর এ সাক্ষ্য দানের মাধ্যমেই এক জন কাফির মুসলিম হয়ে যায়।

১- আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এই সাক্ষ্য দানের অর্থ (١- معنى شهادة أن لا إله إلا الله:)

আর তা হলোঃ এর অর্থ জেনে ইহা মুখে উচ্চারণ করা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে এর দাবী ও চাহিদা অনুযায়ী আমল করা, আর এর অর্থ না জেনে এবং এর দাবী অনুযায়ী আমল না করে শুধু মুখে পাঠ করা সকলের ঐক্যমতে কোন উপকারে আসেনা। বরং তার বিরূদ্ধে হুজ্জত হবে।

আর (**لا إله إلا الله**) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ হলোঃ এক আল্লাহ সুবহানাহু ও তা'আলা ছাড়া প্রকৃত পক্ষে কোন সত্য মা'বুদ-উপাস্য নেই।

এ কালেমার দু'টি রুক্‌ন রয়েছে। (النفي والإثبات) আন্‌নাফি-অস্বীকৃতি জানানো, ওয়াল ইছবাত-স্বীকৃতি জানানো।

অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া সব কিছুর উপাসনা অস্বীকার করা, এবং সে উপাসনা একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা, যার কোন অংশীদার নেই। তাগুতকে অস্বীকার করাও এই কালেমার অন্তর্ভুক্ত।

তাগুত-হলোঃ আল্লাহকে ছেড়ে মানুষ, পাথর, বৃক্ষ ও প্রবৃত্তি ইত্যাদির যার পূঁজা-উপাসনা করা। আর তাকে (তাগুতকে) ঘৃণা করা ও তা হতে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করাও এ কালেমার অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপরঃ যে ব্যক্তি এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করেছে অথচ আল্লাহ ছাড়া যে সকল বস্তুর ইবাদাত করা হয় তা অস্বীকার করে নাই সে এই কালেমার দাবী পূরণ করে নাই।

এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

অর্থঃ **তোমাদের ইলাহ্‌-উপাস্য হলেন এক ও অদ্বিতীয়, আর সে মহান করুনাময় দয়ালু ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ-উপাস্য নেই**। *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৬৩)*

তিনি আরো বলেনঃ

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থঃ **দ্বীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নাই, সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মযবূত হাতল ধরবে যাহা কখনও ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।** *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-২৫৬)*

আর (الإله) ইলাহ্‌ এর অর্থঃ ইলাহ্‌ অর্থ সত্য মা'বুদ-উপাস্য।

আর যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে যে ইলাহ্‌-উপাস্য হলেন তিনি যিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, বা নতুন কিছু আবিস্কারে ক্ষমতাশীল, এর দ্বারাই ঈমান সৌন্দর্য লাভ করে, ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর একাত্বতা ঘোষণা করা ছাড়াই।

সে ব্যক্তির (لا إله إلا الله) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই" মুখে উচ্চারণ করে ইসলামে প্রবেশ করা দুনিয়াতে কোন উপকারে আসবে না। আর আখিরাতে স্থায়ী শাস্তি হতে এই কালেমা তাকে মুক্তি দিবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ

অর্থঃ **বলঃ কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি কার কর্তৃত্বাধীন? কে জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হতে নির্গত করে এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে? তখন তারা বলবেঃ আল্লাহ। বলঃ তবুও কি তোমরা সাবধান হবেনা?** *(সূরা যূনুস-আয়াত-৩১)*

তিনি আরো বলেনঃ

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

অর্থঃ **যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ। তবুও তারা কোথায় ফিরছে?** । *(সূরা আল-যুখ্‌রুফ-আয়াত-৮৭)*

২– কালেমায়ে তাওহীদ এর শর্তসমূহ (٢-شروط كلمة التوحيد:)ঃ

(১) ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভাবে অর্থ জানা, যা অজ্ঞতার পরিপন্থী।

নেতিবাচক হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য ইবাদাত সাব্যস্ত না করা। আর ইতিবাচক হলো তা (ইবাদাত) এককভাবে তার জন্য সাব্যস্ত করা। তার কোন অংশীদার নেই তিনিই একমাত্র ইবাদাতের মালিক ও হক্বদার।

(২) এই কালেমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, যা সন্দেহের পরিপন্থী।

অর্থাৎঃ এই কালেমার দাবীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আন্তরিকভাবে নিশ্চিত হয়ে মুখে উচ্চারণ করা।

(৩) এই কালেমাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা, যা প্রত্যাখ্যাণের পরিপন্থী।

আর তা হলো এই কালেমার সকল দাবী-চাহিদা ও তার বক্তব্য গ্রহণ করা। সংবাদ সমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখা, আদেশ সমূহ পালন করা। নিষেধ সমূহ হতে বিরত থাকা। কুরআন ও হাদীসের দলীল পরিত্যাগ ও অপব্যাখ্যা না করা।

(৪) অনুগত হওয়া, যা ছেড়ে দেওয়ার পরিপন্থী। আর তা হলো এই কালেমা যে সকল বিধানের নির্দেশ দিয়েছে তা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে আনুগত্য করা।

(৫) (এই কালেমাকে) সত্য জানা, যা মিথ্যার পরিপন্থী। আর তা হলো বান্দা এই কালেমাকে সত্য জেনে অন্তর হতে উচ্চারণ করবে।

এই কালেমা পাঠ কারীর অন্তর তার কথা মোতাবেক হবে, এবং তার বাহ্যিক অবস্থা আভ্যন্তরীণ অবস্থা মুতাবিক হবে।

অতঃপর যে ব্যক্তি এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করেছে আর তার দাবীকে অস্বীকার করেছে নিশ্চয়ই তার এই মুখে উচ্চারণ তার কোন কাজে আসবে না, যেমন মুনাফিকদের অবস্থা ছিল। তারা এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করতো অন্তরে অস্বীকার করতো।

(৬) পূর্ণ একনিষ্টতা থাকা, যা শিরকের পরিপন্থী। আর তা হলো বান্দা আমলকে নেক নিয়াতের দ্বারা শিরকের সকল প্রকারের গ্লানি হতে মুক্ত রাখবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء

অর্থঃ **তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে ইবাদাত করার**। *(সূরা আল-বায়্যিনা-আয়াত-৫)*

(৭) এই কালেমার সাথে মুহাব্বাত-ভালবাসা রাখা, যা বিদ্বেষের পরিপন্থী।

আর ইহা বাস্তবায়িত হবে, এই কালেমাকে, তার দাবীকে, তার নির্দেশিত বিধানকে এবং যারা এই কালেমার শর্ত মোতাবেক চলে তাদেরকে ভালবাসার মাধ্যমে। আর উল্লেখিত কথা গুলোর বিপরীত কথার সাথে বিদ্বেষ রাখার মাধ্যমে।

এর নিদর্শন হলোঃ আল্লাাহর প্রিয় বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া, যদিও তা প্রবৃত্তির বিরোধ হয়। আর আল্লাহর যা অপছন্দ তা অপছন্দ করা, যদিও তার দিকে প্রবৃত্তি ধাবিত হয়। আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যাদের বন্ধুত্ব রয়েছে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা। আর আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যাদের শত্রুতা রয়েছে তাদের সাথে শত্রুতা রাখা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

অর্থঃ **তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যতক্ষন না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।** *(সূরা আল-মুম্‌তাহানা-আয়াত-৪)*

তিনি আরো বলেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلَّهِ

অর্থঃ **তথাপি কেহ কেহ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম।** *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৬৫)*

আর যে ব্যক্তি ইখলাস ও ইয়াকীনের সাথে (لا إله إلا الله) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই" একথা বলবে এবং সকল পাপাচার, বিদ'আত, ছোট শিরক ও বড় শিরক হতে মুক্ত থাকবে, সে দুনিয়াতে পথভ্রষ্টতা হতে হিদায়াত পাবে। আর আখিরাতে শাস্তি হতে নিরাপত্তা পাবে। তার উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে।

এই শর্ত গুলো পূর্ণ করা বান্দার উপর আবশ্যক। আর এই শর্ত গুলো পূর্ণ করা অর্থ হলো যে, এই শর্ত গুলো একজন বান্দার জীবনে সমাবেশ ঘটা এবং তা জানা অত্যাবশ্যক হওয়া। তবে ইহা মুখস্থ করা জরুরী নয়।

আর এই মহান কালেমা (لا إله إلا الله) (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) হলো তাওহীদুল উলুহীয়্যাহ, যা তাওহীদের প্রকার সমূহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ এক প্রকার তাওহীদ, এ বিষয়েই নবীগণ ও তাদের সম্প্রদায়ের মাঝে মতনৈক্য সংঘটিত হয়েছিল। আর এরই বাস্তবায়নের জন্যে রাসূলগণকে প্রেরণ করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

অর্থঃ **আল্লাহ্র ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমরা তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি।** *(সূরা আল-নাহ্‌ল-আয়াত-৩৬)*

তিনি আরো বলেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

অর্থঃ **আমরা তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার নিকটে এই ওহী অবতীর্ণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর।** *(সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত-২৫)*

আর যখন শুধু তাওহীদ বলা হবে, তখন তা হতে মুল-উদ্দেশ্য হবে তাওহীদুল উলূহীয়্যাহ।

تعريف توحيد الألوهية: *তাওহীদুল উলূহীয়্যাহ এর সংজ্ঞাঃ* নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সকল সৃষ্টি জীবের উলূহীয়াত ও উবূদীয়াতের মালিক, তিনি এককভাবে ইবাদাতের মালিক তার কোন শরীক নেই এই স্বীকৃতি দেওয়া।

أسماؤه: *তার (তাওহীদুল উলূহীয়্যার) নাম সমূহঃ* এই তাওহীদকে তাওহীদুল উলূহীয়্যাহ বা ইলাহীয়্যাহ বলা হয়েছে কারণ একনিষ্টভাবে ইহা নিছক তা'আল্লুহ (تألّه) এর উপর প্রতিষ্ঠিত। একক আল্লাহর জন্য অধিক ভালবাসাকে তা'আল্লুহ বলা হয়।

নিম্নে বর্ণিত নাম গুলো তাওহীদুল উলূহীয়্যার নামঃ

(ক) তাওহীদুল ইবাদাহ বা উবূদীয়াহঃ কারণ ইহা এক আল্লাহর জন্য ইবাদাত হওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(খ) তাওহীদুল ইরাদাঃ কারণ ইহা আমলের দ্বারা আল্লাহর সন্তষ্টি কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(গ) তাওহীদুল কাছদঃ কারণ ইহা এক আল্লাহর জন্য ইবাদাতকে একনিষ্ঠ অত্যাবশ্যক করে এমন একক ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(ঘ) তাওহীদুত ত্বলাবঃ কারণ ইহা আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে চাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(ঙ) তাওহীদুল আমলঃ কারণ ইহা আল্লাহ তা'আলার জন্য আমলকে একনিষ্ঠ করার উপর প্রতিষ্ঠিত।

حكم توحيد الألوهية: *তাওহীদুল উলূহীয়্যাতের হুকুম বা বিধানঃ* তাওহীদুল উলূহীয়্যাহ সকল বান্দাদের উপর ফরয। বান্দারা কেবল মাত্র এর দ্বারাই ইসলামে প্রবেশ করে। আর এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আমল করলেই জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে। প্রাপ্ত

বয়স্ক ব্যক্তির উপর এ বিশ্বাস এবং এ মোতাবেক আমল করা সর্ব প্রথম ওয়াজিব। আর এর দ্বারাই দাও'আত ও শিক্ষা শুরু করা সর্ব প্রথম ওয়াজিব। যারা এর বিপরীত ধারণা করে তারা এতে মতনৈক্য করেছে।

কুরআন ও হাদীসে এর ফারযিয়াতের নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ এরই বাস্তবায়নের জন্য সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করেছেন এবং কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ

অর্থঃ **বলঃ আমি তো আল্লাহর ইবাদাত করতে ও তার কোন শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি তারই প্রতি আহ্বান করি এবং তারই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন**। *(সূরা রা'দ-আয়াত-৩৬)*

তিনি আরো বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থঃ **আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে**। *(সূরা আয্-যারিয়াত-আয়াত-৫৬)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুআয (রাযিআল্লাহু আনহু) কে বলেনঃ

অর্থঃ (হে মুআয রাযিআল্লাহু আনহু) তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো। সর্ব প্রথম তাদেরকে (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-) আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই-এই দিকে আহ্বান কর। যদি তারা এই দাও'আত গ্রহণ করে তোমার আনুগত্য করে, তখন তুমি তাদেরকে জানাও যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা ইহা গ্রহণ করে, তখন তুমি তাদেরকে জানাও যে, আল্লাহ তোমাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, ইহা ধনীদের কাছ থেকে নেওয়া হবে এবং দরিদ্রদেরকে দেওয়া হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

এই তাওহীদ যাবতীয় আমল সমূহের মধ্যে অধিকতর উত্তম আমল ও অধিক পাপ মোচন কারী। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও মুসলিম সাহাবী ইত্বান (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামকে হারাম করেছেন যে, ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে।

(চ) সমস্ত রাসূলগণের এই কালেমার উপর ঐক্যমত।

সমস্ত রাসূলগণ তাদের সম্প্রদায়কে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর দিকে দাও'আত দানে এবং ইহা হতে বিমুখের ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারে একমত ছিলেন।

যেমন কুরআন কারীমে অনেক আয়াতে এর বর্ণনা এসেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

অর্থঃ **আমরা তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার নিকটে এই ওহী অবতীর্ণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর**। *(সূরা আল-আম্বিয়া-আয়াত-২৫)*

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই কালেমার দিকে দাও'আত দানে নবীদের একমতের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যেঃ

অর্থঃ নবীগণ একে অপরে বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। তাদের মা ভিন্ন ছিল, আর দ্বীন একছিল।

সকল নাবীদের মূল দ্বীন ছিল একই, তা হলো তাওহীদ, যদিও শরী'আতের অন্যান্য বিধি-বিধান ভিন্ন ছিল। যেমন কখনো ছেলে-মেয়ে মায়ের দিক হতে ভিন্ন হয়, আর তাদের পিতা এক।

৩ –মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দানের অর্থ (٣-معنى شهادة أن محمداً رسول الله:)

(ক) নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দানের অর্থ হলোঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা আদেশ করেছেন তা পালন করা, যে সব খবর দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা, এবং যেগুলি

সম্পর্কে নিষেধ ও সতর্ক করেছেন সেগুলি থেকে বিরত থাকা, আর একমাত্র তিনি যে বিধান দান করেছেন সেমত আল্লাহর ইবাদাত করা।

(খ) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য বাস্তবায়নঃ

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য বাস্তবায়ন হবে ঈমান ও পূর্ণ ইয়াকীন দ্বারা। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল, যাকে সকল মানব ও জ্বিন জাতীর নিকট প্রেরণ করেছেন। তিনি শেষ নবী ও রাসূল। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর নৈকট্যর্জনকারী বান্দা। তার মাঝে উলূহীয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট নেই। তার অনুসরণ করা, তার আদেশ নিষেধের সম্মান করা। কথায়, কাজে ও বিশ্বাসে তার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

অর্থঃ **বলঃ হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল**। *(সূরা আল-আ'রাফ-আয়াত-১৫৮)*

তিনি আরো বলেনঃ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

অর্থঃ **আমরা তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি**। (সূরা সাবা-আয়াত-২৮)

তিনি আরো বলেনঃ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

অর্থঃ **মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নাবী**। *(সূরা আল-আহ্যাব-আয়াত-৪০)*

তিনি আরো বলেনঃ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا

অর্থঃ **বলঃ আমার প্রতিপালক পবিত্র! আমি কেবলমাত্র একজন মানুষ যাকে রাসূল বানানো হয়েছে**। *(সূরা আল-ইস্রা-আয়াত-৯৩)*

উক্ত সাক্ষ্য নিম্নে বর্ণিত বিষয় গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেঃ

প্রথমতঃ তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রিসালাতের স্বীকৃতি দেওয়া ও অন্তরে তার বিশ্বাস রাখা।

দ্বিতীয়তঃ এর উচ্চারণ করা ও মুখের দ্বারা প্রকাশ্য ভাবে এর স্বীকৃতি দেওয়া।

তৃতীয়তঃ যে সত্য তিনি নিয়ে এসেছেন তা অনুসরণ করা, এবং যে বাতিল বিষয় সমূহ নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অর্থঃ **সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তার বার্তাবাহক উম্মী নাবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তার বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হতে পার**। *(সূরা আল-আ'রাফ-আয়াত-১৫৮)*

চতুর্থতঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সব খবর দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা।

পঞ্চমতঃ জান, মাল, ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা, ও সকল মানুষের ভালবাসার চাইতে তাকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে) অধিক ভালবাসা। কারণ তিনি আল্লাহর রাসূল, আর তাকে ভালবাসাই হলো আল্লাহর ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত।

আর তার প্রকৃত মুহাব্বাত হল তার আদেশ সমূহের আনুগত্য করে তার নিষেধ সমূহ হতে বিরত থেকে তার অনুসরণ করা। তাকে সাহায্য করা, তার সাথে বন্ধুত্ব রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

অর্থঃ **বলঃ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন**। *(সূরা আল-ইমরান-আয়াত-৩১)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ তোমাদের কেহ পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না যতক্ষন আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও সকল মানুষের চেয়ে অধিকতর প্রিয় না হবো। *(ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীসটি আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন)*

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থঃ **সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে উহার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।** *(সূরা আল-আ'রাফ-আয়াত-১৫৭)*

ষষ্টতঃ তার সুন্নাতের প্রতি আমল করা। তার কথাকে সকলের কথার উপর প্রাধান্য দেওয়া, নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করা। তার শরী'আত মোতাবেক বিধান পরিচালনা করা এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

অর্থঃ **কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষন পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিস্মবাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সমন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্ত করণে উহা মানিয়া না লয়।** *(সূরা আন-নিসা-আয়াত-৬৫)*

দ্বিতীয় রুক্নঃ আস্-সলাত (নামায) (*الركن الثاني : الصلاة.*)

নামায ইবাদাত সমূহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এর ফরয হওয়ার দলীল অত্যন্ত সুস্পষ্ট, ইসলাম এ বিষয়ে খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে। সুতরাং ইবাদাত সমূহে নামাযের ফযিলত ও তাৎপর্য কতটুকু তা বর্ণনা করেছে। আর ইহা বান্দা ও তার প্রভুর মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী, ইহা প্রতিষ্ঠার দ্বারা বান্দা তার প্রভুর আনুগত্য প্রকাশ করে।

১- নামাযের সংজ্ঞা (١- تعريفها:)

:لغة - শাব্দিক অর্থঃ নামাযের শাব্দিক অর্থ দু'আ, এই অর্থ কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

অর্থঃ **তুমি তাদের জন্য দু'আ কর, তোমার দু'আ তাদের জন্য চিত্তস্বস্তিকর।** *(সূরা আত্-তাওবাহ-আয়াত-১০৩)*

:واصطلاحاً - পারিভাষিক অর্থঃ ইহা এমন এক ইবাদাত যা বিশেষ কিছু কথা ও কর্মকে শামিল করে, আল্লাহু আকবার দ্বারা শুরু হয়, আস্সালামু আলাইকুম দ্বারা শেষ হয়।

: والمراد بالأقوال কথা হতে উদ্দেশ্য হলঃ আল্লাহু আকবার বলা, ক্বিরাত, তাসবীহ, ও দু'আ ইত্যাদি পাঠ করা।

:والمراد بالأفعال - কর্ম দ্বারা উদ্দেশ্যঃ ক্বিয়াম-দাঁড়ানো, রুকু করা, সিজ্দা করা ও বসা ইত্যাদি।

২- নাবী ও রাসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম)-নিকট এর গুরুত্ব (٢- أهميتها لدى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام:)

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রেরণের পূর্বের আসমানী দ্বীন সমূহে নামায বিধিবদ্ধ ছিল। ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) তার প্রভুর কাছে নিজের ও স্বীয় বংশধরের নামায প্রতিষ্ঠার দু'আ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي

অর্থঃ **হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও।** *(সূরা ইব্রাহীম-আয়াত-৪০)*

আর ইসমাঈল (আলাইহিস্ সালাম) তার পরিবারকে নামায প্রতিষ্ঠার আদেশ করেছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

অর্থঃ **সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত।** *(সূরা মারয়াম-আয়াত-৫৫)*

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস্ সালাম) কে সম্বধন করে বলেনঃ

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

অর্থঃ **আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। অতএব আমার ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।** *(সূরা তাহা-আয়াত-১৪)*

আল্লাহ তা'আলা নামায আদায়ের ব্যাপারে তার নবী ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) কে আদেশ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

অর্থঃ **যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে।** *(সূরা মারয়ামঃ আয়াত- ৩১)*

আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মি'রাজ ও ইস্রার রাত্রিতে আসমানে নামায ফরয করেছেন। আর নামায ফরয কালে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হালকা করে পাঁচ ওয়াক্ত করেছেন। ইহা আদায়ে পাঁচ ওয়াক্ত, কিন্তু ছুয়াবে পঞ্চাশ ওয়াক্ত।

والصلوات الخمس هي: - পাঁচ ওয়াক্ত নামায তা হলোঃ ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ঈশা, এর উপর সকল মুসলমানদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩- সালাত-নামায প্রবর্তনের দলীল (৩- دليل مشروعيتها:)

নামাযের প্রবর্তনতা প্রমাণিত হয়েছে একাধিক দলীল দ্বারা। নিম্নে তার কিছু বর্ণনা করা হলঃ

প্রথমতঃ কুরআন হতেঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ

অর্থঃ তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর। *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-৪৩)*

তিনি আরো বলেনঃ

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

অর্থঃ নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। *(সূরা আন-নিসা-আয়াত-১০৩)*

তিনি আরো বলেনঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

অর্থঃ **তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্টভাবে তার ইবাদাত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে।** *(সূরা আল-বায়্যিনা-আয়াত-৫)*

দ্বিতীয়তঃ হাদীস হতেঃ

(১) ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হাদীস, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

((بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)) (متفق عليه).

অর্থঃ ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দান করা। নামায প্রতিষ্ঠা করা। যাকাত প্রদান করা। বায়তুল্লাহ শরীফের হাজ্জ করা। রামাযানের রোযা রাখা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(২) উমার বিন খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস, যাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - -، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً)) (رواه مسلم).

অর্থঃ ইসলাম হলো, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দেওয়া, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রামাযান মাসের রোযা রাখা, সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহ এর হাজ্জ করা। *(মুসলিম শরীফ)*

(৩) ইব্‌নে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর হাদীসঃ

অর্থঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুআয (রাযিআল্লাহু আনহু) কে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন এবং (তাকে) বল্‌লেনঃ যে, তুমি তাদেরকে (আহলে কিতাবদেরকে) (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু–) আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দানের দিকে আহ্বান কর। যদি তারা এই দাও'আত গ্রহণ করে তোমার আনুগত্য করে তবে তুমি তাদেরকে জানাও যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। *(বুখারী মুসলিম)*

তৃতীয়তঃ ইজমা

সকল মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার উপর একমত হয়েছেন। আর ইহা ইসলামের ফরয সমূহের অন্যতম একটি ফরয।

৪- সালাত-নামায প্রবর্তনের পিছনে হিক্‌মাত ((৪-الحكمة في مشروعيتها:)

একাধিক হিক্‌মাত ও রহস্যকে সামনে রেখে নামায প্রবর্তন করা হয়েছে। নিন্মে তার কিছু ইঙ্গিত করা হলোঃ

(১) আল্লাহ তা'আলার জন্য বান্দার দাসত্ব প্রকাশ করার লক্ষ্যে, সে তার দাস, এই নামায আদায়ের দ্বারা মানুষ উবূদীয়াতের অনুভূতি লাভ করে, এবং সে সর্বদায় তার সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।

(২) এই নামায তার প্রতিষ্ঠাকারীকে আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনকারী ও সর্বদায় স্বরণকারী করে রাখে।

(৩) নামায তার আদায়কারীকে নির্লজ্জ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে, আর ইহা বান্দাকে পাপ ভুল-ক্রটি হতে পবিত্র করার মাধ্যম।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর হাদীসই তার প্রমাণ।

তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা ঐ প্রবহমান নদীর ন্যায় যা তোমাদের কারো দরজার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে, তথায় সে প্রতি দিন পাঁচ বার গোসল করে। *(মুসলিম শরীফ)*

(৪) নামায অন্তরের তৃপ্তি, আত্নার শান্তি, ও মুক্তি দানকারী ঐ বিপদ-আপদ হতে যা তাকে কলুষিত করে। এ জন্যই ইহা রাসূলের কুর্‌রাতুল আইন-নয়ন সিক্তকারী। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোন কঠিন কাজের সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি নামায আদায়ের দিকে ছুটে যেতেন। এমনকি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে থাকতেনঃ

অর্থঃ হে বিলাল! নামাযের দ্বারা তুমি আমাকে শান্তি দাও। *(আহ্‌মাদ)*

৫- কাদের উপর নামায ফরয ((৫-من تجب عليه الصلاة:)

প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক জ্ঞানী মুসলিম ব্যক্তির উপর নামায ফরয। চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক। কাফিরের উপর নামায ফরয নয়। এর অর্থ-দুনিয়াতে সে এর আদিষ্ট নয়, কারণ তার কুফরী অবস্থায় তার পক্ষ থেকে ইহা শুদ্ধ হবেনা। তবে ইহা ছেড়ে দেওয়ার কারণে আখিরাতে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইহা আদায় করা তার জন্য সম্ভব ছিল, কিন্তু সে তা করে নাই।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণীঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ
قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ
حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ

অর্থঃ **তোমাদেরকে কিসে সাকার নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? উহারা বলবে, আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, আমরা অভাবগ্রস্থকে আহার্য দান করতাম না, এবং আমরা আলোচনাকারীদের সহিত আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করতাম, আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমণ পর্যন্ত।** *(সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির-আয়াত-৪২-৪৭)*

আর বাচ্চাদের উপরও ফরয নয়। কারণ সে মুকাল্লাফ-প্রাপ্ত বয়স্ক নয়। পাগলের উপরও ফরয নয়। ঋতু ও নিফাস গ্রস্থ মহিলাদের উপরও ফরয নয়। কারণ শরী'আত তাদের হতে এর বিধান তুলে নিয়েছে, ইহা আদায়ে বাঁধা প্রদান কারী নাপাকির কারণে।

বাচ্চা সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তার বয়স যখন সাত বছর হবে তখন তার অভিভাবকের উপর তাকে নামাযের আদেশ দেওয়া আবশ্যক। আর যখন তার বয়স দশ বছর হবে তখন নামায আদায় না করলে তার অভিভাবকের উপর তাকে প্রহার করা আবশ্যক। হাদীসে এর বর্ণনা এসেছে। যাতে সে তা আদায়ে অভ্যস্ত ও আগ্রহী হয়।

৬ - সালাত-নামায ত্যাগ কারীর বিধান (٦- حكم تارك الصلاة:)

যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল সে ইসলাম হতে বহিস্কৃত হয়ে গেল এবং কুফরী করলো।

ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান হতে মুর্তাদ ব্যক্তিদের

অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার উপর যে বিধি-বিধান ফরয করেছেন তা ছেড়ে দিয়ে সে তার নাফারমানী করেছে। তাই তাকে তাওবার আদেশ দেওয়া হবে। যদি তাওবা করে ও নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফিরে আসে তবে ভাল, অন্যথায় সে ইসলাম হতে মুর্তাদ হয়ে যাবে। তার গোসল, কাফন, জানাযার নামায পড়া, মুসলমানদের কবরে দাফন করা নিষেধ। কারণ সে তাদের (মুসলমানদের) অন্তর্ভুক্ত নয়।

৭ - সালাতের-নামাযের শর্ত সমূহ (٧- شروطها:)

- ইসলাম-মুসলিম হওয়া।
- জ্ঞানবান হওয়া।
- ভাল-মন্দ পার্থক্যের জ্ঞান থাকা।
- নামাযের সময় উপস্থিত হওয়া।
- নিয়াত করা।
- ক্বিবলা মুখী হওয়া।
- সতর ঢাকা, পুরুষের সতর নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত। আর মহিলার তার সম্পূর্ণ শরীরই নামাযে সতর, তার মুখ ও হাতের তালুদ্বয় ছাড়া।
- মুসল্লির কাপড়, শরীর ও নামায পড়ার স্থান হতে নাপাকি দূর করা।
- হাদাছ দূর করা, আর ইহা-নাপাকি হতে অযু গোসল করে পবিত্র হওয়াকে বুঝায়।

৮ - সালাতের-নামাযের সময় (٨- أوقاتها:)

(১) যোহর নামাযের সময়ঃ সূর্য ঢলে যাওয়া হতে-অর্থাৎ মধ্য আকাশ হতে সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়া হতে নিয়ে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত।

(২) আসর নামাযের সময়ঃ যোহর নামাযের সময় চলে যাওয়া হতে নিয়ে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুন হওয়া পর্যন্ত। আর তা হল সূর্য হলদে হওয়া সময় পর্যন্ত।

(৩) মাগরিব নামাযের সময়ঃ সূর্য ডুবা হতে নিয়ে লালিমা দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত। আর তা হল ঐ লালটে ভাব যা পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবার পর প্রকাশিত হয়।

(৪) ঈশার নামাযের সময়ঃ মাগরিবের নামাযের সময় চলে যাওয়া হতে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত।

(৫) ফজর নামাযের সময়ঃ ফজরে সানী প্রকাশ হওয়া থেকে নিয়ে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত।

এর প্রমাণ আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ যোহরের সময়ঃ যখন সূর্য ঢলে যাবে, মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হবে। আসরের নামাযের সময় হওয়া পর্যন্ত থাকবে। আর মাগরিবের নামাযের সময় সূর্য ডুবা হতে নিয়ে লালিমা পর্যন্ত। আর ঈশারের নামাযের সময় মাগরিবের নামাযের সময় চলে যাওয়া থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত। আর ফজরের নামাযের সময় ফজর প্রকাশিত হওয়া থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত, আর তখন (সূর্য উদয়ের সময়) নামায পড়া হতে বিরত থাক। *(মুসলিম শরীফ)*

৯- ফরয নামাযের রাকা'আতের সংখ্যা (৯- عدد ركعاتها:)

ফরয নামাযের রাকা'আতের সংখ্যা সর্বমোট সতের রাকা'আত। নিম্নে তার তালিকা দেওয়া হলঃ

যোহরঃ চার রাকা'আত;

আসরঃ চার রাকা'আত;

মাগরিবঃ তিন রাকা'আত;

ঈশাঃ চার রাকা'আত;

ফজরঃ দু' রাকা'আত;

যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে এই রাকা'আতের সংখ্যায় বাড়ায় বা কমায় তবে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি তা ভুলবশতঃ হয় তবে তা সিজ্‌দায় সাহুর দ্বারা পূর্ণ করবে। এই সংখ্যা মুসাফির ব্যক্তির জন্য নয়। তার জন্য চার রাকা'আত বিশিষ্ঠ নামায গুলো দু' রাকা'আতে কছর করে পড়া মুস্তাহাব। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায তার নির্ধারিত সময়ে পড়া মুসলিম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যদি কোন শারয়ী অজর (যেমন-নিদ্রা, ভুলে যাওয়া, ভ্রমণে যাওয়া,) না থাকে। যে ব্যক্তি নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে যাবে বা ভুলে যাবে সে তা পড়ে নিবে যখন স্বরণ হবে।

১০- নামাযের ফরয সমূহ ((১০- فرائضها:))

সামর্থ্য থাকলে দাঁড়ানো;

তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমাহ;

সূরা ফাতিহা পাঠ করা;

রুকু' করা;

রুকু' হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো;

সাত অঙ্গের উপর সিজ্‌দা করা;

সিজ্‌দা হতে উঠা;

শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পড়া;

তাশাহ্‌হুদ কালে বসা;

নামাযের এই রুক্‌ন গুলো সম্পাদনে স্থিরতা বজায় রাখা;

এই রুক্‌ন গুলো ধারাবাহিক ভাবে আদায় করা;

ডানে ও বামে দুই সালাম প্রদান করা বা সালাম ফিরানো;

১১- নামাযের ওয়াজিব সমূহ (১১- واجباتها:)

নামাযের ওয়াজিব সমূহ আটটিঃ

প্রথমঃ তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার তাক্‌বীর ছাড়া নামাযে অন্যান্য তাক্‌বীর সমূহ।

দ্বিতীয়ঃ ((سمع الله لمن حمده))(সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা) বলা। আর ইহা ইমাম ও একাকী নামায আদায় কারীর জন্য ওয়াজিব। তবে মুক্তাদী ইহা পাঠ করবে না।

তৃতীয়ঃ ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামায আদায় কারী সকলের উপর ((ربنا ولك الحمد)) (রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ) বলা ওয়াজিব।

চতুর্থঃ রুকুতে ((سبحان ربي العظيم)) (সুব্‌হা-না রাব্বিয়াল আজীম) বলা।

পঞ্চমঃ সিজ্‌দায় ((سبحان ربي الأعلى)) (সুব্‌হা-না রাব্বিয়াল আ'লা) বলা।

ষষ্ঠঃ দু'সিজ্‌দার মাঝে ((رب غفر لي)) (রাব্বিগ ফিরলী) বলা।

সপ্তমঃ প্রথম বৈঠকে তাহিয়্যাত পড়া, আর তা হলোঃ

((التحيّات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله))

উচ্চারণঃ আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্‌ সালা-ওয়া-তু ওয়াত্‌ তাইয়্যেবা-তু, আস্‌সালা-মু আলাইকা আইউ হান্নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ। আস্‌সালা-মু আলাইনা-ওয়া আ'লা-ইবাদিল্লা-হিস্‌ স-লিহীন। আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াশ্‌ হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহ। বা অনুরূপ প্রমাণিত তাহিয়্যাত পাঠ করা।

অষ্টমঃ প্রথম বৈঠকের জন্য বসা। আর যারাই ইচ্ছাকৃত ভাবে এই ওয়াজিব সমূহের কোন একটি ওয়াজিব ছেড়ে দিবে তাদেরই নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি ইহা ছেড়ে দিবে অজ্ঞতা বা ভুল বঃশত সে সাহু সিজ্‌দা দিবে।

১২ - জামা'আতে নামায ((١٢- صلاة الجماعة:))

মসজিদে জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া মুসলিম ব্যক্তির উপর আবশ্যক। এতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ছাওয়াব অর্জন করতে পারবে।

একা নামায পড়ার চাইতে জামা'আতে নামায পড়ার ছাওয়াব সাতাশ গুণ বেশী।

ইব্‌নে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ জামা'আতে নামায পড়া, একা নামায পড়ার চাইতে সাতাশ গুণ (ছাওয়াব) বেশী। *(বুখারী ও মুসলিম)*

তবে মুসলিম রমণীর নিজ বাড়ীতে নামায পড়া জামা'আতে নামায পড়ার চাইতে উত্তম।

১৩- নামায বাতিল (নষ্ট) কারী বিষয় সমূহ (١٣- مبطلاتها:)

নিম্নে বর্ণিত কর্ম সমূহের যে কোন একটি কর্ম সম্পাদনের দ্বারা নামায বাতিল হয়ে যাবে।

(১) ইচ্ছাকৃত পানাহার করা।

যে ব্যক্তি নামায অবস্থায় পানাহার করবে তার উপর ঐ নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক হওয়ার উপর উলামাগণের ইজমা রয়েছে।

(২) নামাযের মাসলাহাতের (কল্যাণ মূলক) বহির্ভূত এমন বিষয়ে ইচ্ছাকৃত কথা বলা।

এ ব্যাপারে যায়েদ বিন আরকাম (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ ((كنا نتكلم في الصلاة))

অর্থঃ আমরা নামাযে কথা বলতাম, আমাদের কেহ কেহ নামাযে তার পাশের সাথীর সাথে কথা বলতো।

এমতাস্থায় নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হলঃ

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

অর্থঃ **আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে**। *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-২৩৮)*

অর্থঃ অতঃপর আমরা চুপ থাকার আদেশ প্রাপ্ত হলাম। আর কথা বলা হতে নিষেধ প্রাপ্ত হলাম। *(বুখারী ও মুসলিম)*

এমনিভাবে ইজমা সংঘটিত হয়েছে ঐ ব্যক্তির নামায ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে যে, নামাযে তার মাসলাহাতের বহির্ভূত ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত কথা বলবে।

(৩) ইচ্ছাকৃত অনেক বেশী কাজ করা। আর অধিক কাজের পরিমাণ নির্ণয় করার মানদন্ড হলঃ নামাযির দিকে দৃষ্টি পাত কারীর নিকট মনে হবে যে, সে নামাযের মাঝে নয়।

(৪) বিনা অজরে ইচ্ছাকৃত নামাযের কোন রুক্ন বা শর্ত ছেড়ে দেওয়া। যেমন বিনা অযুতে নামায পড়া, বা ক্বিবলা মুখী না হয়ে নামায পড়া। অর্থাৎ ক্বিবলা ছেড়ে অন্য দিক হয়ে নামায পড়া।

এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ বেদুঈনকে বলেছেন, যে তার নামায সুন্দর করে পড়তে পারে নাই।

((ارجع فصل فإنك لم تصلّ)) (অর্থঃ ফিরে যাও নামায পড়, কেননা তুমি নামায পড় নাই।)

(৫) নামাযে হাঁসা। কারণ হাঁসি দ্বারা নামায বাতিল হয়ে যাওয়ার উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

১৪- নামাযের নিষিদ্ধ সময় সমূহ (১৪-أوقات النهي عن الصلاة:)

ফজর নামাযের পর হতে নিয়ে সূর্য উঠা পর্যন্ত;

ঠিক দুপুর সময়;

আসর নামাযের পর হতে সূর্য ডুবা পর্যন্;

এই সময় সমূহে নামায পড়া মাক্রুহ হওয়ার উপর দলীল হল উক্ববা বিন আমির (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস, তিনি বলেনঃ

অর্থঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে তিন সময়ে নামায পড়তে ও আমাদের মৃত্যু ব্যক্তিদেরকে দাফন করতে নিষেধ করতেন।

(১) সূর্য স্পষ্ট ভাবে উদিত হওয়ার সময় হতে নিয়ে তা (উর্ধে উঠা) পর্যন্ত।

(২) ঠিক দুপুরে সূর্য উঁচু হওয়া হতে নিয়ে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত।

(৩) সুর্য অস্তমুখী হওয়া থেকে নিয়ে তা ডুবা পর্যন্ত। *(মুসলিম)*

আরো দলীল হলো আবু সাঈদ (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ আসরের নামাযের পর হতে নিয়ে সূর্য ডুবা পর্যন্ত, ফজরের নামাযের পর হতে নিয়ে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত কোন নামায নাই। *(বুখারী ও মুসলিম)*

১৫- নামাযের পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ((১৫- إجمال صفة الصلاة:))

মুসলিম ব্যক্তির উপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণ করা ওয়াজিব। নামায পড়ার পদ্ধতিও তার অনুসরণের অন্তর্ভুক্ত।

কারণ তিনি বলেছেনঃ

((صلوا كما رأيتموني أصلي)) (رواه البخاري).

অর্থঃ তোমরা নামায পড়, যে ভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ। *(বুখারী মুসলিম)*

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন, আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতেন।

অন্তরে নামাযের নিয়্যাত করতেন, নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করার ব্যাপারে তার পক্ষ হতে কোন হাদীস বর্ণিত হয় নাই।

আর (الله أكبر) "আল্লাহু আক্বার" বলে তাক্বীর দিতেন। এই তাক্বীরের সাথে তার হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন দুই কাঁধ সমপরিমাণ, আর কখনো কখনো দুই কানের লতি পর্যন্ত। তার ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর ধারণ করতেন।

নামায আরম্ভ করার দু'আ সমূহের যে কোন একটি দু'আ দিয়ে নামায শুরু করতেন তন্মধ্যে এটি।

উচ্চারণঃ সুব্হা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা ওয়া তাবা-রাকাস্মুকা ওয়া তা'আ-লা যাদ্দুকা ওয়ালা-ইলা-হা গাইরুকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সহিত পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নাম মহিমান্বিত, আপনার সত্ত্বা অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত, আর আপনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই।

এই দু'আটি নামায আরম্ভ করার দু'আ সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তার পর সূরা ফাতিহার সাথে আরো একটি সূরা পড়তেন। তার পর হস্তদ্বয় (প্রথম বারের ন্যায়) উত্তোলন করে তাক্‌বীর দিয়ে রুকুতে যেতেন, আর রুকুতে পিঠ সোজা করে রাখতেন, এমনকি যদি নিজের পিঠের উপর পানির পাত্র রাখা হত, তবে তা স্থীর থাকতো।

(سبحان ربي العظيم) "সুবহা-না রাব্বিয়াল আযীম" তিন বার পড়তেন।

অতঃপর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে মুখে (سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد) "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা ওয়া-লাকাল হাম্‌দ" বলে রুকু' হতে উঠে স্থীর হয়ে দাঁড়াতেন। অতঃপর তাক্‌বীর বলে সিজ্‌দা করতেন, সিজ্‌দা অবস্থায় নিজ হস্তদ্বয় নিজ বক্ষের পার্শ্ব দ্বয় হতে দূরে রাখতেন, এতে বগলের শুভ্র প্রকাশিত হয়ে যেত। তার সাত অঙ্গ নাক সহ কপাল, তালুদ্বয়, হাঁটুদ্বয়, পাদ্বয়ের মাথা, মাটিতে রেখে সিজ্‌দা করতেন, (سبحان ربي الأعلى) "সুব্‌হা-না রাবিবয়াল আ'লা" তিনবার বলতেন। অতঃপর ডান পা খাড়া রেখে সকল আঙ্গুলের মাথা ক্বিবলা মুখী করে আল্লাহু আকবার বলে বাম পার উপর বসতেন। আর এই বৈঠকে,

(رب اغفرلي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارفعني)

উচ্চারণঃ রাব্বিগ্‌ফিরলি ওয়ার হাম্‌নী ওয়াজাবরিনী ওয়ার ফা'নী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া আ'ফিনী ওয়ার ফা'নী।

এই দু'আ তিনবার পড়তেন। অতঃপর আল্লাহু আক্‌বার বলতেন ও সিজ্‌দা করতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য তাক্‌বীর দিতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক রাক'আতে অনুরূপ করতেন। অতঃপর দু' রাকা'আতের পর যখন প্রথম বৈঠকের জন্য বসতেন তখন বলতেন,

((التحيّات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله))

উচ্চারণঃ আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্‌ সালা-ওয়া-তু ওয়াত্‌ তাইয়্যেবা-তু, আস্‌সালা-মু আলাইকা আইউ হান্নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ। আস্‌সালা-মু আলাইনা-ওয়া আ'লা-ইবাদিল্লা-হিস্‌ স-লিহীন। আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াশ্‌ হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহ।

তার পর তাকবীর দিয়ে দন্ডায়মান হয়ে দু' হাত উত্তোলন করতেন। (তৃতীয় রাকা'আতের জন্য) আর ইহা নামাযের চতুর্থ স্থান যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন। তার পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন শেষ বৈঠকের জন্য, তা হলো মাগরিবের তৃতীয় রাক'আতের শেষে বা যোহর, আসর, ও ঈশার চতুর্থ রাক'আতের শেষে-বসতেন তখন তাওয়াররুক করে বসতেন।

বাম পা ডান পায়ের নলীর নীচ দিয়ে বের করে দিয়ে ডান পা কিব্‌লা মুখী অবস্থায় খাড়া রেখে নিতম্বের উপর বসতেন। হাতের সমস্ত আঙ্গুল বন্ধ রাখতেন, শুধু শাহাদাত আঙ্গুল তার প্রতি দৃষ্টি রেখে ইশারা বা নাড়ানোর জন্য খোলা রাখতেন। অতঃপর যখন তাশাহুদ শেষ করতেন তখন ডান দিকে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ও বাম দিকে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাতেন। এমনকি তার গালের শুভ্রতা প্রকাশ পেয়ে যেতে।

নামাযের এই পদ্ধতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম) এর অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

ইহা নামাযের বিধান সমূহের কিছু বিধান যার উপর কর্মের সঠিকতা নির্ভর করে, আর তার (বান্দার) যদি নামায ঠিক হয়ে যায় তবে তার সকল কর্ম ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি নামায নষ্ট-ফাসেদ হয়ে যায় তবে তার সকল কর্ম নষ্ট-ফাসেদ হয়ে যাবে। আর কিয়ামাত দিবসে সর্ব প্রথম বান্দার নামাযের হিসাব নেওয়া হবে যদি সে ইহা পুরোপুরি ভাবে আদায় করে তবে সে আল্লাহর সন্ত ষ্টি লাভের মাধ্যমে উত্তীর্ণ হবে। আর যদি সে ইহা হতে কিছু ছেড়ে দেয় তবে সে ধ্বংস হবে। আর নামায (মানুষকে) বেহায়াপানা ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে। আর ইহা মানব আত্মার রোগের চিকিৎসা যাতে ইহা (আত্মা) হীনস্বভাব হতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হতে পারে।

তৃতীয় রুক্‌নঃ যাকাত (*الركن الثالث: الزكاة.*)

১- যাকাতের সংজ্ঞা ((١- تعريفها:))

:الزكاة لغة- *যাকাতের শাব্দিক অর্থঃ* বৃদ্ধি পাওয়া, বেশী হওয়া। কখনো প্রশংসা, পবিত্র করন ও সংশোধন এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর মালের যে অংশ বের করা হয় তাকে যাকাত বলে। কারণ এর দ্বারা বরকতের মাধ্যমে মাল বৃদ্ধি পায়, আর ক্ষমার মাধ্যমে ব্যক্তিকে পবিত্র করা হয়।

:واصطلاحاً - *যাকাতের পারিভাষিক অর্থঃ* নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ঠ গোষ্টির জন্য নির্ধারিত মালে অত্যাবশকীয় হক্ব বের করা।

২- ইসলামে যাকাতের স্থান ((٢- مكانتها في الإسلام:))

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ। আল-কুরআনে বহু স্থানে সালাতের সাথে যাকাতের আলোচনা হয়েছে। যেমন-আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ

অর্থঃ তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর। *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-৪৩)*

তিনি আরো বলেনঃ

ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزّكاة (سورة البينة، الآية:٥).

অর্থঃ **এবং (তারা আদিষ্ট হয়েছিল) সালাত কায়েম করতে, এবং যাকাত প্রদান করতে।** *(সূরা আল-বায়্যিনাহ-আয়াত-৫)*

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে যাকাত আদায় করা অন্যতম একটি রুক্ন। *(এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম একত্রিত ভাবে ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেছেন)*

আল্লাহ মানব জাতির আত্মাকে কৃপণতা, বখীলতা ও লোভ-লালসা হতে পবিত্র করার জন্য, ফকীর-মিসকীন ও অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করার জন্য, মালকে পবিত্র ও বৃদ্ধি করার জন্য, তথায় বরকত অবতীর্ণ করার জন্য, তাকে বিপদ-আপদ ও বিপর্যয় হতে রক্ষা করার জন্য এবং জাতির জীবন ও সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যাকাত প্রবর্তন করেছেন।

আল্লাহ তার কিতাবে যাকাত গ্রহণের হিক্‌মাত উল্লেখ করেছেন।

যেমন তিনি বলেনঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

অর্থঃ **তুমি তাদের সম্পদ হতে সাদ্‌কা (যাকাত) গ্রহণ কর। ইহার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র এবং আত্মশুদ্ধি কর।** *(সূরা আত্‌তাওবাহ-আয়াত-১০৩)*

৩- যাকাতের বিধান ((٣- حكمها:))

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি মালের শর্তানুযায়ী নিসাবের মালিক হলে তার উপর যাকাত ফরয। এমনকি বাচ্চা ও পাগলদের পক্ষ হতে তাদের অভিভাবক তাদের মালের যাকাত আদায় করবেন। যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে ইচ্ছাকৃত ভাবে এর ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি বখীলতা ও অলসতা করে যাকাত দিবেনা এর জন্য তাকে ফাসেক ও কাবীরাহ গুনাহে লিপ্ত বলে গণ্য করা হবে। আর তার যদি এ অবস্থায় মৃত্যু হয় তবে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীনে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

অর্থঃ **আল্লাহ্ তার সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্য যে কোন অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।** *(সূরা আন-নিসা-আয়াত-৪৮)*

তার কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে, আর হারামে পতিত হওয়ায় তাকে তা'জির (সাময়িক শাস্তি) করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা যাকাত অস্বীকার কারীকে নিম্নের বাণী দ্বারা ধমকী দিয়েছেনঃ

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

অর্থঃ **আর যারা সোনা রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ প্রদান করুন। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। (এবং সেদিন বলা হবে) ইহাই তা যা তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে।** *(সূরা আত্‌তাওবাহ-আয়াত-৩৪-৩৫)*

আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ মালের মালিক যাকাত আদায় না করলে সে মালকে জাহান্নামের আগুনে গরম করে তক্তা বানানো হবে, তারপর তা দিয়ে তার পার্শ্বদ্বয় ও ললাটে দাগ দিতে থাকবে। আল্লাহ তার বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করা পর্যন্ত ঐ দিনে, যে দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। তারপর সে জান্নাতী হলে জান্নাতের পথ আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামের পথ দেখবে। *(হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম একত্রিত ভাবে বর্ণনা করেছেন, তবে শব্দগুলো মুসলিমের)*

৪- যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ((٤- شروط وجوبها:

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছেঃ

প্রথম শর্তঃ ইসলাম-কাফেরের উপর যাকাত ফরয নয়।

দ্বিতীয় শর্তঃ স্বাধীনতা, অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট দাসের মালে যাকাত ওয়াজিব নয়। অনুরূপ মুকাতাবের (চুক্তি বদ্ধ কৃতদাস) মালের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কারণ তার উপর এক দেরহাম আদায় অবশিষ্ট থাকলেও সে দাস হিসাবে গণ্য।

তৃতীয় শর্তঃ নিসাবের মালিক হওয়া, আর যদি মাল নিসাব পূর্ণ না হয় তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব নয়।

চতুর্থ শর্তঃ মালের পূর্ণ মালিক হওয়া, তাই মুকাতাবের দাঈন বা ঋণে যাকাত ফরয নয়। বন্টনের পূর্বে মুযারিব অর্থাৎ মুযারাবা (যৌথ ব্যবসায়) লেন দেনে অংশগ্রহণ কারীর লভ্যাংশে যাকাত ফরয নয়। অসচ্ছল ব্যক্তির উপর যে ঋণ রয়েছে তা অর্জীত না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত ওয়াজিব নয়। আর যে মাল কল্যাণ ও পূণ্যের পথে যেমন মুজাহিদের, মাসজিদের, বসবাসের ও অনুরূপ খাতে ওয়াক্‌ফ তাতে যাকাত ওয়াজিব নয়।

পঞ্চম শর্তঃ এক বছর অতিবাহিত হওয়া। এক বছর অতিবাহিত না হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন মালেই যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে জমি হতে উৎপন্ন ফসল ও ফল মূল ছাড়া। কারণ তার যাকাত ওয়াজিব হবে তা কাটার ও পাড়ার সময়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

অর্থঃ **এবং তার (ফসলের) হক্ব আদায় কর তা কাটার দিবসে।** *(সূরা আন-আ'ম-আয়াত-১৪১)*

আর খনিজ সম্পদ ও রিকায-(মাটিতে পুঁতে রাখা) সম্পদের যাকাতের বিধান জমি হতে উৎপন্ন ফসল ও ফলের যাকাতের বিধানের ন্যায় কারণ তা জমি হতে সংগৃহিত মাল।

গৃহপালিত পশুর এবং ব্যবসার লভ্যাংশের উপর বছর অতিবাহিত হওয়া গণ্য হবে মূলের উপর বছর অতিবাহিত হওয়ার ন্যায়। তাই গৃহপালিত পশুর উৎপাদিত ও ব্যবসার লভ্যাংশকে তার মূলধনের সাথে মিলাবে এবং নিসাব পূর্ণ হলে তার যাকাত দিবে।

আর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানবান হওয়া শর্ত নয়। তাই অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট বাচ্চা ও পাগলের মালে যাকাত ওয়াজিব হবে।

৫- যাকাত ওয়াজিব যোগ্য সম্পদ ((٥- الأموال الزكوية:

পাঁচ শ্রেণীর মালে যাকাত ওয়াজিব হয়।

প্রথমঃ সোনা, রূপার ও অনুরূপভাবে তার স্থলাভিসিক্ত প্রচলিত কাগজের মুদ্রার উপর যাকাত ওয়াজিব

আর তাতে যাকাতের পরিমাণ হলো রুবু'ল উ'শর (এক চল্লিশমাংশ)। আর রুবু'ল উ'শরের পরিমাণ হলো শতকরা আড়াই ভাগ। এক বছর অতিবাহিত ও নিসাব পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

সোনার নিসাবের পরিমাণ হলো বিশ মিছকাল। আর এক মিছকালের ওজন (৪.২৫) গ্রাম। অতএব সোনার নিসাব হলো (৮৫) গ্রাম।

রূপার নিসাবের পরিমাণ হলো দু'শত দিরহাম। আর এক দিরহামের পরিমাণ হলো (২.৯৭৫)। সুতরাং রূপার নিসাব হলো (৫৯৫) গ্রাম।

তবে বর্তমান কাগজের মুদ্রা তার নিসাবের পরিমাণ হলোঃ এক বছর অতিবাহিত কালে যাকাত বের করার সময় তার মূল্য পঁচাশি (৮৫) গ্রাম সোনার অথবা পাঁচশত পঁচানব্বই (৫৯৫) গ্রাম রূপার সমান হতে হবে। এই জন্য সোনা ও রূপার নিসাবের পরিমাণের তুলনায় বর্তমান কাগজের মুদ্রার নিসাব তার দর-মান কম-বেশী হওয়ার কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

তাই কারও কাছে তার যে কাগজের মুদ্রা রয়েছে তা দিয়ে যদি সে পূর্বে বর্ণিত সোনা বা রূপার পরিমাণে যে কোন একটি পরিমাণ ক্রয় করতে সক্ষম হয় বা তার চাইতে বেশী হয় তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে, তার নাম যাই হোক না কেন রিয়াল হোক বা দিনার হোক বা ফারাঙ্ক হোক বা ডলার হোক বা অন্য আরো যে কোন নাম হোক। আর তার গুনাগুণ যাই হোক না কেন কাগজের মুদ্রা হোক বা খনিজ পদার্থ হোক, বা অন্য আরো কিছু হোক। আরো প্রসিদ্ধ কথা হলে যে, মুদ্রার দর কোন কোন সময় পরিবর্তন হয়। তাই তাতে যখন যাকাত ওয়াজিব হবে তখন যাকাত দাতার তার মূল্যের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত হবে। আর তা হল তাতে এক বছর অতিবাহিত হওয়া। আর যদি কোন মালে নিসাবের চাইতে বেশী হয় তবে সেই মাল থেকে নিসাব অনুসারে যাকাত বের করতে হবে ।

এর দলীল হলো আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ তুমি যদি দুই শত দিরহামের মালিক হও, আর তাতে যদি এক বছর অতিবাহিত হয়। তবে তা যাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ হবে পাঁচ দিরহাম। যদি তোমার নিকট বিশ দিনার থাকে, আর তা এক বছর অতিবাহিত হয়, তবে তাতে অর্ধ দিনার যাকাত দিতে হবে। আর এর চাইতে কম মালে যাকাত ওয়াজিব হবে না। সুতরাং এই পরিমাণের বেশি হলে এই অনুপাতে যাকাত দিতে হবে। আর কোন মালেই যাকাত ওয়াজিব হবে না এক বছর অতিবাহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত। *(হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, আর হাদীসটি হাসান)*

অলঙ্কার-গহনা যদি জমা ও ভাড়া দেওয়ার জন্য তৈরী করে রাখা হয় তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। এতে কোন দ্বিমত নেই। আর তা যদি ব্যবহারের জন্য তৈরী করে রাখা হয় তবে তাতে বিদ্যানগণের দু'মতের গ্রহণযোগ্য মতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কারণ সোনা রূপার যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে যে সকল দলীল বর্ণিত হয়েছে তা আম-ব্যাপক।

ইমাম আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী আমর বিন শু'আইব তার পিতা হতে, পিতা তার দাদা (রাযিআল্লাহ আনহুম) হতে বর্ণনা করেছেনঃ

অর্থঃ জনৈক মহিলা তার মেয়ে সহ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আসলো। তার মেয়ের দু' হাতে দু'টি সোনার মোটা চুরি ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন তুমি কি এর যাকাত দাও? সে বলল, না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি কি ভাল বাস যে এর বিনিময়ে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তোমাকে আগুনের দু'টি চুরি পরান? সাথে সাথে মহিলাটি চুরি দু'টি খুলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে রাখল এবং বললঃ এই চুরি দু'টি আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য।

আবু দাউদ ও অন্যান্যরা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেনঃ

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট প্রবেশ করে আমার হাতে অনেকগুলো রূপার আংটি দেখে বললেন হে আয়েশা এগুলো কি? অতঃপর আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল এগুলো আমি তৈরী করেছি আপনার সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য। তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন তুমি কি এগুলোর যাকাত প্রদান কর? আমি বললাম না অথবা আল্লাহ যদি চান। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ এর যাকাত না দেওয়াটাই তোমার জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ঠ।

খনিজ জাত ধাতুব দ্রব্যের ও সোনা ছাড়া তৈরী-অলঙ্কার যেমন-মুক্তা, মতি ইত্যাদিতে কোন বিদ্যানগণের নিকটেও যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে যদি ব্যবসার জন্য তৈরী করা হয় তাহলে ব্যবসার জন্য তৈরী মালের যাকাতের ন্যায় যাকাত দিতে হবে।

দ্বিতীয়ঃ চতুষ্পদ জন্তু

আর তা হলো, উট, গরু, ছাগল। আর ইহাতে যাকাত ওয়াজিব হবে যখন ইহা সায়েমা হবে। সায়েমা ঐ সকল পশু যা বছরের অধিকাংশ দিনগুলো (মালিকের কাছে) লালিত-পালিত হয়, কারণ অধিকাংশের জন্য সকলের যে বিধান সে বিধান প্রযোজ্য।

আর এর দলীল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীঃ

অর্থঃ প্রত্যেক সায়েমা উটে যাকাত রয়েছে। *(হাদীসটি আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন)*

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আরো বাণী হলোঃ

অর্থঃ ছাগলের যাকাত কেবল মাত্র সায়েমা ছাগলে। *(বুখারী)*। যখন নিসাব পূর্ণ হবে ও এক বছর অতিবাহিত হবে।

গৃহপালিত পশুর যাকাতের তালিকাঃ

শ্রেণী	নিসাবের পরিমাণ (হতে – পর্যন্ত)	নির্ধারিত পরিমাণ

উট	৫------------৯	একটি ছাগল
	১০-----------১৪	দু'টি ছাগল
	১৫-----------১৯	তিনটি ছাগল
	২০-----------২৪	চারটি ছাগল
	২৫-----------৩৫	এক বছরের একটি মাদী উট
	৩৬-----------৪৫	দু'বছরের একটি মাদী উট
	৪৬-----------৬০	তিন বছরের একটি মাদী উট
	৬১-----------৭৫	চার বছরের একটি মাদী উট
	৭৬-----------৯০	দু'বছরের দু'টি মাদী উট
	৯১----------১২০	তিন বছরের দু'টি মাদী উট

আর যদি উটের সংখ্যা ১২০টির উপর হয় তাহলে প্রতি ৪০টিতে দু'বছরের একটি মাদী উট। আর প্রতি ৫০টিতে তিন বছরের একটি মাদী উট দিতে হবে, ইহা অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট।

গৃহপালিত পশুর যাকাতের তালিকাঃ

শ্রেণী	নিসাবের পরিমাণ (হতে - পর্যন্ত)	নির্ধারিত পরিমাণ
গরু	৩০-----------৩৯	এক বছরের একটি বাছুর বা বক্না দিতে হবে
	৪০-----------৫৯	দু'বছরের একটি বক্না দিতে হবে
	৬০-----------৬৯	এক বছরের দু'টি বাছুর দিতে হবে
	৭০-----------৭৯	এক বছরের একটি বাছুর এবং দু'বছরের একটি বক্না দিতে হবে।

আর যদি গরুর সংখ্যা ৭৯টির উপর হয় তাহলে প্রতি ৩০টিতে একবছরের একটি বাছুর, আর প্রতি ৪০টিতে একবছরের একটি বক্না দিতে হবে।

শ্রেণী	নিসাবের পরিমাণ (হতে – পর্যন্ত)	নির্ধারিত পরিমাণ
ছাগল	৪০----------১২০	একটি ছাগল দিতে হবে।
	১২১---------২০০	দু'টি ছাগল দিতে হবে।
	২০১---------৩০০	তিনটি ছাগল দিতে হবে।

আর যদি ছাগলের সংখ্যা ৩০০ শত এর বেশী হয় তাহলে প্রতি ১০০ শতে একটি ছাগল দিতে হবে।

আর এর দলীল হলোঃ আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীসঃ

((أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها ﷺ التي فرض رسول الله فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وّعشرين إلى خمسٍ وّثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى فإذا بلغت ستة وّثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على ثلاثمائة في كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها)) الحديث،(رواه البخاري).

অর্থঃ আবু বকর (রাযিআল্লাহু আনহু) যখন তাকে (আনাস রাযিআল্লাহু আনহু কে) বাহরাইনে গভর্নর হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, তখন তার নিকট এই পত্র লিখেছিলেনঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরয সাদ্‌কা (যাকাত) সম্পর্কে মুসলমানদের উপর যা নির্ধারণ করেছেন এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ তার রাসূলকে যা আদেশ করেছেন তা এ কাজেই মুসলিমদের যার কাছেই (যাকাত) বিধি অনুসারে এটা চাওয়া হবে সে যেন তা প্রদান করে। কিন্তু যার নিকট তার অধিক (অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক) দাবী করা হবে সে যেন (অতিরিক্ত) প্রদান না করে। চব্বিশটি উট কিংবা তার কম হলে ছাগল দিতে হবে-(এ নিয়মে যে,) প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি ছাগল। উটের সংখ্যা যখন পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হবে তখন তাতে দু' বছরের একটি মাদা উট দিতে হবে। যখন তা ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে পৌঁছবে তখন তাতে তিন বছরের একটি মাদী উট দিতে হবে। যখন তা ছিচল্লিশ থেকে ষাটে পৌঁছবে তখন তাতে গর্ভধারণের উপযোগিনী একটি চার বছরের মাদী উট দিতে হবে। যখন তা (উটের সংখ্যা) একষট্টি থেকে পঁচাত্তর হবে তখন তাতে পাঁচ বছরের একটি মাদী উট দিতে হবে। যখন তা ছিয়াত্তর থেকে নব্বই হবে তখন তাতে দু'টি তিন বছরের মাদী উট দিতে হবে। যখন তা একানব্বই থেকে একশ বিশ হবে তখন তাতে গর্ভধারণের উপযোগিনী দু'টি চার বছরের মাদী উট দিতে হবে। যখন উটের সংখ্যা একশ বিশের উর্ধে হবে তখন প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি তিন বছরের মাদী উট এবং প্রতি পঞ্চাশটি উটের জন্য একটি চার বছরের মাদা উট দিতে হবে। যদি কাহারো নিকট মাত্র চারটি উট থাকে তবে তাতে যাকাত দিতে হবে না। হাঁ যদি মালিক স্বেচ্ছায় (নফল সাদ্‌কা হিসেবে) কিছু প্রদান করে (তবে তাতে ক্ষতি নেই)। কিন্তু যখন উটের সংখ্যা পাঁচ হবে তখন তাতে একটি ছাগল দিতে হবে। যেসব ছাগল চড়ে খায় (অর্থাৎ বিচরণ করে বেড়ায়) তাতে যাকাত দিতে হবে। চল্লিশ থেকে একশ বিশটি পর্যন্ত একটি ছাগল, একশ বিশটির অধিক হলে দু'শ পর্যন্ত দু'টি ছাগল, দু'শতের অধিক হলে তিনশ পর্যন্ত তিনটি ছাগল এবং যদি তিনশ এর অধিক হয় তবে প্রতি একশ তের জন্য একটি ছাগল দিতে হবে। চড়ে খায় এমন ছাগলের সংখ্যা যদি কাহারো নিকট চল্লিশের একটিও কম থাকে তবে তাতে যাকাত দিতে হবে না। হাঁ, মালিক যদি স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে (ক্ষতি নেই)। *(বুখারী)*

আরো দলীল হলোঃ মু'আয বিন জাবাল (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীসঃ

((أن النبي بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة)) (رواه أحمد وأصحاب السنن).

অর্থঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে (মু'আযকে) ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন। প্রতি ত্রিশটি গরু হতে একটি বাছুর বা বক্‌না গ্রহণের আদেশ দিয়েছিলেন। আর প্রতি চল্লিশটি গরু হতে দু'বছরের একটি বক্‌না গ্রহণের আদেশ দিয়েছিলেন। *(হাদীসটি আহমাদ ও আসহাবুস্ সুনান বর্ণনা করেছেন)*

যখন নিসাব গণনা করবে তখন গৃহপালিত পশুর উৎপন্ন বস্তু তার আসলের সাথে মিলাবে। আর যদি তা ছাড়া গৃহপালিত পশুর নিসাব পূর্ণ না হয় তাহলে নিসাব পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, তার দ্বারা একবছর অতিবাহিত গণ্য করা হবে।

আর যদি চতুস্পদ জন্তু ব্যবসার জন্য লালিত-পালিত হয় তাহলে ব্যবসার মালের যাকাতের ন্যায় তার যাকাত দিতে হবে। আর যদি তা ব্যবহারের বা উন্নয়নের জন্য লালিত-পালিত হয়, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ (এই ব্যাপারে) আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস বর্ণিত আছেঃ

অর্থঃ মুসলিম ব্যক্তির দাসের ও ঘোড়ার উপর যাকাত নেই। *(হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন)*

তিনঃ ফসল ও ফলাফল

অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট উৎপাদিত ফসলে যাকাত ওয়াজিব হবে নিসাব পূর্ণ হলে। আর তাদের নিকট তার নিসাব হল পাঁচ ওয়াসাক।

কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

অর্থঃ পাঁচ আওসুক এর কমে যাকাত ফরয নয়। *(হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন)*

আর এক وسق (ওয়াসাক) সমান ষাট স্বা'আ। সুতরাং নিসাবের পরিমাণ হলো তিনশত স্বা'আ। আর ভাল গমের দ্বারা নিসাবের পরিমাণ হবে ছয়শত বায়ান্ন কিলো ও আটশত গ্রাম।

ফসল ও ফলের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য একবছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়।

কারণ এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার বাণী রয়েছেঃ

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

অর্থঃ **এবং তার (ফসলের) হক্ব আদায় কর তা কাটার দিবসে**। *(সূরা আন-আ'ম-আয়াত-১৪১)*

যে সকল ফসল বিনা পরিশ্রমে পানি সরবরাহ হয়ে উৎপন্ন হয়েছে তাতে যাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ হলো দশ ভাগের এক ভাগ, আর যে সকল ফসল পরিশ্রমের দ্বারা পানি সরবরাহ হয়ে উৎপন্ন হয়েছে তাতে নির্ধারিত পরিমাণ হলোঃ বিশ ভাগের এক ভাগ।

কারণ এ ব্যাপারে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস রয়েছেঃ

((فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر))(أخرجه البخاري).

অর্থঃ যেসব ভূমি বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা অথবা নদ-নদীর পানি দ্বারা স্বাভাবিকভাবে আবাদ হয়, তাতে উ'শর (এক দশমাংশ) ওয়াজিব হবে। আর যে সব ভূমিতে পানি সেচ করতে হয় তাতে বিশ ভাগের একভাগ ওয়াজিব হবে (এটাই ফসলের যাকাত)। *(হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন)*

চারঃ ব্যবসা সামগ্রী

মুসলিম ব্যক্তি ব্যবসার জন্য যে মাল প্রস্তুত করেছে তাকে ব্যবসা সামগ্রী বলে। তা যে কোন শ্রেণীর মাল হোক না কেন। যাকাতের সাধারণ সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। নিসাব পূর্ণ হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। ব্যবসা সামগ্রীর মূল্য সোনা ও রূপার নিসাবের সমান হওয়া গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর তা হলো বিশ মিছকাল যা পঁচাশি গ্রাম সোনার সমতুল্য। অথবা দু'শত দিরহাম যা পাঁচশত পঁচানব্বই গ্রাম রূপার সমতুল্য।

সোনা ও রূপা হতে ব্যবসা সামগ্রীর পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে ফকীরদের অংশের প্রতি লক্ষ্য রেখে। যখন তাতে এক বছর অতিবাহিত হবে তখন ক্রয় মূল্য গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যাকাত বের করার সময়ে বাজার মূল্য গ্রহণযোগ্য হবে।

পূর্ণ মূল্যের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত বের করা ওয়াজিব হবে। ব্যবসার লভ্যাংশ তার আসল মালের সাথে মিলাবে, যদি নিসাব পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে তার যাকাত দানে নতুন বছরের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। আর যদি লভ্যাংশ ছাড়া আসল মালে নিসাব পূর্ণ না হয় তাহলে নিসাব পূর্ণ হওয়ার সময় হতে বছর শুরু/গণ্য হবে।

পাঁচঃ খনিজ সম্পদ ও রিকাযঃ যা মাটিতে পুঁতে রাখা মাল

(ক) খনিজ সম্পদঃ

খনিজ সম্পদ ঐ সকল বস্তু যা জমি হতে নির্গত হয়, তথায় জন্ম নেয় যা জমির মূল্যবান উৎপন্ন নয়, এবং উদ্ভিদও নয়, যেমন সোনা-রূপা, লৌহ, তামা, ইয়াকুত পাথর ও পেট্রোল ইত্যাদি। আর তাতে যাকাত ওয়াজিব।

কারণ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক বাণী রয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ

অর্থঃ **হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমরা তোমাদের জন্য জমি হতে যা উৎপন্ন করেছি তার মধ্যে যা পূত-পবিত্র তা তোমরা ব্যয় কর**। *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত- ২৬৭)*

খনিজ সম্পদ যে আল্লাহ তা'আলা জমি হতে নির্গত করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট খনিজ সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাব পূর্ণ হওয়া শর্ত। আর খনিজ সম্পদে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। সোনা-রূপার যাকাতের পরিমাণের উপর ক্বিয়াস বা তুলনা করে। তাতে এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। তা যখন সংগ্রহ হবে তখনই তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

(খ) রিকায-মাটিতে পুঁতে রাখা ধনসম্পদঃ

জাহিলি যুগের মাটিগর্ভে-গচ্ছিত সম্পদ, অথবা পূর্ববর্তী কাফির সম্প্রদায়ের সম্পদ যদিও জাহিলি না হয় আর তার উপর বা তার কিছুর উপর কুফুরের নির্দশন হয় যেমন তাদের নাম, তাদের রাজাদের নাম, তাদের ছবি, তাদের পৃষ্টদেশ ও শুধু তাদের প্রতিমার বক্ষদেশ থাকে (তা হলেও তা রিকায হবে)। আর যদি তার উপর বা তার কিছুর উপর মুসলমানদের নিদর্শন থাকে, যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম বা মুসলমানদের খলীফাদের কারও নাম বা কুরআন কারীমের আয়াত। তা হলে তা (লুক্বাতা)-পথে পড়ে থাকা বস্তু হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি তাতে কোন নির্দশন না থাকে, যেমন পাত্র, স্ত্রীলোকের অলঙ্কার সাজ-সজ্জা, স্বর্ণের বিস্কুট তা হলেও তা লুক্বাতা হবে, আর তা প্রচার করার আগ পর্যন্ত কেহই তার মালিক হবে না। কারণ তা হল মুসলিম ব্যক্তির মাল, আর তা হতে তার মালিকানা নষ্ট হয়ে যায় নাই। আর রিকাযে (মাটি গর্ভে গচ্ছিত রাখা সম্পদে) এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব।

কারণ আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

((وفي الركاز الخمس)).

অর্থঃ আর রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে।

অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট রিকায, কম হোক বা বেশী হোক তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। তাদের নিকট তা বন্টনের খাত হল ফাই (যুদ্ধ বিহিন অমুসলিম শত্রুর সম্পদ যা মুসলমানরা অর্জন করে) বন্টনের খাত। যে ব্যক্তি তা পাবে সে বাকী রিকাযের মালিক হবে, এতে বিদ্যানগণের কোন মতনৈক্য নেই। কারণ উমার (রাযিআল্লাহু আনহু) অবশিষ্ট রিকায তার প্রাপককে দিয়েছিলেন।

৬ - যাকাত বন্টনের খাত সমূহ ((٦- مصارف الزكاة:))

আট শ্রেণীর লোক যাকাত পাওয়ার হক্বদার। তার নিম্নের তালিকা প্রদত্ত হলোঃ

প্রথমতঃ ফকীরঃ আর তারা হলেন ঐ সকল লোক যাদের কাছে জীবন যাপনের কোন কিছুই নেই, অথবা কিছুটা আছে, তাদেরকে পূর্ণ বছরের জন্য যথেষ্ট হয় এই পরিমাণ যাকাত থেকে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়তঃ মিসকীনঃ যাদের নিকট অর্ধবছর বা অর্ধবছরের চেয়ে কিছু বেশী সময়ের খাবার রয়েছে। এই অর্থে মিসকীনের অবস্থা ফকীরের অবস্থার চেয়ে ভাল। তাদেরকে তাদের পুরা বছরের জন্য যথেষ্ট হয় এই পরিমাণ যাকাত দেওয়া হবে।

তৃতীয়তঃ যাকাত আদায়কারীঃ আর তারা হলেন, ঐ সমস্ত কর্মচারী যারা যাকাত দাতাদের নিকট হতে তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং নেতার আদেশে তার হক্বদারের নিকট বিতরণ করেন। তাদেরকে তাদের কর্মের পারিশ্রমিক হিসাবে যাকাত প্রদান করা হবে।

চতুর্থতঃ যাদের অন্তর জয় করার উদ্দেশ্য হবেঃ আর তারা দু' শ্রেণীর লোকঃ কাফির এবং মুসলিম।

- অতঃপর কাফিরকে যাকাত দেওয়া হবে যখন তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রত্যাশা করা যাবে, বা তাকে যাকাত দেওয়ার কারণে মুসলমানদের উপর হতে তার অত্যাচার অনিষ্ট বন্ধ হবে। আরো অনুরূপ কারণে।

- আর মুসলিম ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া হবে তার ইসলাম গ্রহণকে আরো শক্তিশালী করার জন্য বা তারমত আরও একজনের ইসলাম গ্রহণের আশায়। এরকম অন্য আরো কারণে।

পঞ্চমতঃ দাস সমূহঃ আর তারা হলেন ঐ সমস্ত মুকাতিব দাস যাদের কাছে তাদের মালিকের সাথে কৃত চুক্তি পরিশোধের পয়সা নাই। তাই মুকাতিব দাসকে যাকাত হতে যে পরিমাণ প্রদান করলে সে দাসত্ব হতে মুক্তি পেতে সামর্থ্যবান হবে সে পরিমাণ তাকে প্রদান করা হবে।

ষষ্ঠতম ঋণগ্রস্তদেরকেঃ আর তারা দু' ভাগে বিভক্তঃ নিজেদের জন্য ঋণগ্রস্ত, এবং অন্যের কারণে ঋণগ্রস্ত।

- নিজের জন্য ঋণগ্রস্তঃ সে ঐ ব্যক্তি যে নিজের অভাবের কারণে ঋণ করেছে আর তা পরিশোধে সে সামর্থ্যবান নয়। তাই যাকাত হতে তাকে যে পরিমাণ দিলে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে সে পরিমাণ তাকে প্রদান করা হবে।

- অন্যের কারণে ঋণগ্রস্তঃ সে ঐ ব্যক্তি যে পরস্পরের মাঝে সংশোধন-ফায়সালা করার জন্য ঋণী হয়েছে। তাই সে ঋণী হলে যাকাত হতে যে পরিমাণ দিলে সে ব্যাপারে তার সহযোগিতা হবে, সে পরিমাণ তাকে প্রদান করা হবে।

সপ্তমতঃ যারা আল্লাহর রাস্তায় রয়েছেন তাদেরকেঃ এর দ্বারা মুরাদ-উদ্দেশ্য হলোঃ যারা জিহাদে রয়েছেন। সুতরাং যে সকল মুজাহিদদের বেতন বাইতুল মালের পক্ষ হতে নির্ধারিত নেই তাদেরকে যাকাত প্রদান করা হবে।

অষ্টমতঃ মুসাফিরঃ সে ঐ মুসাফির যার সব কিছু রাস্তায় শেষ হয়ে গেছে। তার কাছে তার দেশে পৌঁছার মত খরচ নেই।

সুতরাং যাকাত হতে যে পরিমাণ তাকে দিলে সে তার দেশে পৌঁছতে পারবে সে পরিমাণ যাকাত তাকে প্রদান করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা এই শ্রেণীগুলো তার বাণীতে উল্লেখ করেছেনঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থঃ **বস্তুতঃ সাদকা ফকীরদের, মিসকীনদের, তা আদায়কারীদের, যাদের অন্তর জয় করার উদ্দেশ্য হবে তাদের, দাস মুক্তির, ঋণগ্রস্তদের, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ও মুসাফিরদের জন্য। আল্লাহর কর্তৃক ফরয। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।** *(সূরা তাওবাহ-আয়াত-৬০)*

৭- যাকাতুল ফিত্বর (٧- زكاة الفطر:)

(ক) যাকাতুল ফিত্বর বিধি-বদ্ধর হিক্মাত বা রহস্যঃ

সিয়াম সাধনাকারীদেরকে অনর্থক কথা-কাজ, সহবাস ও তার আনুসাংগিক কর্ম হতে পবিত্র করার জন্য যাকাতুল ফিত্বর চালু করা হয়েছে।

এ ছাড়াও মিসকীনদের খাদ্য হিসাবে ও তাদেরকে ঈদের দিন মানুষের কাছে চাওয়া হতে মুক্ত রাখার জন্য চালু করা হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমার) হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেনঃ

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাকাতুল ফিত্বর ফরয করেছেন, সিয়াম সাধনা কারীদেরকে অনর্থক কথা-কায ও সহবাস ও তার আনুসংগীক কাজ হতে পবিত্র করার জন্য ও মিসকীনদের খাদ্য হিসাবে। *(হাদীসটি আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন)*

(খ) যাকাতুল ফিত্বর এর হুকুম -বিধানঃ

যাকাতুল ফিত্বর প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারী, ছোট বড়, স্বাধীন-ও দাস দাসীর উপর ফরয।

ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেনঃ

((فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحرّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة))(متفق عليه).

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রামাযান মাসের যাকাতুল ফিত্বর ফরয করেছেন, খেজুর বা যবের এক স্বা'আ, দাসের, স্বাধীন ব্যক্তির, পুরুষের, নারীর ছোটদের ও বড়দের উপর। এবং তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন ঈদের নামাযের জন্য মানুষের বের হওয়ার পূর্বে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

যে শিশুর জন্ম হয় নাই পেটে রয়েছে তার পক্ষ হতে তা আদায় করা মুস্তাহাব। নিজের, নিজ স্ত্রী ও নিকটবর্তী আত্মীয় যাদের ভরণ পোষণ করা তার দায়িত্ব রয়েছে তাদের পক্ষ হতে ফিৎরা আদায় করা ওয়াজিব।

ফিৎরা শুধুমাত্র তার উপর ওয়াজিব যার খাদ্য ও ভরণ পোষণ করা তার উপর দায়িত্ব তাদের খাদ্য ঈদের দিন ও রাত্রির জন্য যথেষ্ট হয়ে বেশী হবে।

(গ) ফিৎরার পরিমাণঃ

শহরের প্রধান খাদ্য যেমন-গম, যব, খেজুর, কিসমিস-মুনাক্কা, পনির, চাল ও ভুট্টা হতে যাকাতুল ফিতরের নির্ধারিত পরিমাণ হল এক স্বা'আ।

আর এক স্বা‘আ প্রায় দু’ কিলো একশত ছিয়াত্তর গ্রাম এর সমান। আর অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট ফিৎরার মূল্য বের করা জায়েয নয়। কারণ ইহা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা আদেশ দিয়েছেন তার বিপরীত এবং সাহাবাদের আমলের পরিপন্থী।

(ঘ) ফিৎরা আদায় করার সময়ঃ

ফিৎরা আদায় করার দুইটি সময় রয়েছেঃ

(ক) জায়েয সময়ঃ আর তা হলো, ঈদের একদিন বা দু’ দিন আগে আদায় করা।

(খ) উত্তম সময়ঃ আর তা হলো, ঈদের দিনের ফজর উদিত হওয়া হতে - ঈদের নামায আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত ফিৎরা আদায় করা।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষদের ঈদের নামাযের জন্য বের হয়ে যাওয়ার আগেই যাকাতুল ফিত্বর আদায় করার আদেশ দিয়েছিলেন। যাকাতুল ফিত্বর ঈদের নামাযের পর পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ নয়।

কেউ যদি তা ঈদের নামাযের পরে আদায় করে তবে তা সাধারণ সাদ্‌কা (দান) হিসাবে গণ্য হবে। আর সে এই বিলম্বের কারণে গুনাহগার হবে।

(ঙ) যাকাতুল ফিত্বর বিতরণের খাতঃ

যাকাতুল ফিত্বর ফকীর ও মিসকীন এর জন্য বিতরণ করা হয়। কারণ অন্যদের চাইতে এরাই এর অধিক হক্বদার।

চতুর্থ রুক্‌নঃ রামাযানের সিয়াম সাধন (*الركن الرابع : صيام شهر رمضان.*)

১- সিয়ামের-রোযার সংজ্ঞা (١- تعريفه:)

الصيام لغة: - *সিয়ামের শাব্দিক অর্থঃ* বিরত থাকা।

وشرعاً: - *পারিভাষিক অর্থঃ* ফাজরে সানী উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার রোযা ভঙ্গের কারণ হতে বিরত থাকা।

২- রামাযান মাসের সিয়াম সাধনের বিধান (٢- حكمه:)

ইসলামের রুক্‌ন সমূহের অন্যতম একটি রুক্‌ন ও তার মহান স্তম্ভ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থঃ **হে মু‘মিনগণ! তোমাদের উপর সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পারো।** *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৮৩)*

ইব্‌নে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা‘বুদ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দান করা। নামায প্রতিষ্ঠা করা। যাকাত প্রদান করা। রামাযানের রোযা রাখা। বায়তুল্লাহ শরীফের হাজ্জ করা। *(বুখারী মুসলিম)*

হিজরী সনের দ্বিতীয় বর্ষে মুসলিম উম্মার উপর রামাযানের সিয়াম সাধন ফরয হয়েছে।

৩- সিয়াম সাধনের ফযিলত ও তা প্রবর্তনের পিছনে হিক্‌মাত (٣- فضله وحكمة مشروعيته:)

রামাযান মাস মহান আল্লাহর আনুগত্য করার বিরাট মৌসুম, আর ইহা বান্দার নিকট একটি বিরাট নি‘আমত ও মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিরাট অনুগ্রহ। তার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান তার প্রতি এর দ্বারা অনুগ্রহ করেন। যাতে তাদের সৎকর্ম বৃদ্ধি পায়, তাদের মান মর্যাদা বেড়ে যায়, এবং তাদের অসৎকর্ম কমে যায়। যাতে তাদের সম্পর্ক তাদের মহান সৃষ্টি কর্তার

সাথে আরো শক্তিশালী হয়। যাতে তাদের জন্য লিখা হয় মহা পুরস্কার ও অধিক সাওয়াব। যাতে তারা তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। তার ভয়ে ও তাকওয়ায় তাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

রোযার ফযিলত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তার কিছু নিম্নে বর্ণিত হলঃ

(ক) আল্লাহ তাবারাক ও তা'আলা বলেনঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থঃ **রামাযান মাস, ইহাতে বিশ্ব মানবের দিশারী এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং সত্যের ও মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেহ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে বা ভ্রমণে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না, এই জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা কীর্তন করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।** *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৮৫)*

(খ) আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ যে ব্যক্তি রামাযানের সিয়াম সাধন করবে ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তার পূর্ববর্তী পাপ রাশী ক্ষমা করে দেওয়া হবে। *(বুখারী মুসলিম)*

(গ) আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ প্রতিটি ভাল কাজের প্রতিদান দশ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেনঃ তবে সাওম ছাড়া। কারণ সাওম হল আমার জন্য, আর আমি তার প্রতিদান প্রদান করবো। কারণ সে শুধুমাত্র আমার জন্যই তার প্রবৃত্তির অনুসরণ ও পানাহার বর্জন করেছে। সিয়াম সাধন কারীর জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। একটি আনন্দ ইফতারের সময়, অপর আনন্দটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। আর সিয়াম সাধন কারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেসকের সুগন্ধির চাইতেও অধিক সুগন্ধি পূর্ণ। *(বুখারী ও মুসলিম শব্দ গুলো ইমাম মুসলিমের)*

(ঘ) সিয়াম সাধন কারীর দু'আ মাকবুল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ সিয়াম সাধন কারীর ইফতারের সময় তার দু'আ গৃহীত হয়। *(ইবনে মাজাহ)*

তাই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উচিত হবে তার ইফতারের সময়টাকে গনিমত মনে করে তার প্রভুর কাছে চাওয়া ও প্রার্থনার মাধ্যমে আগ্রহী হওয়া। হতে পারে সে মহান আল্লাহর সুগন্ধির কিছু সুগন্ধি পেয়ে যাবে। অতঃপর দুনিয়া ও আখেরাতে তার সৌভাগ্যময় জীবন অর্জীত হবে।

(ঙ) আল্লাহ জান্নাতের দরজা সমূহের একটি দরজা সিয়াম সাধন কারীদের জন্য নিদিষ্ট করেছেন। এই দরজা দিয়ে শুধু সিয়াম সাধন কারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের সম্মানার্থে ও অন্যদের উপর তাদের বৈশিষ্ট সাব্যস্ত করনার্থে।

সাহ্ল বিন সা'দ (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ নিশ্চয়ই জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যার নাম হল-রাইয়্যান। অতএব যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সে দিন বলা হবে সিয়াম সাধন কারীরা কোথায়? তাদের প্রবেশ শেষে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তা দিয়ে আর কেহ প্রবেশ করতে পারবেনা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(চ) কিয়ামাত দিবসে সিয়াম সাধন কারীর জন্য সিয়াম সুপারিশ করবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনেল আছ (রাযিআল্লাহু আনহুম) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ সিয়াম ও কুরআন কিয়ামাত দিবসে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবেঃ হে আমার প্রভু! আমি তাকে পানাহার ও স্ত্রীসঙ্গম হতে বিরত রেখেছিলাম। অতঃপর তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর। আর কুরআন বলবেঃ রাতে আমি তাকে ঘুম হতে বিরত রেখেছিলাম। অতঃপর তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর। তিনি বলেনঃ অতঃপর উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। *(আহমাদ)*

(ছ) আর সিয়াম মুসলিম ব্যক্তিকে ধৈর্য, কষ্ট, সাধনা ও কোন কাজ মনোযোগ সহকারে পালন করার শিক্ষা দেয় বা অভ্যাস গড়ে তুলে। আর সিয়াম সাধন কারীকে তার প্রিয় ও প্রসিদ্ধ বস্তু ছাড়াতে পরিত্যাগে বাধ্য করে। আর তা অবাধ্য আত্মাকে বাধ্য করে, অথচ এতে বিরাট কষ্ট রয়েছে।

৪- সিয়াম ফরয হওয়ার শর্ত সমূহ (:৪- شروط وجوبه)

নিশ্চয়ই সিয়াম সাধন প্রত্যেক বালেগ-প্রাপ্ত বয়স্ক আকেল-জ্ঞানবান সহীহ-সুস্থ্য মুকীম মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরয হওয়ার উপর সকল আলেমগণ একমত হয়েছেন।

হায়েয ও নিফাসরত মহিলা ছাড়া অন্যান্য মহিলাদের উপরও সিয়াম সাধন ফরয।

৫- সিয়াম সাধনের আদাব সমূহ ((:৫- آدابه

(ক) গিবাত করা, চুগোল খোরী করা এবং এ দু'টি ছাড়াও অন্যান্য কর্ম যা আল্লাহ হারাম করেছেন তা থেকে সিয়াম সাধন কারীর বিরত থাকা। তাই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর অপরিহার্য যে, সে তার জবানকে সকল হারাম কথাবার্তা হতে ও অন্যদের চরিত্রতে আঘাত হানা হতে বিরত রাখবে।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও মিথ্যার প্রতি আমল করা ছেড়ে দিলনা সে ব্যক্তির খানাদানা-পানাহার ছেড়ে দেওয়ায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। *(বুখারী)*

(খ) সিয়াম সাধনকারী সাহ্‌রী খাওয়া ছাড়বেনা। কারণ ইহা তাকে তার সিয়াম সাধনে সহযোগিতা করে। অতঃপর সে আরামে দিন অতিবাহিত করতে পারবে। ফুর্তি ও স্বজীবতার সাথে তার কর্ম আদায় করতে পারবে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। তার নিম্নে বর্ণিত বাণী দ্বারা বলেছেনঃ

অর্থঃ সাহ্‌রী বরকতের খাবার, তা ছেড়ে দিওনা। যদিও তোমাদের কেহ এক ঢোক পানি পান করে, তার পর ও আল্লাহ তা'আলা সাহ্‌রী খানে ওলাদের প্রতি রাহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্‌তারা তাদের জন্য দু'আ করেন। *(আহমাদ)*

(গ) নিশ্চিত ভাবে সূর্য ডুবার সাথে সাথেই ইফতার করা।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) (متفق عليه).

অর্থঃ মানুষ যতক্ষন তাড়াতাড়ী ইফতার করবে, ততক্ষন তারা ভাল থাকবে। *(বুখারী মুসলিম)*

(ঘ) রূত্বাব (অর্ধপক্ক খেজুর) বা খেজুর দিয়ে ইফতার করার চেষ্টা করবে, কারণ ইহা সুন্নাত। আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ

অর্থঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযের পূর্বে রূত্বাব দিয়ে ইফতার করতেন। আর রত্বাব না থাকলে খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, আর খেজুর না থাকলে পানি দিয়ে ইফতার করতেন। *(আবু দাউদ)*

(ঙ) কুরআন পাঠ আল্লাহ তা'আলার যিকির তার প্রশংসা ও তার শুকরিয়া, দান, দয়া, নফল ইবাদাত ও অন্যান্য সৎকাজ বেশী বেশী করা।

কারণ ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকলের চাইতে অধিক দানবীর ছিলেন। রামাযান মাসে যখন তার সাথে জিব্‌রাঈল সাক্ষাত করতেন তখন তিনি আরো অধিক দানবীর হয়ে যেতেন। আর জিব্‌রাঈল রামাযানের প্রতি রাতে তার সাথে সাক্ষাত করতেন, ও তাকে কুরআন পড়াতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাথে যখন জিব্‌রাঈল সাক্ষাত করতেন তখন তিনি প্রবাহমান বায়ুর চাইতেও অধিক দানবীর হয়ে যেতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

৬- সিয়াম বিনষ্ট কারী বিষয় সমূহ ((:৬- مفسداته

দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করা। অনুরূপ ভাবে সকল সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ, যেমন খাদ্যের ইন্‌জেকশন বা মুখের সাহায্যে ঔষধ গ্রহণ। কারণ ইহা পানাহারের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। তবে অল্প রক্ত বের করা যেমন-পরীক্ষার জন্য বের করা, ইহা সিয়ামের কোন ক্ষতি করবেনা।

রামাযান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করা। কারণ ইহা তার সিয়ামকে নষ্ট করে দিবে। রামাযান মাসের সম্মান নষ্ট করার কারণে তার উপর আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করা অপরিহার্য হয়ে দাড়াবে। যে দিবসে সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে সে দিবসের সিয়াম কাযা করবে। তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আর তা হলঃ একজন দাস আজাদ করা, আর এর সামর্থ্য না থাকলে ধারাবাহিক দু' মাসের সিয়াম সাধন করা, এর সামর্থ্য না থাকলে ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো। প্রতি মিসকীনের জন্য গম বা অন্য কিছু যা শহর বাসীর নিকট খাদ্য হিসাবে গণ্য তা হতে অর্ধ সা'আ দেওয়া।

কারণ আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে, তিনি বলেনঃ

অর্থঃ একদা আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট বসা ছিলাম, হঠাৎ এক লোক আগমণ করলো, অতঃপর বল্‌ল হে আল্লাহর রাসূল আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন তোমার কি হয়েছে? সে বল্‌ল আমি সিয়াম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন, তুমি কি একটি দাস আজাদ করতে পারবে? সে বল্‌ল না। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন তুমি কি দু'মাস পর্যায় ক্রমে সিয়াম সাধন করতে পারবে? সে বল্‌ল না। তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন তুমি কি ষাট মিসকীনকে খানা খাওয়াতে পারবে? সে বল্‌ল না। বর্ণনা কারী বলেনঃ তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। আমরা এই অবস্থাই ছিলাম, এমতাবস্থায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট ফারাক্ব নিয়ে আসা হলো যাতে খেজুর ছিল। আর ফারাক্ব মিকতাল নির্ধারিত পরিমাণকে বলা হয়। তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেনঃ প্রশ্নকারী কোথায়? তারপর সে উত্তর দিল যে, আমি। তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেনঃ এগুলো নিয়ে যেয়ে সাদ্‌কা করে দাও। সে ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার চেয়েও অধিক গরীবের উপর, (সে বল্‌ল) আল্লাহর শপথ মদিনার এই দু'হার্‌রার (অর্থাৎ সমগ্র মদিনার) মাঝে আমার পরিবারের চেয়ে দরিদ্র পরিবার আর নেই। একথা শুনে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাঁসলেন। এমনকি তার আনইয়াব নামক দাত প্রকাশ হয়ে গেল। তারপর বল্‌লেন (যাও) তা তোমার পরিবারকে খাওয়াও। *(বুখারী ও মুসলিম)*

চুমু, সহবাস বা হস্ত মৈথুনে বীর্য বের করা। সিয়াম সাধন কারী যদি উল্লেখিত কারণ সমূহের যে কোন একটি কারণ দ্বারা বীর্য বের করে তবে তার সাওম বাতিল হয়ে যাবে, তা কাযা করা অপরিহার্য হয়ে যাবে, দিনের বাকী অংশ পানাহার ইত্যাদি হতে বিরত থাকবে। তার উপর কাফ্ফারা ধার্য হবে না। আর সে তাওবা করবে, লজ্জীত হবে, ক্ষমা চাবে, কামভাব উত্তেজীত করে এমন সকল অপকর্ম হতে দূরে থাকবে। যদি সিয়াম সাধন অবস্থায় ঘুমের ঘরে স্বপ্নদোষ হয়ে বীর্যপাত হয়, তবে তার সিয়াম সাধনের উপর কোন প্রভাব পড়বেনা ও তার উপর কোন কিছু ধার্য হবে না। তবে তার উপর গোসল করা অপরিহার্য হবে।

পাকস্থলীতে বিদ্যমান বস্তু মুখ দিয়ে বের করে ইচ্ছা কৃত বমি করা। কিন্তু বিনা ইচ্ছায় যদি কিছু বের হয়ে যায় তবে তা তার সিয়ামের উপর কোন প্রভাব ফেলবেনা।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ যার বমি হয়ে যাবে তার উপর কাযা নেই। আর যে ইচ্ছাকৃত বমি করলো সে কাযা করবে। *(আবু দাউদ ও তিরমিযী)*

হায়েয ও নিফাস দেখা দিলে। আর তা দিনের প্রথম অংশে হোক বা শেষাংশে সূর্য ডুবার পূর্ব মুহূর্তে হোক।

সিয়াম সাধনকারীর জন্য সিঙ্গা লাগানো ছেড়ে দেওয়া উত্তম। যাতে ইহা তার সিয়াম নষ্টের কারণ না হয়। রক্ত দানের জন্য রক্তবের না করা উত্তম। তবে অসুস্থ্য ও অনুরূপ ব্যক্তির সহযোগিতার তাগিদে রক্ত দান করলে অসুবিধা নেই। আর যদি নাক দিয়ে বা কাশির সাথে বা জখম হওয়ার কারণে বা দাঁত উঠানোর কারণে ও অনুরূপ কারণে রক্ত বের হয়, তবে ইহা তার সিয়ামের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না।

৭- সিয়ামের বা রোযার সাধারণ বিধান সমূহ ((৭- أحكام عامة:))

চাঁদ দেখার মাধ্যমে রামাযান মাসের সিয়াম সাধন ফরয প্রমাণিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থঃ সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৮৫)*

চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য একজন ন্যায় পরায়ণ মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষীই যথেষ্ট।

ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ

((ترائ النّاس الهلال فأخبرت رسول الله أني رأيته فصام وأمر النّاس بصيامه)) (رواه أبو داود والدارمي وغيرهما).

অর্থঃ মানুষ একে অপরে চাঁদ দেখতে ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সংবাদ দিলাম যে আমি চাঁদ দেখেছি। তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিয়াম সাধন করলেন ও মানুষদেরকে সিয়াম সাধনের আদেশ দিলেন। *(আবু দাউদ, দারেমী ও অন্যান্যরা এই হাদীস বর্ণনা করেছেন)*

চাঁদ দেখার ব্যাপারে দুরদর্শন যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া জায়েয আছে। রামাযান শুরু বা শেষ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে কক্ষ পথের হিসাবের ও তারকা দেখার উপর ভরসা করা ঠিক নয়। কেবল মাত্র চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থঃ সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৮৫)*

প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে যে ব্যক্তি রামাযান মাসকে পাবে তার উপর সে মাসের দিন গুলো তা ছোট হউক বা বড় হউক সিয়াম সাধন করা ফরয হবে। প্রত্যেক দেশে রামাযান মাসের সিয়াম সাধন শুরু হওয়ার ব্যাপারে মানদন্ড হলো তার চাঁদ উদিত হওয়ার স্থানে চাঁদ দেখা। আর ইহা বিদ্যানগুণের অধিক গ্রহণযোগ্য মত। কারণ চাঁদ উদিত হওয়ার স্থান সমূহ ভিন্ন এর উপর উলামাদের ঐক্যমত রয়েছে। আর এটাই প্রমাণিত হয় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী দ্বারা, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

((صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً))(أخرجه البخاري ومسلم).

অর্থঃ -তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম সাধন শুরু কর। আবার চাঁদ দেখেই সিয়াম সাধন ছেড়ে দাও। আর তোমরা যদি চাঁদ দেখতে না পার তবে শা'বান মাসকে ত্রিশ দিনে পুরা কর। *(বুখারী ও মুসলিম)*

সিয়াম সাধন কারীর রাতেই সিয়ামের নিয়াত করা আবশ্যক।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

((إنما الأعمل بالنيّات، وإنما لكل امرئ ما نوى))(متفق عليه).

অর্থঃ কর্মের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়াত করবে তাই তার জন্য অর্জীত হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেনঃ

অর্থঃ যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে সিয়াম সাধনের নিয়াত করবেনা, তার সিয়াম সাধন শুদ্ধ হবে না। *(এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন হাফসা (রাযিআল্লাহু আনহা) এর বর্ণিত হাদীস হতে)*

অজর যুক্ত ব্যক্তি যেমন অসুস্থ্য বা মুসাফির ব্যক্তি বা হায়েয বা নিফাসরত মহিলা বা গর্ভধারিণী, বা বাচ্চাকে দুধ পান কারীনি মহিলা ছাড়া কারো জন্য রামাযান মাসের সিয়াম সাধন ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

অর্থঃ **তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিবে।** *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৮৪)*

অতঃপর অসুস্থ্য ব্যক্তি যার উপর সিয়াম সাধন কষ্টকর হবে, সিয়াম ভঙ্গকারী কারণ সমূহ হতে বিরত থাকা কঠিন হবে, ও তার দ্বারা সে ক্ষতি গ্রস্থ হবে, তার জন্য রামাযান মাসের সিয়াম ছেড়ে দেওয়া বৈধ হবে। রামাযানের মাসে যে কয় দিনের সিয়াম ছেড়ে দিয়েছিল রামাযানের পর সে কয় দিনের সিয়াম কাযা আদায় করবে। যদি গর্ভধারিণী ও দুধ পান কারীনি শুধু নিজেদের কষ্টের আশংকা করে তবে সিয়াম ছেড়ে দিবে। ও তাদের উপর কাযা করা আবশ্যক হবে, এর উপর আলেমগণের ইজমা রয়েছে। কারণ তারা দু'জন প্রাণ নাশের আশংকা করে এমন অসুস্থ্য ব্যক্তির সমপর্যায়।

আর যদি নিজেদের ও সন্তানের কষ্টের আশংকা করে বা শুধু সন্তানের কষ্টের আশংকা করে তবে তারা সিয়াম সাধন ছেড়ে দিবে, তাদের উপর কাযা আবশ্যক হবে। কারণ আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) মারফু' হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরের, গর্ভধারিণী ও দুধ পান কারীনির অর্ধেক সালাত ও সিয়াম মাফ করে দিয়েছেন। *(নাসায়ী ও ইবনে খুযাইমা হাদীসটি হাসান হিসাবে বর্ণনা করেছেন)*

তবে অতি বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা তাদের জন্য সিয়াম ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি আছে। যদি সিয়াম সাধন তাদের পক্ষে খুব কষ্টকর হয়। তাদের উপর প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো আবশ্যক হবে।

কারণ ইমাম বুখারী আতা হতে বর্ণনা করেছেন, সে ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) কে নিম্নের আয়াত পাঠ করতে শুনেছেনঃ

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

অর্থঃ **আর যারা ওতে (সিয়াম সাধনে) অক্ষম তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে বা খাওয়াবে।** *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৮৪)*

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ

অর্থঃ এই আয়াতটি রহিত নয়। বরং ইহা অতি বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা যাদের সিয়াম সাধনের সামর্থ্য নেই তাদের ব্যাপারে। তারা প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে।

আর সফর বা ভ্রমণ হল সিয়াম সাধন ছেড়ে দেওয়ার গ্রহণযোগ্য কারণ সমূহের একটি কারণ।

কারণ আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ

অর্থঃ আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা) এর সাথে সফর করতাম। সিয়াম সাধন কারীরা সিয়াম ত্যাগ কারীদের, আর সিয়াম ত্যাগ কারীরা সিয়াম সাধন কারীদের দোষারোপ করতোনা। *(বুখারী মুসলিম)*

পঞ্চম রুক্নঃ হাজ্জ (*الركن الخامس : الحج.*)

১- হাজ্জের সংজ্ঞা (১- تعريفه:)

الحج في اللغة: - *হাজ্জের শাব্দিক অর্থঃ* القصد (আলকাসদু) ইচ্ছা করা। আরবী ভাষায় বলা হয়ঃ حج إلينا فلان: অমুকে আমাদের নিকট হাজ্জ করেছে। অর্থাৎ সে আমাদের নিকট আসার ইচ্ছা করেছে ও আমাদের নিকট এসেছে।

وفي الشرع: - *হাজ্জের পারিভাষিক অর্থঃ* নির্ধারিত শর্তসহ নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদাত করার জন্য মাক্কায় গমণের ইচ্ছা করাকে হাজ্জ বলে।

২- হাজ্জের হুকুম (২- حكمه:)

সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর তার জীবনে একবার হাজ্জ ফরয হওয়া এবং তা পাঁচটি স্তম্ভ যার উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত তার অন্যতম একটি স্তম্ভ হওয়ার ব্যাপারে উম্মাত ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ

অর্থঃ **মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। এবং কেহ প্রত্যাখ্যান করলে সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ বিশ্ব-জগতের মুখাপেক্ষী নহেন।** *(সূরা আল-ইমরান-আয়াত-৯৭)*

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দান করা। নামায প্রতিষ্ঠা করা। যাকাত প্রদান করা। রামাযানের সিয়াম পালন করা। বায়তুল্লাহ শরীফের হাজ্জ করা। *(বুখারী মুসলিম)*

তিনি বিদায় হাজ্জের ভাষণে আরো বলেনঃ

অর্থঃ হে মানব জাতি! আল্লাহ তোমাদের উপর বায়তুল্লাহর হাজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হাজ্জ কর। *(মুসলিম)*

৩- হাজ্জের ফযিলত ও তা প্রবর্তনের পিছনে হিক্মাত ((৩-فضله والحكمة من مشروعيته:)

হাজ্জের ফযিলতে অনেক দলীল বর্ণিত হয়েছেঃ

তন্মধ্যে তার (আল্লাহর) বাণীঃ

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

অর্থঃ **এবং মানুষের নিকট হাজ্জ এর ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে, তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে। যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থান গুলিতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুস্পদ জন্তু হতে যাহা রিযক হিসাবে দান করেছেন উহার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারবে।** *(সূরা আল-হাজ্জ-আয়াত-২৭ -২৮)*

আর হাজ্জ সকল মুসলমানের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে অনেক কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে। সুতরাং হাজ্জের মধ্যে নানা প্রকার ইবাদাতের সমাবেশ রয়েছে, যেমন কা'বা শরীফের তাওয়াফ, সাফা মারওয়ার মাঝে সা'ঈ, আরাফাতে, মিনায়, মুয্দালিফায় অবস্থান, কঙ্কর নিক্ষেপ, মিনায় রাত্রি যাপন, হাদী জবেহ, মাথার চুল মুন্ডানো, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য তার কাছে বিনয়- নম্রতা প্রকাশ করার জন্য ও তার দিকে ধাবমান হওয়ার জন্য বেশী বেশী আল্লাহর যিকির। তাই হাজ্জ হলো পাপ মোচনের ও জান্নাতে প্রবেশের কারণ সমূহের অন্যতম একটি কারণ।

আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

অর্থঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি এই ঘরের হাজ্জ করলো আর সে নির্লজ্জ কোন কথা বার্তা ও ফাসেকী কোন কর্মে লিপ্ত হলোনা সে তার পাপ হতে ফিরে আসলো সেই দিনের ন্যায় যে দিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ এক উম্রাহ হতে অপর উম্রাহ এই দুইয়ের মাঝে কৃত পাপের কাফ্ফারা। আর গৃহীত হাজ্জের একমাত্র প্রতিদান হল জান্নাত। *(বুখারী ও মুসলিম)*

আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ

((سئل رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال حج مبرور))(متفق عليه).

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কোন কাজটি অতি উত্তম? তিনি বল্লেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। বলা হলোঃ তার পর কোনটি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। বলা হলো তার পর কোনটি? তিনি বল্লেনঃ গৃহীত হাজ্জ। *(বুখারী ও মুসলিম একত্রিত ভাবে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহ আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

((تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة))(رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح).

অর্থঃ তোমরা হাজ্জ ও উম্রাহ পর্যায়ক্রমে করতে থাক। কারণ এ দু'টি দরিদ্রতা দূর করে আর পাপ মোচন করে। যেমন কর্মকারের অগ্নিকন্ড লোহার, সোনা ও রূপার মরিচা দূর করে। আর গৃহীত হাজ্জের একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত। *(হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, হাসান ও সহীহ বলেছেন)*

বিশ্বের দূর-দূরান্ত হতে আগত মুসলমানদের আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়স্থানে একে অপরের মিলন, পরস্পরের পরিচয় লাভ, কল্যাণকর ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করার সুযোগ ও তাদের কথা কাজ ও যিকির এক হওয়া হাজ্জের উপকারিতার অন্ত র্ভুক্ত। ইহাতে তাদের আক্বীদায়, ইবাদাতে, উদ্দেশ্য ও ওয়াসিলাতে ঐক্যের ও একত্রিতের প্রশিক্ষণ রয়েছে। আর তাদের এই একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে তাদের মাঝে পরস্পর পরিচয় লাভ হয়, বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় ও এক অপর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পায়, ও আল্লাহ তা'আলার কথা বাস্তবায়িত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

অর্থঃ **হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।** *(সূরা আল-হুজরাত-আয়াত-১৩)*

৪- হাজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত সমূহ ((شروط وجوبه: -৪

(ক) হাজ্জ ফরয হয় পাঁচটি শর্তে, এতে বিদ্যানগণের মতনৈক্য নেই। আর তা হলোঃ

ইসলাম বা মুসলিম হওয়া, জ্ঞানবান হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, স্বাধীন হওয়া, ও সামর্থ্য থাকা। তবে মহিলার উপর হাজ্জ ফরয হওয়ার জন্য হাজ্জের সফরে তার সাথে মাহ্রাম থাকা আবশ্যক।

কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এমন মহিলার জন্য বিনা মাহ্রামে (বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ এমন পুরুষ।) একদিনের দূরত্বের পথও সফর করা বৈধ নয়। আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) এই হাদীসটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এই শর্ত গুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেনঃ

প্রথমতঃ হাজ্জ সহীহ ও ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত, তা হলোঃ ইসলাম ও জ্ঞান, তাই কাফির ও পাগলের উপর হাজ্জ ফরয নয়। তাহাদের পক্ষ হতে হাজ্জ শুদ্ধও হবে না। কারণ তাহারা ইবাদাত কারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

দ্বিতীয়তঃ যা ওয়াজিব ও যথেষ্ট হওয়ার জন্য শর্ত, তা হলোঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ও স্বাধীন হওয়া, ইহাদের (হাজ্জ) সহীহ হওয়ার শর্ত নয়। তাই যদি বাচ্চা ও দাস হাজ্জ করে, তাহাদের হাজ্জ সহীহ হবে। তবে তাহাদের এই হাজ্জ ইসলামের ফরয হাজ্জ হিসাবে যথেষ্ট হবে না।

তৃতীয়তঃ যা শুধু ফরয হওয়ার জন্য শর্ত। আর তা হলো সামর্থ্যতা। তবে সামর্থ্যহীন ব্যক্তি যদি কষ্ট করে হাজ্জ করে এবং যদি পাথেয় ও যানবাহন ছাড়াই হাজ্জে চলে যায় তবে তার হাজ্জ সহীহ হবে।

(খ) হাজ্জ আদায়ে প্রতিনিধি নিযুক্ত করার বিধানঃ

যে ব্যক্তি হাজ্জ আদায়ের সামর্থ্যবান হওয়ার পূর্বে মারা যাবে, তার উপর ফরয হবে না। এতে বিদ্যানগণের মাঝে কোন মতনৈক্য নেই। তবে যে ব্যক্তি হাজ্জ আদায়ের সামর্থ্যবান হওয়ার পর মারা যাবে, তার উপর হতে মৃত্যুর কারণে ফরয সাকেত (বন্ধ) হবে কি হবে না এ ব্যাপারে মতনৈক্য রয়েছে। তবে সঠিক মত হলো মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষ হতে হাজ্জের ফারযিয়াত সাকেত (বন্ধ) হবে না।

মৃত্যু ব্যক্তির ওয়ারিসদের উপর তার পক্ষ হতে তার মাল হতে হাজ্জ করা অপরিহার্য হবে, সে তার পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায়ের ওসিয়াত করে যান আর নাই যান। তা তার উপর সব দিক দিয়ে ঋণের ন্যায় ওয়াজিব হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে।

কারণ ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। জনৈক মহিলা হাজ্জ করার নজর মেনে মারা যায়।

অতঃপর তার ভাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে তাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্লেনঃ

অর্থঃ তোমার কি মত? যদি তোমার বোনের উপর ঋণ থাকতো তাহলে তুমি কি তা আদায় করতেনা? সে বল্ল হ্যাঁ। তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্লেন, আল্লাহর ঋণ আদায় কর, কারণ আল্লাহর ঋণ আদায় করা অধিক যুক্তি যুক্ত। *(নাসায়ী)*

(গ) যে ব্যক্তি নিজে হাজ্জ করে নাই সে অন্যের পক্ষ হতে বদল হাজ্জ করতে পারবে কি?

যে ব্যক্তি প্রথমে নিজের হাজ্জ করে নাই সে অন্যের পক্ষ হতে বদল হাজ্জ করতে পারবেনা। ইহা বিদ্যানগণের সঠিক মত।

কারণ এ ব্যাপারে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে, আর তা হলোঃ

অর্থঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে লাব্বাইক আন শুব্রামাহ বলতে শুনলেন। অতঃপর (তাকে) বল্লেন শুব্রামাহ কে? সে বল্ল আমার ভাই বা আমার নিকট আত্মীয়। তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্লেন তুমি তোমার হাজ্জ করেছ? সে বল্ল না। তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্লেন আগে তুমি নিজের হাজ্জ কর, তারপর শুব্রামার হাজ্জ কর। *(এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী বর্ণনা করেছেন, ইমাম বাইহাকী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

সামর্থ্যহীন অপারগ ব্যক্তির পক্ষ হতে বদল হাজ্জ সঠিক মতে সহীহ হবে ।

কারণ এ ব্যাপারে ফজল বিন আববাস (রাযিআল্লাহু আনহুমার) একটি হাদীস রয়েছেঃ

অর্থঃ আর তাতে আছে খাছআমা কাবিলার জনৈক মহিলা বল্‌ল হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ সে যানবাহনে স্থীর থাকতে পারেনা । তার উপর আল্লাহর ফারিযাহ-হাজ্জ ফরয হয়েছে । আমি কি তার পক্ষ হতে বদল হাজ্জ করতে পারবো? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন হ্যাঁ । তার পক্ষ হতে বদল হাজ্জ কর । এই ঘটনা বিদায় হাজ্জে ঘটে ছিল । *(বুখারী ও মুসলিম, তবে শব্দ গুলো বুখারীর)*

(ঘ) হাজ্জ অবিলম্বে ফরয না বিলম্বে ফরয?

হাজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পুরা হওয়ার সাথে সাথেই হাজ্জ ফরয হবে, ইহা বিদ্যানগণের গ্রহণ যোগ্য মত ।

কারণ এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী আম বা ব্যাপক রয়েছে যেমনঃ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

অর্থঃ **মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য** । *(সূরা আল-ইমরান-আয়াত-৯৭)*

আরো আল্লাহর বাণী হলোঃ

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

অর্থঃ **তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ ও উম্‌রাহ পূর্ণ কর** । *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৯৬)*

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

((تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) (رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه).

অর্থঃ তোমরা ফরয হাজ্জের জন্য তাড়াতাড়ী কর, কেননা তোমাদের কেহই একথা জানেনা যে, তাহার ভাগ্যে কি রহিয়াছে । *(হাদীসটি আবু দাউদ, আহমাদ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হাকেম হাদীসটি সহীহ বলেছেন)*

৫- হাজ্জের আর্‌কান বা রুক্‌ন সমূহ (٥-أركان الحج:)

হাজ্জের আর্‌কান চারটিঃ

(ক) ইহ্‌রাম বাঁধা ।

(খ) আরাফায় অবস্থান করা ।

(গ) তাওয়াফুয যিয়ারা ।

(ঘ) সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা ।

আর এই চারটি আর্‌কানের কোন একটি রুক্‌ন ছুটে গেলে হাজ্জ পূর্ণ হবে না ।

প্রথম রুক্‌নঃ ইহ্‌রাম বাধা

ইহ্‌রামের সংজ্ঞাঃ ইহ্‌রাম হলো, ইবাদাতে প্রবেশের নিয়াত করা ।

হাজ্জের মীকাতঃ হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার মীকাত দু' প্রকারঃ

(১) সময়ের মীকাত ।

(২) স্থানের মীকাত ।

সময়ের মীকাতঃ আর তা হলোঃ

হাজ্জের মাস সমূহ যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

অর্থঃ **হাজ্জ হয় সুবিদিত মাসে** । *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৯৭)*

আর তা হলোঃ শাওয়াল, যুলকা'দা, ও যুলহাজ্জাহ।

স্থানের মীকাতঃ আর তা হলোঃ ঐ সীমা সমূহ যা হাজী সাহেবদের জন্য বিনা ইহ্রামে অতিক্রম করে মক্কার দিকে যাওয়া ঠিক নয়। আর তা হলো পাঁচটিঃ

প্রথমঃ (যুলহুলাইফা) বর্তমানে এর নাম "আবারে আলী" ইহা মদিনা বাসীদের মীকাত, ইহা মক্কা হতে (৩৩৬) কিঃ মিঃ অর্থাৎ ২২৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

দ্বিতীয়ঃ (আল-জুহ্ফা) ইহা একটি গ্রাম, সে গ্রাম ও লোহিত সাগরের মাঝে দূরত্ব হলো (১০) কিঃ মিঃ, ইহা মক্কা হতে (১৮০) কিঃ মিঃ অর্থাৎ (১২০) মাইল দূরে অবস্থিত। আর ইহা মিসর, সিরীয়া, মরক্ক ও এদের পিছনে বসবাস কারী স্পেন, রূম ও তিক্রূর বাসীদের মীকাত। বর্তমানে মানুষ (রাবেগ) হতে ইহ্রাম বাঁধে। কারণ ইহা তার কিছুটা বরাবর।

তৃতীয়ঃ (ইয়ালামলাম) বর্তমানে ইহা (আস্সা'দীয়া) নামে পরিচিত। আর ইহা তুহামাহ (সারিবদ্ধ) পর্বত সমূহের একটি পর্বত। ইহা মক্কা হতে (৭২) কিঃ মিঃ অর্থাৎ (৪৮) মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ইয়েমেন আহলে জাওয়াহ, ভারতীয় উপমহাদেশের ও চীন বাসীদের মীকাত।

চতুর্থঃ (ক্বারনু মানাযেল) বর্তমানে এর নাম "আস্সাইলুল কাবীর" ইহা মক্কা হতে (৭২) কিঃ মিঃ অর্থাৎ (৪৮) মাইল দূরে অবস্থিত। আর ইহা নাজদ ও ত্বায়েফ বাসীদের মীকাত।

পঞ্চমঃ (যাতে ইর্ক্ব) ইহা বর্তমানে (আয্যারীবাহ) নামে পরিচিত, এর নাম যাতে ইর্ক্ব রাখা হয়েছে। কারণ তথায় ইর্ক্ব আছে। আর ইর্ক্ব হলো ছোট পর্বত। ইহা মক্কা হতে (৭২) কিঃ মিঃ অর্থাৎ (৪৮) মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা প্রাচ্য বাসীদের, ইরাক্ব ও ইরান বাসীদের মীকাত।

ইহা স্থানের মীকাত – ঐ নির্ধারিত সীমা সমূহ যা বিনা ইহ্রামে অতিক্রম করে মক্কার দিকে যাওয়া কোন হাজ্জ ও উম্রাহ কারীর জন্য ঠিক নয়।

এই মীকাত গুলো আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করে গেছেন।

যেমন- ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমার) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ

অর্থঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনা বাসীদের জন্য যুলহুলাইফা। আর সিরীয়া বাসীদের জন্য আল-জুহ্ফাহ। আর নাজদ বাসীদের জন্য ক্বার্নুল মানাযেল। ইয়েমেন বাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নির্ধারণ করেছেন। ঐ মীকাত গুলো ঐ এলাকা বাসীদের জন্য। আর যারা হাজ্জ ও উম্রাহ করার উদ্দেশ্যে ঐ স্থানে পৌছবে, তাদের জন্যও মীকাত নির্ধারিত হল। আর যারা মীকাতের ভিতরে অবস্থান করে তাদের ইহ্রাম বাঁধার স্থান হবে তাদের নিজস্ব অবস্থান স্থল, এমনকি মক্কার লোক মক্কাতেই ইহ্রাম বাঁধবে। *(বুখারী মুসলিম)*

অর্থঃ মুসলিম শরীফে জাবির (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর হাদীসে আছে। ইরাক্ববাসীদের ইহ্রাম বাঁধার স্থান হলো যাতে ইর্ক্ব।

যে ব্যক্তি ঐ মীকাত সমূহের কোন একটি মীকাত দিয়ে অতিক্রম করবে না, সে ঐ সময় ইহ্রাম বাঁধবে যখন সে জানতে পারবে যে, সে ঐ মীকাত সমূহের একটি মীকাতের বরাবর হয়েছে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আকাশ পথে বিমানে আরোহণ করবে সে ঐ মীকাত সমূহের যে কোন একটি মীকাতের নিকটবর্তী হলে সে ইহ্রাম বাঁধবে। বিমানে আরোহী ব্যক্তির জন্য জিদ্দা এয়ার পোর্টে নেমে ইহ্রাম বাঁধা ঠিক হবে না, যেমনটি কিছু হাজী সাহেবগণ করে থাকেন।

কারণ জিদ্দা শুধু জিদ্দা বাসীদের মীকাত বা জিদ্দা তাদের জন্য মীকাত যারা তথা হতে হাজ্জ ও উম্রার নিয়াত করবে।

তাই জিদ্দা বাসী ছাড়া যে কেও তথা হতে ইহ্রাম বাঁধলো সে (হাজ্জের) একটি ওয়াজিব পরিত্যাগ করলো। আর তা হলো মীকাত হতে ইহ্রাম বাঁধা। এর কারণে তার উপর একটি ফিদ্য়া অপরিহার্য হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করবে তার কর্তব্য হবে তথায় ফিরে যেয়ে ইহ্রাম বেঁধে আসা। আর সে যদি তথায় ফিরে না যায় বরং যে স্থানে পৌছেছে সে স্থান হতেই ইহ্রাম বেঁধে নেয় তবে তার উপরও একটি ফিদ্য়াহ অপরিহার্য হবে। আর তা হল একটি বক্রি জবেহ করা, বা উট ও গরুর এক সপ্তাংশে অংশীদার হওয়া, আর তা হারামের মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করা, এবং তা হতে কিছু ভক্ষণ না করা।

হাজ্জ আদায়ের পদ্ধতিঃ ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে গোসল করে পরিস্কার পরিছন্ন হয়ে, চুলের যা কর্তন করা বৈধ তা কর্তন করে শরীরে সুগন্ধি লাগিয়ে ইহরামের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া মুস্তাহাব। পুরুষ লোক সিলাই যুক্ত কাপড় খুলে ফেলবে। পরিস্কার পরিছন্ন সাদা দু'টি-লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করবে। সঠিকমতে ইহ্রামের জন্য কোন বিশেষ সালাত (নামায) নেই, তবে ইহ্রাম বাঁধাটা যদি কোন ফরয নামাযের সময় হয়, তবে ফরয নামাযের পর ইহ্রাম বাঁধবে, কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরয নামাযের পর ইহ্রাম বেঁধে ছিলেন।

অতঃপর তিন প্রকার হাজ্জ- তামাত্তু', ক্বিরান, ইফ্‌রাদ যেটার ইচ্ছা করবে সেটার ইহ্‌রাম বাঁধবে।

তামাত্তু' হাজ্জের সংজ্ঞাঃ হাজ্জের মাসে উম্‌রার ইহ্‌রাম বেঁধে তা পুরা করে ঐ বছরেই হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা হলো তামাত্তু' হাজ্জ।

ক্বিরান হাজ্জের সংজ্ঞাঃ হাজ্জ ও উম্‌রার এক সাথে ইহ্‌রাম বাঁধা, অথবা প্রথমে উম্‌রার ইহ্‌রাম বাঁধা, পরে উম্‌রার তাওয়াফ শুরু করার আগেই হাজ্জকে উম্‌রার সাথে জড়িত করে নেওয়াই ক্বিরান হাজ্জ। অতঃপর মীকাত হতে হাজ্জ ও উম্‌রার উভয়ের নিয়াত করবে বা উম্‌রার তাওয়াফ শুরু করার আগেই হাজ্জ ও উম্‌রা উভয়ের নিয়াত করবে। তারপর হাজ্জ ও উম্‌রা উভয়ের তাওয়াফ ও সা'ঈ করবে।

ইফ্‌রাদ হাজ্জের সংজ্ঞাঃ মীকাত হতে শুধু হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা ও হাজ্জের সকল কর্ম সম্পাদন করা পর্যন্ত ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকা হলো ইফ্‌রাদ হাজ্জ।

মাসজিদে হারামের অধিবাসী নয় এমন-তামাত্তু' ও ক্বিরান কারীর উপর হাদী অপরিহার্য। তিন প্রকার হাজ্জের কোনটি উত্তম এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

বিদ্যানগণের মধ্যে কিছু কিছু বড় মুহাক্কেকীনদের নিকট তামাত্তু' হাজ্জ উত্তম।

তারপর যখন এই তিন প্রকার হাজ্জের যে কোন একটি হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে, তখন ইহ্‌রামের পর লাব্বাইক বলবেঃ

((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك))

উচ্চারণঃ লাববাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক লা-শারীকা লাকা।

তালবীয়াহ বেশী বেশী পাঠ করবে। পুরুষ লোক উচ্চ-শব্দে পাঠ করবে।

محظوراته: وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي تسعة:

ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কর্ম সমূহঃ আর তা হলো ইহ্‌রাম বাঁধার কারণে মুহ্‌রিম ব্যক্তির উপর যা সম্পাদন করা হারাম, তা সর্ব মোট নয়টিঃ

একঃ চুল মুন্ডানো বা অন্য কিছুর মাধ্যমে সমস্ত শরীর হতে চুল উঠানো।

কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী হলোঃ

وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

অর্থঃ যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু উহার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মাথা মুন্ডন করিও না। *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৯৬)*

দুইঃ বিনা অজরে নখ কাটা, তবে অজর থাকলে নখ কাটা জায়েয হবে, যেমন অজরের কারণে হাল্‌ক বা মাথা মুন্ডানো জায়েয। কারণ এর দ্বারা চাকচিক্য অর্জিত হয় তাই ইহা চুল উঠানোর সাদৃশ্যে পরিনত হয়।

তিনঃ মাথা ঢাকা, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুহ্‌রিমকে পাগড়ী পরতে নিষেধ করেছেন যে মুহ্‌রিমকে তার উট পা দিয়ে পিসে দিয়েছিল, তার ব্যাপারে তার (রাসূলের) বাণীঃ

অর্থঃ তার মাথা ঢাকিওনা, কারণ কিয়ামাত দিবসে তাকে তালবীয়াহ পাঠ করা অবস্থায় উঠানো হবে। *(এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমার) বরাতে বর্ণনা করেছেন)*

আর ইবনে উমার বলতেনঃ

অর্থঃ পুরুষের ইহ্‌রাম হলো তার মাথায়, আর মহিলাদের ইহ্‌রাম হলো তার চেহারায় বা মুখে। *(ইমাম বাইহাকী এই হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন)*

চারঃ পুরুষের সিলাই যুক্ত কাপড় পরিধান করা ও মুজা পরিধান করা। কারণ আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ

((سئل رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوباً مسّه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين))(رواه البخاري ومسلم).

অর্থঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুহ্‌রিম ব্যক্তি কি পোষাক পরিধান করবে? তিনি বল্‌লেনঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তি কুর্তা, পাগড়ী, বুরনুস (এমন পোষাক যা সম্পূর্ণ মাথা আবৃত করে রাখে), পায়জামা পরিধান করবে না, ওয়ারস ও যাফরান যুক্ত কাপড়ও পরিধান করবে না, মুজাও পরিধান করবে না। তবে যদি সে জুতা না পায় তাহলে মুজা পায়ের গিরার উপরিভাগ কর্তন করে পরিধান করবে, যাতে মুজা পায়ের গিরার নিচে থাকে। *(বুখারী মুসলিম)*

পাঁচঃ সুগন্ধি ব্যবহার করা।

অর্থঃ কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাফওয়ান ইবনে ই'লা ইবনে উমাইয়াহ এর হাদীসে এক ব্যক্তিকে সুগন্ধি ধুয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন। *(এই হাদীস বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন)*

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ মুহ্‌রিম ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছিলেন যাকে তার উট পা দিয়ে পিসে দিয়েছিলেন।

অর্থঃ তাকে সুগন্ধি লাগাইওনা। *(হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমার) বরাতে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন)*

ولمسلم: ((ولا تمسوه طيب))

অর্থঃ মুসলিম শরীফে আছে তাকে সুগন্ধি দ্বারা স্পর্শ করিও না।

মুহ্‌রিমের জন্য তার ইহ্‌রাম বাঁধার পর শরীরে বা শরীরের কোন অংশে সুগন্ধি লাগানো হারাম।

পূর্ব বর্ণিত ইবনে উমারের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

ছয়ঃ স্থলচর প্রাণী হত্যা করা।

কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী রয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ

অর্থঃ **হে মু'মিনগণ! ইহ্‌রামে থাকা কালে তোমরা শিকার-জন্তু বধ করিও না**। *(সূরা আল-মায়িদাহ-আয়াত-৯৫)*

আর তা শিকার করাও হারাম, যদিও তা হত্যা বা জখম না হয়।

কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী রয়েছেঃ

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

অর্থঃ **এবং তোমরা যতক্ষন ইহ্‌রামে থাকবে ততক্ষন স্থলের (কোন প্রাণী) শিকার তোমাদের জন্য হারাম**। *(সূরা আল-মায়িদাহ-আয়াত-৯৬)*

সাতঃ বিবাহ করা। মুহ্‌রিম নিজে বিবাহ করবে না ও নিজের অভিভাবকতায় ও প্রতিনিধিত্বে অপরকে বিবাহ করাবে না, কারণ উসমান (রাযিআল্লাহু আনহু) এর মারফু হাদীসে আছে।

অর্থঃ মুহ্‌রিম নিজে বিবাহ করবে না অপরকে বিবাহ করাবে না ও বিবাহের প্রস্তাব ও দিবে না। *(এই হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন)*

আটঃ লজ্জাস্থানে সহবাস করা, কারণ আল্লাহর বাণী রয়েছেঃ

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ

অর্থঃ **অতঃপর যে কেহ এই মাস গুলিতে হাজ্জ করা স্থির করে সে যেন কোন গর্হিতকাজ না করে**। *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৯৭)*

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ তা (রাফাস) হলো সহবাস করা।

এর দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ

অর্থঃ **সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সহবাস বৈধ করা হইয়াছে**। *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৮৭)*

উদ্দেশ্য হলো সহবাস করা।

নয়ঃ যৌন আকর্ষণের সাথে নারীদের শরীরে শরীর লাগানো বা চুমু দেওয়া বা স্পর্শ করা। অনুরূপভাবে যৌন আকর্ষণের সাথে তাকানো। কারণ ইহা হারাম সহবাসের দিকে পৌঁছে দেয়, সুতরাং ইহা হারাম।

এই নিষিদ্ধ কাজে মহিলারা পুরুষদের ন্যায়। তবে মহিলারা বিশেষ কিছু কর্মে পুরুষদের হতে স্বতন্ত্র। মহিলার ইহ্‌রাম হল তার মুখে। তাই মহিলাদের জন্য বুরকা, নিকাব, বা অনুরূপ কিছুর দ্বারা তাদের মুখ ঢাকা হারাম। তাদের জন্য হাত মুজা পরিধান করাও হারাম।

কারণ ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমার) মারফু' হাদীসে আছেঃ

অর্থঃ মুহ্‌রিম মেয়েরা নিকাব পরিধান করবে না, হাত মুজাও পরিধান করবে না। *(হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন)*

ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ

অর্থঃ মহিলার ইহ্‌রাম হলো তার মুখে। *(হাদীসটি বাইহাকী উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন)*

আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ

অর্থঃ যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সহিত বিদায় হাজ্জে হাজ্জ যাত্রী ছিলাম তখন আমাদের পাশ দিয়ে কাফেলা অতিক্রম করতো। যখন কাফেলার লোকজন আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতো তখন আমরা মাথা হতে চাদর চেহারার উপর ঝুলাইয়া দিতাম। আর যখন তাহারা আমাদেরকে অতিক্রম করে চলে যেত তখন আমরা মুখের উপর হতে কাপড় তুলে দিতাম। *(এই হাদীসটি আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন, হাদীসটির সনদ হাসান)*

পুরুষের জন্য যেমন চুল উঠানো, নখ কাটা, জানোয়ার হত্যা করা ইত্যাদি হারাম ইহা মহিলাদের জন্যও হারাম, কারণ সে আম খিতাবে শামিল রয়েছে। তবে তারা সেলাই যুক্ত কাপড়, পায়ে মুজা পরিধান করতে পারবে ও তারা মাথা ঢাকতে পারবে।

দ্বিতীয় রুক্নঃ আরাফায় অবস্থান

কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

((الحج عرفة))(رواه أحمد وأصحاب السنن).

অর্থঃ আরাফার অবস্থানই হাজ্জ। *(হাদীসটি আহমাদ ও আসহাবুস সুনান বর্ণনা করেছেন)*

তৃতীয় রুক্নঃ তাওয়াফুল ইফাযা

কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

অর্থঃ এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের। *(সূরা আল-হাজ্জ-আয়াত-২৯)*

চতুর্থ রুক্নঃ সা'ঈ করা

কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

((اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي))(رواه الإمام أحمد والبيهقي).

অর্থঃ তোমরা সা'ঈ কর, কারণ আল্লাহ তোমাদের উপর সা'ঈ লিখে দিয়েছেন। *(হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও বাইহাকী বর্ণনা করেছেন)*

৬- হাজ্জের ওয়াজিব সমূহ (٦- واجباته:)

হাজ্জের সর্ব মোট ওয়াজিব সাতটিঃ

(১) মীকাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা।

(২) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা, ইহা তাদের জন্য যারা দিনের বেলায় আরাফায় অবস্থান করবে।

(৩) মুযদালিফায় রাত্রি যাপন।

(৪) আইয়্যামে তাশ্‌রীকের (১১, ১২ ও ১৩ই- যুলহাজ্জাহর) রাত্রি গুলোতে মিনায় রাত্রি যাপন করা।

(৫) জামারাত গুলোতে কঙ্কর মারা।

(৬) মাথার চুল মুন্ডানো বা ছোট করা।

(৭) তাওয়াফুল বি'দা করা ।

৭- হাজ্জের বর্ণনা (صفته: - ৭)

হাজ্জ আদায়ের ইচ্ছা পোষণ কারী ব্যক্তির জন্য ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করা সুন্নাত । নিজ শরীরে যেমন তার মাথায় ও দাঁড়িতে সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত । সাদা লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করা সুন্নাত । মহিলা সৌন্দর্য প্রকাশ করে এমন পোষাক ছাড়া যে কোন পোষাক পরিধান করতে পারবে ।

তারপর মীকাতে পোঁছে (ইহ্‌রাম বাঁধার সময়) ফরয নামাযের সময় হলে তা আদায় করবে ও তার পর ইহ্‌রাম বাঁধবে । ইহ্‌রাম বাঁধার সময় ফরয নামাযের সময় না হলে দু' রাকা'আত নামায আদায় করবে, অযুর সুন্নাতের নিয়াতে ইহ্‌রামের সুন্নাতের নিয়াতে নয় । ইহ্‌রামের জন্য সুন্নাত নামায রয়েছে একথা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে প্রমাণ হয় নাই । আর যখন নামায শেষ হয়ে যাবে তখন ইবাদাতে (হাজ্জে) প্রবেশের নিয়াত করবে । আর তামাত্তু' হাজ্জকারী হলে বলবেঃ

(لبيك اللهم عمرة) (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা উমরাতান) । আর হাজ্জে ইফরাদকারী বলবেঃ (لبيك اللهم حجاً) (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হাজ্জান) । আর হাজ্জে ক্বিরান কারী বলবেঃ

(لبيك اللهم حجاً في عمرة) (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হাজ্জান ফি উমরাতিন) । পুরুষ ব্যক্তি জোরে বলবে মহিলারা চুপে চুপে বলবে, আর বেশী বেশী তালবীয়াহ পাঠ করবে । যখন মক্কায় পৌঁছবে তখন তাওয়াফ শুরু করবে, হাজারে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ শুরু করবে । আল্লাহর ঘরকে তার বাম দিকে রাখবে । হাজারে আসওয়াদকে লক্ষ্য করবে । তাকে চুমু দিবে বা তাকে স্পর্শ করবে বিনা ভিড়ে যদি সম্ভব হয় তবে তাকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করবে । অন্যথায় তার দিকে ইশারা করবে ও তাকবীর দিবে ।

আল্লাহু আকবার বলবে আর বলবেঃ

((اللهم ايماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك ،))

উচ্চারণঃ ((আল্লাহুম্মা ঈমানান বিকা, ওয়া তাসদীকান বিকিতাবিকা ওয়া ওয়াফাআন বিআহদিকা ইত্তেবাআন লিসুন্নাতে নাবীইয়েকা))

আর সাত চক্কর তাওয়াফ করবে । আর যখন রুক্‌নে ইয়ামানীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন তাকে চুমু ছাড়াই হাত দিয়ে স্পর্শ করবে ।

রামল করা তাওয়াফের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত । আর রামল হলো, তাওয়াফে কুদূমের প্রথম তিন শাওতে বা প্রথম তিন চক্করে ঘন ঘন পা রেখে দ্রত চলা ।

কারণ ইবনে উমার এর মুত্তাফাক আলাইহি হাদীস রয়েছে ।

তা হলোঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন প্রথম তাওয়াফ করতেন তখন প্রথম তিন চক্করে দ্রত চলতেন আর বাকী চার চক্করে সাধারণ ভাবে চলতেন ।

ইয্‌তিবা করা তাওয়াফের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত । আর ইয্‌তিবা হলোঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় পরিহিত চাদরের মধ্য ভাগকে ডান কাঁধের নীচ দিয়ে চাদরের উভয় কোণ বাম কাঁধের উপর ধারণ করা ।

কারণ ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ

((اضطبع رسول الله هو وأصحابه ورملوا ثلاثة أشواط))

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে ও তার সাহাবাগণ ইয্‌তিবা করেছেন, ও তিন চক্করে রামল করেছেন ।

আর ইয্‌তিবা শুধুমাত্র সাত চক্কর তাওয়াফে সুন্নাত । এর আগে বা পরে সুন্নাত নয় ।

বিনয়ের সাথে ও আন্তরিকভাবে নিজের নিকট যে সকল দু'আ পছন্দনীয় সে সকল দু'আ তাওয়াফ করা কালীন সময়ে পড়বে ।

রুক্‌নে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যে বলবেঃ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আযাবান নার ।

অর্থঃ **হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নি-যন্ত্রনা হতে রক্ষা কর** । *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-২০১)*

প্রতি চক্করে নির্ধারিত দু'আর প্রচলন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে প্রমাণিত নয়। বরং তা বিদ'আত ইসলামে নতুন কাজ।

আর তাওয়াফ তিন প্রকারঃ তাওয়াফে ইফাযাহ, তাওয়াফে কুদূম, ও তাওয়াফে বিদা'। প্রথমটি রুক্ন, দ্বিতীয়টি সুন্নাত এবং তৃতীয়টি বিশুদ্ধ মতে ওয়াজিব।

তাওয়াফ শেষান্তে মাক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে দু' রাকা'আত নামায পড়বে। মাক্বামে ইব্রাহীম হতে দূরে পড়লেও কোন অসুবিধা নেই। প্রথম রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আল-ক্বাফিরুন (قل يا أيها الكافرون) এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখ্লাস (قل هو الله أحد) পড়বে। এই দু' রাকা'আত নামায হালকা হওয়া সুন্নাত। হাদীসে এভাবেই এসেছে। তারপর সাফা ও মারওয়াতে সাত চক্কর সা'ঈ করবে। আর সা'ঈ সাফা হতে শুরু হবে, মারওয়াতে শেষ হবে। আর সাফাতে উঠে নিম্নের আয়াত পাঠ করা সুন্নাত।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

উচ্চারণঃ ইন্নাস্ সাফা ওয়াল মার্ওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ ফামান্ হাজ্জাল বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আই-ইয়াত্তাওফা বিহিমা ওয়ামান তা-তাওয়া' খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শা-কিরুন আলীম।

অর্থঃ **সাফা ও মারওয়া, আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেহ কা'বা গৃহের হাজ্জ কিংবা উম্রাহ সম্পন্ন করে তার জন্যে এই দুইটির তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করলে তার কোন পাপ নেই, এবং কেহ স্বেচ্ছায় সৎকাজ করলে আল্লাহ গুণগ্রাহী সর্বজ্ঞ।** *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৫৮)*

(أبدأ بما بدأ الله به)

"আল্লাহ যা দ্বারা শুরু করেছেন, আমিও তা দ্বারা শুরু করলাম"।

তারপর সাফা পর্বতে উঠবে। হস্তদ্বয় উত্তোলন করে ক্বিব্লা মুখী হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহর একত্বতা বর্ণনা করবে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবে, ও তাঁর প্রশংসা করবে ও বলবেঃ

((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده))

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু ইহ্য়ী ওয়ায়ামুতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়ীন কাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আন্জাযা ওআ'দাহু ওয়ানাসারা আবদুহু ওয়াহাযামা আল-আহযাবা ওয়াহদাহু।

তারপর দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধনের জন্য দু'আ করবে। আর এই দু'আ তিনবার করে পাঠ করবে। তারপর মারওয়ার দিকে যাবে, দুই সবুজ চিহ্নের মাঝে পুরুষের জন্য সম্ভব হলে দ্রুত চলা সুন্নাত। তবে কাউকে কষ্ট দিবে না। মারওয়াতে পৌঁছে তার উপর উঠবে, ক্বিব্লা মুখী হবে, তারপর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে, সাফাতে যা পাঠ করে ছিল অনুরূপ মারওয়াতে তাই পাঠ করবে। সা'ঈ করা কালীন নিম্নের দু'আটি পাঠ করা উত্তম।

((رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم))

উচ্চারণঃ রাব্বিগ ফির ওয়ারহাম ইন্নাকা আনতাল আয়ায্যুল আক্রাম।

কারণ ইবনে উমার ও ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) সা'ঈতে এ দু'আটি পড়তেন। অযু অবস্থায় সা'ঈ করা মুস্তাহাব, কেহ যদি বিনা অযুতে সা'ঈ করে নেয়, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। ঋতুবর্তী মহিলা যদি সা'ঈ করে নেয়, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। কারণ সা'ঈতে অযু শর্ত নয়।

আর সে তামাত্তু' হাজ্জ কারী হলে সম্পূর্ণ মাথার চুল ছোট করবে। মহিলা তার চুল হতে এক পোর-আঙ্গুলের মাথার পরিমাণ ছোট করবে।

আর যদি সে ক্বিরান বা ইফ্রাদ হাজ্জ কারী হয় তবে সে (ইয়াওমুন নাহার)-কুরবানীর দিন যুল হাজ্জ মাসের দশ তারিখে জামারাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করে হালাল হওয়া পর্যন্ত ইহ্রাম অবস্থায় থাকবে। যুল হাজ্জ মাসের আট তারিখে "তারবীয়ার দিবসে" সূর্য উদয়ের কিছু পরে তামাত্তু' হাজ্জ কারী নিজ বাসস্থান হতে ইহ্রাম বাঁধবে। মাক্কা বাসীদের যে ব্যক্তি হাজ্জ করতে ইচ্ছা করবে সে অনুরূপ করবে।

ইহ্‌রাম বাঁধা কালীন গোসল করবে, পরিস্কার পরিছন্ন হবে ও অন্যান্য কাজ করবে। ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য মাসজিদে হারাম যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ ইহা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত হয় নাই। আমাদের জানা মতে তিনি তার কোন সাহাবাকে এর আদেশও দেন নাই।

বুখারী ও মুসলিমে জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে (সাহাবাদেরকে) বল্‌লেনঃ

অর্থঃ তোমরা হালাল অবস্থায় থাক। তারপর তারবীয়ার দিবসে হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধ। *(আল-হাদীস)*

অর্থঃ মুসলিম শরীফে জাবির বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন আমরা মিনার দিকে রওনা হলাম তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে ইহ্‌রাম বাঁধার আদেশ দিলেন, তখন আমরা আল-আবত্বাহ নামক স্থান হতে ইহ্‌রাম বাঁধলাম।

তামাত্তু' হাজ্জ কারী তার ইহ্‌রাম বাঁধার সময় (لبيك حجاً) লাব্বাইক হাজ্জান বলবে।

মিনার দিকে বের হয়ে যাওয়া ও তথায় যোহর, আসর, মাগরিব, ও ঈশার নামায পৃথক পৃথকভাবে স্বওয়াক্তে কসর করে পড়া মুস্তাহাব। তথায় আরাফার রাত্রি যাপন করাও তার জন্য মুস্তাহাব।

কারণ ইহা মুসলিম শরীফে জাবির এর হাদীসে আছে।

তারপর আরাফার দিবসের (যুলহাজ্জ মাসের নয় তারিখের) সূর্য উদিত হলে আরাফায় যাবে। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সম্ভব হলে নামেরায় অবস্থান করা তার জন্য মুস্তাহাব। কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহা করেছেন। আর কারো জন্য যদি নামেরায় অবস্থান সম্ভব না হয় আর সে আরাফায় অবস্থান করে তাতে কোন অসুবিধা নেই। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর যোহর, আসরের নামায এক আযান দু' ইকামাতে একত্রিতভাবে দু'রাকা'আত দু' রাকা'আত করে পড়বে। তারপর মাওকিফ-আরাফায় অবস্থান স্থলে অবস্থান করবে। সম্ভব হলে জাবালে রাহমাতকে তার ও ক্বিবলার মাঝে রাখা উত্তম। অন্যথায় পাহাড় মুখী না হলেও ক্বিবলা মুখী হবে হস্তদ্বয় উত্তোলন অবস্থায় আল্লাহর যিকিরে, বিনয়তা প্রকাশে, দু'আয়া ও কুরআন তিলাওয়াতে পুরোপুরি ভাবে ব্যস্ত থাকা মুস্তাহাব।

কারণ উসামাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে, তিনি বলেনঃ

অর্থঃ আমি আরাফার মাঠে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে এক সাওয়ারীতে ছিলাম। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হস্তদ্বয় উত্তোলন করে দু'আ করতে লাগলেন, তাঁর উটনি তাকে নিয়ে একটু সরে গেল ও তার লাগাম পড়ে গেল, তারপর তার এক হাত দিয়ে তা উঠিয়ে নিলেন আর তার অপর হাতটি উত্তোলন অবস্থায় ছিল। *(হাদীসটি নাসাঈ বর্ণনা করেছেন)*

আর সহীহ মুসলিম শরীফে আছেঃ

অর্থঃ সূর্য অস্তমিত হওয়া ও পশ্চিম আকাশে হলদে রং দূরিভুত হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দু'আ করতে ছিলেন।

আরাফা দিবসের দু'আ সর্বোত্তম দু'আ।

কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ সর্বোত্তম দু'আ হলো আরাফা দিবসের দু'আ। আমি ও আমার পূর্বের নাবীগণের পঠিত উত্তম দু'আ হলোঃ

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল্ মুল্‌কু ওয়ালাহুল্ হাম্‌দু ওয়াহুয়া আলা-কুল্লি শাইয়িন কাদীর। *(হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন)*

আল্লাহর নিকট (তার) অভাব, প্রয়োজন, ও বিনয়তা প্রকাশ করা তার উপর অপরিহার্য। আর সে এই সূবর্ণ সুযোগ হারাবে না।

কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিবসে সব চেয়ে বেশী তার বাঁন্দাকে জাহান্নাম থেকে আজাদ-মুক্তি দান করেন, তিনি তাদের নিকটবর্তী হয়ে তাদেরকে নিয়ে ফিরিশ্‌তাদের সাথে গর্ব করেন ও বলেনঃ তারা কি চায়। *(হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন)*

আর আরাফায় অবস্থান হওয়া হাজ্জের রুক্‌ন। সূর্য ডুবা পর্যন্ত অবস্থান করা ওয়াজিব। হাজী সাহেবদের জন্য নিশ্চিত ভাবে আরাফার সীমান্তের ভিতর অবস্থান করা কর্তব্য।

কারণ অনেক হাজী সাহেবরা এর গুরুত্ব দেন না, ফলে তারা আরাফা সীমান্তের বাইরে অবস্থান করেন। তাই তাদের হাজ্জ হয়না। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর ধীর-স্থীর ও শান্তি পূর্ণভাবে মুযদালিফার দিকে রওনা হবে।

কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ হে মানব সমাজ! তোমরা ধীর স্থীরতা গ্রহণ কর, তোমরা ধীর স্থীরতা গ্রহণ কর। *(হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন)*

তারপর তথায় পৌছার পর মাগরিব ও ঈশার নামায আদায় করবে। মাগরিবের তিন রাকা'আত নামায পড়বে, আর ঈশার দু' রাকা'আত নামায পড়বে জমা তা'খীর করে।

হাজীদের জন্য তথায় মাগরিব ও ঈশা নামায আদায় করা সুন্নাত। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তথায় মাগরিব ও ঈশার নামায পড়েছেন। আর যদি ঈশার নামাযের সময় চলে যাওয়ার আশংকা করে তবে তা যে কোন স্থানে পড়ে নিবে।

আর মুয্দালিফায় রাত্রি যাপন করবে। নামায ও অন্য কোন ইবাদাত করে রাত্রি কাটাবে না। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহা করেন নাই।

কারণ ইমাম মুসলিম জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ

অর্থঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুযদালিফায় পৌছলেন এবং তথায় মাগরিব ও ঈশার নামায এক আযান দু' ইকামতে আদায় করলেন এ দু'য়ের মাঝে কোন সুন্নাত পড়েন নাই। তারপর ফজর হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থেকেছেন।

জামরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করার জন্য অর্ধ রাত্রি ও চন্দ্র ডুবে যাওয়ার পর অজর গ্রস্থ ও দুর্বল ব্যক্তির জন্য মুযদালিফা হতে মিনায় যাওয়া জায়েয আছে। আর যারা দুর্বল নয় ও দুর্বলের সহযোগিতাতেও নয় এমন ব্যক্তিরা ফজর হওয়া পর্যন্ত তথায় থাকবে। আরাম করার জন্য প্রথম রাত্রে কঙ্কর নিক্ষেপ করার প্রতিযোগিতা যা আজ কাল অধিকাংশ মানুষ করে থাকে, তা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাতের পরিপন্থী।

হাজী সাহেব মুয্দালিফায় ফজর নামায পড়ে আল-মাশ'আরুল হারামে অবস্থান করবে। কিব্লা মুখী হয়ে হস্তদ্বয় উত্তোলন করে পূর্বাকাশ পুরোপুরি ফর্শা হওয়া পর্যন্ত বেশী বেশী আল্লাহকে আহ্বান করবে।

মুয্দালিফার যে কোন স্থানে অবস্থান করলেই তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী রয়েছেঃ

অর্থঃ আমি এখানে অবস্থান করলাম, তবে মুয্দালিফা সম্পূর্ণটাই অবস্থান স্থল। *(এই হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন)*। আর (জামা') অর্থ মুয্দালিফা।

তারপর হাজী সাহেব কুরবানীর দিবসে সূর্য উদিত হওয়ার আগেই মিনায় চলে আসবে, ও জামরাতুল আকাবায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। জামরাতুল আকাবা হলো বড় জামরা যা মক্কার নিকটবর্তী। আর প্রতিটি কঙ্কর ছোলা বুটের চেয়ে একটু বড় হতে হবে। চতুর্দিক হতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয হওয়ার উপর সকল আলেমগণ একমত হয়েছেন। তবে কা'বাকে তার বাম পাশে আর মিনাকে তার ডান পাশে রেখে কঙ্কর নিক্ষেপ করা উত্তম।

কারণ ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছেঃ

অর্থঃ তিনি যখন বড় জামরার নিকটে পৌছতেন, তখন কা'বাকে তার বাম পাশে আর মিনাকে তার ডান পাশে রাখতেন ও সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন এবং বলেছেনঃ যার উপর সূরা আল-বাক্বারাহ অবতীর্ণ হয়েছিল তিনি এভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম একত্রিতভাবে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)*

বড় কঙ্কর, মুজা, ও জুতা নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। হাজী সাহেব জামরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় তালবীয়াহ পাঠ ছেড়ে দিবে। হাজী সাহেবদের জন্য আগে কঙ্কর মারা তার পর সে তামাত্তু' বা কিরান হাজ্জ কারী হলে হাদী জবেহ করে কুরবানী করা, তারপর চুল নেড়ে করা বা চুল ছোট করা সুন্নাত। পুরুষের জন্য নেড়ে করা উত্তম।

কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নেড়ে কারীদের জন্য তিনবার রাহমাত ও মাগফিরাতের দু'আ করেছেন। আর চুল ছোট কারীদের জন্য মাত্র একবার দু'আ করেছেন। যেমন এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তারপর হাজী সাহেব তাওয়াফে ইফাযাহ করার জন্য বাইতুল্লাহতে যাবেন।

আর ইহাই জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহুমার) হাদীসে সুন্নাত হিসাবে বর্ণিত হয়েছে হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। আর তাতে আছেঃ

অর্থঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে জামরাটি গাছের নিকটে ছিল তার কাছে আসলেন, ও তাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন, আর প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপ কালে "আল্লাহু আকবার" বললেন। কঙ্কর ছেলেদের ব্যবহৃত গুলালের গুলির মত-বা সমান হবে।

আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাত্বনুল ওয়াদী হতে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন। তারপর মিনায় গেলেন, ও কুরবানী করলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাওয়ারীতে আরোহণ করে মক্কায় এসে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফে ইফাযা করলেন, ও তথায় যোহরের নামায আদায় করলেন।

কোন হাজী সাহেব যদি এই চারটি ইবাদাতের কোন একটি ইবাদাতকে অন্য কোন একটি ইবাদাতের আগে করে ফেলে তাতে তার উপর কোন দোষ বর্তাবে না। কারণ বিদায় হাজ্জের ব্যাপারে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস যা বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তাতে আছেঃ

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমতাবস্থায় মানুষেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সেই দিন আগে বা পরে করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ কর কোন ক্ষতি নেই।

হাজী সাহেব যদি তামাত্তু' হাজ্জ কারী হন তাহলে তাওয়াফে ইফাযার পর সা'ঈ করবে। কারণ তার প্রথম সা'ঈ উম্‌রার জন্য ছিল। সুতরাং তার উপর হাজ্জের সা'ঈ অপরিহার্য হবে। আর যদি সে ইফরাদ বা কিরান হাজ্জ কারী হন ও তাওয়াফে কুদূমের পর সা'ঈ করে নেন তাহলে দ্বিতীয় বার আর সা'ঈ করবেনা।

কারণ জাবির (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছেঃ

((لم يطف النبي ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول))(رواه مسلم).

অর্থঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার সাহাবায়ে কেরাম সাফা ও মারওয়াতে একবার সা'ঈ করেছেন প্রথম সা'ঈ। *(এই হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন)*

যারা তাড়াতাড়ী করবেন না তাদের জন্য আইয়্যামুত তাশরীক যুল হাজ্জ মাসের (এগার, বার, ও তের) তারিখ কঙ্কর মারার দিন ধরা হবে। আর যারা তাড়াতাড়ী করবেন তারা দু' দিন যুল হাজ্জ মাসের এগার, ও বার তারিখ কঙ্কর মারবে।

কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী রয়েছেঃ

وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى

অর্থঃ **তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ করবে। যদি কেহ তাড়াতাড়ী করে দু' দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই, আর যদি কেহ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নেই। ইহা তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করে।** *(সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-২০৩)*

হাজী সাহেব প্রথম জামরা (ছোট) যা মাসজিদে খাইফের নিকটে তাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। তারপর মধ্য জামরাকে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। তারপর জামরাতুল আকাবাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপ কালে "আল্লাহু আকবার" বলবে। (ছোট) জামরাকে কঙ্কর নিক্ষেপ করে ক্বিবলামুখী হয়ে দাড়িয়ে, তার বাম পাশে রেখে অনেকক্ষণ ধরে লম্বা দু'আ করা সুন্নাত। দ্বিতীয় জামরাকে কঙ্কর মেরে ক্বিবলামুখী হয়ে দাড়ানো, ও তাকে তার ডান পাশে রেখে লম্বা দু'আ করা সুন্নাত। কিন্তু বড় জামরাকে কঙ্কর মারার পর লম্বা দু'আ করা কিংবা দাড়ানো সুন্নাত নয়।

কঙ্কর মারার সময় শুরু হবে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর।

কারণ ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমার) হাদীসে আছে। তিনি বলেনঃ

অর্থঃ আমরা সময় দেখতে থাকতাম, যখন সূর্য ঢলে যেত তখন আমরা কঙ্কর নিক্ষেপ করতাম। *(হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন)*

যুলহাজ্জ মাসের তের তারিখের সূর্য ডুবার সাথে সাথে আইয়্যামুত তাশরীকের কঙ্কর মারার সময় শেষ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি যুলহাজ্জ মাসের তের তারিখের সূর্য ডুবে গেল অথচ সে কঙ্কর মারতে পারলো না এর পর সে আর কঙ্কর মারবে না। তার উপর দাম-ফিদয়া অপরিহার্য হবে।

হাজী সাহেব আইয়্যামে তাশরীকের-যুলহাজ্জ মাসের এগার ও বার তারিখের রাত্রি গুলো মিনায় যাপন করবে, আর যে হাজী সাহেবের বার তারিখের সূর্য ডুবে গেল অথচ সে মিনা হতে বের হতে পারলো না তার উপর মিনায় রাত্রি যাপন এবং তের তারিখের কঙ্কর মারা অপরিহার্য হবে।

হাজী সাহেব যদি মক্কা হতে চলে যেতে চান তাহলে তাওয়াফে বি'দা করে চলে যাবেন। কারণ ইহা অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট হাজ্জের ওয়াজিব সমূহের একটি ওয়াজিব। তবে ইহা ঋতুবর্তী মহিলা হতে সাকেত-হয়ে যাবে। (তাকে করতে হবে না) কারণ ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর হাদীসে আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ কেহই (মক্কা হতে) চলে যাবে না যতক্ষন না তার সর্ব শেষ সময়টুকু আল্লাহর ঘরের কাছে কাটবে, (অর্থাৎ বিদায় তাওয়াফ না করে কেহই মক্কা ত্যাগ করবে না)। অন্য বর্ণনায় আছেঃ ঋতুবর্তী মহিলার জন্য তাওয়াফে বিদা' না করেই চলে যাওয়া অনুমতি রয়েছে। (হাদীসটি মালেক বর্ণনা করেছেন। আর মূল হাদীসটি সহীহ মুসলিমে আছে)

যে ব্যক্তি তাওয়াফে ইফাযাহ তার ভ্রমণ কাল পর্যন্ত পিছাবে তার জন্য তাওয়াফে ইফাযাই তাওয়াফে বিদা' হিসাবে অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট যথেষ্ট হবে।

যে দু'আটি বুখারী ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেছেন সেই দু'আটি হাজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন কারী ব্যক্তির জন্য পড়া মুস্তাহাব। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোন ধর্ম যুদ্ধ হতে বা হাজ্জ ও উম্রা হতে ফিরতেন তখন প্রত্যেক উঁচু জায়গায় "আল্লাহু আকবার" বলতেন। অতঃপর নিম্নের দু'আটি পড়তেনঃ

((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)).

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল্ মূল্কু, ওয়ালাহুল্ হাম্‌দু ওয়াহুয়া আলা-কুল্লি শাইয়ীন কাদীর। আ-য়েবূনা তায়েবূনা আ'বেদূনা লিরব্বেনা হা-মেদূন, সাদাক্বাল্লাহু ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহ্‌যাবা ওয়াহদাহু।

হৃদয়ের ব্যাধি ও অন্তরের বিশুদ্ধতার চিহ্ন এবং কতিপয় হৃদয়ব্যধি ও তার চিকিৎসা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এবং দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল (সাঃ) এর উপর। অতঃপর হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

তুমি কি জান, আমরা কত সময় ব্যয় করছি পোশাক, বাড়ি, গাড়ি প্রভৃতি অর্জনের উদ্দেশ্যে?

আমরা শারীরিক রোগের চিকিৎসায় ও সুস্বাস্থ্যের জন্য কত সম্পদ ব্যয় করছি, আমরা কি এ ব্যাপারে একটুও চিন্তা করেছি? আমরা রোগমুক্তির জন্য এমন কতিপয় পদ্ধতি গ্রহণ করব ও সাবধানতা অবলম্বন করব যাতে করে আমরা প্রকৃত ধারণাপ্রসূত রোগে আক্রান্ত না হই।

এবার আমরা আমাদের অন্তরকে জিজ্ঞেস করি।

আমরা কি জানি যে, সেখানে কিছু গোপন (ব্যাধি) রয়েছে যা অন্তরের মাঝে লুকায়িত থাকে? অনুভূতিশীল রোগের চেয়ে এই রোগটি মানুষের জীবনের জন্য (সবচেয়ে অধিক) ক্ষতিকর?

এ রোগটি আক্রান্ত ব্যক্তিকে তিলে তিলে হত্যা করে, কিন্তু সে তা বুঝতেই পারে না। এমনকি তার অন্তর এক কুৎসিত অন্তরে পরিণত হয়। তখন সে সত্যকে গ্রহণ ও মিথ্যাকে পরিহার করার শক্তি হারিয়ে ফেলে, আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

আমরা যখন এটা জানতে পারলাম, তাহলে আমরা শরয়ী পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব না, যা আমাদেরকে এ সমস্ত রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে পরিত্রাণ দিবে, আর এর কারণেই আমাদের দু' কলম লিখা। আমাদের স্মরণের জন্য ও প্রত্যেক ঐ ভাইদের জন্য (আমরা) যাদের মঙ্গল কামনা করি।

আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি আমাদের অন্তরকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করেন, আল্লাহ আমাদরে সহায় হোন। আমীন!

প্রথমতঃ অন্তরের ব্যধি সম্পর্কে কেন এই আলোচনা?

কতিপয় কারণে অন্তরের ব্যাধিসমূহ সম্পর্কে আলোচনার গুরুত্ব রাখে, যা নিম্নরূপঃ

১। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা অন্তরের পবিত্র পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করণের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি মুহাম্মদী ও রিসালাতের উদ্দেশ্য করেছেনঃ মানুষকে পবিত্রকরণ এবং উহাকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষার পূর্বে এনেছেন তার গুরুত্বের জন্যই। তিনিই নিরক্ষরদের তাঁর আয়াতসমূহে তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত, ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

২। বর্তমান যুগে মানুষের মাঝে অন্তরের ব্যধি অধিক হারে বিস্তারের জন্য। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হেফাযত করেন। হিংসা অপছন্দ ও মন্দ ধারণা, নিজেকে বড় মনে করা, অন্যকে তুচ্চ করা, উপহাস করা, ঠাট্টা ও অধিকার সম্পদকে ন্যায় ও অন্যায়ভাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নতুন নতুন ঝগড়া থেকে বেঁচে থাকতে পারেনি এবং একে অন্যকে পরিত্যাগ করেছে ও সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। দুনিয়া ও তার ভোগ বিলাসিতার দিকে লোভ রাখা এবং একেই সবচেয়ে বড় ধ্যান-ধারণার বস্তু মনে করা,

৩। মুসলমানদের জীবনে অন্তরের ব্যধির প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাওয়ার জন্য, মনের মাঝে নামাযকে বোঝা মনে করা এবং যখন নামাযরত হয় তখন ভীত সন্ত্রস্ত হয় না। গোপনে আল্লাহকে ভয় করতে দুর্বলতা, আল্লাহর রহমত লাভের আশায় ও তার শাস্তির ভয়ে ক্রন্দনে দু'চোখে অশ্রু ঝরে না। কুরআন তেলাওয়াতে অন্তর নরম হয় না ও শরীর শিউরে ওঠে না। কল্যাণ কাজে মনের আনন্দে দুর্বল, অন্যায় কাজে পেরেশান হওয়া থেকেও দুর্বল।

৪। অন্তরই হল মানুষের জীবনের দিক নির্দেশনা ও অংকিত পথ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা বাস্তবায়ন করে। কাজেই মন যখন রোগ থেকে, সন্দেহ-সংশয় থেকে পবিত্র হবে, মানুষ তার রবের আনুগত্য করে এবং যথার্থই তার ইবাদাত করে, তার চরিত্র সৌন্দর্যময় হয়। তার অবস্থান সুদৃঢ় হয়। সে নিজেই সৌভাগ্যবান হয় ও অপরকেও সৌভাগ্যবান করতে পারে।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, "অন্তর হল নেতা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো হল তার সৈন্যবাহিনী। নেতা যখন পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় তার সৈন্যবাহিনীও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর অন্তর যখন অপবিত্র হয়ে যায় তখন তার সৈন্যবাহিনী তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও অপবিত্র হয়ে যায়।"

৫। আল্লাহ তা'আলার কাছে আসল গ্রহণযোগ্যতার মানদন্ড প্রতিদান, অধিক আমলের দ্বারা নয় এবং ঐ আমলের দ্বারাও নয় যাতে অনেক কষ্ট করতে হয় বরং উত্তম প্রতিদান হল অন্তরের মাঝে মহান আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা অর্জন করা ও অন্তরকে প্রবৃত্তি ও দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হতে পৃথক করা।

এভাবে যখনই অন্তরে সবচেয়ে বেশী পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা ও একনিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে। মহান আল্লাহর দরবারে এবং জান্নাতে তার জন্য অত্যন্ত মর্যাদাম্পন্ন স্থান। **"সে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না কিন্তু সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে"** *(সূরা শু'আরা ২৬ঃ ৮৮-৮৯)*

নবী (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সৌন্দর্য ও দেহাকৃতির দিকে দেখবেন না কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তর ও কর্মের দিকে দেখবেন।"

দ্বিতীয়তঃ অন্তরে পরিশুদ্ধির নিদর্শনঃ

মুসলিম ভাই ও বোনেরা! যখন আপনি জানতে চাবেন আপনার অন্তর রোগ-ব্যাধি থেকে সুস্থ কি না? যেই সুস্থতা তাঁকে পৌঁছায় সৃষ্টির মূল রহস্যের দিকে।

তাহলে আসুন, আমরা লক্ষ্য করি বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত বড় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পরামর্শদাতা ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহ আলাইহির দেয়া নিদর্শনসমূহের দিকে।

আমাদের প্রত্যেকেই যেন তার অন্তরকে এগুলোর সামনে উপস্থাপন করে, যদি এ সমস্ত নিদর্শন তার মাঝে পাওয়া যায় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি ব্যতিক্রম হয় তাহলে সে যেন তার রোগে আক্রান্ত প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ার পূর্বেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। নচেৎ আক্রান্ত হওয়ার পর কোন ডাক্তার ও চিকিৎসা উপকারে আসবে না।

নিদর্শনসমূহ নিম্নরূপঃ

১। সর্বদা অন্তর তার সাথীকে আল্লাহর দরবারে তাওবা ও ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আঘাত করতে থাকবে।

২। আল্লাহর যিক্‌রে শিথিলতা প্রদর্শন করে না ও তাঁর ইবাদত থেকে অনীহা প্রকাশ করে না।

৩। আনুগত্য ও ইবাদতের কিয়দাংশ নস্ট হয়ে গেলে এমন আঘাত পায় যে তার সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলেও এমন আঘাত পায় না। (আল্লাহ ইবনুল কাইয়িম এর উপর রহম করুন)

৪। খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় থেকে সে ইবাদতে বেশী স্বাদ পায়। (বর্তমানে আমাদের কেউ কি ইবাদতে স্বাদ পায়? নাকি ইবাদত থেকে বের হয়ে গেলে স্বাদ পায়?)

৫। সে যখন নামায়ে দাঁড়ায় দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনা তার থেকে চলে যায়, আর আমরা নামাযের মাঝেই আমাদের সব কাজ একত্র করি। তাদের কাছে নামাযের স্বাদ কোথায়? কোথায় সেই নামায যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "নামাযে আমার চোখকে প্রশান্তি করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কতিপয় মুসলমানদের কথা এখন যেন তারা বলবে, ইমাম সাহেব, আপনি আমাদেরকে নামায থেকে অব্যাহতি দেন।"

৬। তার চিন্তা ধ্যান-ধারণা আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর সত্ত্বার ব্যাপারে, আর এটা সুউচ্চ স্থান।

৭। কৃপণ ব্যক্তি তার সম্পদের ব্যাপারে যেমন কার্পণ্য করে তার থেকে বেশি কার্পণা করে তার সময় বিনষ্ট হয়ে গেলে।

৮। সে আমলকে গুরুত্ব দেয়া থেকে আমলের বিশুদ্ধতাকে খুব বেশী গুরুত্ব দেয়।

তৃতীয়তঃ কতিপয় অন্তরের ব্যাধিঃ কিছু ব্যাধি রয়েছে যাতে অন্তর আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে আমরা কিছু উল্লেখ করব যাতে করে আমরা সেসব ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

আর যদি আমরা আক্রান্ত হয়ে থাকি তাহলে তার চিকিৎসা শুরু করব। রোগগুলো হচ্ছে।

১। কপটতাঃ এ ব্যধিই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর ও পরকালেও সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছনাকর এ কথা কেউ যেন না ভাবে, কপটতা বা নিফাকী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগ শেষ হওয়ার পর চলে গেছে এবং আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল ও তার সঙ্গী-সাথীদের বিশিষ্টতাও চলে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগের মুনাফিকীর অনিষ্টতা অতীতের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

আর এই নিফাক মৌখিক কাজ কর্মের দ্বারাই বুঝা যায়। যেমন নবী (সাঃ) এর গুণাগুণ উল্লেখ করেছেনঃ "যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, যদি তার কাছে আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত করবে, যদি ঝগড়া করে অশ্লীল ভাষা বলবে আর যদি অঙ্গীকার করে তা ভেঙ্গে ফেলবে, আর যদি ও'য়াদা করে তবে ওয়াদা ভঙ্গ করবে"-এসব কাজগুলো মানুষ যখনই বার বার করতে থাকে, তা থেকে তাওবা না করে এবং তার অন্তর দোদুল্যমান থাকে সন্দীহানের মাঝে ও প্রবৃত্তির অনুসরণের সাথে তার এ সমস্ত কাজগুলোই খাঁটি মুনাফিকের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ আমাদেরকে এ সমস্ত কাজ থেকে বাঁচান।

এ কারণে সালফে সালেহীনগণ নিফাককে খুব বেশী ভয় পেতেন, উমর বিন খাত্তাব (রা)-কে তার সমতুল্য ইখলাসের ও আমলের দিক থেকে? তিনিই হুযায়ফা (রা) কে জিজ্ঞেস করেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি আমাকে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন? তিনি বলেন, না এবং আমি তোমার পর আর কাউকেই প্রমাণপত্র দেব না।"

২। লোক দেখানোঃ এটাও খুব ক্ষতিকারক ব্যাধি। আর এটা তার গোপন থাকার কারণেই, আমলকে ধ্বংস করার ব্যাপারে এটা প্রধান হাতিয়ার, খুব কম মানুষই এ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

হাদীসে কুদসীতে এসেছে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি শির্ককারীর শির্ক থেকে অমুখাপেক্ষী, যে আমার সাথে অংশীদার স্থাপন করে কোন কাজ করল আমি তাকে এবং তার শির্ককে পরিহার করি।

আর এর উদাহরণ হচ্ছে আপনি দেখতে পাবেন, যে মানুষ অন্যান্য মানুষের সামনে খুব সুন্দরভাবে নামাজ পড়ে, আর কেউ যদি না থাকে তাহলে নামাযে অলসতা করে ও দ্রুত নামায আদায় করে এবং কখনও মানুষের কাছে দাতা হওয়ার জন্য দান করে। এভাবে রোযা করে, শিক্ষা অর্জন করে সৎকাজের আদেশ করে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করে ও অন্যান্য ফরজ কাজ করে যা বাহ্যিক দিক থেকে ভাল মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে রিয়া তথা লোক দেখানোতে পরিপূর্ণ, কম হোক বা বেশি হোক যা অন্তরের ব্যাধির উপর প্রমাণ বহন করে।

৩। হিংসা-বিদ্বেষঃ বর্তমানে খুব কম মানুষই তা থেকে বেঁচে থাকতে পারে, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়াহ (আল্লাহ তার উপর রহম করুন) বলেন, "হিংসা হচ্ছে অন্তরের ব্যাধি, খুব কম মানুষই তা থেকে বেঁচে থাকে। এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে বলেন, "যা কিছু আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে, অবশ্যই অমি ইবরাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য।" *(সূরা আন-নিসাঃ৫৪)*

হাদীসে এসেছে "তোমরা একে অপরের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবে না।"

কিন্তু আফসোস কতিপয় লোক অপরের সাথে হিংসা করে, আল্লাহ যাকে সম্পদ, স্বাস্থ্য, বংশ-মর্যদা, সন্তান ও অন্যান্য নি'য়ামত দিয়েছেন। এটা মারাত্মক ক্ষতিকারক। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা থেকে ভয় প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেন, তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা হিংসা সৎ আমলকে খেয়ে ফেলে, আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে।"

৪। অহঙ্কার ও নিজেকে ভাল মনে করাঃ অন্যকে তুচ্ছ জানা ও উপহাস করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হিদায়াতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহির পথ দেখলে তাই

গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে বে-খবর রয়ে গেছে। *(সূরা আ'রাফঃ১৪৬)*

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে আগত কোন দলিল ব্যতিরেকে, তাদের অন্তরে আছে কেবল আত্মম্ভরিতা, যা অর্জনে তারা সফল হবে না।

"অতএব আপনি আল্লাহর আশ্রয় প্রর্থনা করুন, নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন।" *(সূরা আল-মু'মিনঃ৫৩)*

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "হে মু'মিনগণ! কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে, কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা সে উপাহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না, কেই বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তাওবা না করে তারাই যালেম।" *(সূরা হুজরাতঃ১১)*

নবী (সাঃ) বলেছেনঃ "যার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" কিন্তু বর্তমানে একে অপরকে তাচ্ছিল্য করা অনেকাংশে বেড়ে গেছে। অহঙ্কার করা ও নিজেকে অন্যের উপর প্রাধান্য দেয়া, আর এটা এ কারণেই যে, আল্লাহ তাকে অনেক নি'য়ামত দিয়েছেন এবং সুউচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন অথবা বংশ মর্যাদা ও দুনিয়ায় চাকচিক্যের অন্যান্য উপাকরণাদি অর্জনের জন্য।

৫। প্রবৃত্তি ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভালবাসাঃ মুসিবতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুসিবত, আর দ্রুত প্রাণ হরণকারী বিষ।

মানুষের ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে ও দুনিয়াবী কোন স্বার্থে প্রবৃত্তি ও ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্য হবে নিঃসন্দেহে তার এ কাজগুলো ধ্বংস ও মন্দ অবস্থার দিকে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- "আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন।" *(সূরা জাসিয়াঃ২৩)*

নবী (সাঃ) বলেন- "তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণপর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমার নিয়ে আসা বস্তু তথা আল-কুরআনের অনুসরণ না করবে।"

তাই আসুন মুসলিম ভাই! আপনি কি আপনার অন্তরকে এ প্রশ্ন করতে পারেন না যে, আমার সম্পর্ক বন্ধুত্ব, উপঢৌকন গ্রহণ ও প্রদান আমার ভালবাসা ও শত্রুতা আল্লার জন্য নাকি অন্য কারো জন্য?

উত্তরঃ আমি এর উত্তর বের করব তোমার পাঠ্য-পুস্তক হতে যা তোমর জন্য প্রযোজ্য তোমার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে তোমার বাচনভঙ্গি ও কর্মসমূহের মাধ্যমে।

৬। অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়াঃ অন্তরের কাঠিন্যঃ বতৃমান যুগে এ ব্যাধি থেকে খুব কম সংখ্যক লোকই বেঁচে থাকতে পারে। যে ব্যক্তির মাঝে এ রোগের কারনসমূহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আল্লাহর যিকর বাদ দিয়ে অন্যান্য কথাবার্তা বলা, সব রকমের হারাম মাল ভক্ষণ করা, পরনিন্দা, চোগলখোরী, গান বাদ্য শ্রবণ, অশ্লীল ছবি প্রদর্শন ও অতিরিক্ত হাসা, পানাহার ও নিন্দা প্রভৃতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা মুমিন, তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত ওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরন কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।" *(সূরাহ হাদীদঃ১৬)*

এ ব্যাধির ক্ষতি ও ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর ইহকালে ও পরকালে যে খারাপ প্রতিক্রিয়া পড়ে, আল্লাহ তা'আলা আক্রান্ত ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন তার এ বাণীর মাধ্যমে "আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে (সে কি তার সমান যে এরূপ নয়) যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠোর তাদের জন্য দুর্ভোগ। তারা সুস্পস্ট গোমরাহীতে রয়েছে।" *(সূরা যুমারঃ২২)*

চতুর্থতঃ এ ব্যাধিগুলোর চিকিৎসাঃ আশা করি আপনারা পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ ব্যাধির ক্ষতিকারক দিকসমূহ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর আপনার মনকে জিজ্ঞেস করবেন। এ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার কি পদ্ধতি ও মাধ্যম রয়েছে?

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে এ ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিসমূহ প্রহণের মাধ্যমে।

১। রোগ সম্পর্কে স্বীকৃতি দেয়াঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা চিকিৎসা মাত্র। এর গুরুত্বের কারণেই চিকিৎসার প্রথম ধাপে আমরা এটাকে উল্লেখ করলাম। যে ব্যক্তি বুঝতে না পারবে যে, সে অন্তরের রোগী অথবা সে এই ব্যাধির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষতি উপলব্ধি করতে না পারে সে কিভাবে এর চিকিৎসা গ্রহন করতে পারে?

এমনকি যদি তার সামনে এর সহজ দিকও তুলে ধরা হয় তাহলেও সে তা অস্বীকার করবে।

২। ইসলামী জ্ঞান অর্জন করাঃ সুতরাং কুরআন হাদীস ইসলামী বই-পুস্তক ও বিভিন্ন জ্ঞানী লোকদের লিখিত বই সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং নির্ভরযোগ্য সালফে সালেহীনদের থেকে জ্ঞানার্জন করলে মানুষ এ সমস্ত ব্যাধিকে বুঝতে পারে, আর এটা থেকেই সে বিশুদ্ধ চিকিৎসার পথ আবলম্বন করতে পারে।

৩। হিসাব করা, তাওবা করা ও সচেতন থাকাঃ আত্মসমালোচনা, তাওবা ও ধ্যান করা প্রতিটি মুসলমান ছোট বড় যে কোন গুনাহের কাজই করুক না কেন, কিন্তু তার বিবেক তার পুনরাবৃত্তি করে না এবং সে যে কোন গুনাহেই পতিত হোক না কেন দ্রুত তাওবা করে বিশেষ করে অন্তরের গুনাহ থেকে, আর এ কাজ ঐ ব্যক্তির দ্বারাই হতে পারে যে ব্যক্তি তার অন্তর, কথাবার্তা ও কর্মসমূহকে কুরআন হাদীসের সামনে উপস্থাপন করে, সুতরাং যার কর্ম ও কথাবার্তাসমূহ এতদুভয়ের সাথে মিলে যাবে, তার অবস্থা আলহামদু লিল্লাহ ভাল। আর যদি বিপরীত হয় তখন সে তাওবা করে।

এ রকমভাবে কোন লোকের বার বার তাওবা করা তাকে মুসলমানের অবস্থায় সুদৃঢ় রাখতে যথেস্ট হবে না। বরং তাকে অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী হতে হবে এবং সর্বদা সচেতন থাকতে হবে, সে যেন ভবিষ্যতে তার অজ্ঞাতেও কোন গুনাহের কাজে পতিত না হয়।

৪। আল্লাহ তা'আলার প্রতি একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপনঃ আর এ রকম অন্তর ব্যাধি থেকে পরিত্রান পেতে শুধুমাত্র মানুষের প্রচেস্টা ও শরী'য়তসিদ্ধ পদ্ধতি প্রহণের মাধ্যমে সম্ভব নয় এবং এর সাথে সেই আল্লাহর প্রতি পূর্ণ একনিষ্ঠ বিশ্বাস রাখতে হবে যার হাতে অন্তরের ও সমগ্র বিশ্বের চাবি এবং এ ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভে আল্লাহর সহায়তা নির্ভর করে বান্দার সততা ও একনিষ্ঠতার উপরই।

৫। আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভয়-ভীতি প্রদর্শনঃ আর এটা এ কারণে যে, মুসলমানকে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্বের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে হবে এবং তাঁর এ ক্ষমতার উপরও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সে বড় গুনাহে রত থাকা অবস্থায়ই যে কোন মুহূর্তে পাকড়াও করতে পারেন। তখন তার কঠিন হিসাব হবে এবং কঠোর শাস্তি হবে। অথবা তার এ অনুভূতিও রাখতে হবে যে, আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হরণের মাধ্যমেও দিতে পারেন। অথবা তার ব্যবসা-বাণিজ্য বিনষ্টের মাধ্যমে অথবা সন্তান-সন্ততি ধ্বংসের মাধ্যমে অথবা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিভিন্ন প্রকারে শাস্তি দিতে পারেন যারা তাকে ভয় করে না এবং তার সম্মানের আশা করে না।

৬। বেশী বেশী সৎ কাজ করাঃ এ চিকিৎসার কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে মুসলমান সর্বদা সৎ কাজকে পাথেয় সংগ্রহের ব্যাপারে লোভ রাখবে।

উদাহরণ স্বরূপঃ

১। পিতা-মাতার প্রতি সৎ-ব্যবহার;

২। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে সময় মত জামা'আতের সহিত আদায় করা;

৩। কুরআন কারীমের তেলাওয়াত করা;

৪। সুন্নতে মুওয়াক্কাদাহ আদায় করা;

৫। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা;

৬। নফল রোযা রাখা;

৭। দ্বি-প্রহরের নামায আদায় করা;

৮। তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা;

৯। বিতরের নামায পড়া;

১০। দান করা (বিশেষ করে গোপনে দান করা);

৭। সর্বদা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রে রত থাকাঃ এ ব্যাধি এবং প্রত্যেক ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ ও মুক্তি লাভে আল্লাহ তা'আলার যিকরই একমাত্র সহায়ক। আর এ কারণেই মুসলমানদের জন্য শরী'য়তসিদ্ধ করে দেয়া হযেছে যে, সব সময় সর্বস্থানে তার জিহ্বা আল্লাহর স্মরণে রত থাকবে এবং প্রত্যেক আবস্থায়ও (কিন্তু কিছু কিছু দু'আ রয়েছে যা নিদিষ্ট করে দেয়া হয়েছে);

তার প্রকারগুলো নিম্নরূপঃ

- আবস্থার সাথে সম্পর্কিত দু'আ যেমন-বাড়িতে গমন ও বের হওয়ার দুআ, পানাহার, নিদ্রা ও প্রভৃতির দু'আ।
- সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দু'আ ও প্রত্যেক নামাযের পর পঠিতব্য দু'আ।

- গণনা সম্পর্কিত দু'আ যেমন-দশ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করা, একশত বার "আল্লাহু" পাঠ করা ও একশত বার"সুবহানাল্লাহ" পাঠ করা ইত্যাদি ।

- সাধারণ যিকর যেমন-সুবহানাল্লাহ আলহামদু-লিল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই) ।

৮। দু'আ করাঃ মু'মিনের প্রতিটি অবস্থায়ই এটা প্রধান হাতিয়ার এবং প্রত্যেক বিপদাপদ ও মুসিবত থেকে পরিত্রাণকারী। আর এ কারণেই আপনি কতিপয় মুসলমানদের পাবেন যে, তারা বর্সদা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও করুণা পেতে আগ্রহী এবং এ কামনাও করে যে তিনি সকল বিপদ ও মুসিবত থেকে পরিত্রাণ দিবেন ও সকল রোগ-ব্যাধি থেকে সুস্থ্যতা দান করবেন।

সুতরাং আমরাও আল্লাহ তা'আলার কাছে এ কামনাই করব। বিশেষ করে ঐ সময় ও অবস্থাগুলোতে যখন দু'আ কবুলের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

৯। পরকালের সাথে সম্পর্কে রাখা ও দুনিয়ার অস্থায়ীত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখাঃ প্রত্যেক মুসলমান যখন এ বিশ্বাস রাখে যে, এ দুনিয়া স্থায়ী আবাসস্থল নয়। তা একদিন না একদিন ধ্বংস হয়ে যাবেই এবং সে যতদিনই দুনিয়াতে বসবাস করুক না কেন তাকে একদিন মৃত্যু ও কবরের দিকে যেতেই হবে। এবং পরকাল ও জান্নাত-জাহান্নামই হল সর্বশেষ ঠিকানা। তার এ বিশ্বাসই রোগ-ব্যাধি নিরাময়ে প্রধান সহায়ক। আর যে দ্রুত এ আবস্থার দিকে ফিরে যায় সে দ্বিধাহীন ও রোগমুক্ত অবস্থায় মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে।

১০। প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণ থেকে দূরে থাকাঃ প্রবৃত্তি ও শয়তান কোন মুসলমানের মঙ্গল কামনা করে না যদিও এর বিপরীত ভাব প্রকাশ পায়। অতঃপর মানুষ যখন সত্যিকারভাবে জানতে পারে যে, এ দু'টোই অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহের কাজে লিপ্ত করার প্রধান কারণ। তখন সেগুলো পরিহারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সত্যের অনুসরণে ধৈর্য ধারণ করে এবং সৎ কাজ ও উত্তম পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক গুনাহ ও অন্যায় মূলক কাজ থেকে দূওে থাকে। কেননা এতে রয়েছে মৃত সঞ্জীবনী ও মুক্তি যদিও তা অন্তরের কাছে খুব কঠিন মনে হয়।

মুসলিমদের চূড়ান্ত লক্ষ্য

আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন ।আর তা হবেঃ

১/ শুধুমাত্র আল্লাহ্র দিকে সত্যনিষ্ঠভাবে নিজেদের সমর্পন করার মাধ্যমে ।

২/ তাঁর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্যিকার অনুসারী হওয়ার মাধ্যমে ।

আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "জান্নাতী লোকদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমরা আপনার দরবারে উপস্থিত আছি। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে, অতঃপর তিনি বলবেন, 'তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা উত্তর দেবে, 'হে আমাদের রব! আমরা কেন সন্তুষ্ট হবো না? অথচ আপনি আমাদের এমন জিনিষ দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টি জগতে অন্য কাউকে দান করেন নি।' তিনি বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এর থেকে উত্তম জিনিষ দান করবো না?' তারা বলবে, 'হে রব! এর চাইতে উত্তম আর কি হতে পারে?' অতঃপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলবেন, 'আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করবো, অতঃপর তোমাদের উপর আমি আর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না।'" [বুখারী, মুসলিম - ৬৮৭৮ (ইসঃফাউন্ডেশন)]

হে আমাদের রব! নিশ্চয় অন্য সবকিছুর চাইতে মূল্যবান ও উত্তম হচ্ছে তোমার সন্তুষ্টি। সমস্ত কিছুর উপরে আমরা তোমার সন্তুষ্টিকে স্থান দেই ।আর তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমরা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পদাংক অনুসরণ করি। যিনি (সাঃ) তাঁর দোয়ায় জান্নাত চাওয়ার আগে তোমার সন্তুষ্টি চাইতেন। তিনি (সাঃ) বলতেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার সন্তুষ্টি চাই এবং জান্নাত চাই।"

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদের কাছে সবচাইতে সম্মানিত এবং সবচাইতে বড়। যে কোন লক্ষ্য অর্জন করার চাইতে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা আমাদের কাছে বেশী মূল্যবান।

"আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হচ্ছে সবচেয়ে বড় (নে'য়ামত), এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।" [৯:৭২]

তিনি আল্লাহ্ যিনি মহামহিমান্বিত। তিনিই প্রথম(আল-আউয়াল), তাঁর পূর্বে কিছুই ছিলনা, তিনিই শেষ(আল-আখির) তাঁর পর আর কিছুই নেই, তিনিই সর্বোচ্চ(আল-আ'লা) তাঁর উপরে কেউ নেই ; তিনিই নিকটতম (আল-ক্বরীব) তাঁর চেয়ে নিকটে আর কেউ নেই, তিনিই সর্বশক্তিমান(আল-ক্বাদির), সর্বজ্ঞানী(আল-আলীম), সবচেয়ে বিচক্ষণ (আল-ওয়াসি), তিনি সব জানেন (আল-খাবির), সব শুনেন (আস–সামি'), সর্বদ্রষ্টা (আল–বাছির) সমস্ত শক্তির মালিক (আল–কুউয়ী) তিনি সমস্ত কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান(আ'লা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদির) ; সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী ; সকল কাজই আল্লাহ্র কাছে সহজ ; তাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই ; তিনি অভাবহীন ; অমুখাপেক্ষী।

"কোন কিছুই তাঁর সাদৃশ্য নয়; তিনি অভাবহীন, অমুখাপেক্ষী।" [৪২:১১]

তিনিই তো সকল কিছুর স্রষ্টা - তিনিই প্রয়োজনের সময় রিজিক দেন। তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যুও দেন তিনিই। তিনিই কবর থেকে জাগাবেন মৃতদের। কেয়ামতের দিন সবার প্রত্যাবর্তন হবে তাঁরই দিকে। সেই তিনি তাঁর রহমতের দ্বারা ক্ষমা করবেন যাকে খুশী ; আর যাকে খুশী শাস্তি দেবেন তাঁর ন্যায়বিচার দ্বারা।

"তিনিই আল্লাহ্! তোমাদের রব, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় যাচ্ছ।" [৩৯:৬]

সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ছাড়া,

"ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবকিছুই ধ্বংসশীল (নশ্বর), অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের সত্ত্বা, যিনি মহিমাময় , মহানুভব।" [৫৫:২৬-২৭]

এই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিই কি আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য নয়? যা অর্জনের জন্য আমরা সংগ্রাম করি আর জাহিলিয়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি; যাতে আমরা আশ্রয় ও প্রশান্তি লাভ করতে পারি।

"তোমরা আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও, আমি (মুহাম্মদ(সাঃ)) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত সুস্পষ্ট সতর্ককারী।" (৫১:৫০)

আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছেন যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই আমাদের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়, আয়শা (রাঃ) বলেন, "আমি একরাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে না পেয়ে (অন্ধকারে) হাতড়াতে লাগলাম। হঠাৎ আমার হাতখানি তাঁর

পায়ের তালুতে গিয়ে ঠেকলো, তিনি সিজদারত ছিলেন, তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে এবং তোমার আযাব থেকে তোমার ক্ষমার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে সক্ষম নই। তুমি তেমনি যেমন তুমি নিজে তোমার প্রশংসা করেছ।" [মুসলিম(৯৭২-ইস.ফাউ)]

"আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন" এটা এমনই এক লক্ষ্য যার সামনে অন্য সকল লক্ষ্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

"আল্লাহ্ই সর্বোত্তম (পুরস্কার হিসেবে তোমাদের পুরস্কারের তুলনায়) এবং স্থায়ী (শাস্তি হিসেবে তোমাদের শাস্তির তুলনায়)।" (২০:৭৩)

যে এই সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলো, সে যেন সবকিছুই পেয়ে গেল; আর যে এটা হারালো বা পথভ্রষ্ট হলো, সে যেন সবকিছুই হারালো। সে ঐ ব্যক্তির মত যাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দিয়েছেন,

"---এবং তার কর্ণ ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতপর আল্লাহ্র পর কে তাকে হেদায়েত দেবে?" (৪৫:২৩)

যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই তাঁর সন্তুষ্টি চায়, তিনি তাকে এর বুঝ দেন এবং হেদায়াত দেন, এটা তাঁর অশেষ রহমতের একটি।

"আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখি হয়, তিনি তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন।" (৪২:১৩)

মহামহীম আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কখনো তাকে ফিরিয়ে দেন না যে তাঁর পথের সন্ধান করে বরং তিনি তাকে সাহায্য করেন এবং পথ দেখান।

"যারা আমার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো; আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন।" (২৯:৬৯)

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন, আমি আমার বান্দার কাছে তার ধারণা অনুযায়ী। যখন সে আমার যিকর করে তখন আমিও তার সঙ্গে থাকি। বান্দা আমাকে একাকী স্মরণ করলে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। আর যদি সে কোন মজলিসে আমার স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে তার চাইতে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে হেটে আসে আমি তার দিকে দ্রুত আসি।" (বুখারী,মুসলিম-৬৫৬১,ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

এরপরও কি আমাদের লক্ষ্য অন্য কিছু হতে পারে?

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এরশাদ করেন,

"ও আমার বান্দারা! আমি আমার নিজের উপর যুলুমকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম ঘোষণা করেছি। কাজেই তোমরা একে অপরের উপরে যুলুম করো না।

ও আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ছিলে পথহারা, আমি যাকে সুপথ দেখিয়েছি সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছে হিদায়াত চাইলে আমি তোমাদের হিদায়াত দান করবো।

ও আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ছিলে ক্ষুধার্ত, আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছে আহার্য চাও আমি তোমাদের আহার করাবো।

ও আমার বান্দারা! তোমরা সবাই বস্ত্রহীন উলঙ্গ, আমি যাকে পরিধান করাই সে ব্যতিত। তোমরা আমার কাছে পরিধেয় চাও আমি তোমাদের পরিধান করাবো।

ও আমার বান্দারা! তোমরা রাত দিন গুনাহ করে থাকো, আর আমিই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে মাগফিরাত কামনা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব।

ও আমার বান্দারা! তোমরা আমার অনিষ্ট করতে পারবে না যদিও অনিষ্ট করতে চাও এবং তোমরা আমার উপকারও করতে পারবেনা যদিও উপকার করতে চাও।

ও আমার বান্দারা! তোমাদের আদি, তোমাদের অন্ত আমার জানা আছে। মানুষ ও জ্বীন জাতির মধ্যে যার অন্তর আমাকে সবথেকে বেশী ভয় পায়, তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও তাতে আমার রাজত্ব একটুও বৃদ্ধি পাবে না।

ও আমার বান্দারা! তোমাদের আদি, তোমাদের অন্ত আমার জানা আছে।মানুষ ও জ্বীন জাতির মধ্যে যার অন্তর সবথেকে বেশী পাপিষ্ঠ তোমরা যদি সকলে তার মতো হয়ে যাও তাতে আমার রাজত্ব এতুটুকু হ্রাস পাবে না ।

ও আমার বান্দারা! তোমাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষ ও জ্বীন যদি কোন বিস্তির্ণ মাঠে দাড়িয়ে সবাই আমার কাছে চাও এবং আমি সবার চাহিদা পূরণ করি তাহলে আমার যা আছে তা এতোটুকুও কমবে না যেমন কেউ সমুদ্রে একটি সূঁচ ডুবিয়ে উঠালে যতটুকু কমতি হয় ।

ও আমার বান্দারা! আমি তোমাদের আমলকে সংরক্ষিত করে রাখবো । এরপর হাশরের ময়দানে পুরোপুরি ভাবে তার বিনিময় দিবো । সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণ লাভ করতে চায় সে যেন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে । আর যে তা ব্যতিত অন্য কিছু চায় সে যেন নিজেরই দোষারোপ করে ।" (মুসলিম-৬৩৩৮, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেছেন, তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধুদের সাহায্য করেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেনঃ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের রক্ষা করেন ।" (২২:৩৮)

তারপরও কি আমরা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করবো না?
হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আরো বলেন, "যে আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দেই------ ।" (বুখারী, মুসলিম)

আমাদের কি ইচ্ছা করে না তাদের মত হতে যাদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ভালোবাসেন; যেমনটি তিনি বলেছেন ঐ একই হাদিসে, "আমার বান্দারা আমার আরোপিত ফরজ কাজের মাধ্যমে , যা আমার নিকট অতি প্রিয় , আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে । আর নফল কাজের মাধ্যমে সে সর্বদা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে যে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি । আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি আমি হয়ে যাই তার কান যা দিয়ে সে শুনে, আমি হয়ে যাই তার চোখ যা দিয়ে সে দেখে, আমি হয়ে যাই তার হাত যা দিয়ে সে ধরে আর হয়ে যাই তার পা যা দিয়ে সে চলাফেরা করে । যদি সে আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে দেই এবং আমার নিকট আশ্রয় চায় আমি আশ্রয় দেই ।" (বুখারী, মুসলিম)

আমরা তো চাই তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে আর আমরা আশা করি কেয়ামতের দিন তিনি আমাদের জান্নাতে দাখিল করাবেন তাঁর নেককার বান্দাদের সাথে,

"হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না । যারা আমার আয়াত সমূহে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পন করেছিল । তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মীরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর ; অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয় তা সেখানে রয়েছে, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই জান্নাত, যার অধিকারী তোমাদেরকে করা হয়েছে তোমাদেরই কর্মের ফল সরূপ, সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল তোমরা তা থেকে আহার করবে ।" (৪৩:৬৮-৭৩)

তাহলে বলুন, আমাদের এই লক্ষ্যই কি সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য নয়?

"বলুন অন্ধ আর চক্ষুস্মান কি সমান? অথবা অন্ধকার আর আলো কি এক?" (১৩:১৬)

"যে ব্যক্তি ঝুকে মুখে ভর দিয়ে চলে সেই কি ঠিক পথে চলে, নাকি সেই ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে?" (৬৭:২২)

এই মূল লক্ষ্যের আলোকেই নির্ধারিত হয় একটি মুসলমানের চলার পথ, তার সংগ্রাম, তার পদক্ষেপ আর তার অবস্থান । সে চলাফেরা করে জমীনের ওপর কিন্তু তার অন্তর বাঁধা থাকে আসমানের দিকে । কখনো সে থামে আর কখনো বা চলে, কখনো দ্রুত আর কখনো ধীরে, কখনো সে সোচ্চার হয় আবার কখনো সে সংযত রাখে নিজেকে । এসব কিছুর মধ্য দিয়েই সে এগিয়ে চলে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে ।

যে মুসলিমের মন এই লক্ষ্যের দিকে বাঁধা থাকে সে কখনো তার রবের অবাধ্য হয় না । সামান্যতম সময়ও সে নষ্ট হতে দেয় না । তার জীবনের সময়গুলো যাতে অপ্রয়োজনীয় (যা তার রবকে সন্তুষ্ট করে না) কাজে নষ্ট না হয় এ ব্যপারে সে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে ।

এই চূড়ান্ত লক্ষ্যের আর একটি সুবিধা হলো– এটি অর্জনের পদ্ধতিগুলোও এই লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । কোন মুসলিম তার খেয়ালখুশী মত এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না । বরং এই লক্ষ্যই তাকে বলে দেয় কোন পথে এগুতে হবে । এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে দুটি বিষয় নিশ্চিত করতে হয় –

- প্রতিটি কাজ শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য (ইখলাছ)।
- প্রতিটি কাজ হতে হবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শিক্ষা মোতাবেক।

প্রথম যুগের মুসলিমরা এই লক্ষ্য অর্জনকেই তাদের জীবনের মূল কাজ হিসেবে নিয়েছিল। আর এ কারণেই তাঁরা ছুড়ে ফেলতে পেরেছিল এই দুনিয়ার লোভ-লালসাকে; কোন বাধাই তাদের ঠেকাতে পারেনি এইপথ থেকে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র সকল আদেশ মেনে চলা আর এভাবেই তাঁরা পরিণত হয়েছিল মুত্তাকী বান্দাতে , হয়েছিল অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী আর সবচেয়ে নীতিবান। তাদের রব তাদের উপর খুশী। তারা সেই হিদায়াত প্রাপ্ত ও সাহায্য প্রাপ্ত দল, যারা ছিলেন সবচেয়ে সেরা মানুষ।

আর আজকের যুগের মুসলমানেরা তাদের লক্ষ্যকে ভুলে গেছে। কেউ আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে পিছনে ছুড়ে ফেলে ছুটছে দুনিয়ার পিছনে। আবার কেউ ভাবছে কিভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের সাথে সাথে অন্য লক্ষ্যের পিছনেও ছোটা যায়; অর্থাৎ

"একজন দাস যার রয়েছে কয়েকজন পরস্পর বিরোধী অংশীদার।" (৩৯:২৯)

কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন; তাঁর কোন শরীক নাই। তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা হলে আল্লাহ্ তা গহণ করবেন না।

এ কারণেই আজকের মুসলিম সমাজ সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও নগন্য ও গুরুত্বহীন, সমুদ্রের ফেনার মত। তারা আজ ডুবে আছে অসংখ্য গুনাহর মাঝে। তারা এখন বিভক্ত তাদের মত ও পথ নিয়ে। মুসলিম জাতির অবস্থা আজ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সেই উক্তির মত, 'একটি ভোজের থালা; যাতে কুফ্ফাররা একে অন্যকে আহবান করবে।

অবস্থা খুবই গুরুতর! মূল লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে এই জাতি শুধু পৃথিবীর বুকেই অপমানিত হচ্ছেনা, আরো অপমানিত হবে কেয়ামতের ময়দানে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যকে ত্যাগ করার অপর নাম হলো আল্লাহ্র ক্রোধের শিকার হওয়া। মানুষ এই বিভ্রান্তিতে যতই থাকুক-সবকিছুর মানে ঐ একটিই- আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার ক্রোধ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র এমন সব আকর্ষনীয় যে নামে তারা তাদের লক্ষ্যকে ডাকতে চায় ডাকুক এগুলো মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

"সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর গোমরাহী ছাড়া আর কি থাকে?" (১০:৩২)

"এরাই হলো সেই সকল লোক যারা হিদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী এবং ক্ষমার পরিবর্তে আযাব ক্রয় করেছে। হায়! কতইনা ধৈর্যশীল তারা আগুনের উপর" (২:৭৫)

"কতইনা নিকৃষ্ট তা যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রি করেছে, যদি তারা জানত!" (২:১০২)

তাই আমরা আমাদের জাতিকে বলতে চাই ফিরে আসো সত্যের দিকে।

"তোমরা তোমাদের রবের ডাকে সাড়া দাও।" (৪২:৪৭)

ফিরে আসো আল্লাহ্র সন্তুষ্টির দিকে। তোমাদের ইখলাসকে বিশুদ্ধ কর এবং তোমাদের সংগ্রামকে করো বিরতিহীন।

"হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীর [মুহাম্মদ (সাঃ)] ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনো, আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন।" (৪৬:৩১)

আর জেনে রাখো এই মহান লক্ষ্যে পৌছানো খুবই সহজ যাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সাহায্য করেছেন, আর এই পথ খুবই সুস্পষ্ট তার জন্য যাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা রহম করেছেন হিদায়াত দ্বারা।

"আল্লাহ্ যাকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয় তিনি তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন।" (৪২:১৩)

যারা এই পথে চলতে চায় তাদের প্রয়োজন শুধুমাত্র দুইটি জিনিসঃ

- আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার প্রতি একনিষ্ঠতা (ইখলাস) তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে; এবং
- রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাহ অনুসরণ।

ইখলাস(একনিষ্ঠতা)

ছোট বা বড় কোন আমলই আল্লাহ্র (সুবঃ) নিকট গ্রহনযোগ্য হয় না; যদি তা শুধুমাত্র আল্লাহ্র (সুবঃ) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা না হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেনঃ আমি মুশরিকদের শিরক থেকে অভাবমুক্ত। যে ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করল, তারপর অন্য কাউকে তাতে শরীক করল, আমি তা থেকে দায়িত্বমুক্ত। তা কেবল তারই জন্য যাকে সে আমার সাথে শরীক স্থাপন করেছে। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

একজন মুসলিমের সকল কাজই হবে আল্লাহ্র (সুবঃ) সন্তুষ্টির জন্য। তার কথা, তার কাজ, তার চিন্তা-চেতনা, নিদ্রা-জাগরণ, ভালোবাসা বা ঘৃণা, লেনদেন, ইবাদত, মোটকথা তার জীবন ধারনাই হবে আল্লাহ্কে (সুবঃ) খুশী করার উদ্দেশ্যে।

"বলুনঃ {হে মুহাম্মাদ(সাঃ)} নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও মরণ সব কিছু সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্য। তার কোন শরীক নাই।" (৬:১৬২,১৬৩)

বান্দা তার সকল কাজে একনিষ্ঠ হবে সেই আল্লাহ্র (সুবঃ) জন্যঃ

"বলুনঃ {হে মুহাম্মাদ(সাঃ)} আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্র ইবাদত করতে তাঁরই উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে এবং আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি সকল মুসলিমদের মধ্যে প্রথম মুসলিম হই।" (৩৯:১১,১২)

ইখলাস হলো, সকল কিছুর নিয়তকে পরিশুদ্ধ করা। শুধুমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে, ইবাদতের জন্য শুধুমাত্র তাকেই মনোনীত করা, অন্তরকে সৃষ্টির দিক থেকে সরিয়ে আল্লাহ্র দিকে ফেরানো এবং সকল কাজকে তাঁরই উদ্দেশ্যে ক্রটিমুক্ত রাখা।

আল্লাহ্ (সুবঃ) সম্পর্কে যার পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে, যে জানে আল্লাহ্ সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর মহিমা, তাঁর ক্ষমতা, তাঁর জ্ঞান, তাঁর রহমত, তাঁর আশ্রয়, তাঁর কোমলতা, তাঁর দয়া, তাঁর ভালোবাসা এবং বিশ্বাস করে যে তিনিই আল্লাহ্।

"তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গুপ্ত এবং সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত।" (৫৭:৩)

সে শুধু তাঁর রবের ব্যাপারেই জানে না, সে জানে তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কেও। এ সকল সৃষ্টি- **"কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদি এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্রিত হয়, আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তাও তারা উদ্ধার করতে পারবে না।"** (২২:৭৩)

এবং তারা, **"কোন উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। আর তাদের কোন ক্ষমতা নেই মৃত্যুর উপরে আর না জীবনের উপরে আর না পুনরায় জীবিত করে উঠানোর উপরে।"** (২৫:৩)

আর তারা, **"মালিক নয় একটি খেজুরের আটির বাঁকলেরও (ক্বিতমির)।"** (৩৫:১৩)

এমন পরিপূর্ণ জ্ঞান যাদের রয়েছে তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতে পারে না। তাদের দ্বারা কি সম্ভব ইখলাছকে বিসর্জন দেয়া? কক্ষনো নয়।

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "সমস্ত কাজের ফলাফল (বিনিময়) নিয়্যত অনুযায়ী হবে। প্রত্যেকেই যে নিয়্যতে কাজ করবে সে তাই পাবে। কাজেই যার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সন্তুষ্টির) জন্য হয়েছে (বলে পরিগনিত হবে)। আর যে ব্যক্তি কোন পার্থিব স্বার্থ হাসিলের অভিপ্রায়ে বা কোন নারীকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তার হিজরত উক্ত উদ্দেশ্যে হয়েছে (বলে পরিগনিত হবে)।" (বুখারী, মুসলিম)

নিশ্চয়ই সে অনর্থক বিনষ্ট হয়েছে, যা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করা হয় নি। একারনেই দুনিয়ার সর্বোত্তম কাজগুলো করার পরও অনেকে আখেরাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ 'কিয়ামতের দিবসে সর্বপ্রথম একজন শাহীদের বিচার হবে। তাকে দরবারে হাযির করে তার প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের কথা প্রকাশ করা হবে এবং সে ঐ নিয়ামতের কথা স্বীকারও করবে। তিনি (আল্লাহ্) তাকে বলবেন, 'তুমি তা কি কাজে লাগিয়েছ? সে বলবে আমি আপনার পথে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেছি।তিনি বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি 'বীর' খ্যাতি অর্জন করার জন্য লড়াই করেছো এবং সে সুনাম দুনিয়াতেই কুড়িয়েছ। অতঃপর তাকে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে। সে মতে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর একজন আলেমকে হাজির করা হবে, সে ইলম অর্জন করেছে, শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন শিক্ষা করেছে। তাকে আল্লাহ্র নিয়ামতের কথা বলা হবে আর সে তা স্বীকার করবে। তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, তুমি তা কি কাজে লাগিয়েছ? সে বলবে আমি ইলম অর্জন করেছি, ইলম শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন শিক্ষা করেছি। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। বরং তুমি 'আলিম' খ্যাতি অর্জনের জন্য ইলম অর্জন

করেছ। ক্বারী হিসেবে খ্যাতি অর্জনের জন্যই ইলম অর্জন করেছ। আর তা তো বলা হয়েছে, তারপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । এরপর হাযির করা হবে এক দানশীল ব্যক্তিকে যাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রাচুর্য দান করেছেন, তাকে নিয়ামতের কথা বলা হবে। আর সে তা স্বীকার করবে। তিনি বলবেন, তুমি এসব কি কাজে লাগিয়েছ? সে বলবে, তুমি যেসব পথে সম্পদ ব্যয় পছন্দ করো, তার কোনটিতে সম্পদ ব্যয় করাকে আমি ত্যাগ করিনি। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি 'দানশীল' খ্যাতি অর্জনের জন্য তা করেছো, আর তা বলাতো হয়েছে। তারপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'(মুসলিম, তিরমিযী, আন-নাসাঈ)

ইখলাছের অভাবে কিভাবে সর্বোত্তম আমলগুলোও ক্ষতির কারন হয়ে দাড়াবে তার প্রমাণ এই হাদীস।
ইখলাসের বিপরীত বস্তুটি হলো 'আর-রিয়া' বা লোক দেখানো আমল। মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে বা প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন আমল করলে তাকে রিয়া বলে। রিয়া নিতে পারে চুড়ান্ত রূপ, যেমনটি দেখা যায় মুনাফিকদের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেছেন, **"আর যখন তারা সালাতে দাড়ায় তখন নিতান্ত অলসতার সাথে দাড়ায় লোক দেখানোর জন্য।"(৪:১৪২)**

এটাই ছিল মুনাফিকদের একমাত্র ও চুড়ান্ত লক্ষ্য। এটা ছাড়া অনেকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আমল করে এবং পাশাপাশি অন্য উদ্দেশ্যও তাদের অন্তরে বিরাজ করে। আবার অনেক সময় ইখলাছের সাথে আমল সম্পন্ন করার পরে অন্তরে রিয়া প্রবেশ করে।

তাই মুসলিমের প্রতি রয়েছে, সে যেন সার্বক্ষনিক তার নাফসের সাথে সংগ্রাম করে। প্রতিটি কাজে নিয়্যতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে এবং রিয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। আমাদেরকে একই সাথে ভালো আমলও করতে হবে আবার ইখলাছ-কেও সংরক্ষণ করতে হবে;,

" সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ লাভের আশা করে সে যেন নেক কাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"(১৮:১১০)

ইখলাছ নাফসকে ক্ষতিকর লালসা থেকে রক্ষা , আর আল্লাহ্ যা চেয়েছেন তার দিকে নাফসকে ধাবিত করে।

 # মহানবী (সাঃ) এর সুন্নাহর সঠিক অনুসরণঃ

একথা আগেও বলা হয়েছে যে, একনিষ্ঠতা হলো কোন কাজ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দুইটি শর্তের মাঝে একটি। দ্বিতীয় শর্তটি হলো- সব কাজে মহানবী (সাঃ)-এর দেয়া উদাহরণ মেনে চলা। ইবনে আল-কাইয়্যিম আল-জাওজিয়াহ বলেছেন, যাদের কথা এবং কাজে একনিষ্ঠতা আছে এবং যারা নবী (সাঃ)-এর দেখানো পথ অনুসরণ করে-তারাই হল সেই সব মানুষ যারা বলতে পারে ঃ **'আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি।'(১:৫)** তাদের সমস্ত কথা ও কাজ, দান করা অথবা বিরত থাকা, ভালোবাসা, ঘৃনা করা, প্রকাশ্য ও গোপন সব কর্মকান্ড- এর সবই একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার জন্যই নিবেদিত। তারা মানুষের কাছ থেকে কোন পুরস্কার বা ধন্যবাদ চায় না, সমাজের উচু মর্যাদার জন্যেও তারা আশা করে না। তারা তাদের কাজের প্রশংসাও শুনতে চায় না, আবার তিরস্কারের পরোয়াও করে না- কারন তারা ভালোভাবেই জানে, মানুষ হলো কবরে শায়িত ব্যক্তির মতো যার কারো ভালো করার ক্ষমতা নেই, কারও ক্ষতি করারও ক্ষমতা নেই, জীবন-মৃত্যুর উপরও তার কোন হাত নেই, মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতাও তাদের নেই।'

যারা তাদের রবের ব্যপারে জানেনা এবং মানবজাতির পরিস্থিতি এবং তাদের স্বভাবের কথা জানে না- একমাত্র এইসব অজ্ঞরাই মানুষকে খুশী করার জন্য, তাদের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য এবং সমাজে উচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতার জন্য লালায়িত থাকে। অন্যদিকে যারা মানুষের স্বভাব জানে এবং আল্লাহ্‌কেও চিনে- তারা সব সময় চেষ্টা করে নিজেদের আল্লাহ্র দিকে সঁপে দিতে এবং সব সময় তারা শুধু চায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, সমাজের সব স্বার্থান্বেষী মানুষের প্রতিক্রিয়াকে তারা কোন আমলই দেয় না। তাদের কাজের মাঝে থাকে আল্লাহ্র হুকুম এবং তাঁর খুশী-অখুশীর প্রতিফলন। এবং এ ধরনের আমলই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য। মহামহীম আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,ঃ

" মহান সেই পূণ্যময় সত্ত্বা ! যাঁর হাতে রয়েছে আসমান -যমীনের সার্বভৌমত্ব এবং সবকিছুর যিনি ক্ষমতাবান, যিনি জন্ম ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তিনি যাচাই করে নিতে পারেন যে, আমলের দিকে তোমাদের মাঝে কে সবচেয়ে ভালো।"(৬৭:২)

তিনি আরও বলেন,ঃ

"যা কিছু এই জমিনের বুকে আছে যাকে আমি এর জন্য শোভনবর্ধনকারী হিসেবে বানিয়েছি যাতে করে আমি মানুষকে পরীক্ষা করতে পারি যে, তাদের মধ্যে কাজ কর্মের দিক থেকে কে বেশী উত্তম।"(১৮:৭)

আল-ফুদাইল বিন আইয়াদ বলেছেন,' উত্তম কাজ হলো সেটা যা হলো সবচেয়ে একনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে সঠিক । ' তার পর তাকে প্রশ্ন করা হলো, ' হে আবুল হাসান, এটা কিভাবে হল ? তখন তিনি উত্তর দিলেন, ' যে কাজ একনিষ্ঠ অথচ সঠিক নয়, তা গ্রহন করা হবে না । একইভাবে যে কাজ সঠিক অথচ একনিষ্ঠ নয়, তাও গ্রহণ করা হবে না- যতক্ষণ না এটি একই সাথে একনিষ্ঠ এবং সঠিক না হচ্ছে ।" একনিষ্ঠ কাজ হলো তাই যা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করা হয়; আর সঠিক কাজ হলো তাই যা মহানবী (সাঃ)-এর সুন্নাহ মোতাবেক করা হয় । যেমন আল্লাহ্‌ সুবহানা ওয়া তা'য়ালা বলেন,

" সুতরাং তোমাদের মাঝে কেউ যদি তার মালিকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন(সবসময়) নেক আমল করে,এবং তার মালিকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে ।"(১৮:১১০)

তিনি আরও বলেন,

" তার চেয়ে উত্তম দ্বীন আর কার হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র নির্দেশের সামনে মাথানত করে দেয় এবং ভালো কাজ করে ।"(৪:১২৫)

কোন কাজ যদি এই সব পূর্বশর্ত পূরণ না করতে পারে, তাহলে তা অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে, যদিও এটা গ্রহনযোগ্য হওয়া ছিলো খুবই জরুরী । আয়শা (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, নবী (সাঃ) বলেছেন," যে কাজ আমার শেখানো পথের সাথে মিলে না, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান যোগ্য ।"(বুখারী, মুসলিম)

এবং মহানবীর (সাঃ) উদাহরণ অনুসরণ না করে যে কাজ করা হয়, তা কেবলমাত্র বান্দা এবং তার মালিকের মাঝে দূরত্বই বাড়িয়ে দেয়, কারণ আল্লাহ্‌ তা'য়ালার ইবাদত শুধু সেই ভাবেই সম্ভব যেভাবে তিনি আদেশ করেছেন, এবং অবশ্যই কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মতামত অনুযায়ী নয় ।

মহানবী (সাঃ) এর সঠিক অনুসরণ হলো বান্দাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র প্রতি তার ভালোবাসার প্রমান, এবং যার মাধ্যমে সে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পেতে পারে,

"বল [হে মুহাম্মদ (সাঃ)] যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ্‌কে ভালোবাস,তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ্‌ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে ।"(৩:৩১)

মহানবীর (সাঃ) এর সঠিক অনুসরণ শুধুমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন একজন মুসলিম সেই সমস্ত নতুন আবিস্কৃত জিনিস এবং প্রথা ত্যাগ করবে, যা মানুষরা এই দ্বীনের সাথে সংযোজন করেছে (বিদ'য়াত) । একজন মুসলমানকে অবশ্যই তার বিশ্বাসে ও কাজে, তার আল্লাহ্‌ভিরুতায় ও আচরণে, তার ফয়সালায় ও সিদ্ধান্তে, তার সংঘাতে ও শান্তিতে, তার দৈনন্দিন জীবনে ও সাধনায়, তার কথায় ও তার মৌনতায়, তার স্মরণে ও তার চিন্তায়, তার ঘুমন্ত ও তার জাগ্রত অবস্থায়- সবক্ষেত্রেই নবী (সাঃ) এর শিক্ষাকে আকড়ে ধরতে হবে । আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

"তোমাদের জন্য অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূলের মাঝে অনুকরণযোগ্য উত্তম আদর্শ রয়েছে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের উপর বিশ্বাসী এবং সর্বপরি যে আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ করে ।"(৩৩:২১)

"আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহন করো এবং যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক ।"(৫৯:৭)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, কখনো তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না যখন তোমরা তাঁর কথা শোন ।"(৮:২০)

কোরআনে মোট চল্লিশটি স্থানে রাসূলের প্রতি আনুগত্য করাকে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য করার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে । মানুষের জন্য সমস্ত পথই বন্ধ হয়ে গেছে, শুধু সেই সব মুসলমান ছাড়া যারা নবীর (সাঃ) দেখানো পথে চলে । এদের জন্য পথ উম্মুক্ত ।

নবী (সাঃ)-এর অনুসরনের পরিপন্থী কাজ অনেক ধরনের হতে পারে । এর কয়েকটি এখানে বলা হচ্ছেঃ

১) নতুন মতবাদ বা তন্ত্র গ্রহণ করা এবং এর মাধ্যমে ইসলামকে নিজের মনমত পরিবর্তন করার চেষ্টা ।

২) মানুষের মতামতকে সত্যের মাপকাঠি এর শরীয়াহ যাচাই করার একটি শর্ত মনে করা এবং শরীয়াহ বাদ দিয়ে তাদের মতামতকেই প্রাধান্য দেয়া ।

৩) ব্যক্তিগত কথা বা কাজকে কুরআন ও সুন্নাহর আগে প্রাধান্য দেয়া ।

" হে ঈমানদার গণ ! আল্লাহ্‌ ও রাসূলের সামনে কখনো অগ্রণী হয়ো না ।"

" হে ঈমানদার গণ ! কখনো নিজেদের কণ্ঠের আওয়াজ নবীর চেয়ে উচু করো না ।"(৪৯:১-২)

৪) শরীয়াহর কিছু ক্ষেত্রে নবীর (সাঃ) উদাহরণ মেনে চলা এবং অন্য ক্ষেত্রে অবজ্ঞা করা। এর উদাহরণ হলো- সালাত এবং সাওমের ব্যপারে নবীর (সাঃ) উদাহরণ মানা, অথচ বিচার-ফয়সালা ,জিহাদ ও শাসন-কর্তৃতের ব্যপারে না মানা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

" তবে কি তোমরা এই কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করো ?" (২:৮৫)

মহানবীর (সাঃ) সত্যিকার অনুসরণই হচ্ছে হেদায়েতের পথে টিকে থাকার এবং ভ্রান্ত পথ থেকে দূরে থাকার একমাত্র সুনিশ্চিত পদ্ধতি।

অতীতে মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত এবং খন্ড খন্ড হয়ে গিয়েছিল, কারণ তারা সুন্নাহ অনুযায়ী চলতে পারেনি। তদুপরি, এই একই কারনে উদ্ভব হয়েছে দ্বীনের মাঝে নানান নতুন সংযোজন অর্থাৎ বিদা'য়াত যা কিনা আমাদের বিভক্ত করেছে অসংখ্য দলে যার মাঝে বাহাত্তরটি দলই যাবে জাহান্নামের আগুনে। হেদায়াত এবং মুক্তি একমাত্র নবী (সাঃ) এর অনুসরণের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। প্রত্যেক বিদ'য়াত এবং ভ্রান্ত মতবাদই ভয়াবহ। যারা এগুলো উদ্ভব ঘটায় তারা ঘৃণিত, তাদের সব কাজই প্রত্যাখ্যাত এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

মুসলিম ভাইয়েরা, এই হলো আপনাদের চুড়ান্ত লক্ষ্য যা অর্জনের জন্য আপনাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের পন্থা হলো- এক আল্লাহ্র প্রতি নিজেকে একনিষ্ঠ ভাবে আত্মসমর্পণ করা এবং নবীর (সাঃ) পরিপূর্ণ অনূসরনের জন্য চেষ্টা করা।

যদি আপনি লক্ষ্য অর্জন করতে চান এবং এই পথে চলতে চান তাহলে আপনার প্রস্তুত থাকতে হবে অন্য সবার চেয়ে আলাদা এক জীবন যাপন করতে, কারণ বেশীর ভাগ মানুষই আজ পথভ্রষ্ট, সম্পূর্ণ অন্ধকারের মাঝে সামান্য আলোর রশ্মি যেমন সুস্পষ্ট পৃথক থাকে, ঠিক তেমনি এসব ভ্রান্ত মানুষের মাঝে সত্যের অনুসারী মানুষও হয়ে যায় সুস্পষ্ট বিচ্ছিন্ন। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, **'ইসলাম শুরু হয়েছে অপরিচিত হিসেবে এবং আবার একসময় এটি অপরিচিত হয়ে যাবে, সুসংবাদ তাদের জন্য যারা অপরিচিত-এর অনুসারী ।'(মুসলিম)**

বর্তমান মানুষ প্রতিযোগিতা করে সম্পদ ও প্রতিপত্তির জন্য, খ্যাতি এবং ক্ষমতার জন্য। তারা মনে করে এই দুনিয়া তাদের একমাত্র আবাস এবং এটাই তাদের যাত্রার শেষ। তাই এগুলো হয়ে গেছে তাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং এগুলো অর্জনের জন্য তারা কঠোর পরিশ্রম করতেও প্রস্তুত। কিন্তু যারা পরকালের উপর বিশ্বাসী তারা এই দুনিয়াতে মুসাফিরের মতো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'পৃথিবীতে এমনভাবে থাকো যেন তুমি আগন্তক বা মুসাফির ।'(বুখারী, ইবনে উমার থেকে বর্ণিত)

একজন আগুন্তক বা মুসাফিরের অন্তর কখনো তার সত্যিকার আবাস বা তার শেষ গন্তব্য ছাড়া আর কোন কিছুতেই কোন আকর্ষণ বোধ করে না।

" যারা আল্লাহ্কে ভয় করে তাদের জন্য তাদের মালিকের কাছে রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে------ ।" (৩:১৫)